আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

কলা অনুষদ

উপস্থাপক

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান

পি-এইচ. ডি. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

400504

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী

পি-এইচ.ডি. (লন্ডন)

অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারী-২০০২

Dhaka University Institutional Repository

Ph.D.

GIFT

400504

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা

400504

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী বেক (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

400504

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.)

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

400504

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা)
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى

الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داك ، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
Ph.D. (London), M.A. (Double), B.A. Hons (Dhaka)
M.M. (Dhaka), F.R.A.S.

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. 9661920-59/4310, 4313. Res. 8612992
E-mail : harchow@du.bangla.net

Ref : Date :

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি-এইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান (রেজি: নং ৪৭/১৯৯৮-৯৯) কর্তৃক দাখিলকৃত **"আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

২. এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩. এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং তুলনামূলক ইসলামী সাহিত্যের নতুন দিগন্ত।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা সন্দর্ভটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

১৮/১২/২০০২

(ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"** শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণার পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি।

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান
০৭.২.২০০২

(মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান)
পি-এইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا	-	অ	ء	-	অ/'
ب	-	ব	ي	-	য়
ت	-	ত	ـَ	-	া
ث	-	ছ/স	ـِ	-	ি
ج	-	জ	ـُ	-	ু
ح	-	হ	اَ	-	া
خ	-	খ	ـِيْ	-	ী
د	-	দ	ـُوْ	-	ূ
ذ	-	য	أَ	-	আ
ر	-	র	إِ	-	ই
ز	-	য/ঝ	إِي	-	ঈ
س	-	স	أُ	-	উ
ش	-	শ	أُو	-	ঊ
ص	-	স	يَ	-	ইয়া/য়্যা
ض	-	দ/জ	يِ	-	ই/য়ি
ط	-	ত	يِـى	-	য়ী
ظ	-	য	يُ	-	ইউ
ع	-	'অ/'	يُو	-	ইঊ
غ	-	গ	وَ	-	ওয়া
ف	-	ফ	وِ	-	বি
ق	-	ক	وِي	-	বী
ك	-	ক	وُ	-	উ/বু
ل	-	ল	وُو	-	ঊ/বূ
م	-	ম	عَا	-	'আ
ن	-	ন	عِي	-	'ঈ
و	-	ও	عُو	-	'ঊ
ه	-	হ			

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	ভূমিকা	১-৫
প্রথম অধ্যায়	আহমাদ শাওকীর জীবন চরিত	৬-৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	নজরুল ইসলামের জীবন কথা	৪৬-১০৯
তৃতীয় অধ্যায়	আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম ও কাব্যপ্রতিভা	১১০-১৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভার ও কবি-প্রতিভা	১৪৪-১৯০
পঞ্চম অধ্যায়	আহমাদ শাওকীর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা	১৯১-২৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	আল্লাহর প্রতি ঈমান ও 'আকীদা	১৯৫-২১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নবী-রাসূলগণের প্রশস্তিগাঁথা	২১৪-২৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য	২৪৭-২৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	মুসলিম খিলাফতের প্রশংসা	২৬৬-২৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা	২৮৭-৪৩৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	আল্লাহর প্রশংসাসূচক 'হাম্দ' ও 'কাব্য আমপারা'	২৯২-৩২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক 'না'ত' ও 'মরু-ভাস্কর'	৩২৮-৩৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদের জাগরণ	৩৭৩-৪১৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার	৪২০-৪৩৯
	উপসংহার	৪৪০-৪৪৪
	আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	৪৪০-৪৪৪
	গ্রন্থপঞ্জি	৪৪৫-৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার রহমতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার দীর্ঘদিনের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা আধুনিক যুগে বেশ গুরুত্বের সাথে চলে আসছে। তুলনামূলক সাহিত্য এমন একটি সমালোচনা সাহিত্য যা লেখকের একটি সাহিত্যকর্মকে অনুরূপ সাহিত্যকর্মের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। এটি আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং বিশেষতঃ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত। সুতরাং পৃথিবীর দুই প্রান্তের দু'টি দেশের দু'জন ভিন্ন ভাষা-ভাষী কবি-সাহিত্যিকের একজনের কাব্যকর্মের সাথে আরেকজনের কাব্যকর্মের তুলনা করাটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বটে। সাহিত্য আলোচনায় দু'জন ভিন্ন লেখকের কর্ম ও চিন্তাধারাকে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উভয়ের কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যায়ন করা গেলেই কেবল সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় পারস্পরিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেকখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মিসরবাসী যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, নানা প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, বৈদেশিক শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীকার এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত, ঠিক এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে এ লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও দিশেহারা জাতিকে জ্ঞানের আলোর দিকে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার দিকে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক মুক্তির নির্দেশনার লক্ষ্যে আরবের ভাগ্যাকাশে যিনি ধ্রুবতারা সদৃশ উদিত হয়েছিলেন, যিনি আলোর মশাল হাতে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার ক্ষুরধার লেখনীতে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির সুপ্তপ্রাণে বিপ্লবের গণজোয়ার বয়েছিল, যিনি আর্তমানবতার কণ্ঠস্বররূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তিনিই হচ্ছেন মিসরের জাতীয় জাগরণের কবি আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)'আমীর আল-শু'আরা' বা 'কবি সম্রাট'। আধুনিক যুগের আরো অনেক কবির ন্যায় তিনিও তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য অঙ্গনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করেছেন। অবশ্য অবিস্মরণীয় অবদানের দিক থেকে সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের চেয়ে নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। আরব জাতির সাহিত্যের নেতা হওয়ায় তিনি ছিলেন জাতির ভাষ্যকার ও মুখপাত্র। শুধু কবিতা নয়, আরবী গদ্য সাহিত্যেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। বিশেষতঃ আরবী কাব্যনাটক রচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর 'কবি সম্রাট' উপাধির যথার্থতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) যেমন শ্রেষ্ঠত্বের আঙ্গনে সমাসীন, তেমনিভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্যজগতে আহমাদ শাওকীও কবি সম্রাট উপাধিতে অভিষিক্ত এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য তাঁকে নিয়ে রীতিমত গর্বিত। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আরবী সাহিত্য ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগসহ সরকারী-বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আহমাদ শাওকীর নির্বাচিত কবিতাবলী পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। কবির জীবনী ও সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অনেক হলেও তাঁর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা অতি নগণ্য।

উল্লেখ্য যে, প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই আরবী কবিতায় ধর্মীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবী কবিতায় নতুন আদর্শরূপে ইসলামী চিন্তাধারা সংযোজিত হয়। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবতঃই ইসলামী সাহিত্য আরবী কাব্য সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিদ্যমান। শুধু ভাষা ও সাহিত্য নয়, আরবদের প্রাচীন অবস্থা তথা সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি ধর্মীয় অবস্থা অবগত হতে হলেও কবিতার উপর নির্ভর করতে হয়। কাল পরিক্রমায় অনেক আরব কবি তাঁদের কবিতায় ইসলামী ভাবধারার চিত্র এঁকেছেন। পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণ করে আধুনিক যুগের খ্যাতনামা কবি আহমাদ শাওকী স্বীয় কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারাকে নতুন আঙ্গিকে ও অনুপম ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) মূলতঃ বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের সুর ও বাণী থাকলেও সে বিদ্রোহ ছিল অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য প্রতিভা। নজরুল ইসলাম তিন সহস্রাধিক গানের রচয়িতা ও সুরকার। এই সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য তিনি অনেকের কাছে বাংলার 'বুলবুল কবি' বলেও খ্যাতি অর্জন করেন। উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণের লক্ষ্যে তিনি অসংখ্য ইসলামী কবিতা, হাম্দ, না'ত ও ভক্তিমূলক গান লিখেছেন। এজন্য নজরুল ইসলামকে 'মুসলিম রেনেঁসার কবি' বলেও চিহ্নিত করা হয়। কেবল ইসলামী চিন্তা ও ভাবনায় নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ অসাধারণ শিল্প কুশলতায় প্রয়োগ করেছেন। এমনিভাবে সংস্কৃত শব্দ প্রভাবিত বাংলা ভাষার গতানুগতিক রূপ বদলিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনামূলক কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের যুগে তাঁর প্রকৃত সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি রাজনৈতিক জাগরণী কবিতা লিখে তৎকালীন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করেন। কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়াও সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক সেবক হিসেবে তাঁর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরুণ জীবনে তিনি একাধারে নব্য মিসরের মহান নেতা জামালুদ্দীন আল-আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.) এর 'প্যান-ইসলামিক' চিন্তাধারা ও নব্য তুরস্কের জন্মদাতা মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রি.) এর জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁর সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটান। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনও তাঁকে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু নজরুল ইসলামের সমস্ত কাব্যসাহিত্যকর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাধারাই তাঁর মানবিক আবেদনমূলক কবিতার প্রকৃত উৎস।

আরব কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী ও বাংলার জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম উভয়ের সাহিত্য জুড়েই ইসলামী চিন্তাধারা বিদ্যমান অর্থাৎ দু'জন প্রথিতযশা কবি স্ব স্ব কবিতায় সবচেয়ে বেশী ইসলামের জয়গান করেছেন। তবে দু'জনের ইসলামী চিন্তাধারাসম্পন্ন কবিতার মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একই ভঙ্গীতে তাঁরা ইসলামের কথা লিখেননি। উভয়ের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এবং চিন্তা-কল্পনাও এক রকম নয়। উভয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটও এক ছিল না। দু'জন জাতীয় কবির কোন কোন কবিতার পংক্তির মধ্যে ভাবের মিল থাকার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের একজন আরেকজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই উভয়ের কবিতায় বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে ইসলামী চিন্তাধারার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা ও তুলনামূলক সাহিত্যের বিশ্লেষণধারায় সেগুলোকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা বর্তমান গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য। এতে বাংলা ও আরবী সাহিত্য এবং ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের পাঠক-পাঠিকাদের উভয়ের সাহিত্য অধ্যয়ন ও তাঁদের ইসলামী চিন্তাধারা হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়ক হবে বলে দৃঢ় আশা করা যায়।

অভিসন্দর্ভের শুরুতে আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পৃথকভাবে উপস্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও প্রাজ্ঞ সমালোচকদের বিভিন্ন তথ্যবহুল মন্তব্য পর্যালোচনা করতঃ সঠিক অভিমত নিরূপণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরবী ও বাংলা সাহিত্যে যথাক্রমে আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ অবদান উল্লেখ করতঃ তাঁদের অসামান্য কবি-প্রতিভার পর্যালোচনা এবং উভয়ের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি। বিশেষতঃ "আহমাদ শাওকীর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা" সংক্রান্ত বিষয়টি তাঁর কবিতার যথাযথ উদ্ধৃতির মাধ্যমে বঙ্গানুবাদ সহকারে তুলে ধরার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদ্ব্যতীত "নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা" সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ইসলামী কবিতাবলীর প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি প্রদানের চেষ্টা করেছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমরা পুরো বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে **"আহমাদ শাওকীর জীবন চরিত"** শিরোনামে কবির জন্ম, বংশ পরিচয়, বাল্যকাল, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা জীবনে বিদেশ গমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রাজপ্রাসাদে কর্মজীবনের ব্যতিব্যস্ততা, নির্বাসন জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা, জাতীয় সংবর্ধনা ও কবি সম্রাট উপাধি অর্জন, পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ভ্রমণ ও অবকাশ যাপনের পর বার্ধক্যে জীবনাবসান, তাঁর উন্নত ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **"নজরুল ইসলামের জীবন কথা"** শিরোনামে কবির জন্ম, বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন, সৈনিক জীবন, কলকাতায় সাহিত্য জীবন, সাংবাদিক জীবন, কারাজীবন, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন, জাতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত তাঁকে সংবর্ধনা, অসুস্থ ও সম্বিতহারা জীবন, চিকিৎসার্থে বিদেশ প্রেরণ, বার্ধক্য জীবন, কবিকে বাংলাদেশে আনয়ন ও ধানমন্ডিতে অবস্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব, আর্মি ক্রেষ্ট ও একুশে পদক প্রদান, ইন্তেকাল ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁরই ইচ্ছানুসারে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে **"আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম ও কাব্য প্রতিভা"** শিরোনামে কাব্যক্ষেত্রে ও গদ্যসাহিত্যে আহমাদ শাওকীর অবদান, তাঁর কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যাবলী ও নাট্যদক্ষতা সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকবৃন্দের মতামত ও মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে। সেই সাথে আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা, আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যে তাঁর স্থান, বিশ্বকবিদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা, কবিতার মূল্যায়ন এবং তাঁর মূল্যায়নে প্রসিদ্ধ আরব কবি-সাহিত্যিকদের যথার্থ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে **"নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভার ও কবি-প্রতিভা"** শিরোনামে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের অসাধারণ রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছি। এতদসঙ্গে যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা হিসেবে নজরুল ইসলামের মূল্যায়নে বিশিষ্ট পণ্ডিত, লেখক ও সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পর্যালোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়টি **"আহমাদ শাওকীর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"** সম্পর্কিত। আহমাদ শাওকীর কাব্য সংকলন দীওয়ান 'আল-শাওকিয়্যাত'-এর এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন কবিতাবলী। পর্যালোচনার সুবিধার্থে এবং বিষয়টিকে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে আলোচ্য অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে "আল্লাহর প্রতি ঈমান ও 'আকীদা", দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "নবী রাসূলগণের প্রশস্তিগাঁথা", তৃতীয় পরিচ্ছেদে "ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য" এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে "মুসলিম খিলাফতের প্রশংসা" এবং ওসমানীয় তুর্কী খলীফাদের সমর্থনে কবির আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কিত কবিতাবলী সন্নিবিষ্ট করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি **"নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"** সম্পর্কিত। নজরুল রচনাবলীর এক বিরাট অংশ জুড়ে বিদ্যমান আছে ইসলামী কবিতা। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী ও পূর্ণ তত্ত্ব-তথ্যাদি সহকারে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে আলোচ্য অধ্যায়টিকে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে "আল্লাহর প্রশংসাসূচক 'হাম্‌দ' ও পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা'", দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক 'না'ত' ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী কাব্য 'মরু-ভাস্কর'", তৃতীয় পরিচ্ছেদে "ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদের জাগরণ" এবং চতুর্থ

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদে নজরুল ইসলামের কবিতায় "আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার" সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কবিতাবলীর যথাযথ চরণের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে উপসংহারে **"আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা"** উপস্থাপন করে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে উভয় কবির সামগ্রিক অবস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনামূলক মূল্যায়ন উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

পরিশেষে অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী গ্রন্থাবলী, গবেষণা জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রভৃতি তথ্য-সূত্র নির্দেশনা সম্বলিত একটি তালিকা গ্রন্থপঞ্জিতে সংযোজিত করেছি।

এ অভিসন্দর্ভে যেসব মনীষীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে আমরা সাধারণতঃ প্রথমে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যুর সাল উল্লেখ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু যাঁদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ কোনভাবেই উদঘাটন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই তা করা হয়নি।

আরবী, উর্দু ও ফারসী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে বাংলায় সর্বজন গ্রাহ্য বা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছি। তবে প্রয়োজনবোধে এবং জটিলতা পরিহারের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয়নি। প্রসিদ্ধ স্থানের নামের ক্ষেত্রে বাংলায় ব্যবহৃত নিয়মের অনুসরণ করা হয়েছে এবং অপ্রসিদ্ধ নামের বেলায় প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের আরবী ও বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিতবর্গের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে গবেষণার উপাত্ত-উপকরণ আহরণ করেছি এবং দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকে মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেছি। যাঁদের সার্বিক সহায়তায় গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে আমি সর্বপ্রথম আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী স্যারের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সর্বোতভাবে গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদান, প্রয়োজনীয় উপাদান, বই-পুস্তক, সাময়িকী প্রভৃতি তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মে সহায়তা প্রদান করে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। তিনি স্বীয় কর্মব্যস্ততার মাঝে মূল্যবান সময় ব্যয় করে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আমার প্রস্তুতকৃত সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও সমৃদ্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

অতঃপর আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এ অভিসন্দর্ভ রচনার ব্যাপারে আমাকে প্রতিনিয়ত মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ, সক্রিয় সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা ও নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

তাছাড়া এ গবেষণাকর্মে আমার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকমন্ডলীসহ অনেকেই ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই-পুস্তক ও তথ্যসূত্র সরবরাহ করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, জাতীয় গণ-গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব ইসলামাবাদ লাইব্রেরী-এর কুতুবখানাসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে অকপটে আমার ঋণ স্বীকার করছি, যারা আমাকে নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, দুর্লভ গবেষণা জার্ণাল, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য আহরণে অকৃত্রিম সহায়তা করেছেন। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

যেসব মূল্যবান গ্রন্থ থেকে আমি গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সকল গ্রন্থের রচয়িতাদের প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার দুর্গম পথ পরিক্রমায় শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভের বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিনি। এক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার যথার্থ প্রয়োগ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর উপজীব্য গ্রহণে সুদীর্ঘ সময় ব্যয়ে রচিত এহেন গবেষণাকর্ম সার্বিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে তুলনামূলক ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে সুধী, গবেষক, শিক্ষানুরাগী, সাহিত্যামোদী, ছাত্র-ছাত্রী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের সামান্যতম উপকার ও জ্ঞানের খোরাক জোগাতে সক্ষম হলে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করে সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনায় বিনীত প্রার্থনা করছি। আমীন।

ঢাকা : ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ইং

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহমাদ শাওকীর জীবন চরিত

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আহমাদ শাওকী 'বেক'[১] ১২৮৫ হি. /১৮৬৮ খ্রি. মতান্তরে ১৮৬৯ সালে[২] খেদীব ইসমাঈল পাশা (১২৪৫-১৩১২ হি./১৮৩০-১৮৯৫ খ্রি.) এর শাসনামলে (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) মিসরের রাজধানী কায়রো নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩]

তাঁর পিতার নাম আলী (মৃ. ১৩১৫ হি./১৮৯৭ খ্রি.)[৪], দাদার নাম আহমাদ শাওকী বেক, আর নানার নাম ছিল আহমাদ বেক হালীম আল-নাজ্দী।[৫] তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই মিসরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৬] তাঁর দাদা ছিলেন তুর্কীস্থানের কুর্দ বংশোদ্ভুত; আর দাদী ছিলেন জার্কাসী, নানা তুর্কী এবং নানী গ্রীক বংশোদ্ভুত। ফলে পিতৃকুলের দিক থেকে তাঁর শিরায় আরবী, কুর্দী ও জার্কাসী রক্ত এবং মাতৃকুলের দিক থেকে তাঁর ধমনীতে তুর্কী ও গ্রীক রক্ত প্রবাহমান ছিল।[৭]

---

১. 'বেক' بك একটি সর্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় তুর্কী উপাধি। দ্রঃ আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩), পাদটীকা, পৃ. ৩৯। ১৯০৮ সালে ওসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ (১২৫৮-১৩৩৭ হি./১৮৪২-১৯১৮ খ্রি.) তাঁর খিলাফতকালে (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.) আহমাদ শাওকীকে এ বিরল মর্যাদাসম্পন্ন 'বেক' উপাধিতে ভূষিত করেন। যার অর্থ 'সাহিব আল-সা'আদা' صاحب السعادة বা 'সৌভাগ্যের অধিকারী'। এ উপাধিটি কবি আজীবন নিজের নামের সাথে বহন করেন। মিসরের খুব স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দ্রঃ মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন, আ'লাম আল-নাসর ওয়া আল-শি'র ফী আল-আসর আল-আরবী আল-হাদীস, (মাদ্রাজঃ দার হাফিজা লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশর, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৫৫।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬১), পৃ. ১১০। আহমাদ শাওকী কর্তৃক প্যারিস থেকে আইনশাস্ত্রে অর্জিত লিসান্স সার্টিফিকেট অনুসারে ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্যুব কবির জন্মসন ১৮৭০ সালের ১৬ ই অক্টোবর বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ আল-আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, (বৈরুত : আল-মারকায্ আল-আরবী লি আল-সাকাফা ওয়া আল-'উলুম, তা. বি.), পৃ. ২০৮।

৩. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুত : আল-মাত্‌বা'আত আল-বুলিসিয়া, তা. বি.), পৃ. ৯৭২; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, (বৈরুতঃ দার আল-জীল, ১৯৭০), পৃ. ৭৪; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুতঃ দার আল-সাকাফা, ২৮তম সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ৫৭৯; ইন'আম আল-জুন্দী, আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুতঃ দার আল-রাঈদ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।

৪. মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন, আ'লাম আল-নাসর ওয়া আল-শি'র ফী আল-আসর আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ২৪৩।

৫. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পাদটীকা, পৃ. ৩৯।

৬. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, (কায়রোঃ ১৯৭২), পৃ. ৪।

৭. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২; ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১০; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শির আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, (Leiden; E. J. Brill, 1984), S. A. L. Volume-X, P. P. 35-36.

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আহমাদ শাওকীর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,[৮]

إِنِّيْ عَرَبِيٌّ تُرْكِيٌّ يُوْنَانِيٌّ جَرْكَسِيٌّ. أُصُوْلٌ أَرْبَعَةٌ، فِيْ فَرْعٍ مُجْتَمِعَةٌ، تَكْفُلُهُ لَهَا مِصْرُ كَمَا كَفَلَتْ أَبَوَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

"নিশ্চয়ই আমি হচ্ছি আরব, তুর্কী, গ্রীক ও জার্কাসী। একটি শাখায় চারটি মূল একত্রিত, যেগুলোকে মিসর আমার জন্য লালন-পালন করেছে, যেমন ইতোপূর্বে আমার পিতা-মাতাকে লালন পালন করেছিল।"

উল্লেখ্য যে, আহমাদ শাওকীর পিতা আলী ইব্‌ন আহমাদ শাওকী বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার প্রচুর সম্পদের কারণে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের তত্ত্বাবধানে দেখতে পান। অতঃপর আহমাদ শাওকী জন্মলাভ করলে তাঁর পিতা আলী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট প্রচুর ধন-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়। পিতার সম্পদ সম্পর্কে আহমাদ শাওকী বলেন,[৯]

جَمَعَ أَبِيْ مِنَ الْمَالِ كَمَا جَمَعَتْ أُسْرَتِيْ مِنَ النَّسَبِ: جَمَعَتْ بَيْنَ كُرْدِيَّةِ الأَبِ، وَتُرْكِيَّةِ الأُمِّ، وَشَرْكَسِيَّةِ الْجَدِّ لِلأَبِ، وَيُوْنَانِيَّةِ الْجَدَّةِ لِلأُمِّ.

"আমার পিতা সম্পদ জমায়েত করেন, যেমন আমার পরিবার বংশের গৌরব একত্রিত করেন। আমার পরিবার কুর্দী পিতা, তুর্কী মাতা, জার্কাসী দাদা ও গ্রীক নানীর ধারা একত্রিত করেন।"

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, আহমাদ শাওকীর দাদা আহমাদ শাওকী বেক আরবী ও তুর্কী ভাষায় লেখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর 'আক্কার শাসক আহমাদ পাশা আল-জায্‌যার (১৭২০/১৭৩৫-১৮০৪ খ্রি.) এর একখানা সুপারিশপত্র নিয়ে মিসরে মুহাম্মদ আলী পাশা (১১৮৪-১২৬৫ হি./১৭৭০-১৮৪৯ খ্রি.) এর রাজত্বকালে (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) তাঁর দরবারে আগমন করেন। মিসরাধিপতি তাঁকে উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সুলতানের কৃপায় তিনি উচ্চস্তরে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। এমনকি পরবর্তীতে তিনি সাঈদ পাশা (১২৩৮-১২৭৯ হি./১৮২২-১৮৬৩ খ্রি.)এর শাসনামলে (১৮৫৪-১৮৬৩ খ্রি.) মিসরীয় শুল্ক বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা থেকে প্রাপ্ত সহানুভূতির ফলে তিনি তাঁকে নিয়োজিত চাকুরীর কেন্দ্রে কাজ করা সহজসাধ্য করে দেন এবং ধনীদের থেকে আরোপিত প্রচুর অর্থ সম্পদ লাভ করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পক্ষান্তরে আহমাদ শাওকীর মাতার বংশধারা তাঁর পিতার বংশ থেকে ভিন্নতর ছিল। কারণ তাঁর মাতা ছিলেন গ্রীক পরিচারিকার কন্যা, খেদীব ইসমাঈল পাশার গৃহে যার ছিল অবাধ পদচারণা। আর আহমাদ শাওকীর নানা আহমাদ বেক হালীম আল-নাজ্‌লী যৌবনকালেই মিসরে আগমন করেন এবং ইব্‌রাহীম পাশা (১২০৪-১২৬৪ হি./১৭৮৯-১৮৪৮ খ্রি.) এর অধীনে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত

---

৮. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৯; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২০৯, উদ্ধৃত মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত বি কলমে শাওকী, ১ম খণ্ড, (কায়রো, ১৮৯৮)।

৯. ড. আবদুল মজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী আমীর আল-শু'আরা ওয়া নাগ্‌ম আল-লাহ্‌ন ওয়া আল-গিনা, (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১৩ হি./ ১৯৯২ খ্রি.), পাদটীকা, পৃ. ৪৬; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি ইব্রাহীম পাশা কর্তৃক আযাদকৃত এক রমণীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। খেদীব ইসমাঈল পাশার বিশেষ উকিল থাকা অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন।[১০]

আহমাদ শাওকীর নানা আহমাদ বেক হালীম আল-নাজ্‌দীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খেদীব ইসমাঈল পাশা নিম্নে উদ্ধৃত অংশে চমৎকার একটি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন,[১১]

لَمْ أَرَ أَعفَّ مِنْهُ وَلاَ أَقْنَعَ مِنْ زَوْجــتِهِ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّهِ أَبِيْ حَلِيْمًا لِحِلْمِهِ لَسَمَّيْتُهُ عَفِيْفًا لِعِفَّتِهِ.

"আমি কখনো তাঁর চেয়ে অধিক যত্নবান এবং তাঁর স্ত্রীর চেয়ে অধিক অল্পে তুষ্ট কাউকে দেখিনি। যদি আমার পিতা তাঁর সহনশীলতার কারণে তাঁকে হালীম (পরম সহনশীল) বলে নামকরণ না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁকে তাঁর মহত্ত্বের জন্য 'আফীফ (মহৎ প্রাণ) বলে নামকরণ করতাম।"

বাল্যজীবন

আহমাদ শাওকী মাত্র তিন বছর মায়ের যত্নে প্রতিপালিত হন। অতঃপর শৈশবকালেই শিশু আহমাদ শাওকীর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর নানী 'তিমযার'।[১২] তিনি ছিলেন তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র। ইব্রাহীম পাশার আমল থেকেই রাজপ্রাসাদের সাথে তিমযারের ছিল দৃঢ় সম্পর্ক।[১৩] ফলে তিনি খেদীবী পরিবারে খুব যত্নের সাথে শিশুটির তত্ত্বাবধান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে আহমাদ শাওকীর বাল্যজীবনে খেদীবী রাজদরবারে সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আহমাদ শাওকীর তিন বছর বয়সে একদা তাঁর নানী তাকে কাঁধে বহন করে খেদীব ইসমাঈল পাশার নিকট নিয়ে যান। ইসমাঈল পাশা আহমাদ শাওকীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, শিশুটির দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে যা বিস্তৃত ভূখন্ডের দিকে অবনত হচ্ছে না। তখন খেদীব এক থলে স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে পাঠালেন এবং তাঁর নানীকে সেগুলো শিশুটির পায়ের কাছে বিছিয়ে দিতে নির্দেশ করলেন। তখন শিশু শাওকী তার চক্ষুদ্বয়কে নিম্নমুখী করে অপলক দৃষ্টিপাত করে সেগুলো নিয়ে খেলায় মত্ত হলেন। এতদর্শনে ইসমাঈল পাশা মুচকি হেসে আহমাদ শাওকীর নানীকে বললেনঃ 'যখনই সে তার চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী করে রাখবে, তুমি তার জন্য স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিবে এবং তার

---

১০. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, (কায়রো, তা. বি.), পৃ. ২৫; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ.২০৮; আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৯; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭৯।

১১. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২০৮।

১২. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, 'আ'লাম আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস', ঈলিয়্যা হাভী সম্পাদিত, (বৈরূতঃ আল-মাকতাব আল-তিজারী লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্‌র ওয়া আল-তাওযী', ১ম সংস্করণ, ১৯৭০), পৃ. ৩৭। খেদীব ইসমাঈল পাশা আহমাদ শাওকীর নানীর নামকরণ করেন 'তিমযার'। তবে অপরাপর বর্ণনায় আহমাদ শাওকীর নানীর নাম 'তিমযার' (تِمْزَار) এর স্থলে 'তিমরায' (تِمْرَاز) উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রঃ ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৪৬; ড. শাওকী দায়ফ, ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাক্‌দিহি, (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭),পৃ. ৩৩২।

১৩. আহমাদ শাওকীর পিতা আলী ছিলেন অমিতব্যয়ী। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পদ অপচয় দ্বারা নিঃশেষ করে ফেলেন। শিশু পুত্রকে যথাযথভাবে লালন-পালনে অক্ষম ছিলেন বিধায় পিতা-মাতার অবর্তমানে আহমাদ শাওকী তাঁর নানীর নিকট লালিত-পালিত হন। আর আহমাদ শাওকীর নানী ছিলেন খেদীব ইসমাঈল পাশার শাহী দরবারের একজন গৃহপরিচারিকা। দ্রঃ আবদুর রহমান তাহির সুরতী, তারীখে আদবে আরবী লি আহমাদ হাসান যাইয়্যাত, (লাহোর : শায়খ গুলাম আলী এন্টারপ্রাইজ পাবলিশার্স, ১৯৬১), উর্দু অনুবাদ, পৃ. ৬৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে অনুরূপ খেলা করবে, যে পর্যন্ত না সে নীচের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়।' অতঃপর নানী তোষামোদ ও কৌশলছলে উত্তর দিলেন: 'হে আমার কর্তা ! এমনটি কেবল আপনার দ্বারাই সম্ভব, আপনার দাওয়াখানা থেকেই এ ঔষধ বের হয়ে আসবে।' তখন খেদীব বললেন: "তুমি যখন ইচ্ছা শিশুটিকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। মিসরে আমিই সর্বশেষ ব্যক্তি যে স্বর্ণ বিক্ষিপ্ত করতে পারি।"[১৪]

মিসরে আহমাদ শাওকীর অবস্থান ছিল অস্থিরতার স্রোতধারায় পরিবেষ্টিত এমন পরিবেশাদির মধ্যে যা সমাজের প্রথা ও ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট ছিল। শিশু শাওকী তাঁর অবস্থানস্থলে থেকে নানীর ক্রোড়ে ইসমাঈল পাশার রাজদরবারে বসে মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক একটি প্রচন্ড আক্রমণের মাধ্যমে বিজিত একটি রাষ্ট্রের কাহিনী শুনতেন। যখন তাঁর নানী মুহাম্মদ আলী পাশার মিসরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতেন তখন তিনি মুহাম্মদ আলী ও তাঁর সন্তানেরা যা সম্পাদন করেছে এবং পূর্ববর্তী সামরিক শাসকবৃন্দের কার্যাবলীর মধ্যে তুলনার প্রয়াস পেতেন।[১৫] আহমাদ শাওকী অবাক বিস্ময়ে এগুলো উপলব্ধি করতেন, এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর শরীরে শিহরণ জাগত। অতঃপর নানী তাঁর এ অবস্থায় তাঁকে আনন্দের সাথে কোলে জড়িয়ে নিতেন। এমনিভাবে বাল্যাবস্থায় আহমাদ শাওকী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর নানীর কথা, আদর্শ কাহিনী ও মজাদার গল্পসমূহ শুনতেন এবং আনমনে বসে গ্রীকে তার নানার বাড়ী ও তুরস্কে তাঁর দাদার বাড়ী গমনের ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তাঁর এ আকাঙ্খাগুলো পূর্ণতা লাভ করেছিল। আহমাদ শাওকীর অবস্থানস্থল তাঁর মধ্যে রাজদরবারের ব্যক্তিবর্গের নৈকট্যের অনুভূতিকে বলিষ্ঠ করেছে যারা তাঁকে ও তাঁর নানীকে আশ্রয় দান করেছিল।[১৬]

এভাবে ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদে নানীর সান্নিধ্যে আহমাদ শাওকীর বাল্যকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে অতিবাহিত হতে লাগলো। আর তিনি তাঁকে শিশুর সম্ভ্রান্ত জীবনে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। এর ফলে শিশু শাওকী সেখানে রাজকীয়ভাবে কৌলিন্যের মাঝে আনন্দঘন পরিবেশে বয়ঃবৃদ্ধি লাভ করতে থাকেন।[১৭]

শিক্ষাজীবন (১৮৭৩-১৮৯১ খ্রি.)

ক. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

আহমাদ শাওকী মিসরের বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১২৯০ হি./১৮৭৩ সালে চার বৎসর বয়সে তাঁকে কায়রোর 'হানাফী মহল্লায়'[১৮] অবস্থিত আল-শারব

---

১৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পাদটীকা, পৃ. ৪৬-৪৭; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়ূব, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাকদ, পৃ. ২০৯; ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩), পৃ. ১০; Mounah A. Khouri, Poetry and the Making of Modern Egypt 1882-1922, (Leiden : E. J. Brill, 1971), P.56.

১৫. ফীলীব হাত্তী, তারীখ আল-আরব, (বৈরুত: দার গানদূর লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্‌র ওয়া আল-তাওযী', ৫ম সংস্করণ, ১৯৭৪), পৃ.৭৭৫।

১৬. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, (কায়রো, ১৯৪৭), পৃ. ৮।

১৭. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১০।

১৮. আহমাদ আল-ইস্‌কানদারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুত:দার ইহ্‌ইয়া আল-'উলুম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.),পৃ. ৫৭০; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭৯; প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্বাস হাসান কায়রোস্থ উক্ত মহল্লায়

Dhaka University Institutional Repository

সালিহ' اَلشَّيْخُ صَالِحُ মক্তবে ভর্তি করা হয় এবং তথায় তিনি পড়া ও লেখার নিয়মাবলী শিখেন। সেখানে একদল রুক্ষ, চঞ্চল, দুষ্টমনা ছেলের সংস্পর্শে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের দিনগুলো নিরানন্দে কাটে। এই মক্তবের বেদনা বিধুর দুঃসময়ের চিত্র তাঁর স্মৃতিতে চিরভাস্বর থেকে যায় যা তাঁর ক্রন্দনরত নিম্নোক্ত বাক্যে বিধৃত হয়েছে,[১৯]

دَخَلْتُ فِيْ مَكْتَبِ الشَّيْخِ صَالِحٍ وَأَنَـا فِي الرَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِيْ، وَهِـيَ مِنْ أَهْلِـيْ جِـنَايَـةٌ عَلَى وِجْدَانِيْ أَغْفِرُهَا لَهُمْ.

"আমাকে আল-শায়খ সালিহ্ মক্তবে ভর্তি করা হয়, তখন আমার বয়স ছিল চার বছর; আর সেটি ছিল আমার অনুভূতির উপর আমার পরিবারের একটি অপরাধ, যা আমি তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

অতঃপর পাঁচ বছর বয়সে তিনি কায়রোস্থ 'আল-মুব্তাদিয়ান' اَلْـمُـبْتَدِيَان প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন। এরপর 'মাদ্রাসা-আল-তাজ্হিযিয়্যা' اَلْمَدْرَسَةُ التَّجْهِيْزِيَّةُ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তাঁর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি গভীর মনযোগ সহকারে পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং মৌলিক প্রচেষ্টা আর নিরলস সাধনার জোরে অল্পদিনের মধ্যে ভাবাতত্ত্ব ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। সহপাঠীদের মধ্যে অতুলনীয়ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করায় এ বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন।[২০] পরে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৩০১ হি./১৮৮৩ সালে পনর বছর বয়সে তিনি এ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[২১]

এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন তাঁকে মিসরের শিশুদের গণতান্ত্রিক জীবনধারার সাথে সংস্পর্শের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু এ মেলামেশা ছিল অত্যন্ত সীমিত, কেননা বিদ্যালয় ছুটির পর তাঁকে অতি দ্রুত বাড়ি ফিরতে হতো।[২২]

তৎকালীন সময় মিসরে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ আল-আয্হারের ধারায় ঐতিহ্যমন্ডিত প্রাচ্য ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত পাশ্চাত্য নাগরিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থাটি ইউরোপ থেকে গৃহীত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বলিত। আহমাদ শাওকী ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ না করে নাগরিক শিক্ষাব্যবস্থা বেছে নেন এবং এহেন ইউরোপীয় নাগরিক শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী চিন্তাধারায় এগিয়ে যেতে থাকেন।[২৩]

নাম 'আল-সাইয়্যেদা যয়নব' (اَلسَّيِّدَةُ زَيْنَب) বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পাদটীকা, পৃ. ৩৯।

১৯. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্যব, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২০৯, উদ্ধৃত মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত বিকলমে শাওকী।

২০. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী আমীর আল-শু'আরা ওয়া নাগম আল-লাহ্ন ওয়া আল-গিনা, পৃ. ৪৭।

২১. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ.৫৭৯; আহমাদ কাফিল, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্যব, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২০৯, আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৯-৪০ ।

২২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ.১১০।

২৩. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৩০১ হি./ ১৮৮৩ সালে আহমাদ শাওকীর পিতা তাঁকে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য আইন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।[২৪] তথায় তিনি দুইটি শিক্ষাবর্ষ অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের সাথে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে অযথা সময় নষ্ট না করে একাগ্রতার সাথে পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করেন।[২৫] এ সময় আহমাদ শাওকী তাঁর নানীর দ্বারা খুব প্রভাবিত হন। প্রায়ই নানী তাঁকে নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে বের হতেন। তখন আহমাদ শাওকী নানীকে তাঁর জানাশোনা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।[২৬]

এ মহাবিদ্যায়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি শায়খ মুহাম্মদ আল-বাসূইউনী আল-বায়ানী (মৃ. ১৩১০ হি./১৮৯২ খ্রি.) এর সাথে আহমাদ শাওকীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা তাঁকে উৎসাহিত করে। আহমাদ শাওকী আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনে একজন সহায়ক খুঁজে পেয়ে তাঁর দরবারে শিষ্য হিসেবে উপস্থিত হতে থাকেন। ফলে আহমাদ শাওকীর কণ্ঠে কাব্যধারা অনুরণিত হতে থাকে। শিক্ষক তাঁর কবিতা শুনে বিমুগ্ধ হন এবং তাঁর মনে কবিতার প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে এর স্বাদ আস্বাদন ও কবিতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সক্ষম করে তুলেন।[২৭] শায়খ মুহাম্মদ আল-বাসূইউনী বিভিন্ন উপলক্ষে ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে খেদীব তাওফীক পাশা (১২৬৯-১৩১০ হি./ ১৮৫২-১৮৯২ খ্রি.) এর প্রশংসায় দীর্ঘ গীতিকবিতা রচনা করতেন। তিনি এসব কবিতা 'আল-ওয়াকায়ি' আল-মিসরিয়্যা'[২৮] ও অন্যান্য আরবী পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্তে রাজদরবারে পাঠানোর পূর্বে সেগুলোকে আহমাদ শাওকীর নিকট সংশোধনের জন্য পেশ করতেন। আহমাদ শাওকী সেগুলোতে কোন কোন শব্দের অথবা কোন কোন চরণের সংকোচন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আবার কখনো সংযোজন করে দিতেন। শিক্ষক তাঁর শৈল্পিক কুশলতায় প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁর অযাচিত প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁকে কাব্যচর্চায়ও দারুণভাবে উৎসাহিত করতেন। ফলে মাত্র ১৪ বছর বয়সে আহমাদ শাওকী খেদীব

---

২৪. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০; ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১০১; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭৯; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আযব, আন আল লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাকদ, পৃ. ২০৯।

২৫. ড. শাওকী দায়ফ, ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাকদিহি, পৃ. ৩৩২ ।

২৬. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৩।

২৭. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ.১১০; আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ. ৩৮; Salma Khadra Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, (Leiden: E. J. Brill, 1977), S. A. L. Volume-vi, P. 46.

২৮. 'আল-ওয়াকায়ি' আল-মিসরিয়্যা' الوَقَائِعُ المِصْرِيَّة একটি মিসরীয় প্রখ্যাত আরবী পত্রিকা, যা ১২৪৪ হি./ ১৮২৮ সালে মুহাম্মদ আলী পাশা (১১৮৪-১২৬৫ হি./ ১৭৭০-১৮৪৯ খ্রি.) কর্তৃক কায়রো থেকে প্রকাশ করা হয়। ইতোপূর্বে 'আল-তানবীহ' التنبيه পত্রিকাটি ব্যতীত আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি; যা বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সমরনেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (১১৮৩-১২৩৭ হি./১৭৭০-১৮২১ খ্রি.) এর নির্দেশে ১৮০১-১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ 'আল-ওয়াকায়ি' আল-মিসরিয়্যা' পত্রিকাটি তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হতো, পরে এটি আরবীতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদকমন্ডলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছেন: রিফা' বেক রাফি' আল-তাহ্তাভী (১২১৬-১২৯০ হি./ ১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.), শায়খ হাসান আল-আত্তার (মৃ. ১২৫০ হি./ ১৮৩৪ খ্রি.), আহমাদ ফারিস আল-শিদ্য়াক (১২১৯-১৩০৫ হি./১৮০৪-১৮৮৭ খ্রি.) ও শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ (১২৬৬-১৩২৩ হি./১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ। দ্র: ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল আ'লাম, (বৈরুত: দার আল-মাশরিক, দশম সংস্করণ, ১৯৮০, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৬), পৃ.৭৪২; আহমাদ আল-ইস্কান্দারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী , পৃ. ৫৪০।

Dhaka University Institutional Repository

তাওফীকের প্রশংসায় স্বরচিত প্রথম কবিতাটি নিবেদন করেন।[২৯] অতঃপর ১৩০৬ হি./১৮৮৮ সালে সরকারী গেজেট 'আল-ওয়াকায়ি' আল-মিসরিয়্যা'তে আহমাদ শাওকী বিরচিত প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।[৩০]

গ. অনুবাদ বিভাগে অধ্যয়ন

মিসরীয় সরকার এ সময় আইন মহাবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সেখানে একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] তখন আহমাদ শাওকীর প্রতি রাজপ্রাসাদ থেকে এই অনুবাদ বিভাগে ভর্তির জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই এই নির্দেশে সাড়া দিয়ে আহমাদ শাওকী ঐ অনুবাদ বিভাগে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে আরো দু' বৎসর অধ্যয়ন করার পর শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে ১৩০৫ হি./ ১৮৮৭ সালে অনুবাদ শাস্ত্রে চূড়ান্ত সার্টিফিকেট লাভ করেন। যা অনুবাদকদের সরকারী চাকুরীর জন্য প্রস্তুত করে।[৩২]

অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আল-বাসইউনীর মাধ্যমে আহমাদ শাওকী খেদীব তাওফীক পাশা ও তাঁর দরবারের নৈকট্য লাভ করেন। খেদীব তাওফীক তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং স্বীয় সান্নিধ্যে তাঁকে ধন্য করেন। তিনি আহমাদ শাওকীর ছাত্রাবস্থাকালীন প্রকাশিত কবিতা শুনে বিমুগ্ধ হন। খেদীব তাওফীকের শাসনামলে (১৮৭৯-১৮৯২ খ্রি.) রাজপ্রাসাদের খেদীবী দরবারের বিশেষ বিভাগে তাঁর পিতার পর তাঁকে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়।[৩৩] ইতোমধ্যে আহমাদ শাওকী কিছু সময় তথা প্রায় এক বৎসরকাল প্রাসাদ প্রশাসনের অনুবাদ বিভাগে কর্মরত থাকেন।[৩৪] খেদীব তাওফীকের যুগে আহমাদ শাওকী একজন সার্থক যুবকে পরিণত হয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং জীবনের এ সময়টুকুতে আহমাদ শাওকী খেদীব তাওফীকের প্রশংসায় তাঁর কাব্যশক্তি ব্যয় করতে থাকেন। খেদীবকে নিবেদিত আহমাদ শাওকীর স্তুতি কবিতাগুচ্ছ তাওফীককে মুগ্ধ করত। এমনিভাবে প্রখর মেধা ও প্রতিভা আহমাদ শাওকীকে খেদীবের নৈকট্য প্রদান করে। কিন্তু এ সময় আহমাদ শাওকীর নানী তাঁকে রাজপ্রাসাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং খেদীব তাওফীকের নিকট তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণতার জন্য আবেদন জানান। এ পদে আহমাদ শাওকীর এক বৎসরের চাকুরী সমাপ্ত হতে না হতেই খেদীব তাওফীক তাঁর অসাধারণ মেধা ও সুন্দর কার্য সম্পাদনে বিমোহিত হয়ে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য সরকারী খরচে তাঁকে ফ্রান্সে প্রেরণ করার জন্য মনোনীত করেন। জ্ঞানের কোন শাখায় সে অধ্যয়ন করবে খেদীব তা তাঁর ইচ্ছাধীন করে দিলে আহমাদ শাওকী খুব আনন্দিত হন। অতঃপর

---

২৯. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৩; Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature 1900-1967, (Hyderabad : Dairatul Ma'arif press, First published, 1983), P. 49.

৩০. J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P . 38.

৩১. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২০৯।

৩২. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ. ৩৭; আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৩. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৪।

৩৪. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature 1900-1967, p. 47; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 36.

Dhaka University Institutional Repository

খেদীব তাওফীক তাঁকে আইন এবং ফরাসী সাহিত্য ও সভ্যতার মাঝে সমন্বয় সাধন করতঃ ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে পান্ডিত্য অর্জনের পরামর্শ দেন।[৩৫]

ঘ. উচ্চশিক্ষার্থে ফ্রান্সে গমন

১৩০৫ হি./১৮৮৭ খ্রি.[৩৬] মতান্তরে ১৩০৯ হি./১৮৯১ সালে খেদীব তাওফীক পাশা আহমাদ শাওকীকে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফ্রান্সে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন।[৩৭] খেদীব ফ্রান্সে নিযুক্ত মিসরের কূটনৈতিক মিশনকে আহমাদ শাওকীর ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত চিঠি লিখেন। ফ্রান্সে পৌঁছিলে তথাকার মিশন প্রধান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আহমাদ শাওকীকে এ মর্মে অবহিত করা হয় যে, খেদীব তাওফীক তাঁকে মন্টোপেলিয়ায় দু' বৎসর এবং প্যারিসে দু' বৎসর অধ্যয়ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮]

আহমাদ শাওকী তথায় এসে মন্টোপেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Montpellier) এর আইন কলেজে ভর্তি হন। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি মিসরে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে খেদীব তাঁকে অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করতে বারণ করেন এবং চার বছরের মধ্যে ফ্রান্সের বাইরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না করার পরামর্শ দেন। ফলে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং ফরাসী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উঠা-বসা করে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করেন।[৩৯]

দ্বিতীয় বৎসরের শেষান্তে খেদীব তাওফীকের ইচ্ছানুসারে ফ্রান্সের মিশন প্রধান ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে নিয়ে ইংল্যান্ডে শিক্ষা সফরে যেতে মনস্থ করেন। তদানুযায়ী আহমাদ শাওকী প্যারিস যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে সকলের সাথে ইংল্যান্ডে নাতিদীর্ঘকাল অবস্থান করেন। লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে তাঁরা মাসব্যাপী অবকাশ যাপন ও আনন্দ ভ্রমণ করেন।[৪০] এ ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃতি ও সেখানকার সাহিত্যিকদের সাথে মেলামেশার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।[৪১] অতঃপর তিনি মন্টোপেলিয়ায় ফিরে এসে প্যারিসে চলে যান।

---

৩৫. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৪; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৫১; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৬. হান্না আল-ফাখূরী, আহমাদ কাব্বিশ ও এম. এম. বাদাবীসহ অধিকাংশ সাহিত্যিক ও জীবনী লেখক স্ব স্ব গ্রন্থে আহমাদ শাওকীর ফ্রান্সে গমনের সন ১৮৮৭ বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭) ৩য় খণ্ডেও এ মতের সমর্থন রয়েছে। দ্রঃ হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, (Cambridge: University press, First published, 1975), P.29.

৩৭. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১০; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 36.

৩৮. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৪; আহমাদ আল-ইস্‌কানদারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ.৫৭০।

৩৯. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৪-১৫।

৪০. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১।

৪১. ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, মিন আদাবিনা আল-মু'আসির, (মিসরঃ মাত্‌বা'আতু আল-ফাজ্‌র আল-জাদীদ, ১৯৮০), পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসের তৃতীয় বছরে প্যারিস অবস্থানকালীন সময় আহমাদ শাওকী আকস্মিকভাবে এক মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।[৪২] চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তাঁকে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় আফ্রিকার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। ফলে রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য তিনি আলজেরিয়া গমন করেন এবং তথায় চল্লিশ/পঞ্চাশ দিন অবস্থান করে আরোগ্য লাভের পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।[৪৩] এখানে এসে আহমাদ শাওকী তাঁর সমাপনী চতুর্থ বছরও অতিবাহিত করেন এবং আইন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।[৪৪]

ঙ. ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন

অতঃপর আহমাদ শাওকী প্যারিসে অতিরিক্ত ছয় মাস অবস্থান করেন।[৪৫] প্যারিসে অবস্থান কালীন সময়ে তিনি এখানকার শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শনাদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন, নাট্যশালা ও অপেরা হাউজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। ইংরেজ ও ফরাসী কবি, সাহিত্যিক এবং লেখকদের সাহিত্য ও আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী এবং পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নে মনোযোগী হন।[৪৬] এ সময় পাশ্চাত্য উপন্যাসের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে যা পরবর্তীতে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিরাট প্রভাব রেখেছে নিঃসন্দেহে। তাঁর পঠিত উল্লেখযোগ্য নাটক-উপন্যাসগুলো হচ্ছে 'কর্ণেলী' (Corneille),[৪৭] 'রেসিন' (Racine),[৪৮] 'মুলিয়েরী' (Moliere)[৪৯] প্রমুখ খ্যাতনামা ফরাসী লেখকের রচনাবলী।[৫০] এতে তাঁর জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হয়।

---

৪২. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৫।

৪৩. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১০০; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪।

৪৪. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আবুব, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২১০; হান্না আল-ফাখূরী উল্লেখ করেন যে, প্যারিসে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর আইন শাস্ত্র অধ্যয়নে তৃতীয় বছর শেষে চূড়ান্ত সার্টিফিকেট লাভ করেছেন। দ্রঃ তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২-৯৭৩।

৪৫. আহমাদ আল-ইস্কান্দারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭০; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭২-৯৭৩; ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী উল্লেখ করেছেন যে, আহমাদ শাওকী সেখানে তিন বছর অবস্থান করেন। দ্রঃ মুকাদ্দিমাতু আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৫; এ ব্যাপারে ইসমাত মাহদীর বক্তব্য হচ্ছে ; Where he spent six years. (তথায় তিনি ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন)। দ্রঃ Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, P. 48.

৪৬. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুতঃ দার আল-জীল, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬), পৃ. ৪৩৬ ।

৪৭. 'পিয়েরী কর্ণেলী' (১০১৫-১০৯৬ হি./১৬০৬-১৬৮৪ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত ফরাসী কবি ও নাট্যকার। তিনি 'রুওয়ানে' জন্মগ্রহণ করেন। সর্বদা উন্নত আদর্শ ও বীরত্বের আহ্বানের প্রতি সাড়াদানের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বসমূহ বিশেষিত হয়েছে। তিনি ফরাসীতে ক্লাসিক্যাল নাট্যশিল্পের জনক এবং সকল সাহিত্যের ইতিহাসে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক নাট্যকার হিসেবে বিবেচিত। তাঁর রচিত অনেকগুলো বিয়োগান্ত নাটকের মধ্যে 'আল-সীদ' اَلسِّيْدُ 'হুরাস' هُوْرَاس 'পুলিওকত' بُوْلِيُوكْتْ 'সীনা' سِيْنَا প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, (বৈরুতঃ দার আল-ইল্ম লিল মালায়্যীন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৭৮, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭), মু'জাম আ'লাম, পৃ. ২১; ফারদীনান তূতাল, আল মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫৯৮।

৪৮. 'জিন ব্যাপটিষ্ট রেসিন' (১০৪৯-১১১১ হি./১৬৩৯-১৬৯৯ খ্রি.) সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য যুগের বিয়োগান্ত নাট্যকার ও প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম। সকল সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক নাট্যকারদের একজন বলে বিবেচিত। গ্রীক সাহিত্য তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি কয়েকটি অমর উপন্যাস রচনা করেন তন্মধ্যে 'এন্দরুমাক' إِنْدُرُوْمَاك 'ফীদার' فِيْدَر 'বারিতানিকুস' بِرِيْتَانِيْكُوْس 'আসৃতীর' أَسْتِيْر 'আতালিয়া'

Dhaka University Institutional Repository

ঐ দিনগুলোকে আহমাদ শাওকী সর্বপ্রকার কল্যাণসহ উৎসাহভরে স্মরণ করেন। এতদসম্পর্কে আহমাদ শাওকীর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:[৫১]

"I found from the first day the light that should illuminate my path."

"আলোক রশ্মিটি যে আমার জ্ঞানের পথকে আলোকিত করতে পারবে তা আমি প্রথম দিন থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম।"

খেদীব তাওফীক কর্তৃক ফ্রান্সের এ প্রতিনিধিত্বকে আহমাদ শাওকী এমন একটি আশীর্বাদ হিসেবে মনে করেন যা তাঁর চক্ষুদ্বয়কে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও এর ক্রমোন্নতি থেকে লব্ধ সভ্যতা ও শিল্পের আকর্ষণসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এবং ফরাসী সাহিত্যের সৌন্দর্যাদি দ্বারা ভরে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিনি সেখানে 'ভিক্টর হুগো'(Victor Hugu),[৫২] 'ডি-মুসেট' (De-Musset),[৫৩] 'লা-মারটিনি' (La-Martine)[৫৪] ও 'লা-ফন্টেইনে' (La-Fontaine)[৫৫] প্রমুখ ফরাসী কবিদের সম্পর্কে গভীরভাবে

تَنَازُعُ প্রভৃতি বিখ্যাত। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৩০২; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৭৩।

৪৯. 'মুলিয়েরী' (১০৩২-১০৮৫ হি./১৬২২-১৬৭৩ খ্রি.) একজন খ্যাতনামা ফরাসী হাস্যরসিক লেখক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মিলনাত্মক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। তাঁর নাটক ও উপন্যাসসমূহে তিনি কৃপণতা ও প্রতারণার ন্যায় সাম্যের কলংক যাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তা থেকে মানব চরিত্রকে মার্জিত করণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে 'আল-বাখীল' اَلْبَخِيْلُ 'আল-মুছরী আল-নাবীল' اَلْمُثْرِي النَّبِيْلُ 'আল-তাবীব রাগমান আনহু' اَلطَّبِيْبُ رَغْمًا عَنْهُ 'তারতূফ' تَرْتُوْفُ অথবা 'আল-মুহতাল' اَلْمُحْتَالُ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৬১; ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আ'লাম, পৃ. ৬৯৫ ।

৫০. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১০৬; M. M. Badawi, Modern Arabic literature, (Cambridge: University Press, First published, 1992), P. P . 358-359.

৫১. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, P. 4; Mounah A. Khouri, Poetry and the Making of Modern Egypt 1882-1922, P . 57.

৫২. 'ভিক্টর মারিয়ে হুগো' (১২১৭-১৩০৩ হি./১৮০২-১৮৮৫ খ্রি.) সাহিত্যে রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক অন্যতম ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক ও লেখক। আরবীতে অনূদিত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'আল-বুআসা' اَلْبُؤَسَاءُ 'মাআসা' مَآسَاةُ 'হারনানী' هَرْنَانِي প্রভৃতি। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৭৩৩; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৪৫।

৫৩. 'আলফ্রেড ডি মুসেট' (১২২৫-১২৭৪ হি./১৮১০-১৮৫৭ খ্রি.) একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি ও লেখক। ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচিত। তিনি বেদনার গান গেয়েছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে কতকগুলো গল্প এবং 'আল-লায়ালী' اَللَّيَالِي শীর্ষক গীতিকাব্য সংকলন। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মুজা'ম আ'লাম, পৃ. ৬২; ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৬৯৪।

৫৪. 'আল-ফুনসে ডি-মারটিনি' (১২০৫-১২৮৬ হি./১৭৯০-১৮৬৯ খ্রি.) একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, রাজনীতিবিদ ও রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী রোমান্টিক প্রাতিষ্ঠানিক কবি হিসেবে বিবেচিত। আরবীতে অনূদিত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'আল-তাআম্মুলাত' اَلتَّأَمُّلَاتُ ও 'জুসলীন' جُوْسْلِيْن এবং গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'রিহলাত ইলা আল-শারক' رِحْلَةٌ إِلَى الشَّرْقِ উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল আ'লাম, পৃ. ৬০৮-৬০৯; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি লা-মারটিনির 'আল-বাহীরাহ' اَلْبُحَيْرَةُ নামক কবিতাটি আরবীতে কাব্যানুবাদ করেন।[৫৬] অনুরূপভাবে লা-ফনটেইনের অনেক গল্প, কাহিনী জীব-জন্তুর ভাষায় অনুকরণ করেন এবং আরবী কবিতায় রূপান্তর করেন।[৫৭]

ফ্রান্সে অবস্থানকালে আহমাদ শাওকী একটি বিশেষ কফি হাউজকে বেছে নেন, পড়াশুনার বাইরের অবসর সময়টুকুতে তিনি সেখানে আরব ও পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সমাবেশে আড্ডা জমাতে একত্রিত হতেন। প্যারিস নগরীতে 'কানা ইয়ারতাদানা' كَانَ يَرْتَادَانَا নামক কফিখানায় বিখ্যাত ফরাসী কবি 'ভারলেইন'[৫৮] এর সাথে আহমাদ শাওকীর সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে লেবাননের প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক আল-আমীর শাকীব আরসালান (১৮৭১-১৯৪৬ খ্রি.) এর সাথে আহমাদ শাওকীর পরিচয় ঘটেছিল। এ সময় দু'জনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানসহ সাহিত্যিক ও মানবিক বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। শাকিব আরসালান তখন আহমাদ শাওকীর কবিতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিমুগ্ধ হন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তিনি যেন 'আল-শাওকিয়্যাত' اَلشَّوْقِيَّاتُ নামে একটি কাব্য সংকলনে এগুলোকে একত্রিত করেন। আহমাদ শাওকী এ উপদেশ সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তীতে এর ভিত্তিতে কাজ করেন।[৫৯] এরপর আহমাদ শাওকী ১৩০৯ হি./ ১৮৯১ খ্রি.[৬০] মতান্তরে ১৩১১ হি./১৮৯৩ সালে ফ্রান্স থেকে মিসরে ফিরে আসেন।[৬১]

---

৫৫. 'জিন ডি লা-ফনটেইনে' (১০৩১-১১০৭ হি./১৬২১-১৬৯৫ খ্রি.) একজন খ্যাতনামা ফরাসী কবি ও বিখ্যাত 'আল-আমছাল' اَلْأَمْثَالُ গ্রন্থের লেখক। তিনি আরব, ভারত, গ্রীক উপমা থেকে এর অধিকাংশগুলো গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থটি আরবীতে কাব্যানুবাদ করেন আল-আব নকূলা আবু হেন্দা আল-মুখাল্লিস। এতদ্ব্যতীত তিনি জীব-জন্তুর মুখে বানোয়াট ও কল্পিত প্রতীকি গল্পসমূহের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৬০৮; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আল-আ'লাম, পৃ. ৫৩।

৫৬. ড. মুহাম্মদ মানদূর, 'আল-শি'র আল-মিসরী বা'দা শাওকী, (কায়রোঃ নাহ্দাতু মিসর লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশর ওয়া আল-তাওযী' আল-ফাজালাহ, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫; ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১; মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন, আ'লাম আল-নাসর ওয়া আল-শি'র ফী আল-আসর আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ২৪৪।

৫৭. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৫৮. 'পোল ভারলেইন' (১২৬০-১৩১৪ হি./ ১৮৪৪-১৮৯৬ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত ফরাসী কবি। তিনি আরেকজন ফরাসী কবি ও লেখক চার্লস বোদেলেইরে (১৮২১-১৮৬৭ খ্রি.) এর দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি মদ্যপানে আসক্ত হন। ১৮৮১ সালে তিনি ক্যাথলিক মতবাদ গ্রহণ করেন। তাঁর 'আল-কাসাঈদ আল-লাঈনা' اَلْقَصَائِدُ اللَّعِينَةُ অর্থাৎ অভিশাপমূলক গীতিকবিতা এবং অন্যান্য কবিতামালা রয়েছে। তিনি প্রতীকি ধারার কবিদের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫২৪; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৮৬।

৫৯. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১০৭।

৬০. হান্না আল-ফাখূরী, আহমাদ কাব্বিশ, এম. এম. বাদাবীসহ অধিকাংশ জীবনী লেখক স্ব স্ব গ্রন্থে ফ্রান্স থেকে আহমাদ শাওকীর ১৮৯১ সালে মিসরে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। দ্রঃ হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস পৃ. ৭৪; M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, P. 29; ইসলামী বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ডেও এই মতের সমর্থন রয়েছে, পৃ. ২৩৪।

৬১. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৫; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 36.

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন (১৮৯১-১৯১৫ খ্রি.)

আহমাদ শাওকী অধ্যয়ন শেষে ফ্রান্স থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর খেদীব তাওফীক পাশা তাঁকে স্বীয় সাহচর্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনিও সানন্দে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজদরবারে স্বীয় পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত হন।[৬২] ইতোমধ্যে ১৩১০ হি./১৮৯২ সালে তাওফীক পাশা ইহলোক ত্যাগ করেন। অতঃপর তাওফীকের পুত্র খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মী পাশা (১২৯১-১৩৬৩ হি./১৮৭৪-১৯৪৪ খ্রি.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে তিনি কিছু সময় আহমাদ শাওকীর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন।[৬৩] আব্বাস হিল্‌মী তাঁর শাসনামলে (১৮৯২-১৯১৪ খ্রি.) সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণাবশতঃ কবির প্রতি সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেন। সভাসদদের কারো কারো উস্কানি খেদীব আব্বাসের ধারণা সুদৃঢ় করে। আহমাদ শাওকীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ছিল এই যে, 'তিনি নিছক একজন কবি।' অথচ তিনি কবি থেকে রাজনীতিবিদ হওয়ার প্রতি অধিক আগ্রহী। ইংরেজদের সাথে খলীফার দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সাথে খেদীবের শক্তিশালী দ্বন্দ্বে আহমাদ শাওকীর কিছুই করার নেই। সুতরাং এ মুহূর্তে তাঁর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। ফলে তিনি আহমাদ শাওকীকে তাৎক্ষণিক উপেক্ষা করেন। অনন্তর কবির বন্ধুত্রয় মিসরের প্রধানমন্ত্রী 'বুট্রোস পাশা ঘালী' (১২৬২-১৩২৮ হি./ ১৮৪৬-১৯১০ খ্রি.),[৬৪] 'বাশারা তাক্‌লা' (১২৬৮-১৩১৯ হি./ ১৮৫২-১৯০১ খ্রি.),[৬৫] 'মুস্তফা কামিল' (১২৯১-১৩২৬ হি./১৮৭৪-১৯০৮ খ্রি.)[৬৬] প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আহমাদ শাওকী সম্পর্কিত এ ভ্রান্ত

---

৬২. আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭৯।

৬৩. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৬; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩।

৬৪. বুট্রোস পাশা ঘালী একজন মিসরীয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। ১৮৯৪ সালে তিনি মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে (১৯০৮-১৯১০ খ্রি.) খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মীর খিলাফতকালে মিসরে শাসনতান্ত্রিক জীবনধারায় বেসামরিক দাবীর আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় জাতীয়তাবাদীরা তাঁর উপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পড়ে। ফলে রাজনৈতিক কারণে ইবরাহীম আল-ওয়ার্দানী তাঁকে ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ সালে গুপ্তহত্যা করে। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫০২।

৬৫. বাশারা তাক্‌লা লেবাননের একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি মূলতঃ লেবাননের কাফ্‌রশিমা বংশোদ্ভুত। ১৮৭৬ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় 'আল-আহ্‌রাম' الأهرام পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, অতঃপর এটি কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০০ সালে তিনি ফরাসী ভাষায় 'আল-পিরামিড' البيراميد পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাশারার মৃত্যুর পর ১৯১৪ সালে 'আল-আহরাম' পত্রিকার দায়িত্ব প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও পরে তাঁর পুত্র জিবরাঈল (১৮৯০-১৯৪৩ খ্রি.) এর উপর অর্পিত হয়। যিনি পত্রিকাটির কলেবর প্রশস্ত করেন এবং এর প্রকাশনায় নিরপেক্ষতা বিধানে প্রচেষ্টা চালান। ফলে এটি বিশ্বজনীন পত্রিকায় পরিণত হয়। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুন্‌জিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ১৮৯-১৯০।

৬৬. মুস্তফা কামিল একজন স্বনামধন্য মিসরীয় সাংবাদিক, লেখক, নাট্যকার এবং স্বদেশী রেনেসাঁর পুরোধা। তিনি ১৯৭৪ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে অবস্থানকালে ১৯০৮ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফ্রান্সে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। অতঃপর ১৮৯৫ সালে তিনি দেশে ফিরে মিসরে 'আল-হিয্‌ব আল-ওয়াতানী' الحِزبُ الوَطَنِي নামে জাতীয় দল গঠন করেন। অনন্তর তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য ১৯০০ সালে 'আল-লিওয়া' اللِّوَاءُ শীর্ষক পত্রিকা বের করেন ও কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, কিন্তু বৃটিশরা এর বিরোধিতা করে। তিনি বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মিসরকে মুক্তির প্রচেষ্টা চালান এবং সা'দ জগলুল পাশা (১২৭৩-১৩৪৬ হি./ ১৮৫৭-১৯২৭ খ্রি.) এর আত্মপ্রকাশের পথ সুগম করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে 'আল-মাসআলাতু আল-শারকিয়্যা' المَسْأَلَةُ الشَّرْقِيَّةُ (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাটি তিরোহিত করতে সচেষ্ট হন। এ তিন ব্যক্তিত্ব প্রশাসকের কাছে কবিকে নিকটবর্তী করতে এবং তাঁর স্নেহাস্পদে পরিণত করতে সফল হন, যেমন তাঁর পূর্বসূরীগণ তাঁর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন ও তাঁকে রাজদরবারের কবি নিয়োগ করেন। ফলশ্রুতিতে শীঘ্রই আহমাদ শাওকীর প্রতি খলীফার নেতিবাচক ধারণা ইতিবাচকে পরিণত হয়।[৬৭]

রাজদরবারী কবি হিসেবে শাওকীর মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ

আহমাদ শাওকী তাঁর প্রজ্ঞা ও কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে খলীফাকে বিমুগ্ধ করে আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সক্ষম হন। এতে কিছুকাল পর আব্বাস হিল্‌মী তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে স্থান দেন। তিনি আহমাদ শাওকীর মর্যাদা ও নৈকট্য বাড়িয়ে দেন, স্বীয় সভাসদবর্গের বন্ধু ও ভ্রমণের সাথী বানিয়ে নেন এবং তাঁকে রাজ দরবারী কবি ও ব্যক্তিগত কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। খলীফা তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি কবির মতামত গ্রহণ করতেন। আহমাদ শাওকীও খেদীবী রাজনীতির একনিষ্ঠভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন এবং অঢেল ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেন।[৬৮]

খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মী ইতোমধ্যে আহমাদ শাওকীকে খেদীবী সরকারের ইউরোপীয় শাখার (অনুবাদ বিভাগের) প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।[৬৯] এ শাসকের দরবারে অবস্থানকালে প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের নিকট তাঁর ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর সুপারিশ ও ইঙ্গিত অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে এবং তাঁকে দরবারের সকল কর্মকর্তার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়।[৭০]

অভাবী ও স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর এ ব্যাপারটিকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে। যারা তাঁর ইশারা-ইঙ্গিতে যাকে খুশী বাধা দিতে থাকে এবং যাকে ইচ্ছা কাজ সহজ করে দিতে প্রয়োজনে খুব বেশী প্রতারণা করতে লাগল। ফলে দ্রুত উপহার-উপঢৌকন আসতে থাকে। এ সময় আহমাদ শাওকী দীর্ঘসময় আমোদ-ফুর্তি ও খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে আর্থিক বিভিন্ন দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকেন। অনন্তর খেদীব আব্বাসের দরবারে প্রাপ্ত প্রচুর ক্ষমতা ও মর্যাদার পাশাপাশি বিশাল সম্পদের অধিকারী হওয়ার সুযোগ তাঁর এসে গেল। এ ব্যাপারে কবি-পুত্র হুসাইনের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৭১]

فِيْ دَارِتِهِ " كُرْمَةَ ابْنِ هَانِي" وَ مَا حُوَتْ مِنْ فَاخِرِ الرِّيَاشِ، وَالتُّحَفِ الثَّمِيْنَةِ الَّتِيْ لاَ تُقَدَّرُ بِثَمَنٍ.

"তাঁর (শাওকীর) নিবাস 'কুরমা ইবনে হানী' এবং এতে অন্তর্ভুক্ত যে বিলাস বহুল আসবাবপত্র ও উপহার-উপঢৌকন ছিল, মুদ্রার দ্বারা যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।"

ও 'ফাত্হ আল-আন্দালুস' فتح الأندلس শীর্ষক নাট্যগ্রন্থ প্রভৃতি। দ্রঃ কারনীলান তূভাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫৮২।

৬৭. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৫৯ ।

৬৮. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩, মুহাম্মদ সিকান্দার মুনতাজী, আহমাদ শাওকী ও তাঁর আধুনিক আরবী কাব্য, (ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ৪ ।

৬৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪ ।

৭০. আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ.৫৭৯ ।

৭১. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ৩-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী রাজদরবারে তাঁর চাকুরীর ব্যাপারে গৌরববোধ করার চেয়ে 'শাইর আল-কাস্‌র' شَاعِرُ الْقَصْرِ বা রাজদরবারী কবি হিসেবে পরিগণিত হওয়া অধিক মর্যাদাকর বলে মনে করতেন। তাই তিনি সগর্বে আবৃত্তি করেন,[৭২]

شَاعِرُ الْعَزِيزِ وَمَا * بِالْقَلِيلِ ذَا اللَّقَبُ

"(আমি) রাজপ্রাসাদের কবি, আর সে উপাধিটি কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।"

বলাবাহুল্য যে, আহমাদ শাওকী যদি আমীরকে না চিনতেন এবং তাঁর দরবারে কবি হওয়ার প্রতি লালায়িত না হতেন এবং এর জন্য গৌরববোধ না করতেন আর তা এ জন্য যে, আহমাদ শাওকী তাঁর যৌবনের শুরুতে শাসকের কবি হওয়ার মধ্যে শীর্ষ কাব্য মর্যাদার ধারণা করলেও উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সে অবস্থান ও বিশাল মানবিক সাহিত্যাবলীর সাথে যোগসূত্রতা কাব্য ও সাহিত্যের জগতের ব্যাপারে কবির দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত করে দেয় সুলতানের প্রশংসা ও লোকদের অন্তরসমূহকে আমীরের প্রতি আকৃষ্ট করার চেয়ে তা অনেক বেশী প্রশস্ত।[৭৩]

এমনিভাবে আহমাদ শাওকী কর্মজীবনে স্বীয় পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এ সময়ে তিনি জাতীয় বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানাদিতে স্তুতি কবিতার দ্বারা খেদীব আব্বাস হিল্‌মী পাশাও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর গুণগান করতে থাকেন।[৭৪] আহমাদ শাওকী তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক আকাঙ্খার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। যখন খেদীব আব্বাস ওসমানী খলীফার সন্তুষ্টি কামনা করতেন, তখন কবি ওসমানী খলীফার প্রশংসা করতেন; আবার যখন তিনি ইংরেজদের প্রতি রাগান্বিত হতেন এবং তাদের কোন শাসকের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হতেন, তখন আহমাদ শাওকী ইংরেজদের ভৎর্সনা ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন । এ সময় তিনি জনসাধারণের সাথে তেমন একটা মেলামেশা করতেন না।[৭৫]

বাস্তবকথা এই যে, আহমাদ শাওকীর একই সাথে 'শাইর আল-আমীর' شَاعِرُ الْأَمِيرِ বা 'আমীরের কবি' এবং 'আমীর আল-শু'আরা' أَمِيرُ الشُّعَرَاءِ বা 'কবিদের সম্রাট' হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে 'শাইর আল-মুনাসাবাত' شَاعِرُ الْمُنَاسَبَاتِ বা 'বিভিন্ন উপলক্ষের কবি' হওয়ার দিকে পরিচালিত করে। তিনি কখনো খেদীবীর নামে, আবার কখনো জাতি এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নামে বক্তব্য রাখেন এবং এ সমুদয় ব্যাপারে তিনি নিজকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে অপরকে সন্তুষ্ট করা ছিল না, বরং কখনো কখনো এমন কথা বলতে তিনি বাধিত হন যা সাধারণ জাতিকে সন্তুষ্ট করতো না।[৭৬]

যাহোক, মোটা বেতনের এ চাকুরীতে (১৩১০-১৩৩২ হি./১৮৯২-১৯১৪ খ্রি.) কবি বিশ বৎসরের অধিক দায়িত্ব পালন করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের সুবর্ণ সময়।[৭৭]

---

৭২. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৫৪।

৭৩. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৭৪. ড. শাওকী দায়ফ, শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৭।

৭৫. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১।

৭৬. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

৭৭. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ম, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১১ ; ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

জেনেভায় প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ

আহমাদ শাওকী ১৩১২ হি./১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরীতে অনষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খেদীব আব্বাসের পক্ষ থেকে মিসরের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সম্মেলনে কবি ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিন থেকে নয় বছরে রচিত ২৬৪ শ্লোক বিশিষ্ট 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الحَوَادِثِ فِيْ وَادِي النِّيْلِ বা 'নীল উপত্যকার শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলী' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ, অনুপম ও অতুলনীয় 'কাসীদা'[৭৮] উপস্থাপন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন।[৭৯] যার প্রারম্ভিক শ্লোকটি ছিল নিম্নরূপ:[৮০]

هَمَّتِ الْفُلْكُ، وَاحْتَوَاهَا الْمَاءُ * وَحَدَاهَا بِمَنْ تُقِلُّ الرَّجَاءُ

"জাহাজ তার লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা করছে, আর (নীলনদের) পানি তার চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে আছে, আর তাকে এমন ব্যক্তি চালিয়ে নিচ্ছে যাদের আশা কমে গেছে।"

এ সুদীর্ঘ কাসীদাটিতে যথার্থভাবে দীর্ঘশ্বাস, জাঁকজমকপূর্ণ রচনাশৈলী এবং যন্ত্রসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনা যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে এ শ্রেণীর কাব্যের জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হয়েছে।[৮১] এ অনবদ্য কাসীদায় কবি প্রাচীন ফির'আউনের যুগ থেকে মিসরের আকাশে ইসলামের আলো উদিত হওয়া পর্যন্ত মিসরের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও নীল উপত্যকার ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন। এতে তিনি দক্ষ ঐতিহাসিক, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পদ্ধতিতে এবং সৃজনশীল কবির পাণ্ডিত্যে বিশ্বের এক চতুর্থাংশে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।[৮২] অতঃপর এ সুযোগে তিনি ঐ সকল সমস্যা জর্জরিত দেশগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

সম্মেলনের পর তিনি বেলজিয়াম গমন করেন এবং এর রাজধানী ও কয়েকটি প্রধান নগরী পরিদর্শন করেন। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ তাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন এবং সেখানকার সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের সাথে মিলিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এর মাধ্যমে তিনি স্বীয়

---

৭৮. 'কাসীদা' অর্থ দীর্ঘ কবিতা বা গীতি কবিতা। 'কাসীদা' قَصِيْدَةٌ শব্দটি 'কাসদ' قَصْدٌ ধাতু থেকে নির্গত। 'কাসদ' অর্থ উদ্দেশ্য, সংকল্প।কবির ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে এ কবিতায় প্রকাশিত হয় বলে এটি কাসীদা। আরবী কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতায় সাধারণতঃ পচিশ থেকে একশত পর্যন্ত বায়ত বা শ্লোক থাকে। দ্রঃ আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ৪১-৪৩।

৭৯. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১-১১২; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আযুব, আদ আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২১১; ইন'আম আল-জুন্দীর মতে, জেনেভায় প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনটি ১৮৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। দ্রঃ আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৪০; অপর একটি বর্ণনায় সম্মেলনটি ১৮৯৬ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রঃ আহমাদ আল-ইস্কানদারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭১; তবে অধিকাংশের অভিমত অনুসারে প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনটি ১৮৯৪ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

৮০. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

৮১. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৮২. ড. মুস্তফা মাহমূদ ইউনূস, মিন আদাবিনা আল-মু'আসির, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির সাথে ভিন্ন সংস্কৃতির এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার সাথে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং স্বীয় কাজে যোগদান করেন।[৮৩]

পারিবারিক জীবন

আহমাদ শাওকী ইতোমধ্যে 'সাইয়েদা সারিয়্যা' নাম্নী একজন ধনাঢ্য, সতী-সাধ্বী ভদ্র মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যাকে খেদীব আব্বাস তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।[৮৪] তাঁর স্ত্রী স্বীয় পিতা হুসাইন পাশা শাহীনের নিকট থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। কবি তাঁর সাথে অত্যন্ত বিলাসবহুল দাম্পত্য জীবন যাপন করেন, যা তাঁর মদ ও প্রেমের কবিতায় বিধৃত হয়েছে।[৮৫]

তাঁর স্ত্রীর গর্ভে 'আলী' ও 'হুসাইন' নামক দুইটি পুত্র সন্তান এবং পরে 'আমিনা' নাম্নী একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[৮৬] এ সম্পর্কে আহমাদ শাওকীর নিম্নোক্ত উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:[৮৭]

عَـــلَى أَنَّهَا بِلاَدِيْ، وَهِيَ مَنْشَأِيْ وَمِهَادِيْ وَمَقْبَرَةُ أَجْدَادِيْ ، وُلِدَ لِيَ بِهَا أَبَوَانِ وَلِـــيَ فِيْ ثَرَاهَـــا أَبٌ وَجَدَّانِ، وَبِبَعْضِ هَذَا تُحَـــبَّبُ إِلَى الرِّجَالِ الأَوْطَانُ.

"এতদসত্ত্বেও মিসর আমার দেশ, আমার লালনভূমি, আমার শয্যাস্থান, আমার পূর্ব পুরুষদের সমাধিস্থল, এখানেই আমার দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এদেশের মাটিতে রয়েছে আমার পিতা, দাদা ও নানা, আর এ সকল কারণে মাতৃভূমির লোকেরা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছে।"

এতে আহমাদ শাওকীর পরিবারের প্রতি নিবিড় সম্পর্ক এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও কোমল অনুভূতি অবগত হওয়া যায়, যাদের কথা তিনি স্বীয় কবিতায় উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রতি পিতৃত্বের আকর্ষণের কথা প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর সময়ের বিপরীতধর্মী দুর্যোগপূর্ণ সময়ে স্বীয় পুত্রের জন্মে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর পুত্র আলীর জন্মের সংবাদ পেয়ে 'আবূ আলী' أَبُوْ عَلِي শিরোনামে দু' পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা রচনা করেন;[৮৮]

---

৮৩. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০।

৮৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩; হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ৮; John A. Haywood, Modern Arabic Literature 1800-1970, (London: Lund Humphries, First Edition, 1971) P. 86.

৮৫. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature 1900-1967, P. 48.

৮৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৩; ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, ভূমিকা, পৃ. ৫।

৮৭. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আযব, আদ দাল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২০৯; আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৯; ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৪-৫; উদ্ধৃত মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত বিকলমে শাওকী, (১৮৯৮)।

৮৮. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪; এ পংক্তিদ্বয়ে কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, পুত্র 'আলী'কে জন্ম দিয়ে তিনি তার জন্য দুনিয়ার কষ্ট-যাতনা ও বেদনা পাওয়ার কারণ হয়ে অপরাধ করেছেন। আহমাদ শাওকী দ্বিতীয় চরণটি আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক কবি আবুল আলা আল-মা'আররী (৩৬৩-৪৪৯ হি./৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.) এর কবিতার অনুসরণে রচনা করেছিলেন;

Dhaka University Institutional Repository

صَارَ شَوْقِي أَبَا عَلِي * فِي الزَّمَانِ (الــتَّــرْلـــلِي)
وَجَنَاهَا جِنَــايَـــةً * لَيْــسَ فِـــيـــهَا بِأَوَّلِ !

"শাওকী আলীর পিতা হলেন নাজুক সময়ে এবং তিনি একটি অপরাধ করেন, যা প্রথম নয়।"

আহমাদ শাওকী তাঁর কন্যা আমিনার জন্ম ও একই সময়ে সংঘটিত তাঁর পিতার মৃত্যুতে 'ইয়া লায়লাতা' يَا لَيْلَـةً শীর্ষক কবিতার নিম্নের চরণগুলোতে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতির কথা উল্লেখ করে বলেন:[৮৯]

اَلْمَوْتُ عَجَّــــــلاَنُ إِلَى وَالِدِيْ * وَالْوَضْعُ مُسْتَعْصٍ عَلَى زَوْجَتِي
هَذَا فَتَـــى يُبْكَـــى عَلَى مِثْـلِـــهِ * وَهَذِهِ فِــيْ أَوَّلِ النَّــشْــأَةِ

"আর মৃত্যু আমার পিতার উপর ত্বরান্বিত হয়েছে এবং পরিস্থিতি আমার স্ত্রীর প্রতি অবাধ্যতা জ্ঞাপন করেছে। এই যুবককে তার অনুরূপের উপর কাঁদাচ্ছে আর এই কন্যা জীবন প্রভাতে।"

আহমাদ শাওকী অনেক কবিতায় সন্তানদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির কথা বর্ণনা করেছেন। একমাত্র কন্যা আমিনা জন্মের পর যখন একবছর বয়সে পদার্পণ করে তখন কবি শুভ জন্মদিন উপলক্ষে 'আমিনা' أَمِـيْـنَـةُ শিরোনামে কবিতা রচনা করে বলেন:[৯০]

أَمِيْـــنَـــتِيْ فِي عَامِهَا * الأَوَّلِ مِـــثْـــلُ الْمَلَكْ
صَالِحَةٌ لِلْحُـــبِّ مِـــنْ * كُلِّ وَلِلـــتَـــبَـــرُّكْ
كَمْ خَـــفَقَ الْقَـــلْـبُ لَهَا * عِنْدَ الْبُكَا وَالضَّحِـــكْ

"আমার আমিনা এক বছর বয়সে ফেরেশতাসদৃশ। সে সকলের চেয়ে ভালবাসার যোগ্য এবং আশীর্বাদের জন্য হাসি ও কান্নার সময় তাঁর জন্য মন কতইনা আন্দোলিত হচ্ছে।"

এমনিভাবে আহমাদ শাওকীর কবিতায় তাঁর পারিবারিক জীবনে হৃদ্যতাপূর্ণ অনুভূতির ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত বিপ্লব পরিদৃষ্ট হয়। এ কবিতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক যা তাঁকে তাঁর সন্তানদের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করে রেখেছিল। কবি-পুত্র হুসাইন তাঁর পিতা আহমাদ শাওকী কর্তৃক তাঁর ভাই আলী ও বোন আমিনার প্রতি তাঁর স্নেহের কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের প্রতি অতিমাত্রায় পথ প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবির স্ত্রীর সাথে বৈপরীত্য সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীর প্রতি কবির ছিল কঠিন প্রতাপ ও নিষ্ঠুর আচরণ। তবে

যেখানে কবি আবুল আলা তাঁর পিতাকে জন্ম দেয়ার অপরাধে দায়ী করে মৃত্যুর পূর্বে যে বাণী রেখে যান এবং অসিয়ত মোতাবেক তাঁর কবরে নিম্নোক্ত সেই চরণটি খোদাই করা হয়,

هَذَا جَنَاهُ أَبِيْ عَلَيَّ * وَمَا جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ

"এ অপরাধ আমার পিতা আমার উপর করেছেন, কিন্তু আমি কারো উপর অপরাধ করিনি।"

দ্রঃ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৩৪৮; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পাদটীকা, পৃ. ৫২; ড. শাওকী দায়ফ, আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফী আল-শি'র আল-আরবী, (মিসর: দার আল-মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৩, ৮ম সংস্করণ, ১৯৬০), পৃ. ৩৮৭।

৮৯. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবি-পুত্র কবিকে জীবনসঙ্গিনীর সাথে একত্রে দুপুরের খাবার গ্রহণ করতে দেখার কথা উল্লেখ করেননি।[৯১]

অথচ প্রকৃতপক্ষে আহমাদ শাওকী স্বীয় পরিবারের সাথে দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ করতেন এবং দীর্ঘসময় বিলম্ব হলেও তাঁর জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে তাগাদা দিতেন, অতঃপর আসরের নামাযের পর ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন আর গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ী ফিরে আসতেন না। আর তিনি পরিবার থেকে দূরে একটি নিভৃত কক্ষে নিদ্রা যেতেন।[৯২]

উল্লেখ্য যে, আহমাদ শাওকীর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে প্রায়শঃই দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজে তাঁর সাথে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যেতেন। ফলে তাঁর স্ত্রীকে একাকী মধ্যাহ্নভোজ করতে হত। নৈশভোজেও তিনি ঘরের বাইরে স্বল্পসংখ্যক বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন অভিজাত রেঁস্তোরায় আহার করতেন। সেখানে তাঁকে রাজণ্যবর্গের ন্যায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হতো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জননী কখনো এই রূঢ় আচরণে সৃষ্ট মনের বেদনা ও যন্ত্রণা কবিকে অনুভব করতে দিত না। এমনকি অধিকাংশ সময় কবির ঘরের বাইরে কাটানোর ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী চরম ধৈর্যধারণ করত। উপরন্তু সে কবির প্রতি এ ব্যাপারে কোন প্রকার তিরস্কার বা ভর্ৎসনাও করত না।[৯৩]

বস্তুতঃ কবি এমন একজন ভাগ্যবতী, ন্যায়-পরায়ণা স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেন; যিনি তাঁকে স্বীয় সম্পদ দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, যিনি কোনদিন সামান্যতম নিন্দা প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। অথচ অনেক সময় বিভিন্ন ব্যাপারে বহু ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যদি কবি-পত্নী অত্যন্ত রূঢ়, ভ্রূকুটিপূর্ণ, ক্রোধান্বিত ও রগচটা হতেন তাহলে অবশ্যই আহমাদ শাওকীর জিহ্বা তোতলা হয়ে যেত এবং তিনি এমন সব সুন্দর কাব্য সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে পড়তেন। তাই আহমাদ শাওকীর প্রতি তাঁর স্ত্রীর অবদান এত অপরিসীম যে, তাঁর দীওয়ানের উপরে কবির নামের পাশে তাঁর পত্নীর নাম লেখা হলে কিছুটা ঋণ পরিশোধ হতো।[৯৪]

পরিবার-পরিজনের প্রতি আহমাদ শাওকীর স্বভাবগত দুর্বলতা ছিল এই যে, সন্তানাদির অসুখে-বিসুখে, দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ও উৎকণ্ঠিত হওয়া থেকে দূরে সরে যেতেন। একদা কবির এক পুত্র কায়রোতে রোগাক্রান্ত হলে তিনি দ্রুত পলায়ন করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যান। অতঃপর আরোগ্য লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসেননি। সন্তান-সন্ততিদের প্রতি আহমাদ শাওকীর প্রচন্ড ভালবাসার আতিশয্যের কারণে তারা যখন কবির কাছ থেকে কখনো দূরে কোথাও বেড়াতে চলে যেত, তখন তিনি তাদের নিকট চিঠি-পত্র লিখতে পারতেন না। ফলে এহেন প্রাঞ্জল ও বাগ্মী কবি তাঁর মনের স্নেহ-প্রীতি, মমত্ববোধ ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়তেন। এমতাবস্থায় তিনি শুধুমাত্র টেলিগ্রাম প্রেরণের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সেজন্য কবির সন্তানদের নিকট তাঁর স্বহস্তে লিখিত কোন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।[৯৫]

---

৯১. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ৮ ।

৯২. ইয়াহইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, (কায়রো: আল-হায়আত আল-মিসরিয়্যা আল-'আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৮৮), পৃ. ৫৮।

৯৩. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৫২।

৯৪. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৯।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা ও শাওকীর অবস্থান

১৩৩২ হি./ ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ'[৯৬] (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) শুরু হলে খেদীব আব্বাস তুর্কীদের সাথে মিলিত হয়ে জার্মানীর পক্ষে তুর্কী ভূমিকায় সমর্থন করেন। তখন মিসর ইংরেজদের দখলে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ওসমানী খিলাফতের অনুগত ছিল, এতে ইংরেজ উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে খেদীব আব্বাসের ভূমিকা তাদের ভূমিকার বিপরীত হওয়ার কারণে তারা তাঁকে অপছন্দ করে। ইতোমধ্যে খেদীব আব্বাস মিসর থেকে পলায়ন করে তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় রোগাক্রান্ত হওয়ার পর আরোগ্য লাভের অন্বেষণে খেদীব একাকী তুরস্কের বিভিন্ন শহরে স্থানান্তরে বাধিত হন।[৯৭] তখন আহমাদ শাওকী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সপরিবারে তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে খলীফার পাশে অবস্থানের জন্য গমন করেন। ইত্যবসরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, এমতাবস্থায় খেদীব আব্বাস কবি আহমাদ শাওকীকে মিসরে ফিরে যেতে তাগাদা দেন। যুদ্ধের ঘনঘটায় ইংল্যান্ড তখন মিসরকে আপনার রক্ষণাধীন বলে ঘোষণা দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সৈন্য এসে মিসরে আস্তানা গাড়ল। এমনিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধকালে মিসরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বৃটিশ সরকার নিজ হাতে নেয় এবং দখলদার বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ১৩৩২ হি./১৯১৪ সালে খেদীব আব্বাসকে মিসরের সিংহাসন থেকে পদচ্যুত করে।[৯৮] জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তুর্কী সিদ্ধান্তে খেদীবের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে তাঁকে শত্রু আখ্যায়িত করে তাঁর মিসরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১৫ সালে আহমাদ শাওকী মিসরের ভূমিতে পদার্পণের সাথে সাথে ইংরেজ কর্তৃক খেদীব আব্বাসের বিরুদ্ধে তুর্কীদের সাথে যোগসাজশের অভিযোগে খেদীব আব্বাসের পদচ্যুতির খবর শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।[৯৯]

অতঃপর ইংরেজরা সুলতান হুসাইন কামিল (১২৭০-১৩৩৬ হি./ ১৮৫৩-১৯১৭ খ্রি.) কে খেদীব আব্বাস হিল্‌মীর স্থলাভিষিক্ত করে। এ সময় ইংরেজ অনেক মিসরীয়র উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালায়। তারা খেদীব আব্বাসের অনুসারীদের বিতাড়িত করতে থাকে এবং তাঁর সমর্থকদের রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এদের মধ্যে আহমাদ শাওকীও ছিলেন। তিনি নীরবতা অবলম্বন না করে ইংরেজ ঘোষিত মিসর রক্ষা সম্পর্কে কাসীদা (দীর্ঘ কবিতা) রচনা করেন। এতে তিনি ইংরেজদের অন্তঃসারশূন্য দূরভিসন্ধিমূলক ঘোষণার প্রতি সতর্ক করে দেন এবং নিজেকে মিসর থেকে বহিষ্কার করার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:[১০০] إنَّ الرِّوَايَــةَ لَمْ تَتِمَّ فُصُولًا "নিশ্চয়ই উপন্যাসটি কয়েকটি অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি হয়নি।"

---

৯৬. 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ' اَلْحَرْبُ الْعَالَمِيَّةُ الأُولَى ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সংঘটিত এক মহাসমর। এ মহাযুদ্ধের পক্ষে একদিকে থাকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ও তুরস্ক এবং অপরদিকে থাকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্র। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী যুবরাজ আরকাডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ডের হত্যার পর পরই ১৯১৪ সালের ২৮ শে আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মিত্রবাহিনীর হাতে জার্মানী ও তাদের সমর্থক দেশ পরাজিত হয়। পরিশেষে ১৯১৮ সালের ১১ ই নভেম্বর ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্রঃ কায়দীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ২৩৪; অধ্যক্ষ আবদুর রহমান বিন হাফিজ সম্পাদিত, বি. সি. এস. টেক্সট এন্ড গাইড, (ঢাকা: গুরুগৃহ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৮৬৯।

৯৭. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০।

৯৮. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪।

৯৯. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ.৬৩।

১০০. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান হুসাইন কামিলের প্রশংসায় কবিতা রচনা

১৯১৫ সালে খেদীব আব্বাস ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর আহমাদ শাওকী খেদীবের স্থলাভিষিক্ত ইংরেজ অনুগত সুলতান হুসাইন কামিলের নৈকট্য লাভের ব্যর্থ প্রয়াস চালান।[১০১] আহমাদ শাওকী সুলতানের সাথে সমন্বয় সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং খলীফার সাথে যোগাযোগ করেন। কবি সুলতান হুসাইন কামিলের প্রশংসায় 'স্তুতি কবিতা' [১০২] রচনা করেন, যার প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ:[১০৩]

الْمُلْكُ فِيكُمْ آلُ إِسْمَاعِيلَا * لَا زَالَ مُلْكُكُمْ يَظَلُّ النِّيلَا

"ইসমাঈল বংশের বাদশা তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, তোমাদের বাদশা ও নীলনদ আছে এবং সর্বদা থাকবে।"

অতঃপর আহমাদ শাওকী খেদীব আব্বাসের অনুসরণ করার অপবাদ থেকে সমগ্র পরিবারকে এবং বিশেষ করে ইসমাঈল পাশার বংশধরদের দ্বারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এবং এর মাধ্যমে নিজকে নিষ্কলুস করার জন্য চেষ্টা করেন, যা তাঁর নিম্নের চরণদ্বয়ে প্রতিভাত হয়েছে,[১০৪]

أَأَخُونُ إِسْمَاعِيلَ فِي أَبْنَائِهِ * وَلَقَدْ وُلِدْتُ بِبَابِ إِسْمَاعِيلَا ؟

وَلَبِسْتُ نِعْمَتَهُ وَنِعْمَةَ بَيْتِهِ * فَلَبِسْتُ جَزْلًا وَارْتَدَيْتُ جَمِيلَا

"আমি কি ইসমাঈলের সাথে তার সন্তানদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি? অথচ আমি অবশ্যই ইসমাঈলের রাজদরবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আর আমি তাঁর সম্পদ ও তাঁর গৃহের প্রাচুর্য ভোগ করেছি, সুতরাং আমি প্রচুর উপভোগ করেছি এবং সুন্দর বস্ত্র পরিধান করেছি।"

কিন্তু কবি সুলতান হুসাইন কামিলের শাসনামলে (১৯১৪-১৯১৭ খ্রি.) তার নিকট বড় ধরনের কোন উপকার লাভ করতে পারেননি।[১০৫]

---

১০১. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ.৪৩৮; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৪; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪।

১০২. 'স্তুতিকবিতা' المديح হলো কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির উত্তম গুণাবলীর বর্ণনায় রচিত কবিতা বা প্রশংসাগীতি। যেমন-বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়-পরায়ণতা, বীরত্ব, গঠন-প্রকৃতি তথা সৌন্দর্য ও সুঠাম দেহের উল্লেখ করা। প্রশংসামূলক কবিতা আরবী কাব্যের বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে। আরব কবিগণ অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। তাই তারা পারিতোষিক লাভের আশায় বিভিন্ন রাজদরবারে গিয়ে খলীফাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। রাজা-বাদশাহগণ স্তুতিকবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করতেন। কখনো বা মোটা অংকের এককালীন সম্মানী এবং সাথে সাথে বাৎসরিক ভাতাও ঘোষণা করতেন, আবার কোন কবিকে রাজদরবারে চাকুরী দিতেন। প্রাক-ইসলামী আরব কবি 'নাবিগা যুবয়ানী' (মৃ. ৬০৪ খ্রি.), 'আল-আ'শা' (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) ও 'যুহাইর বিন আবী সুলমা' (৫৩০-৬২৭ খ্রি.) এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কবিতাকে উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দ্রঃ আহমাদ আল-ইস্কান্দারী ও মুস্তাফা ইনানী, আল-ওয়াসীত ফী আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখিহী, (মিসরঃ মাতবা'আতু আল-মা'আরিফ, ৭ম সংস্করণ, ১৩৪৭/১৯২৮), পৃ. ৪৮।

১০৩. ইন'আম আল-জুন্দী, আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৪০; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, পৃ ৬০।

১০৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১১২।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাসিত জীবন (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.)

ইতোমধ্যে ইংরেজগণ আহমাদ শাওকীকে রাজদরবার থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে এবং তাঁকে মিসরের বাইরে নির্বাসন করতে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারা কবিকে মাল্টায় নির্বাসনের উদ্যোগ নেয়। তদানীন্তন সরকার তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করলে বহু দেন-দরবারের পর আহমাদ শাওকীকে মিসরের বাইরে যে কোন দেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনের সুযোগ দেয়া হয়। তখন আহমাদ শাওকী স্বেচ্ছায় জন্মভূমি মিসর ত্যাগ করে ১৩৩৩ হি./ ১৯১৫ সালে জাহাজযোগে স্পেনে চলে যান এবং তথাকার সমুদ্র উপকূল তীরবর্তী বার্সেলোনা (Barcelona) শহরকে তাঁর আবাস হিসেবে নির্বাচন করেন।[১০৬]

তথায় তিনি একটি হোটেলে অবস্থান করেন, অতঃপর বার্সেলোনা বন্দর নগরীর সাগরবক্ষ থেকে অনেক উর্ধ্বে ভূ-মধ্যসাগরের সম্মুখ তীরবর্তী সুউচ্চ স্থানে অবস্থিত 'ফালকাদীরা' فَلْفَدِيرَا নামক এক নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকতে কবি এর উচ্চতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সকাল-সন্ধ্যায় সাগরবক্ষে জাহাজ চলাচলের দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করেন।[১০৭] এ বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরমভাবে কবি তাঁর 'আল-রিহ্‌লাতু ইলা আল-আন্দালুস' اَلرِّحْلَةُ إِلَى الأَنْدَلُسِ শীর্ষক কবিতায় চিত্রণ করেছেন; [১০৮]

مُسْتَطَارٌ إِذَا الْبَوَاخِرُ رَنَّتْ * أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَوْ عَوَتْ بَعْدَ جَرْسِ

رَاهِبٌ فِي الضُّلُوْعِ لِلسُّفْنِ فَطْنٌ * كُلَّمَا ثُرْنَ شَاعَهُنَّ بِنَقْسِ

"রাতের প্রথমভাগে যখন জাহাজগুলো শব্দ করে অথবা ঘন্টাধ্বনির পর যাত্রার জন্য গর্জন করে উঠে, তখন আমার মন প্রশস্ত হয়ে পড়ে। জাহাজগুলোর জন্য পাঁজরের মধ্যস্থিত অনুভূতিগুলো যখন উদ্বেলিত হয়, তখন আমার জাগ্রত মন শিঙ্গার ধ্বনিতে ফুলে উঠে।"

সেখানে মনোরম দৃশ্যের মাঝে কবি তাঁর দেশের কথা স্মরণ করে প্রবল আকুলতা অনুভব করেন এবং ঐ স্থানটি মাতৃভূমির প্রতি তাঁর মমতা বাড়িয়ে দেয়। তখন তিনি স্বদেশের প্রতি প্রীতির ক্ষেত্রে তাঁর 'আন্দালুসিয়া' أَنْدَلُسِيَّةٌ শীর্ষক সুন্দরতম কাসীদাটি রচনা করেন। যেখানে রয়েছে জীবন সংক্রান্ত কবির ভীষণ মনোবেদনা, যার কারণ হচ্ছে রাজদরবারের সম্পদ থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা, প্রবাস জীবন ও দেশ থেকে নির্বাসনের কষ্ট; যাকে তিনি ভালবাসেন এবং যেখানে তিনি জীবন যাপন করেছেন। নিম্নের চরণগুলোতে কবির মনের বেদনার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে,[১০৯]

يَا نَائِحَ الطَّلْحِ، أَشْبَاهٌ عَوَادِيْنَا * نَشْجِي لِوَادِيْكَ، أَمْ نَأْسَى لِوَادِيْنَا ؟

مَا ذَا تَقُصُّ عَلَيْنَا غَيْرَ أَنْ يَدًا * قَصَّتْ جَنَاحُكَ جَالَتْ فِي حَوَاشِيْنَا ؟

رَمَى بِنَا الْبَيْنُ أَيْكاً غَيْرَ سَامِرِنَا * - أَخَا الْغَرِيْبِ- وَظِلاً غَيْرَ نَادِيْنَا

"হে তালহ্ উপত্যকার বিলাপকারী! আমাদের বিপদাদির সাদৃশ্যসমূহে আমরা তোমার উপত্যকার জন্য বিষন্ন হব অথবা আমাদের উপত্যকার জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করব? তুমি আমাদের নিকট কি কাহিনী বলবে? এটা ব্যতীত যে একটি হাত তোমার বাহুকে কর্তন করেছে, যা আমাদের পার্শ্বসমূহে

---

১০৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪, হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৪:. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature 1900-1967, p.48.

১০৭. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৩।

১০৮. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

১০৯. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোরাফেরা করছে, বিরহ আমাদেরকে 'আইকা' নামক স্থানে নিক্ষেপ করেছে আমাদের গল্পকার ব্যতীত, যিনি প্রবাসীর বন্ধু এবং আমাদের আহ্বানকারী ব্যতীত একটি ছায়াসদৃশ।"

এ পর্যায়ে আহমাদ শাওকীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি যেন অন্ধকার ছেড়ে আলোর পৃথিবীতে ফিরে এলেন। যেখানে নেই প্রাসাদের বাধাধরা নিয়ম-কানুন। এ অবস্থায় আহমাদ শাওকী স্বদেশের বিরহ ব্যথা ও সম্পদের স্বল্পতার বেদনা উপলব্ধি করলেন। কেননা ইতোপূর্বে তিনি এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি। প্রকৃতপক্ষে গানের বুলবুলি এতদিন প্রাসাদে আবদ্ধ ছিলেন, স্তুতি ছাড়া কোন কিছুই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। না জনগণের দুঃখ কষ্টের সাথে ছিলেন তিনি পরিচিত। এই প্রথম বারের মত জীবনকে উপলব্ধি করলেন দু'ধারী তরবারীর মত 'স্বাদ (উপভোগ) ও দুঃখ' এবং 'কৃপা (দয়া) ও বঞ্চনা।' [১১০]

এ ব্যাপারে ড. শাওকী দায়ফ (জন্ম-১৯১০ খ্রি.) বলেন যে, "শাওকী বিশেষভাবে নিজের জন্য ও নিজস্ব জীবনের জন্য কবি ছিলেন না, বরং তিনি সর্বদা ছিলেন অন্যের জন্য নিবেদিত। যখন তিনি দেশান্তরিত হন এবং পদচ্যুতির কারণে 'অপর' আব্বাসকে হারান; তখন তিনি জানতেন না কে তাঁর কবিতাকে সংযুক্ত করবে। আর এতে তাঁর কবিতা রচনা ভীষণভাবে কমে যায় এবং কবিতার বদলে তিনি স্পেনিশ ভাষা, স্পেনীয় ইতিহাস অধ্যয়ন ও পাঠ এবং সেদেশে আরবদের বিজয়ের প্রভাব অন্বেষণে মনোনিবেশ করেন।"[১১১]

আহমাদ শাওকীর কালকাদীরা অবস্থানকালে ১৯১৮ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখন কবি মনে করেন যে ইংরেজ কর্তৃক সম্মতি প্রাপ্তির পর তিনি নিজেই দেশে ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু মিসরীয় কর্তৃপক্ষ আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আহমাদ শাওকীকে তৎক্ষণাৎ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়নি, ফলে তিনি ১৯১৯ সালের শেষাবধি সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর মিসরীয় কর্তৃপক্ষ পদচ্যুত হলে আহমাদ শাওকী সপরিবারে 'আল-বিল্য়ার' اَلْبِلْيَار দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন এবং স্পেনের বড় বড় শহরে পরিভ্রমণ করেন। সেখানকার গ্রানাডা, সেভিলা ও কর্ডোভা নগরীতে আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্য দর্শনে তাঁর মন কেঁদে উঠে; যা তাঁকে আরবী শিল্পের মাধুর্যে প্রভাবশালী কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং আব্বাসী যুগের প্রথিতযশা কবি আল-বুহ্তরী (২০৬-২৮৪ হি./৮২১-৮৯৭ খ্রি.) এর 'সীন' ছন্দে রচিত কাসীদার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আহমাদ শাওকীও তদ্রূপ 'সীন' ছন্দে 'আল-রিহ্লাতু ইলা আল-আন্দালুস' اَلرِّحْلَةُ إِلَى الأَنْدَلُسِ শীর্ষক কাসীদা রচনা করেন। স্বদেশ প্রেম দিয়ে শুরু করা এই কাসীদার প্রথম কয়েকটি পংক্তি হচ্ছে,[১১২]

اخْتِلاَفُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ يُنْسِي * أذكروا لِي الصِّبَا، وَأيامَ أُنْسِي

وَصِفَا لِي مُلاَوَةً مِنْ شَبَابٍ * صُوِّرَتْ مِنْ تَصَوُّرَاتٍ وَمَسٍّ

عَصَفَتْ كَالصَّبَا اللَّعُوْبِ وَمَرَّتْ * سِنَةً حُلْوَةً وَلَذَّةُ خَلْسِ

وَسَلاَ مِصْرَ:هَلْ سَلاَ الْقَلْبُ عَنْهَا * أَوْ أَسَا جُرْحَهُ الزَّمَانُ الْمُؤَسِّى ؟

"দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন আমার শৈশব ও আমার ভালবাসার দিনগুলো স্মরণ করাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এ দু'টি আমার যৌবনের কিয়দংশের বর্ণনা তুলে ধরেছে, যাতে আমার কল্পনা এবং অনুভূতি

---

১১০. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৪।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

১১২ আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রিত হয়েছে। এসব অনুভূতি প্রভাতকালীন দমকা হাওয়ার মত বয়ে যাচ্ছে, আর উপভোগ্য তন্দ্রা ও চিত্তাকর্ষক স্বাদের মত অতিক্রম করে যাচ্ছে। দিবা-রাত্রি মিসরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, তবে মানুষের মন কি এতে প্রশান্তি লাভ করছে? অথবা সমবেদনা জ্ঞাপন সময় কি মনের বেদনা বা ক্ষত সারাতে পারছে?"

এভাবে স্পেনে কবির পাঁচ বছর কেটে যায়। এ সময় তিনি আরবদের সাধারণ ইতিহাস ও বিশেষতঃ স্পেনে আরবদের ইতিহাস অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। এছাড়াও তিনি স্পেনের জাতীয় বীর ও কবিদের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেন। অনন্তর ইশ্‌বেলীয় শাসক আল-মু'তামীদ বিন আব্বাদ (৪৩১-৪৮৮ হি./১০৪০-১০৯৫ খ্রি.) এর সপরিবারে মরক্কোয় নির্বাসনের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আহমাদ শাওকী তাঁর 'আমীরাত আল-আন্দালুস' أميرة الأندلس শীর্ষক নাট্যউপন্যাসটি এখানেই রচনা করেন।[১১৩] স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে মিসরের সাথে তাঁর সম্পর্ক কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি তখন কায়রোতে অবস্থানরত তাঁর বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ সমসাময়িক কবি হাফিজ ইবরাহীম (১২৮৮-১৩৫১ হি./১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.) ও ইসমাঈল সাব্‌রী (১২৭৯-১৩৪২ হি./১৮৫৩-১৯২৩ খ্রি.) এর সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতেন।[১১৪]

নির্বাসনকালে কবির মাতৃবিয়োগ

স্পেনে নির্বাসনকালীন (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.) সময়ে মিসরস্থ হাল্‌ওয়ানে অবস্থানরত কবির মাতা ১৯১৮ সালে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করে প্রাঞ্জল বেদনা বিধুর ভাষায় একটি দীর্ঘ শোকগাঁথা রচনা করেন। এর আগে আহমাদ শাওকী হাল্‌ওয়ান শহরে অসুস্থ মাতাকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দেখতে সক্ষম হবেন এমন আশা করছিলেন, কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি মায়ের শেষদর্শনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে কবির মাতৃবিয়োগ সংক্রান্ত টেলিগ্রাম আসলে তিনি এ হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনায় অত্যন্ত শোকাহত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হন এবং এক ঘন্টার মধ্যেই শোকগাথাটি লিখেন।[১১৫]

বলা হয় যে, কবির মাতৃবিয়োগের শোক বিহ্বলতার আতিশয্যের কারণে তিনি শোকগাঁথাটি পরে পুনর্বার দেখার জন্য মনস্থ করেন। ফলে কাসীদাটি তাঁর বিশেষ কাগজপত্রাদির মধ্যে থেকে যায়; শেষ পর্যন্ত কবির মৃত্যুর পরদিন প্রভাতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'ইয়াবৃকী ওয়ালিদাতাহু' يبكي والدته শীর্ষক 'মারছিয়া' مرثية কবিতার প্রথম চরণটি হচ্ছে,[১১৬]

إِلَى اللهِ أَشْكُوْ مِنْ عَوَادِي النَّوَى سَهْمًا * أَصَابَ سُوَيْدَاءَ الْفُؤَادِ وَمَا أَصْمَى

"আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমি অভিযোগ করছি দূর থেকে আমার প্রতি আগত একটি বর্শা সম্পর্কে যা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত হেনেছে এবং আমাকে বধির করে দিয়েছে।"

এতদসম্পর্কে ইয়াহইয়া হাক্কী কবি-পুত্র হুসাইন শাওকীর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, "কবি এ শোকগাঁথাটিকে পুঁতে রাখা গোপন রহস্য ভান্ডারের ন্যায় ভাজ করে রাখেন ফলে তাঁর জীবদ্দশায় এটিকে তিনি প্রকাশ করেননি। যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যেন তিনি এ আশঙ্কা করেছিলেন যে, এটি প্রকাশিত হলে না জানি তাঁর মায়ের কথা তাঁর অন্তর থেকে

---

১১৩. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৫; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী , পৃ. ৬৫।

১১৪. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৮।

১১৫. ড. মুহাম্মদ মান্দুর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১১৬. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্মৃত হয়ে যাবে। তাই কবি যখনই শোকগাঁথাটির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করতেন প্রথমবারের ন্যায় আন্দোলিত হতেন এবং তাঁর মাতৃবিয়োগ নবায়িত হতো। অতঃপর নির্বাসন থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর কবি আর কখনো হাল্ওয়ানে যেতে সক্ষম হননি। তাঁর মনে হত যে যদি সেখানে তিনি প্রবেশ করেন তাহলে মায়ের স্মৃতি তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ভেসে উঠে তাঁর অন্তরকে বিদগ্ধ করবে।"[১১৭]

১৩৩৮ হি./১৯১৯ সালে আহমাদ শাওকীর নির্বাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি স্পেনে অবস্থান করেন। এ সময় আব্বাস হিলমী আহমাদ শাওকীকে তাঁর পক্ষ থেকে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সংযুক্ত হয়ে সেখানে পছন্দ অনুযায়ী পদে অবস্থান করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু কবির দেশপ্রেম তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে স্বেচ্ছচারী করে। ফলে তিনি খেদীব আব্বাসের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করেন।[১১৮]

নির্বাসন শেষে মিসরে প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা লাভ

আহমাদ শাওকীর বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর কাব্যশিল্পের অনুরাগীদের অনেকেই ইংরেজদের নিকট গমন করে কবির নির্বাসনের নির্দেশটি বাতিল করার এবং যখন খুশী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানায়। ১৯১৯ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কবিকে ক্ষমা ও নির্বাসন শেষে মিসরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করে। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে তিনি ভূ-মধ্য সাগরপথে 'জেনেস' উপসাগরের উপর 'জেনোয়া' (جنـوا) নামক একটি ইতালীয় সামুদ্রিক বন্দরে গমন করেন। এরপর সেখান থেকে এড্রিয়াটিক সাগরের উপর ইতালীতে অবস্থিত 'আল-বান্দুকিয়া' (البندقية) সামুদ্রিক বন্দর নগরীতে এসে জাহাজযোগে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ইউরোপকে বিদায় জানান।[১১৯]

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর দেশে প্রত্যাবর্তনকারী কবিকে সাদর অভ্যর্থনা ও স্বাগত সংবর্ধনা জানানোর জন্য মিসরের ষ্টেশনে অধীর আগ্রহে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, কবি-সাহিত্যিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল সমাবেশ ঘটে। অতঃপর আহমাদ শাওকী স্বীয় জন্মভূমি মিসরে পৌঁছলে এখানকার জনগণ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে কবিকে মাল্যভূষিত করে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।[১২০] পরবর্তীকালে আহমাদ শাওকীর জীবনে এর বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ বিশাল গণ-সংবর্ধনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি-পুত্র হুসাইন শাওকী বলেছেন যে, "আমার পিতার প্রতি অভিবাদন ও সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ষ্টেশন প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। অতঃপর তারা গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে উল্লাস ধ্বনি সহকারে তাঁকে পরিবেষ্টন করে ফেলে, এরপর তাঁকে স্কন্ধে উঠিয়ে গাড়ী পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। এহেন বিশাল যুব সমাবেশ আমার পিতার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সারা পথ তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।"[১২১]

---

১১৭. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৫।

১১৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৫; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১১৯. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল্-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৮।

১২০. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৫।

১২১. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

দেশবাসীর এ বিপুল জনসমাগম ও তাদের সাথে পুনঃমিলন সম্পর্কে আহমাদ শাওকী তাঁর 'বা'দ আল-মান্‌ফা' بَعْدَ الْمَنْفَى শীর্ষক কাসীদায় চমৎকারভাবে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হল,[১২২]

تَلَقَّــــوْنِـــــيْ بِـــكُلِّ أَغَرَّةَ زَاهِ * كَأَنَّ عَلَى أَسَــــرَّتِهِ شِهَابًا

تَرَى الإِيْمَانَ مُــــؤْتَــلِــقًا عَلَيْهِ * وَنُورَ العِلْمِ ، والكَـــرَمَ اللُّبابا

وَتَلْمَـــحُ مِـــنْ وَضَاءَةِ صَفْحَتَـــيْهِ * مُحَيًّا مِصْرَ رَائِعَـــةً كَعَابًا

... شَبَابَ النِّـــيْلِ، إِنَّ لَكُمْ لَصَوْتًا * مُلَبًّى حِيْنَ يُرْفَـــعُ مُسْتَجَابًا

"তোমরা সর্বপ্রকার চমৎকার উজ্জ্বলতা সহকারে আমাকে গ্রহণ কর, যেন তার মুখাবয়বের উপর রয়েছে উল্কা নামক জ্যোতিষ্ক। তুমি তার উপর জৌলুসমান ঈমান, শিক্ষার আলো এবং অকৃত্রিম মহানুভবতা দেখতে পাবে। তুমি তাঁর পার্শ্বদ্বয়ের সৌন্দর্যের দ্বারা মনোরম স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট মিসরকে পুনঃজীবন দানকারী হিসেবে উদ্ভাসিত হবে।... হে নীলনদের যুবকগণ! তোমাদের জন্য রয়েছে এমন একটি কণ্ঠধ্বনি; যা উত্থিত হলে সাড়াপ্রাপ্ত হয় ও গৃহীত হয়ে থাকে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের[১২৩] শেষান্তে মতান্তরে ১৯২০ সালের[১২৪] প্রথমার্ধে সুলতান আহমাদ ফুয়াদ (১২৮৫-১৩৫৫ হি./১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রি.) এর শাসনামলে (১৯১৭-১৯৩৬ খ্রি.) তাঁর বদান্যতায় আহমাদ শাওকী স্বীয় জন্মভূমি মিসরে প্রত্যাবর্তন করলেও খেদীব আব্বাস রাজনৈতিক কারণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। কবি স্বদেশভূমিকে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে অমর যুব শহীদদের রক্তে রঞ্জিত দেখতে পেলেন। তিনি অনুভব করলেন নিজে নির্বাসন মুক্ত হলেও স্বজাতি আগের মতই পরাধীন। এখান থেকে আহমাদ শাওকীর সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। তিনি না পেলেন প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ, না ফিরে পেলেন পূর্ববর্তী চাকুরী। নির্বাসিত খেদীব আব্বাসের প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতাগুলোই এ পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শাহী মহলের সাথে তাঁর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইত্যবসরে তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করলেন।[১২৫]

হাফিজ ইবরাহীম ও আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিযোগিতা

নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আহমাদ শাওকী রাজপ্রাসাদে ফিরে যাননি। তখন রাজদরবারে বিভিন্ন প্রকারের মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচিত প্রতিটি কাসীদা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। এমতাবস্থায় দরবারের উপলক্ষগুলোর চেয়ে তিনি জাতীয় উপলক্ষগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই তিনি কখনো যুবকদের প্রতি, কখনো ছাত্রদের প্রতি , আবার কখনো শ্রমিকদের প্রতি সম্বোধন করে কাসীদা রচনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দীর্ঘ কাসীদা রচনার দ্বারা যুবকদের রেঁনেসা আন্দোলনকে স্বাগত জানান। এ সময় তিনি জাতীয় প্রচেষ্টা এবং দেশগড়ার প্রকল্পসমূহের

---

১২২. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

১২৩. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী,পৃ. ৪৩৮; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌য, আন-আল-লুগা ওয়া আল-আদব, ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১২৪. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১২৫. ড. শাওকী দায়ফ আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১২-১১৩; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌য, আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১২; গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ.১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসা করেন। যেমন-মিসরের স্বাধীনতা দিবস (২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খ্রি.), মিসরীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা (জুন, ১৯২৭ খ্রি.), মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯৩১ খ্রি.), প্রাচ্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান (১৯২৯ খ্রি.) ও রেড-ক্রিসেন্টের অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে তিনি অনেক কাসীদা রচনা করেন যা জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধনে সুফল বয়ে আনে।[১২৬]

এতদ্ব্যতীত জাতীয় অথবা আরব বিপ্লবের প্রতিটি বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আহমাদ শাওকী অসংখ্য কাসীদা লিখেন। সমসাময়িক প্রখ্যাত কবি হাফিজ ইবরাহীম (১২৮৮-১৩৫১ হি./১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.)ও প্রতিটি উপলক্ষে আহমাদ শাওকীর নামের সাথে নিজের নাম যুক্ত করতেন এবং তাঁর সাথে জাতীয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে কবিতা রচনায় তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। উভয়ের কাব্য প্রতিযোগিতায় কিছু লোক হাফিজ ইবরাহীমের প্রতি স্নেহাতিশয্যের কারণে তাঁর পক্ষাবলম্বন করত এবং আহমাদ শাওকীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে মত্ত হত। এসব লোকদের নেতৃত্বে ছিলেন ১৩০৭ হি./১৮৮৯ সাল থেকে প্রকাশিত মিসরের কায়রো নগরীর প্রখ্যাত 'আল-মুওয়াইয়্যাদ' اَلْمُؤَيَّدُ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শায়খ আলী ইউসুফ (১২৮০-১৩৩১ হি./১৮৬৩-১৯১৩ খ্রি.) যিনি আহমাদ শাওকীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, যখন কবি খেদীবী দরবারের উপদেষ্টা থাকাকালে পত্রিকার সাহায্যের ক্ষেত্রে মাধ্যম ছিলেন এবং তিনি ছিলেন পত্রিকার দুরাবস্থা ও স্বল্প অর্থ প্রাপ্তির কারণ। যেহেতু আহমাদ শাওকী হচ্ছেন পত্রিকার মালিকের দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিযোগিতার কারণ, তাই তিনি হাফিজ ইবরাহীমকে 'শাইর আল-নীল' شَاعِرُ النِّيل বা 'নীলনদের কবি' উপাধিতে ভূষিত করেন। হাফিজ ইবরাহীমের এ উপাধিটি অন্যান্য কবিদের উপাধিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার উপক্রম হলো।[১২৭]

তখন আহমাদ শাওকী উপলব্ধি করলেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদের কবি এবং তাঁর কবিতা সুলতানদের জন্য নিবেদিত হলেও হাফিজ ইবরাহীম তাঁকে পরাভূত করে ফেলেছে, আর তিনি দেশাত্মবোধে তাঁর সাথে কখনো প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারবেন না। যদিও হাফিজ ইবরাহীম দরিদ্র জনগণের কবি, যিনি তাঁর সমস্ত কাসীদায় জাতির প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এহেন অনুভূতি থেকেই হাফিজ ইবরাহীমের বিরুদ্ধে তিনি এমন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সচেষ্ট হন যা প্রতিযোগিতাকে স্তব্ধ করে দিবে এবং হাফিজ ইবরাহীমকে আহমাদ শাওকীর বিরুদ্ধে তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায় যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এজন্য আহমাদ শাওকী খেদীব আব্বাসের নিকট হাফিজ ইবরাহীমকে 'বেক' بِكْ উপাধি প্রদান করতে সচেষ্ট হলেন, ফলে তিনি হাফিজ ইবরাহীমকে 'বেক' উপাধি প্রদান করলেন। অতঃপর মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন মন্ত্রী আহমাদ হাশমত পাশা (১২৭৫-১৩৪৪ হি./১৮৫৮-১৯২৬ খ্রি.) এর নিকট আর্থিক অনটনগ্রস্ত হাফিজ ইবরাহীমকে খেদীবী কুতুবখানার কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীতে নিয়োগ দানের সুপারিশ করেন। এর মাধ্যমে আহমাদ শাওকী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিশ্চিত করেন, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।[১২৮]

স্পেনে নির্বাসিত হওয়ার পর আহমাদ শাওকী স্বদেশ ও দেশবাসীর প্রতি প্রীতি বিধৃত কাসীদাসমূহ রচনা করে সেগুলো মিসরে পাঠিয়ে জনগণের সাথে কবি-সাহিত্যিকদের মনও জয় করতে

---

১২৬. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৯।

১২৭. আহমাদ আবদুল ওয়াহ্হাব আবুল আয, ইছনা 'আশারা 'আমান ফী সোহবাতি আমীর আল-শু'আরা, (কায়রো, ১৯৩২), পৃ.৫৪।

১২৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থ হন। অতঃপর আহমাদ শাওকীর মিসরে প্রত্যাবর্তনের সময় হাফিজ ইবরাহীম যখন সংবর্ধনা জ্ঞাপনকারীদের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি আহমাদ শাওকীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,[১২৯]

إِنِّيْ حَمَلْتُ الأَمَانَــــــــــةَ فِيْ غِيَابِكَ * وَإِنِّي مُؤَدِّيْهَا لَكَ عِنْدَ حُضُوْرِكَ

"নিশ্চয়ই আমি আপনার অনুপস্থিতিতে আমানত বহন করেছি, আর এখন এটিকে আপনার উপস্থিতিতে আপনার নিকট সমর্পণ করছি।"

কিন্তু কুৎসা রটনাকারী ও প্রচেষ্টাকারী লোকেরা শত্রুতাপরায়ণ হয় এবং সমসাময়িক দুই প্রতিভাবান কবির মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তখন আহমাদ মাহফুযের নেতৃত্বে বন্ধুগণ কবিদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা করেন। প্রতিবারই এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে, কিন্তু বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা উভয়ের মধ্যে আবার প্রভেদ ঘটায়।[১৩০]

জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা রচনা

এ সময় আহমাদ শাওকী জনগণের দুঃখ-কষ্টের দিকে মনোনিবেশ করে তাদের আশা-আকাঙ্খাকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে থাকেন। স্বীয় শিল্প ও জাতির স্বার্থে অভিনব কায়দায় তিনি দেশাত্মবোধক ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা রচনায় হাত দিলেন। কৃষক, শ্রমিক, কুলি, মজুর ও জনসাধারণ তাঁর কবিতার কষাঘাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন সংগ্রামী হয়ে উঠল। শুধু মিসরই নয়, বরং গোটা আরব জাহান তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেতে বিপ্লবের অঙ্গীকারে উজ্জীবিত হল।[১৩১] স্বজাতিকে উদ্দেশ্য করে কবি তাঁর 'আয়্যুহাল উম্মাল' أَيُّهَا الْعُمَّالُ শীর্ষক কাসীদায় শ্রমজীবিদের অনুপ্রাণিত করে বলেন,[১৩২]

أَيُّهَا الْعُمَّالُ ، أَفْنُوا الْعُمْرَ كَدًّا وَاكْتِسَابَا *
أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ جُدُوْدَ * خَلَّدُوْا هَذَا التُّرَابَا
قَلَّدُوْهُ الأَثَرَ الْمُعْجِزَ * وَالْفَنَّ الْعِجَابَا

"ওহে শ্রমিক সমাজ! তোমরা পরিশ্রম ও উপার্জনের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ কর। তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তি হতে তোমরা কোথায় দূরে সরে আছ, যারা এই ভূমিকে (আবাদ করে) চির স্মরণীয় করে রেখেছে। তারা আশ্চর্যজনক নিদর্শন ও বিস্ময়কর শিল্পকলার দ্বারা এই মাটিকে অলংকৃত করেছে।"

অবকাশ যাপন ও আনন্দ ভ্রমণ

এ অখণ্ড অবসরে আহমাদ শাওকী তাঁর গৃহের ধন-সম্পদ ও মালামাল পরিচর্যা করে সময় কাটাতেন। এ সময় তিনি তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া ও ইউরোপের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন স্থলসমূহে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। ১৩৪৩ হি./১৯৫২ সালে তিনি লেবাননের পাহাড়-পর্বতশৃঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ করেন। একদিকে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্যদিকে এ অধিবাসীদের প্রতি তাঁর ভালবাসার

---

১২৯. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ.১৫৬।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৩১. মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ মুনতাজী, আহমাদ শাওকী ও তাঁর আধুনিক আরবী কাব্য, পৃ. ৬।

১৩২. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে তিনি লেবানন গমন করেন।[১৩৩] ইতোমধ্যে তিনি মিসরের প্রখ্যাত পর্যটন ও শিক্ষাকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়াস্থ সামুদ্রিক বন্দর উপকূলে 'দুররাতু আল-গাওয়াছ' دُرَّةُ الْغَوَّاصِ নামক একটি অবকাশ যাপন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তথায় তিনি প্রায়ই গ্রীষ্ম ও শীতকালে আগমন করতেন। অনুরূপভাবে প্যারিসে অধ্যয়নরত দুই পুত্রকে দেখাশোনা করার জন্য তিনি সেখানে আসা-যাওয়া করতেন। এতদ্ব্যতীত নীলনদ এবং পিরামিডের সন্নিকটে তিনি প্রায়ই অবকাশ যাপন ও আনন্দ ভ্রমণ করতেন।[১৩৪] এমনি এক আনন্দ ভ্রমণকালে মিসরের পিরামিড সংলগ্ন বিশাল পাথরের মূর্তি (Sphinx) পরিদর্শনে রচিত তাঁর বিখ্যাত 'আবূল হাওল' أَبُو الْهَوْلِ শীর্ষক কাসীদার প্রারম্ভিক দুটি চরণ উদ্ধৃত হল, [১৩৫]

أَبَا الْهَـــــوْلِ، طَالَ عَلَيْكَ الْعُصُرُ * وَبُلِّغْتَ فِي الأَرْضِ أَقْصَى الْعُــــمُرْ

فَيَا لِدَةَ الدَّهْـــــرِ، لاَ الدَّهْرُ شَـــ * ـــبَّ، وَلاَ أَنْتَ جَاوَزْتَ حَدَّ الصِّغَرْ

"হে নারী সিংহী মূর্তি! তোমার উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর তুমি পৃথিবীতে প্রান্তিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছ। সুতরাং হে যুগ সন্তান! সময়ও যৌবনে পৌঁছেনি, আর তুমিও শৈশবের সীমা অতিক্রম করনি।"

আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে কাব্য চর্চায় সুখ্যাতি লাভ

কবি যেখানেই যেতেন সেখানেই তিনি সংবর্ধিত হতেন। তখন তাঁর আবাসস্থল আরব কবি সাহিত্যিক ও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি অধিকাংশ সময় গৃহের অভ্যন্তরে বসেই জাতীয় ও সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। এতে করে সমগ্র আরব বিশ্বে বিশেষতঃ সিরিয়া ও লেবাননে তাঁর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে।কবি কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনার কারণে স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক আবেগ-অনুভূতি থেকে দূরে না থেকে আরব জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় অভিব্যক্তির জয়গান গেয়েছেন।[১৩৬]

এ সময় তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে সিরীয় বিপ্লব প্রসঙ্গে কতিপয় অভিনব কাসীদা রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত 'আল-জাম্ঈয়্যা আল-আরাবিয়্যা' اَلْجَمْعِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ সংস্থার তিনি ছিলেন পরিকল্পনাকারী। এ সময়ে তাঁর কবিতার মূল সুর ছিল আরব ঐক্যের স্বপক্ষে। তাঁর দর্শন ছিল আরবগণ এক দেহস্বরূপ যে, যখন তার এক অঙ্গ বেদনাক্রান্ত হয়, তখন তার সর্বাঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করে। আরবদের সমাবেশে পঠিত আহমাদ শাওকীর কবিতার দুটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো; [১৩৭]

وَنَحْنُ فِي الشَّرْقِ وَالْفُصْحَى بَنُو رَحِمٍ * وَنَحْنُ فِي الْجُرْحِ وَالآلاَمِ إِخْوَانُ

"আমরা প্রাচ্যে অবস্থান করছি এবং আমরা একই মাতৃতুল্য প্রাঞ্জল ভাষার সন্তান, আমরা আহত অবস্থায় রয়েছি, আর আমাদের বেদনারাশি আমাদের ভ্রাতৃতুল্য।"

---

১৩৩. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৪; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১১১।

১৩৪. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৯।

১৩৫. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।

১৩৬. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১২; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৪।

১৩৭. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এতদসম্পর্কিত বিষয়ে কবি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আবৃত্তি করেন,[১৩৮]

كُلَّمَا أَنَّ بِالْعِرَاقِ جَرِيـــــحٌ * لَمَسَ الشَّرْقُ جَنْبَهُ فِي عُمَانِـهِ

"যখনই ইরাকের কোন আহত ব্যক্তি চিৎকার করে, তখন সমগ্র প্রাচ্য তার বেদনায় ব্যথিত হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।"

দেশাত্মবোধক, জাতীয়তাবাদ ও আরব রাজনীতির স্বপক্ষে আহমাদ শাওকীর কবিতা রচনার এ ধারা তাঁর জীবনের শেষাবধি অব্যাহত থাকে। তিনি সাধারণভাবে গোটা আরবজাতির এবং বিশেষতঃ মিসরীয় আশা-আকাঙ্খা ও জাতীয় চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখেন। ফলে বিশ্বব্যাপী এমনকি পাক-ভারত উপ-মহাদেশেও তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৯]

আহমাদ শাওকীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত

বাংলা সাহিত্যের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৬৮-১৩৪৮ বাং/১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) ১৯২৬ সালে আরব কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। এ ছাড়াও ফিলিস্তিনী সাহিত্যিক ইস্আফ বেক আল-নাশ্শাশীবী (১৮৮৫-১৯৪৮ খ্রি.), তিউনেসীয় নেতা সাইয়্যেদ আল-সা'লাবী প্রমুখ এর সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিল। এভাবে মিসরে প্রতিনিধি হিসেবে আগত আরব দেশের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সমসাময়িক বিশ্ববরেণ্য কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন।[১৪০]

সিনেটের সদস্য নিযুক্তি (১৯২৪-১৯৩২ খ্রি.)

আহমাদ শাওকীর এহেন উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৩৪২ হি./ ১৯২৪ সালে মিসর সরকার তাঁকে মিসরের জাতীয় সংসদ 'সিনেট' (Senate) এবং উচ্চপরিষদ مَجْلِسُ الشُّيُوخِ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।[১৪১] এত বিরাট জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেননি, সিনেটে তাঁর সদস্য পদ থাকলেও তিনি সেখানে তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। রাজনৈতিক অঙ্গনে আহমাদ শাওকীর অবস্থান ছিল স্বভাব সুলভভাবে প্রান্তিক; কেননা ভীড়, ঠেলাঠেলি ও চাপাচাপিকে তিনি অপছন্দ করতেন। তাই রাজনীতি তাঁর মধ্যে তেমন রেখাপাত করেনি। তাঁর প্রধান ব্যতিব্যস্ততা ছিল স্বীয় সম্পদের প্রশাসনে।[১৪২]

জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও 'আমীর আল-শু'আরা' উপাধি অর্জন

আহমাদ শাওকী গণ-বিচ্ছিন্ন কবি ছিলেন না। তাঁর কবিতা ছিল দেশ ও জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এতে করে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে তাঁর কবিতা এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তা মিসরে সর্বত্র ব্যাপকভাবে পঠিত ও গীত হতে থাকে। শুধু মিসর নয়, সমগ্র আরব বিশ্ব যেন তাঁর স্তুতি করতে লাগলো। তাঁর খ্যাতি তাঁকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করে এবং তাঁর সুশিক্ষিত

---

১৩৮. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

১৩৯. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১২-১১৩।

১৪০. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৯।

১৪১. ইন'আম আল-জুন্দী, আল-রাইদ ফী আল-আদব আল-আরবী, পৃ ৪৪০; হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৯; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১৪২. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৭-৫৮; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. P. 37-38.

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসাকারীদের এক বিরাট দল গড়ে উঠে।[১৪৩] অনন্তর ১৯২৭ সালে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-শাওকিয়্যাত' اَلشَّوْقِيَّات শীর্ষক কাব্যসংকলনের পুনঃ প্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে আহমাদ শাওকীকে সম্মাননা জ্ঞাপনার্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।[১৪৪]

ইত্যবসরে ১৩৪৫ হিজরী শাওয়ালের শেষান্তে ১৯২৭ সালে ২৯ এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত কায়রোর 'জাতীয় অপেরা হাউজে' সুলতান আহমাদ ফুয়াদ (১২৮৫-১৩৫৫ হি./১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রি.) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশী-বিদেশী অনেক নামী-দামী কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে আহমাদ শাওকীর সম্মানসূচক এক জাঁকজমকপূর্ণ জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[১৪৫]

উল্লেখ্য যে, আহমাদ শাওকীর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিসরীয় সরকার ও তার প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ এবং সমগ্র আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিদেশী মেহমানদের মধ্যে ছিলেন সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব 'মুহাম্মদ কুরদ আলী'[১৪৬] (১৮৭৬-১৯৫৩ খ্রি.), লেবাননের 'শাকীব আরসালান'[১৪৭] (১৮৭১-

---

১৪৩. আবদুর রহমান তাহির সুরতী, তারীখে আদবে আরবী, (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৬৫২; হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ.৪৩৭; দায়েরায়ে মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যা, (লাহোর, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১৪৪. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩৯; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৯-৮০।

১৪৫. আহমাদ আল-ইস্কান্দারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭১; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী,পৃ. ৯৭৪; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী,পৃ.৫৮০;ড.শাওকী দায়ফ,আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর,পৃ. ১১৩; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, p. 37.

১৪৬. 'মুহাম্মদ কুরদ আলী'(১৮৭৬-১৯৫৩ খ্রি.) সিরিয়ার একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক। আরবী সাহিত্যে ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর 'আল-ইসলাম ওয়া আল-হাদারাত আল-আরাবিয়্যা' اَلإِسْلَامُ وَالْحَضَارَةُ الْعَرَبِيَّةُ অনবদ্য গ্রন্থ। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রিক। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ফালাসিফাতু আল-ইসলাম' فَلَاسِفَةُ الإِسْلَامِ 'খুত্তাতু আল-শামস' خُطَطُ الشَّامِ ও 'তারীখ আহমাদ বিন তূলুন' تَارِيخُ أَحْمَدَ بْنِ طُولُونَ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মিসরে 'আল-মুজাম্মা' আল-আরবী আল-মালাকী' اَلْمَجْمَعُ الْعَرَبِيُّ الْمَلَكِيُّ এর সদস্য ও দামেস্কের 'আল-মুজাম্মা' আল-ইলমী আল-আরবী' اَلْمَجْمَعُ الْعِلْمِيُّ الْعَرَبِيُّ এর সভাপতি (১৯২০-১৯২৫ খ্রি.) ছিলেন। দ্রঃ ফার্দীনান্দ তূত্তাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আদব ওয়া আল-উলূম, (বৈরুতঃ মু'জাম লি আ'লাম আল-শারক ওয়া আল-গারব, ১৯৫৬), পৃ. ৪৩৫; আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃ. ১০৩।

১৪৭. 'আল-আমীর শাকীব আরসালান' (১৮৭১-১৯৪৬ খ্রি.) লেবাননের একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও লেখক। তিনি আরব ও ইসলামী রাজনীতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব। দামেশ্কের 'আল-মুজাম্মা' আল-ইলমী আল-আরবী' اَلْمَجْمَعُ الْعِلْمِيُّ الْعَرَبِيُّ এবং 'আল-জামইয়া আল-আসিয়াওইয়্যা' اَلْجَمْعِيَّةُ الآسِيَوِيَّةُ বা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল-হুলাল আল-সুন্দুসিয়্যা ফী আল-আখবার ওয়া আল-আছার আল-আন্দালুসিয়্যা' اَلْحُلَلُ السُّنْدُسِيَّةُ فِي الأَخْبَارِ وَالآثَارِ الأَنْدَلُسِيَّةِ 'ফী তারীখ আল-আন্দালুস' فِي تَارِيخِ الأَنْدَلُسِ ও 'হাদির আল-আলাম আল-ইসলামী' حَاضِرُ الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি আরব ও ইসলামের খেদমতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৯; ফার্দীনান্দ তূত্তাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ খ্রি.), 'শিবলী বেক মাল্লাত'[১৪৮] (১৮৭৫-১৯৬১ খ্রি.) ও ফিলিস্তিনের আমীন আল-হুসাইনী প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।[১৪৯]

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি ছিল নিতান্তই সাহিত্য নির্ভর। ইতোপূর্বে অনুরূপ উৎসব মিসরে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসেও এ জাতীয় সভার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়না। প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনা সভায় আহমাদ শাওকীর অবদান ও তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। সম্মেলনে অভ্যাগত আরব বিশ্বের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ তাঁর প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। এ সভায় আরবী সাহিত্যে তাঁর অভূতপূর্ব অবদানের মূল্যায়ন করতঃ সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর উচ্চাসনের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইমারাত আল-শি'র' إِمَارَةُ الشِّعْرِ তথা কবিতার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আনুগত্য ঘোষণার প্রশ্নে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫০]

অত্র সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ 'শাইর আল-নীল' شَاعِرُ النِّيلِ বা নীলনদের কবি হাফিজ ইবরাহীম (১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.) একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। যাতে কবি নিজের ও আরবদেশসমূহ হতে আগত প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে সকল আরব কবি-সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে কবি আহমাদ শাওকীর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর কাব্য নেতৃত্বের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আহমাদ শাওকীকে 'আমীর আল-শু'আরা' أَمِيرُ الشُّعَرَاءِ বা 'কবি সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৫১]

হাফিজ ইবরাহীম বিরচিত 'তাহ্নিয়াতু আহমাদ শাওকী বেক' تَهْنِئَةُ أَحْمَدَ شَوْقِي بِكْ নামক কবিতার সংশ্লিষ্ট চরণটি নিম্নরূপ:[১৫২]

أَمِيــرَ الْقَــوَافِيْ قَدْ أَتَيْتُ مُبَايِعاً * وَهَذِي وُفُوْدُ الشَّرْقِ قَدْ بَايَعَتْ مَعِي

"ওহে ছন্দের প্রশাসক! আমি আপনার নিকট আনুগত্যকারী হিসেবে এসেছি, আর প্রাচ্যের এ প্রতিনিধিগণ আমার সাথে আপনার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন।"

এ উপলক্ষে 'আল-সিয়াসা আল-উসবুইয়্যা' اَلسِّيَاسَةُ الأُسْبُوعِيَّةُ ম্যাগাজিনে ২৩ এপ্রিল, ১৯২৭ ইং তারিখে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[১৫৩]

---

১৪৮. 'শিবলী বেক মাল্লাত' লেবাননের একজন প্রখ্যাত কবি, লেখক ও সাংবাদিক। তিনি ১৮৭৫ সালে লেবাননের 'বা'বাদা' بَعْبَدَا নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখানেই ১৯৬১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯০৮ সালে বৈরুতে 'আল-ওয়াতান' اَلْوَطَنُ শীর্ষক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। তিনি 'শাইর আল-আরুয' شَاعِرُ الأَرْزِ উপাধিতে ভূষিত হন। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৬৮৩।

১৪৯. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৪০।

১৫০. ড. মুস্তফা মাহমূদ ইউনুস, মিন আদাবিনা আল-মু'আসির, পৃ. ১০৩; আব্বাস হাসান , আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী , পৃ. ৪১।

১৫১. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৪০; ইন'আম আল-জুন্দী, আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৪১; Pierre Cachia, An Overview of Modern Arabic Literature, (Edinburgh: University Press, 1990), P. 181.

১৫২. হাফিজ ইবরাহীম, দীওয়ান, ড. আহমাদ আমীন সম্পাদিত, (কায়রোঃ দার আল-আউদা, তা. বি., প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৭), পৃ. ১২৮।

১৫৩. J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Eygpt, P. 37.

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে আহমাদ শাওকী তাঁর ইচ্ছামত সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ শুরু করলেন। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় নবজাগরণের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে তিনি অন্যান্য আরব জাতির সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হন। যেমন- সিরীয়দের বিভিন্ন পর্যায়ের জাতীয় বিপ্লবে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং এগুলোকে স্বীয় কবিতায় চিত্রিত করেন।[১৫৪] এগুলোতে আরবদের জাতীয় আকাঙ্খা, তাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে আহমাদ শাওকী মিসর, সিরিয়াসহ অন্যান্য আরবদেশের যুবকদের কামনার বস্তুতে পরিণত হলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতার চর্চা দেশের আনাচে-কানাচে গীত হতে থাকে এবং তিনিও কবি সম্রাট হিসেবে আরব বিশ্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করেন।[১৫৫]

ইতোমধ্যে আহমাদ শাওকী মিসরের জনগণের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে শুরু করেন। তিনি কখনো কখনো স্বীয় বাহন হতে অবতরণ করে অলি-গলির রাস্তায় দিকভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতেন। নিজের ঘরে, সংবাদপত্র অফিসে এবং আড্ডাখানায় বন্ধু-বান্ধবদের সমাবেশে যাতায়াত করতে থাকেন। মিসরবাসী কবিকে তাদের উৎসব-উপলক্ষসমূহে একাত্ম করে নেয়। যদিও কবির জীবন মিসরবাসীর জীবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি তিনি তাদের চেতনা, আনন্দ ও উৎসবাদিতে অংশগ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন।[১৫৬]

হাফিজ ইবরাহীমের মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা

হাফিজ ইবরাহীম আহমাদ শাওকীকে স্বীয় যুগের কবিদের প্রশাসক বা নেতা পরিণত করার কারণে অদ্যাবধি ঐতিহাসিকগণ হাফিজ ইবরাহীমকে একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী কবি হিসেবে গণ্য করে আসছেন। আহমাদ শাওকীও কখনো তাঁর সাথী ও কবি-বন্ধু হাফিজ ইবরাহীমের এহেন অতুলনীয় আন্তরিকতার কথা বিস্মৃত হননি। ১৩৫১ হি./১৯৩২ সালের ২১শে জুলাই কায়রোর উপকণ্ঠে 'আল-যায়তুন' الزَّيْتُون এলাকার একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে সমসাময়িক কবি হাফিজ ইবরাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৫৭] হাফিজ ইবরাহীমের আকস্মিক মৃত্যুতে আহমাদ শাওকী শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং কবি হাফিজ ইবরাহীমের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকগাঁথা কবিতা রচনা করেন।[১৫৮] যার উল্লেখযোগ্য দুটি পংক্তি নিম্নরূপ,[১৫৯]

قَدْ كُنْتُ أُوثِرُ أَنْ تَقُـــوْلَ رِثَائِيْ * يَا مُنْصِفَ الْمَوْتَى مِنَ الأَحْيَاءِ

لَكِنْ سَبَقْتَ، وَكُلُّ طُوْلِ سَلاَمَةٍ * قَــــدَرٌ، وَكُلُّ مَنِيَّةٍ بِقَـــضَاءِ

"আমি প্রাধান্য দিতাম যে, আপনি আমার শোকগাঁথা রচনা করবেন। হে জীবিতদের মধ্যে থেকে মৃত্যুর ইনসাফকারী! কিন্তু আপনি অগ্রে চলে গেছেন, আর প্রতিটি মৃত্যু হচ্ছে ভাগ্যলিপি।"

---

১৫৪. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৪০।

১৫৫. ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, মিন আদাবিনা আল-মু'আসির, পৃ. ১০৩।

১৫৬. প্রাগুক্ত।

১৫৭. আবদুল হামীদ সিন্দ আল-জুন্দী, হাফিজ ইবরাহীম শাইর আল-নীল, (কায়রো, ১৯৬৮), পৃ. ৪২।

১৫৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৫৯. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণা

এ চরম সফলতার ক্ষণেও আহমাদ শাওকী আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হলেন না, বরং তিনি তাঁর কবিতায় জাতীয় আকাঙ্খা বাস্তবায়নে ব্রতী হলেন। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে তিনি আরবী সাহিত্যে নতুনত্বের আহবায়কদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। আরবী কাব্য জগতে তিনি 'আল-শি'র আল-তাম্‌সীলী' اَلشِّعْرُ التَّمْثِيلِيُّ বা 'নাট্যকবিতা' (Dramatique) এর প্রবর্তন করেন। ইত্যবসরে তিনি বিশেষ শ্রেণীর 'আল-মাস্‌রাহিয়্যা আল-শি'রিয়্যা' اَلْمَسْرَحِيَّةُ الشِّعْرِيَّةُ তথা 'কাব্যনাটক' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এ সময় তিনি 'যাজাল'[১৬০] زَجَلٌ বা 'কবিয়াল কবিতা' রচনায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আহমাদ শাওকী বিরচিত চমকপ্রদ 'যাজাল' কবিতার মধ্যে নিম্নের পংক্তিদ্বয় প্রণিধানযোগ্য। কবির ভাষায়:[১৬১]

اَلنِّيلْ نَجَّاشِــــيُّ * حِلِيوه أَسْــمَـرْ

عَجَبْ لِلَــــوْنِهِ * ذَهَبْ وَمَــرْمَــرْ

"নীলনদ হচ্ছে নাজ্জাশী, যার স্রোত তামাটে বর্ণের, এর রং অদ্ভুত ধরণের সোনালী এবং স্বচ্ছ।"

গৌরবের শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়ে আহমাদ শাওকী অনুভব করেন যে, তাঁর সকল আশা চরিতার্থ হয়েছে এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিল্প লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট। এমতাবস্থায় কবি তাঁর জীবনের শেষ চার বছরে (১৯২৯-১৯৩২ খ্রি.) 'আল-রিওয়াইয়্যা আল-তাম্‌সীলিয়্যা' اَلرِّوَايَــاتُ التَّمْثِيلِيَّةُ 'নাট্য উপন্যাস' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরম উৎসাহ ও আগ্রহভরে সাহিত্য সাধনায় তথা নাট্য শিল্পে নিয়োজিত থাকেন।[১৬২]

কবি সমিতির সভাপতি মনোনয়ন

জীবন সায়াহ্নে কবি আহমাদ শাওকী ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'এ্যাপোলো' (Apollo) নামক 'কবিদের একটি সমিতি' (Society of poets) এর সভাপতি মনোনীত হন। এ সমিতির সদস্যভুক্ত কবিগণ রোমান্টিক ষ্টাইলের দ্বারা পরিচালিত হন। তাঁরা আহমাদ শাওকীকে তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে করেন। অবশ্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও নবীনতর প্রজন্মের কবিদের তিনি যৎসামান্যই প্রশংসা লাভ করেন।[১৬৩]

---

১৬০. 'যাজাল' زَجَلٌ হচ্ছে একশ্রেণীর জনপ্রিয় নবসৃষ্ট আরবী কবিয়াল কবিতা; যাতে চলতি ভাষার প্রাধান্য থাকে। এটি প্রাচীন গ্রীক গীতি কবিতার অংশ বিশেষ। যা ডান দিক থেকে বাম দিকে দলবদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয়। মূলতঃ এ জাতীয় কবিতাগুলো আমাদের দেশে প্রচলিত জারী গানেরই মূর্ত প্রতীক। জারী গানে যেমন একজন গায়ক সঙ্গীতের এক টুকরো কলি বলার পর অন্যান্য সহশিল্পীবৃন্দ সম্মিলিত কণ্ঠে তা পুনরাবৃত্তি করেন, ঠিক তদ্রুপ যাজালী কবিগণও তাদের রচিত গীতিকাব্য সম্মিলিত কণ্ঠে দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করতেন। দ্রঃ আল-আব লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ্, (বৈরুতঃ দার আল-মাশ্‌রিক, ২১ তম সংস্করণ, ১৯৭৩), পৃ. ২৯৪; মাজ্‌মা' আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, (মিসরঃ দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২/১৯৭২), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, পৃ. ৯১৯; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: Spoken Language Service Inc, 3rd Edition, 1976), P. 375.

১৬১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৩; ড. শাওকী দায়ফ, ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাক্‌দিহী, পৃ.৩৩৫।

১৬২. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৫; ড. মুহাম্মদ মানদুর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৬৩. J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 38.

Dhaka University Institutional Repository

বার্ধক্য জীবন

জীবনের শেষপ্রান্তে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার প্রাক্কালে আহমাদ শাওকীর দেহে আস্তে আস্তে দুর্বলতা ছেয়ে পড়ে। কবি রাত্রি জাগরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং পূর্বের ন্যায় জেগে থেকে সাহিত্য ও কাব্যচর্চা করতে পারতেন না। কারণ তিনি রক্তবাহিকা শিরঃপীড়ায় ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। ১৯৩০ সালে তিনি চার মাস যাবৎ আকস্মিক রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, যাতে তাঁর দৃঢ়তা ও শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং গৃহের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে চলার সময় তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে চলতে থাকেন।[১৬৪] কবি-পুত্রের বন্ধু আহমাদ মাহফুয এ দুরাবস্থার জন্য কবির যৌবনকালে মদ্য বিশেষতঃ 'হুইস্কি' (Whiskey) পানে চরম আসক্তিকে দায়ী করেন, যা কায়রোর উপকণ্ঠে অবস্থিত 'আল-মাতরিয়া' اَلْمَطَرِيَّـــةُ নামে খ্যাত জলসাঘরে এবং স্বীয় বাসভবন 'কুরমা ইবনে হানী' كُرْمَةُ بْنِ هَانِي তে অবস্থানকালে আহমাদ শাওকী তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অত্যাধিক সেবন করতেন। অবশ্য নির্বাসিতকালীন সময়ে তিনি মিসরীয় সরকার কর্তৃক অর্থ প্রেরণের স্বল্পতার দরুণ 'অ্যালকোহল' (Alcohol) পানের মাত্রা কমিয়ে দেন। এমনকি তিনি অধ্যয়ন অথবা কবিতা রচনাকালেও দুই পেয়ালা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[১৬৫]

এ সময় আহমাদ শাওকীর মধ্যে একটি স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, যা অর্থ স্বল্পতার সময় তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত এবং অর্থের পর্যাপ্ততায় তাঁকে আনন্দিত করত। সম্ভবতঃ এ অনুভূতিটি তাঁর যৌবনকালের ন্যায় বার্ধ্যক্যেও প্রভাব বিস্তার করে। তাই কবি আর্থিক অনটনের শংকা দূরীভূত করার একমাত্র পন্থা হিসেবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ এবং কবিতা রচনাকে বেছে নেন। তথাপি কবির অসুস্থতাকালে এ সংবেদনশীলতা তাঁর মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবির আচরণে এর প্রভাব সম্পর্কে কবি-পুত্র হুসাইন শাওকী বলেন যে, এ অনুভূতি কবিকে মাতম (শোক) সভায় উপস্থিত হতে বাধা প্রদান করত, এমনকি তাঁর বোনের মাতম অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত হননি।[১৬৬] এতদ্ব্যতীত তিনি যখন নির্বাসন থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি 'হাল্ওয়ান' حَلْوَانْ নামক স্থানে যেতে সক্ষম হননি, যেখানে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১৬৭]

মৃত্যু সম্পর্কে কবির দর্শন

কবি অসুস্থতার ব্যাপারে আতংকবোধ করতেন এবং বয়োঃবৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্ককারী থেকে দূরে থাকতেন। তিনি ক্যান্সার (Cancer) বা কর্কট রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। একদা তিনি কোথাও পড়েছিলেন যে, অধিকাংশ চিন্তাবিদ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অনন্তর কবির জিহ্বায় অথবা ঠোঁটে কোন ক্ষুদ্র আকারের স্ফীতি বা ফোড়া জাতীয় কিছু প্রকাশ পেলে তাৎক্ষণিক তিনি অস্থির ও অধীর অবস্থায় ডাক্তারের নিকট দ্রুত গমন করতেন। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় ফলে তিনি 'থার্মোমিটার' (Thermometre) বা তাপমান-যন্ত্রের লেখা পড়তে পারতেন না। আর কবির পরিবার তাঁর জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সময় জ্বরের তাপমাত্রার ব্যাপারে তাঁর নিকট মিথ্যা বলতেন।

---

১৬৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৫-৭৬।

১৬৫. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ.৭৭।

১৬৬. আহমাদ শাওকীর একজন বোন ছিল, যিনি ১৯৩০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ তার কথা ব্যতীত আর কিছুই উল্লেখ করেননি। দ্রঃ ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৪৬।

১৬৭. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই জন্য যে, তারা মনে করতেন জ্বরের তাপমাত্রার সঠিক বর্ণনা তাঁর মানসিক অস্থিরতাকে বৃদ্ধি করবে বরং মিষ্টিকথা, শুভসংবাদ এবং প্রসন্ন মুখমন্ডল তাঁর অন্তরকে শীতল করতে পারে।[১৬৮]

একদা আহমাদ শাওকীর সাহিত্যিক বন্ধু আল-আমীর শাকীব আরসালান (১৮৭১-১৯৪৬ খ্রি.) তাঁকে বললেন যে, তাঁদের অন্তরঙ্গপূর্ণ বন্ধুত্ব সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পূর্ব থেকে চলে আসছে। এতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্তৃক তাঁর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়ার উল্লেখে তিনি প্রচন্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[১৬৯]

এমনিভাবে জীবন সায়াহ্নে আহমাদ শাওকীকে পেরেশানী ও বিষন্নতা দারুণভাবে আক্রান্ত করে ফেলে। এ সময় তিনি একাকী থাকতে এবং বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দূরে থাকতে ভয় করতেন।[১৭০] তাই তাঁর নিকট সংবাদপত্রাদির প্রধান সম্পাদকের দপ্তরসমূহ ছিল সর্বাধিক পছন্দনীয় সমাবেশস্থল। তন্মধ্যে কায়রোর প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মরহুম আমীন আবদুল লতিফ আল-রাফিয়ী (১৮৮৬-১৯২৭ খ্রি.) এর সাথে ছিল তাঁর দৃঢ় যোগসূত্রিতা। অতঃপর অধ্যাপক তাওফিক দায়াবের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে অধিকাংশ দিবা-রাত্রিতে তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটত।[১৭১]

আধুনিক মিসরে তখন ছিল অবকাশ যাপনের সুবর্ণ সুযোগ। তখন কবির একান্ত সচিব ও লেখক আহমাদ আবদুল ওয়াহ্হাব তাঁর গাড়ীকে প্রস্তুত করতেন এবং আহমাদ শাওকীকে নিয়ে কায়রোর শহরতলীতে ঘুরে বেড়াতেন অথবা কবিকে নিয়ে তাঁর বন্ধু ইসমাঈল শিরীনের নিকট গমন করতেন।[১৭২] তাঁর নিকট কবির জীবন-চরিত সম্পর্কে একটি পুস্তক ছিল। অনন্তর আহমাদ শাওকী তাঁর বন্ধুর সাথে ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে তা টের পেয়ে যেন তিনি পবিত্র কুরআনে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।[১৭৩]

একদা সন্ধ্যায় আহমাদ শাওকী তাঁর চালককে অধ্যাপক তাওফিক দায়াবের সাথে সাক্ষাতের জন্য কায়রোস্থ 'আল-জিহাদ' الجهاد পত্রিকা অফিসে নিয়ে যেতে বলেন। অতঃপর সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নৈশ আলাপে মেতে উঠেন এবং খুব প্রশান্তিবোধ করেন। আমোদ-ফুর্তির লগ্নে কবি ভীষণভাবে কাশিতে আক্রান্ত হন। এ সময় তাঁর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও স্বভাবে পরিবর্তন এসে যায়। তখন আহমাদ শাওকীর চালক তাঁকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে ফিরে আসলে তিনি সুস্থতা লাভের আশায় বিশ্রামের জন্য বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটি ছিল ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখের রাত্রিকালীন ঘটনা। সেই রাত্রিতে তিনি আবার এমন কঠিন কাশিতে আক্রান্ত হন এবং আধঘন্টা সময় মনে তীব্র কষ্ট ও উভয় ফুসফুসে প্রবল চাপ অনুভব করেন। এহেন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হতভম্বতার ভেতরে কবিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিবেষ্টিত লোকদের মধ্যে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়।[১৭৪]

---

১৬৮. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৬।

১৬৯. প্রাগুক্ত।

১৭০. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১৫৩।

১৭১. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৮।

১৭২. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১৫৩।

১৭৩. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৪।

১৭৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল ও শোকসভা

অবশেষে ১৩৫১ হি./ ১৯৩২ খ্রি. ১৪ ই অক্টোবর[১৭৫] ভোর রাত্রি ২ ঘটিকার সময় আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের কবিকুল সম্রাট আহমাদ শাওকী কায়রোর জীযাস্থ নীলনদ উপকূল তীরবর্তী তাঁর 'কুরমা ইবনে হানী' كَرْمَةُ ابنِ هَانِي নামে পরিচিত প্রাসাদে ইহধাম ত্যাগ করেন।[১৭৬] (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর। তিনি অসংখ্য গুণগ্রাহীসহ পেছনে ফেলে যান প্রচুর মান-মর্যাদা, বিপুল ধন-সম্পদ এবং আরবী কবিতার বিশাল ভান্ডার।

মৃত্যুর পূর্বলগ্নে কবি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র হাসানকে শেষ দর্শনের জন্য আহ্বান জানালে উভয়ে তাঁর নিকট দ্রুত আগমন করলেও তারা তাঁকে নিস্প্রাণ অবস্থায় দেখতে পায়। বর্ণনাকারীদের সূত্রে বলা হয় যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আহমাদ শাওকীর সর্বশেষ যে কথা ছিল, তা তিনি নিজের একনিষ্ঠ খাদেমের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:[১৭৭]

سَلِّمْ لِيْ عَلَى مُحَمَّدٍ أيْ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ

"মুহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রতি আমার সালাম পৌঁছে দিও।"

অনন্তর আহমাদ শাওকীকে দাফন করার পর তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর নবীপ্রশস্তিমূলক বিখ্যাত 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْـــبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদা থেকে গৃহীত নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় তাঁর কবরের উপর লিখে দেওয়া হয়;[১৭৮]

يَا أَحْمَدَ الْخَيْرِ، لِيْ جَاهٌ بِتَسْمِيَــتِيْ * وَكَيْفَ لاَ يَتَسَامَى بِالرَّسُوْلِ سَمِيٌّ ؟

إِنْ جَلَّ ذَنْبِيْ عَنِ الْغُفْرَانِ لِـيَ أَمَلٌ * فِي اللهِ يَجْـعَلُـنِي فِيْ خَيْرِ مُعْتَصَمِ

"হে কল্যাণের সর্বাধিক প্রশংসিত (আহমাদ)! আমার নামকরণে রয়েছে আমার গৌরব, আর কিভাবে আমার নাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামের দ্বারা গৌরবান্বিত হবেনা? যদিও আমার পাপরাশি ক্ষমার চেয়ে বেশী, তবুও আল্লাহর নিকট আমার আশা রয়েছে যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।"

আহমাদ শাওকীর ইন্তেকালে গোটা আরব দেশে শোক-দুঃখ ও বেদনার ধ্বনি ছেয়ে পড়ে। কবির বিয়োগব্যথায় শোকাতুর জনগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর কবিতা ও জীবন-চরিত নিয়ে বলাবলি করতে

---

১৭৫. আহমাদ শাওকীর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখূরী উল্লেখ করেন যে, আহমাদ শাওকী ১৯৩২ সালের ১৩ ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ তারীখ আল-আদব আল-আরবী,পৃ. ৯৭৪; অনুরূপভাবে আব্বাস হাসানের মতে আহমাদ শাওকী ১৯৩২ সালের ৪ঠা অক্টোবর পরলোক গমন করেন। দ্রঃ আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪১; তবে অধিকাংশের অভিমত অনুসারে আহমাদ শাওকীর মৃত্যুকাল ১৯৩২ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখটি অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য।

১৭৬. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৪৪; ড. শাওকী দায়ফ,আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৩; ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৪; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৫; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌য, আল আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১২; J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 38.

১৭৭. ইয়াহইয়া হাক্কী , হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৪।

১৭৮. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী পৃ. ৭৮; হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। অনুরূপভাবে মিসরের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীগুলো তার জন্য পৃথক ক্রোড়পত্রসহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এগুলোতে কবির কাব্য প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় যদ্বারা তিনি দেশ-বিদেশে ও প্রবাসী জীবনে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন।[১৭৯]

কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পর ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সাহিত্যামোদীদের যৌথ উদ্যোগে কায়রোর রাজকীয় অপেরা হাউজে কবির প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনায় উদ্দেশ্যে এক বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মরহুমের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, বিশেষ প্রতিনিধি, আরব বিশ্বের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[১৮০]

কবির মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোকগাঁথা

কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর নাম অদ্যাবধি আরব কর্ণ-কুহরে যাদুমন্ত্রের ন্যায় মুখরিত হয়। কবি তাঁর শিল্প ও কবিতায় বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। তিনি মরেও অমর। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু মানুষের মনে বিরাট প্রভাব রেখে যায় এবং আরবদেশগুলো আঁতকে উঠে। ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র সকলের চোখ থেকে ঝরে পড়ে তপ্ত লোনা অশ্রুমালা। একটি অবিস্মরণীয় জীবনাবসানে বিশ্ব হারালো একজন বহুভাষাবিদ মহামনীষী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাই অনতিবিলম্বে কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিকগণ মঞ্চসমূহে তাঁর কৃতিত্ব ও কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন শোকগাঁথা নিবেদন করেন এবং তাঁর বিরহে দুঃখ-বেদনাগুলো অনলবর্ষী লেখনীর মাধ্যমে ধারণ করেন।[১৮১]

১৯৩২ সালে নাবলুস শহরে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম শোকানুষ্ঠানে ইরাকের প্রখ্যাত কবি মারূফ আল-রুসাফী (১২৯২-১৩৬৫ হি./১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.) মিসরের কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোক প্রকাশ করে 'রাছা শাওকী শাইর মিসর আল-আক্‌বার' رَثَى شَوْقِي شَاعِرَ مِصْرَ اَلأَكْبَر শীর্ষক কাসীদা আবৃত্তি করে বলেন যে, নিশ্চয়ই যে লোকটি গতকালও জীবিত ছিলেন তিনি মৃতে পরিণত হয়েছেন। গতকাল তিনি ছিলেন হাস্যরত, স্বয়ং বন্ধু-বান্ধবসহ আনন্দিত, আর আজ আমরা তাঁর মৃত্যুর বেদনায় শোকাহত। তাই গোটা আরব জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যুতে বেদনায় ভারাক্রান্ত কবিতার ছন্দগুলো তরঙ্গায়িত হচ্ছে এবং কাব্যভীতি পরিমাপের দ্বারা প্রকম্পিত হচ্ছে। কবির ভাষায়:[১৮২]

اَلشِّعْرُ بَعْدَ مُصَابِـــهِ بِكَبِـــيْرِهِ * فِيْ مِصْرَ حَلَّ مُصَابُهُ بِأَمِــيْرِهِ
دَخَلَتْ لِسَمَاءِ الشِّعْرِ بَعْدَ أُفُوْلِهِ * مِنْ مُشْرِقَاتِ شُمُوْسِهِ وَ بُدُوْرِه

"আরবী কবিতা এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির দুর্যোগের পর এর সম্রাটের আক্রান্ত হওয়ার কারণে মিসরে এর দুর্যোগ প্রকট হয়ে পড়ে। কবিতার আকাশ এ নিম্নমুখীতার উজ্জ্বল সূর্য ও পূর্ণ চন্দ্রগুলোতে প্রবেশ করে।"

এতদ্ব্যতীত ১৯৩২ সালে আধুনিক আরবী কাব্যজগতের দুই দিকপাল কবি হাফিজ ইবরাহীম ও আহমাদ শাওকীর মৃত্যুর পর সিরীয় সাহিত্যিক সায়্যিদ আহমাদ উবায়দ এ দুই মিসরীয় স্বনামধন্য

---

১৭৯. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৮০. আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৮০; আহমাদ আল-ইসকান্দারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৭২; আবদুর রহমান তাহির আল-সূরতী, তারীখে আদবে আরবী (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৬৫২।

১৮১. হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৯।

১৮২. মারূফ আল-রুসাফী, আল-দীওয়ান, (বৈরুত: আল-মাকতাবা আল-আহলিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবির কিছু কবিতা সংগ্রহ করে তাঁদের জীবন চরিত ও কাব্য-প্রতিভার মূল্যায়নসহ দামেশ্ক থেকে ১৩৫১ হিজরীতে 'যিক্‌রা আল-শাইরাইন' ذِكْرَى الشَّاعِرَيْنِ বা 'দুই কবির স্মৃতিকথা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[১৮৩]

কবি আহমাদ শাওকীর মৃত্যুতে আলী মাহমুদ ত্বাহা আল-মুহান্‌দিস (১৩২১-১৩৬৯ হি./১৯০২-১৯৪৯ খ্রি.) কর্তৃক রচিত 'মাওত আল-শাইর' مَوْتُ الشَّاعِرِ শীর্ষক প্রখ্যাত শোকগাঁথা কবিতার প্রারম্ভিক দুটি চরণে মিসরসহ সারা বিশ্বের শোকার্ত মানুষের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এক সকরুণ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে,[১৮৪]

مَالُوْا بِمِصْبَاحِ الْبَيَانِ صَبَاحًا * وَمَشَوْا بِــــــهِ فِي الذَّاهِبِيْنَ رَوَاحًا

وَمَضَوْا بِهِ الاَّ شُعَاعًا لَمْ يَزَلْ * فِيْ الأَرْضِ مُؤْتَلِفُ السَّنَى وَضَاحًا

"তারা প্রাতঃকালে প্রাঞ্জল বর্ণনার প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে যায় এবং সন্ধ্যাকালে গমনকারীদের মধ্যে তা নিয়ে চলতে থাকে। তারা একটি কিরণ রেখে প্রদীপটিসহ চলে যায়, যা পৃথিবীতে সর্বদা উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী হিসেবে থাকবে।"

ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব-চরিত্র

আহমাদ শাওকী অতীব সুশ্রী, সুপুরুষ, অত্যন্ত সংযমী, ভাবগম্ভীর ও আত্মসচেতনতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বচনে সত্যবাদী, চাল-চলনে স্বভাবসুলভ ধীর, স্থির, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, নরম মেজাজী, কৌতুকপ্রিয় ও পরিমিত হাস্যরসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, চিন্তাশীল ও অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। রাজপরিবারে লালিত-পালিত হওয়ার প্রভাবে তিনি ছিলেন উন্নত সংস্কৃতিমনা, উদার চেতনাসমৃদ্ধ। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন রাজদরবারী তোষামোদী কবি। রাজা-বাদশাহ্‌, আমীর-উমরাহ এবং মহান ব্যক্তিবর্গের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তিনি তাঁদের নৈকট্য লাভ করেন। অবশ্য প্রবাস জীবন থেকে ফিরে এসে তিনি জনগণের দুঃখ বেদনায় ব্যথিত হয়ে তাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে কাব্যে চিত্রায়িত করে একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮৫]

আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় যেদিন তিনি আইন অফিসে যোগদান করেন। এ সম্পর্কে মিসরীয় সাহিত্যিক আহমাদ যাকী পাশা (১৮৬৬-১৯৩৪ খ্রি.) এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "তিনি (শাওকী) হচ্ছেন একজন ক্ষীণকায়, সরু, হালকা-পাতলা, খর্ব আকৃতি বিশিষ্ট সুদর্শন যুবক, প্রায় কপালে ভাজযুক্ত, দুটি চক্ষু ঢিলেঢালা, নড়াচড়ার সময় আন্দোলনবিশিষ্ট। আর যখন এক পলক ভূমির দিকে তাকাতেন, আকাশের পানে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত প্রসারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতেন। তিনি এ সকল ক্রমাগত ও অপছন্দনীয় চলাচল সত্ত্বেও শান্ত, নীরব, নির্বিকার; যেন তিনি নিজেই নিজের সাথে কথা বলছেন।"[১৮৬]

আহমাদ যাকীর এহেন বিবরণ সত্ত্বেও তিনি বিরল কাব্য-প্রতিভা ও অতুলনীয় যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যা তাঁকে কাব্য নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

---

১৮৩. আহমাদ উবায়দ, যিকরা আল-শাইরাইন, (দামেশ্‌ক, ১৩৫১হি.)।

১৮৪. আলী মাহমুদ ত্বাহা আল-মুহান্দিস, মাওত আল-শাইর, 'আল-মুক্‌তাতাফ',(কায়রো, ১৯৩২), ৩য় খণ্ড,পৃ. ৫৪৬।

১৮৫. জি. এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য, (ঢাকা: আল-মাহ্‌দা প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৮০-৮১।

১৮৬. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী ছিলেন জীবনবাদী কবি। তিনি জীবনকে ভালবাসতেন এবং জীবনের আরাম-আয়েশের প্রতি ছিলেন উৎসর্গীত। তিনি শালীন ও অত্যন্ত মূল্যবান পোষাক পরিধান করতেন। তিনি ছিলেন অকৃপণ ও অত্যন্ত দানশীল। সম্পদ আহরণ করতেন সত্য, তবে তা সৎপথে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের এবং মানবতার কল্যাণার্থে ব্যয় করার জন্য।[১৮৭] অভাবীদের সাহায্যে তিনি সর্বদা এগিয়ে আসতেন এবং মানবতার কল্যাণে দানের প্রশস্ত হাত সম্প্রসারণ করতেন। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে মিসর তথা আরব প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দানশীল সন্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতেন।[১৮৮]

আহমাদ শাওকী ব্যক্তিগতভাবে একজন সৎ, চরিত্রবান এবং খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী। যদিও ধর্মীয় অবশ্যকরণীয় বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করতেন না, তথাপি গোপনে ও প্রকাশ্যে তিনি ছিলেন মদ্যপানে অভ্যস্ত। উপরন্তু ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার বৈঠকে তিনি অংশ নিতেন।[১৮৯] বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আহমাদ শাওকীর আচরণ ও তাঁদের সাথে কবির যোগসূত্রতা সম্পর্কে আহমাদ মাহফুয বলেন যে, "তিনি বন্ধুদের প্রতি দ্রুত বিরক্তভাজন, দ্রুত পরিবর্তনশীল, দ্রুত ক্রোধান্বিত এবং দ্রুত সন্তুষ্টও হতেন। এজন্য তিনি যথার্থ বন্ধুত্ব চিনতেন না, বরং বিরাট সংখ্যক সঙ্গী-সাথীদের সাথে উঠা-বসা করতেন। তাদের মধ্যে তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন ড. মাহজুব সাবিত। ...এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন স্বল্প প্রতিশ্রুতি পালনকারী, তাঁর প্রতি উপকারীর প্রতিদানে তিনি সৌন্দর্যকে সংরক্ষণ করতেন না।[১৯০]

কবি-পুত্র হুসাইন শাওকী স্বীয় পিতার আমিত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেন ও তাঁর দ্রুত পরিবর্তনশীলতার দোষ ধরেন এবং এটিকে অন্যান্য সকল কবির ন্যায় তাঁর স্পর্শকাতরতার ফলশ্রুতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৯১] কারণ আহমাদ শাওকী স্বীয় কাব্যের দ্বারা অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। পত্রিকাসমূহ আহমাদ শাওকীর মধ্যে এ দুর্বলতাটি লক্ষ্য করেন। তথাপি আমরা আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিত্বে একজন উল্লাসিত মানুষকে দেখতে পাই যিনি সঙ্গী-সাথীদেরকে দুর্লভ উক্তির দ্বারা মুগ্ধ করতেন এবং স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল কাসীদাগুলোতে প্রগতিশীল ধর্মীয় ভাবধারা ধারণ, পারস্পরিক উদারতা, ক্ষমা এবং ঐক্যের পুনঃ পুনঃ কাব্য আহ্বানের মাধ্যমে অনুকম্পা ও উন্নত চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতেন, আর তিনি হচ্ছেন আহমাদ শাওকী। তাঁর কবিতার মাধ্যমে যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, আর এটি হচ্ছে তাঁর বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্ব যা কবিদের অধিকাংশের অবস্থা।[১৯২]

তিনি স্বীয় মাতৃভূমি মিসরকে মন-প্রাণ দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁর আমিত্ব এবং স্বরং সম্মোহিত করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অকৃত্রিম। বন্ধু-বান্ধব বিয়োগে আহমাদ শাওকীর ন্যায় কোন কবিই এত অধিক রোদন করেননি। কারণ তাঁর দীওয়ানের ৩য় খণ্ডটি মিসরের ঘটনাবলীর ইতিহাস ও এর মহান ব্যক্তিবর্গ ছাড়া শোকগাঁথামালার জন্য উৎসর্গীত, যা বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রীতির বিরল নমুনা। আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধুত্ব এমন ভূমিকা রেখেছে যা অনেক কবির জীবনে প্রেমের ভূমিকায় বিদ্যমান।[১৯৩]

---

১৮৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৪৪।

১৮৮. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৯।

১৮৯. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৮৮।

১৯০. আহমাদ মাহফুয, হায়াতু শাওকী, পৃ. ৭৭।

১৯১. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ১০।

১৯২. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৪-৭৫

১৯৩. ইয়াহইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ.৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব এবং সুখ-দুঃখে দ্রুত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পরম বন্ধুবৎসল, সন্তুষ্টচিত্ত, ন্যায়-পরায়ণ ও আদর্শবাদী । রোগে-শোকে অত্যন্ত কাতর হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পরম মানবতাসম্পন্ন, স্বদেশ প্রেমে আত্মোৎসর্গীত। তাইতো তিনি মানুষকে হিংসা বর্জন, শান্তির পতাকা বিস্তার, অসদাচরণে ক্ষমা প্রদর্শন, দুশ্চরিত্র, অসত্য, অকল্যাণ, গোত্রীয় ও বিভিন্ন মাযহাবজনিত কলহ-বিবাদ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এতদ্ব্যতীত তিনি সর্বদা স্বদেশের মর্যাদা, স্বজাতির সর্বপ্রকার শৃংখল মুক্তি এবং সভ্যতা ও প্রগতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের দ্রুত অগ্রগতি কামনা করতেন।[১৯৪]

আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিত্বে দুইটি ভাবধারার সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হয়। একটি ধর্মীয় চিন্তাধারা, অপরটি জাগতিক মোহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ধারা। কারণ আহমাদ শাওকীর এক ধরনের কতিপয় কবিতায় দেখা যায় যে, তিনি একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-সম্ভারকে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে জীবন যাপনে তিনি মদ্যপান, আনন্দ-উপভোগ ও সদর্পে চলার সাথী হিসেবে পরিদৃষ্ট হন।

তাঁর অন্য আরেক ধরনের কবিতায় তাঁকে একজন ধর্মপরায়ণ বিজ্ঞ ও খাঁটি মুমিন মুসলমান হিসেবে দেখা যায়। যিনি ইসলামের গৌরব রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারক এবং মুসলিম খিলাফতের একনিষ্ঠ সমর্থক ও আরবী ভাষার রক্ষক। যদিও আহমাদ শাওকীর কবিতায় দুইটি স্ববিরোধী ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী, মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর জাগতিক ভাবধারার কবিতাগুলো তাঁর জীবনের প্রথম দিকে রচিত। তাঁর ইসলামী চিন্তাধারায় রচিত বিশাল কাব্য সম্ভারের বিবেচনায় প্রাথমিক জীবনে রচিত জাগতিক ভোগ-বিলাস সম্পর্কিত কতিপয় কবিতা উপেক্ষাযোগ্য ও পরিত্যক্ত।[১৯৫]

---

১৯৪. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৪০।

১৯৫. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত,(কায়রো: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
নজরুল ইসলামের জীবন কথা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কাজী নজরুল ইসলাম ১৩১৭ হিজরীর ১৩ ই মোহররম / ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে মে/ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া (তৎকালীন রাণীগঞ্জ) থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত,দরিদ্র,মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর ডাকনাম ছিল 'দুখু মিয়া'। নজরুল ইসলামকে তাঁর পরশী ও পরিজনেরা এই নামেই ডাকতেন।[২] কেউ কেউ আবার তাঁকে 'তারা ক্ষ্যাপা', 'নজর আলী', 'নুরু' বলেও ডাকতেন।[৩]

নজরুল ইসলামের পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ (মৃ. ১৯০৮ খ্রি.), পিতামহের নাম কাজী আমীন উল্লাহ। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন (মৃ. ১৯২৮ খ্রি.), মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। পিতা কাজী ফকির আহমদ দুই স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঔরসে সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র। নজরল ইসলামের সহোদর ভাই-বোনের সংখ্যা চারজন। তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজানের পর ফকির আহমদের চার পুত্র অকালে লোকান্তরিত হওয়ার পর নজরুল ইসলামের জন্ম হলে তাঁর ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'।[৪]

---

১. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৯/ ১৯৭২), পৃ. ১-২; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, (ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫/১৯৮৮),পৃ. ৬৭৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩৯৯/১৯৯২), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫। নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ নিয়ে পূর্বে কোনরূপ বিতর্ক ছিল না; কিন্তু সূফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৫ খ্রি.) এর একটি গ্রন্থে কবির জন্ম তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে নজরুল ইসলামের কুষ্টি গণনাসূত্রে জ্যোতিষী পন্ডিত বি. আর. ব্যানার্জির স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত গণনালিপির যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে কবির জন্ম তারিখ ধরা হয়েছে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ, ভোর ৫ টা । অথচ কবির সুস্থাবস্থায় ১১ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছে, কবি এবং তাঁর পরিবারের ঐ তারিখে পূর্ণ সম্মতি ছিল। সেই অনুযায়ী ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। দ্র: সূফী জুলফিকার হায়দার, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭১/১৯৬৪), পৃ. ১১৯-১২২; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, (কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করন, এপ্রিল,১৯৯৭), পৃ. ২ ।

২. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫/১৯৮৯), পৃ. ২০।

৩. হায়াৎ মামুদ, প্রতিভার খেলা নজরুল, (ঢাকা: চেতনা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪/১৯৮৮),পৃ. ৮৩; রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৭।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫; নজরুল ইসলামের নাম যারা 'দুখু মিয়া' রেখেছিলেন তারা অজান্তে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মেনে তা করেছিলেন বলেই মনে হয়, কেননা আজন্ম দারিদ্রের সংসারে এ লোকটির জীবনে আর যা কিছুরই অভাব হোক অন্ততঃ দুঃখের অভাব কোনদিনই হয়নি। প্রচন্ড দারিদ্র আর অভিভাবকের অভাবে যৌবনেও ছেলেবেলার মত অনেক দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিক্রান্ত করেছেন। দ্র: রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৮৯/এপ্রিল, ১৯৮২), পৃ. ৮-৯; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে কাজী নজরুল ইসলামের বংশলতিকা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলঃ[৫]

কাজী আমীন উল্লাহ
|
কাজী ফকির আহমদ
|

কাজী সাহেবজান | কাজী নজরুল ইসলাম | কাজী আলী হোসেন | উম্মে কুলসুম

কাজী নজরুল ইসলাম
|

কাজী কৃষ্ণ মুহাম্মদ (ওরফে আজাদ কামাল) | কাজী অরিন্দম খালেদ (বুলবুল) | কাজী সব্যসাচী (সান-ইয়াৎ-সেন বা সানি) | কাজী অনিরুদ্ধ (লেনিন বা নিনি)

কাজী সব্যসাচী: খিল্‌খিল্ কাজী | মিষ্টি কাজী | বাবুল কাজী

কাজী অনিরুদ্ধ: কাজী অনির্বাণ | কাজী অনুপম | কাজী অনিন্দিতা (পুটুরাণী)

ঐতিহাসিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, কবির পূর্ব পুরুষগণ বিহারের রাজধানী পাটনার অধিবাসী ছিলেন এবং তৎকালীন দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ্ আলম (১৭২৮-১৮০৬ খ্রি.)এর রাজত্বকালে (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রি.) পাটনার হাজীপুর থেকে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। নজরুল ইসলামের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে কিংবদন্তির রাজা নরোত্তম সিংহের গড়, আর দক্ষিণ পার্শ্বে 'পীর-পুকুর'; কেউ বলে 'হাজী-পুকুর'। এরূপ প্রবাদ আছে যে, হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক জবরদস্ত ফকির প্রাচীনকালে এই রুখু মাটির দেশে ঐ পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন, সেই থেকেই এই নাম। পীর-পুকুরের পূর্বপাড়ে ফকির হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজার, আর পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। বংশানুক্রমে কবির পিতা-পিতামহ উভয়েই আজীবন এ স্থানে ঐ মাজার শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। কবির পিতা কাজী ফকির আহমদ স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন; সাধকবৃত্তি তাঁর স্বভাবগত ছিল, প্রত্যহ মাজার শরীফে সাঁঝবাতি দেওয়া, পূর্ব পুরুষ হযরত গোলাম নক্‌শবন্দ এর সমাধিতে সন্ধ্যায় প্রয়োজনমত পিদিম জ্বালানো এবং মসজিদের জন্য জরুরী সময় মাফিক আযান দেয়া, নামায পড়ানো এমনকি মসজিদে বসে এশার নামায পর্যন্ত তাসবীহ্-তিলাওয়াত করা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।[৬] এসমস্ত কিছুই মিলেমিশে গৃহে ধর্মনিষ্ঠা, ইবাদাত-বন্দেগীতে সাধনা ও ভক্তির আবহাওয়া 'কাজী পরিবারে' গড়ে উঠেছিল। কবির কোন একজন পূর্ব-পুরুষ মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত এক বিচারালয়ের 'কাজী' (বিচারক) এর পদ লাভ করেন এবং তারা সম্রাটের কাছ থেকে দান হিসেবে প্রচুর জমি-জমা বা 'আয়মা' সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।[৭] তখন থেকে নাম হয়ে গেল 'কাজী পরিবার'। আইন রক্ষায় পরে যদি ঐ পরিবারের আর কেউ নাও থেকে থাকে, তবু বংশ পরম্পরায় 'কাজী' পদবীটা বহাল রয়েই গেল। দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের দরবার থেকে দান হিসেবে প্রাপ্ত জায়গা-জমিও ছিল অনেক। কালের আবর্তনে ধন-দৌলত বা সহায়-সম্পত্তি ধীরে ধীরে খসে পড়েছিল একে একে,

৫. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ,১৩৯০/১৯৮৩), পৃ. ১৫৭; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ২।

৬. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২০; আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ২-৩।

৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, (কলকাতাঃ কে. পি. বাগজী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯১), পৃ. ৭-৮; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বংশ গৌরব তো বিত্তের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং কাজী বংশের কৌলিন্য টিকে থাকলো, সেই সঙ্গে স্বভাবেও থেকে গেল বিদ্যাচর্চার ঝোঁক, জ্ঞানের প্রতি দরদ ও আসক্তি।[৮]

বাল্যজীবন

অপরিসীম দুঃখের মধ্যেই নজরুল ইসলামের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে। কবি বাল্যকালেই পিতৃহীন হন। ১৩২৬ হিজরীর ১৬ ই সফর/১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে মার্চ/১৩১৪ সালের ৭ ই চৈত্র কবির পিতা কাজী ফকির আহমদ প্রায় নিঃস্বম্বল অবস্থায় ইহকাল ত্যাগ করেন।[৯] ফলে চরম দারিদ্রের সংসারে ভীষণ বিপর্যয় দেখা দেয় এবং শৈশবেই কবিকে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। কবির পড়াশোনায়ও অতিশয় ব্যাঘাত ঘটে। তাঁর দুঃখিনী মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অকুল সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারে খাদেম ও মসজিদে ইমামতি

প্রায় নয় বছর বয়সেই অভিভাবকহীন নজরুল ইসলামকে জীবন সংগ্রামে নামতে হলো। জীবিকা অর্জনের জন্য অতঃপর গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতা, আশে-পাশের পল্লীতে ধর্মীয় কাজ করে তিনি সামান্য কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন এবং মাঝে এক পর্যায়ে ফকির হাজী পাহ্লোয়ানের মাজার শরীফের খাদেম ও পীর পুকুরের মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১০]

নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান রপ্ত করে নিজের সমাজকে স্বচক্ষে দেখে উপলব্ধি করে দশম বর্ষীয় এই দুরন্ত কিশোর ছেলেটির শৈশব কাটতে থাকে। মক্তব, মাজার ও মসজিদের সংসর্গ বালক নজরুল ইসলামকে যথেষ্ট ধর্মপ্রাণ করতে পেরেছিল এবং অল্প বয়সেই যে নজরুল ইসলামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দুঃখের সংসারে মানুষ হতে থাকলেও চুরুলিয়া গ্রামের ছেলে নজরুল ইসলাম খোলামেলা মুক্ত প্রকৃতির আলোক-আভার মধ্যেই বড় হয়। দুরন্ত হওয়াটাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক, তাই পরবর্তী জীবনের বেপরোয়া উদ্দাম নজরুল ইসলাম দুখুর বয়সে ডানপিটে হওয়ার কোন অবকাশ পায়নি।[১১]

লেটোদলে যোগদান

বাল্যাবস্থায় মাত্র বার/তের বছর বয়সেই মাজার, মসজিদ, মক্তব জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে নজরুল ইসলাম 'লেটো'[১২] দলে যোগদান করেন। লেটো দলের জন্য এ সময় তিনি বেশ কিছু সংখ্যক গান, পালাগান, গীতি-নাট্য, প্রহসন এবং বহু মারফতী, পাঁচালী ও কবিগান রচনা করে 'ছোট উস্তাদজী' খ্যাতি অর্জন করেন।[১৩] গ্রাম্য বালক কবি হিসেবে তখন নজরুল ইসলামের যশ-খ্যাতি জীবন প্রভাতেই আশে-পাশের এলাকায় এমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পল্লীর লেটোদল তাঁর কাছে পালা লেখাতে আসতো। এতে তাঁর বেশ অর্থ রোজগারও হতো। কিশোর কবি নজরুল

---

৮. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ৭।

৯. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৭৪; রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৭।

১০. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২০ -২১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫।

১১. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ১১-১২; রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৮।

১২. 'লেটো' পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলের দৃশ্যপটহীন একধরনের নাচ, গান আর যাত্রাদল। লেটোদলের পল্লী কবিদের ছন্দ গাঁথায় রচিত নাটকের গ্রাম্য অভিনেতাদের নৃত্য গীতাভিনয় কিংবা বিভিন্ন দলের লড়াই, বিচার, বিতর্ক, দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের সাথে সাথে ভাল-মন্দের বিচারের পথও দেখাতো। দ্রঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫; রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৯।

১৩. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের কবিত্ব শক্তির প্রতিশ্রুতি দেখে লেটোদলের বিখ্যাত কবিয়াল 'গোদাকবি' শেখ চকোর ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন: 'এই ব্যাঙাচি বড়ো হয়ে সাপ হবে।' মানে এখন যাকে নেহাৎ সাধারণ ও সামান্য মনে করে অবহেলা করছো, ভবিষ্যতে সেই হয়ে উঠবে উল্লেখযোগ্য, অসামান্য, অপ্রতিরোধ্য। তিনি নজরুল ইসলামকে আদর করে কখনো কখনো 'ব্যাঙাচি' বলে ডাকতেন। কাজী নজরুল ইসলামের তৎকালীন বাল্যরচনা 'চাষার সং', 'শকুনি-বধ', 'মেঘনাদ-বধ', 'রাজপুত্র', 'দাতা-কর্ণ', 'কবি কালিদাস', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি পালাগানে রয়েছে ক্ষুদে কবির স্বকীয়তার ছাপ।[১৪]

কৈশোরে 'লেটোগান'[১৫] রচনার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হয়। নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম লেটোদলের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজেও লেটোগান রচনা করেন। তিনি বালক নজরুলের কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁকে লেটোগান লিখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। নজরুল ইসলামের বাল্যজীবনের উপর আলোকপাত করে তাঁর লেটোদলে যোগদানের পটভূমিকা সম্পর্কে কবির ঘনিষ্ঠ নিকট আত্মীয় কাজী আনওয়ারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন;

"বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না তাই নজরুল এই সব লেটোর দলে যান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর বয়স তখন বার/তের বৎসর মাত্র অথচ এ সময় রচনা তাঁর এত ভালো হতে লাগলো যে, ক্রমে তিনি নিমসা ও চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি 'লেটো নাচের' দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও মেঘনাধ-বধ নামে একটি নাটক রচনা করেন।"[১৬]

বাল্যজীবনে লেটোদলের সাথে নজরুল ইসলামের ক্ষণকালের যোগসূত্র ছিল। সম্ভবতঃ ১৯০৮-১৯১০ সালের মধ্যবর্তী কোন একটা সংক্ষিপ্ত সময়ে ছিল নজরুল ইসলামের লেটোজীবন। শেখ চকোর ও কবিয়াল বাসুদেবের দলের লেটো ও কবিগানের আসরে বালক নজরুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেন। ফরমায়েসী বা তাৎক্ষণিক রচনার অভ্যাস এভাবে তিনি কিশোর বয়সেই রপ্ত করে ফেলেছিলেন। নজরুল ইসলাম একাধারে গান, কবিতা, পালা রচনা করেছেন। আবার কোন কোন বিষয়ে প্রয়োজনে আসরে কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণও করেছেন।[১৭]

---

১৪. হায়াৎ মামুদ, প্রতিভার খেলা নজরুল, পৃ. ৮৩-৮৪; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫।

১৫. 'লেটোগান' চুরুলিয়া তথা পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আঞ্চলিক লোকগীতি। শুধু বর্ধমানেই নয়, পার্শ্ববর্তী বীরভূম, হুগলী, নদীয়া জেলাতেও এ গানের প্রচলন ছিল। বর্ধমান-বীরভূম জেলায় এ গান অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। যে গানে নাট্যের ভাব আছে, তাই লেটো গান। এ গান অভিনয়াদি সহযোগে পরিবেশিত হয়। এতে নাচ ও বাদ্যের স্থান আছে। অন্য কথায় গান, নাচ, অভিনয় ও বাদ্য সমন্বয়ে লেটোগান একটা মিশ্রিরীতির সঙ্গীতধারা, যা উন্মুক্ত মঞ্চে রাতভর পরিবেশিত হয়। দ্রঃ ওয়াকিল আহমদ, 'নজরুলের লেটোগান', 'সাহিত্য পত্রিকা', নজরুল জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, বিয়াল্লিশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫/অক্টোবর, ১৯৯৮), পৃ. ৩০৩।

১৬. আনওয়ারুল ইসলাম, 'নজরুলের বাল্যজীবন', 'কবিতা', (কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১), পৃ. ৩৪-৩৫।

১৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল অ্যালবাম', (ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের নামে প্রচলিত যে সব লেটোগান ও নাটিকা রয়েছে, সেগুলোর ছন্দোবদ্ধ ভাব, ভাষা, প্রকাশরীতি প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে খুব কাঁচা হাতের রচনা বলে মনে হয় না। কোন কোন রচনায় কিছুটা অগ্রসর মন ও প্রকাশরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যায় যে, স্কুলে পড়াশুনা করলেও লেটো দলের সাথে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। এ বিষয়টি আলোকপাত করে মুহাম্মদ আয়ুব হোসেন লিখেন, "তিনি যখন শিয়ারশোল বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন গোপনে লেটো লিখে দিতেন গান প্রার্থীদের এবং গোপনে রাণীগঞ্জের এক নির্জনে আমবাগানে চলতো গান শিক্ষার মহড়া। তাঁর এইসব গান, ছক, পালা লেটোশিল্পীদের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এক বৃহৎ পরিমন্ডলে।"[১৮]

কিশোর কবি নজরুল ইসলামের বাল্যরচনার দু' একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক, তা হলে প্রতীয়মান হবে যে, তাঁর বাল্যজীবনের সেই অপটু হাতের লেখায়ও তিনি বেশ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের ছোটবেলায় রচিত 'চাষার সং' নামক ছোট নাটিকার একটি মারফতী গানের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল,

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে'
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥
যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্জ-জাকাতে লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥[১৯]

প্রকৃতপক্ষে কবি ও শিল্পী নজরুলের হাতে-খড়ি এই লেটোদলে। লেটোদলের সঙ্গে সম্পর্ক বালক নজরুল ইসলামকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা দান করেছিল। কেবল দ্রুত কবিতা, গান, নাটক, বা মিশ্রভাষা রীতিতে রচনা নয়, হিন্দু পুরাণ ইতিকথা এবং ঐ অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নজরুল ইসলামের পরিচয় ঘটেছিল লেটোদলে। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিতে মুসলমান ঐতিহ্যের সাথে হিন্দু ঐতিহ্য এবং বাংলার গ্রামীণ ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয় লেটো কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাল্যরচনায় তার সূত্রপাত ঘটে।[২০]

শিক্ষাজীবন

নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তবসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। কবির জীবন দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিল বিধায় তাঁর জীবনে কোথাও স্থির থেকে লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি।

---

১৮. মোহাম্মদ আয়ুব হোসেন, 'গ্রামীণ নাটক :লেটোগান', লোক সংস্কৃতি গবেষণা, (৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০২), পৃ. ২৮১-২৮২।

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম, চাষীর গীত, নজরুল রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩/ মে, ১৯৬৬: ১ম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৯০/ জুন, ১৯৮৩), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১২।

২০. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের মক্তবে

চুরুলিয়ায় তখন স্কুল ছিল না, ছিল মক্তব। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য ছেলেকে গ্রামের মক্তবে পাঠিয়েছিলেন পিতা কাজী ফকির আহমদ। বালকের স্মৃতিশক্তি ছিল চমৎকার। গ্রামের মক্তবে মৌলবী কাজী ফজল আহমদ সাহেবের কাছে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শেখা আর ফারসী ভাষা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। এভাবে গ্রামের মক্তবে লেখাপড়ায় প্রথম হাতে-খড়ি। এখান থেকেই ১৯০৯ খ্রি./১৩১৬ সালে ১০ বৎসর বয়সে নজরুল ইসলাম নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর তিনি এক বৎসর কাল সেই মক্তবে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। নজরুল ইসলামের পিতৃব্য কাজী বজলে করীম আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন এবং আরবী-ফারসী মিশ্রিত শব্দে বাংলা কবিতা লিখতেন। এই পিতৃব্যের কাছেই নজরুল ইসলামের ফারসী শিক্ষার হাতে-খড়ি হয় এবং তাঁর প্রভাবেই নজরুল ইসলাম বাল্যবয়সেই লেটোদলের জন্য উর্দু-ফারসী মিশ্রিত মুসলমানী বাংলায় পদ্য রচনা শুরু করেন।[২১]

এ সম্পর্কে নজরুল ইসলামের একটি বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ছোটবেলায় আমি মক্তবের ছাত্র ছিলাম। আর মক্তবের ছাত্রদের মধ্যে আমিই ছিলাম মৌলবী সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। সুর করে চমৎকার আরবী পড়তে পারতাম। অল্প বয়সে মোল্লাগিরী করে গ্রামে আমার বেশ সুনাম হয়েছিল। এমনকি পীরের মাজারে খাদেমগিরী আর মসজিদের ইমামতিও করতে পেরেছিলাম সেই বয়সেই।"[২২]

মাথরুন হাইস্কুলে

নজরুল ইসলাম লেটোদল ছেড়ে ১৯১১ সালে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয় নদীর তীরস্থ মাথরুন হাইস্কুলে (প্রকৃত নাম মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট) ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তৎকালীন সময়ে কবি শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০ খ্রি.) সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নজরুল ইসলামের নম্র প্রকৃতি ও সম্ভ্রমবোধ সহজেই তাঁর শিক্ষক কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েই নজরুল ইসলামকে অর্থের অভাববশতঃ সে স্কুল ত্যাগ করতে হয়।[২৩] মাথরুন স্কুলে নজরুল ইসলামের ছাত্র জীবনের এক টুকরো স্মৃতি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি ২৩ বৎসর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি। নজরুল কলিকাতায় আমাকে জানায় সে আমার স্কুলের ছাত্র ছিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে। আমি শুনিয়া আনন্দিত হই ও গৌরববোধ করি। তখনকার দিনে 6th Class-এ নজরুল পড়িত। ছোট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম। সে বড় লাজুক ছিল, হেড মাষ্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত; ছোট ছেলে কাছে আসিতে সাহসী হইত না। সে নিজেই আমাকে এ কথা বলিয়াছে। শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে স্কুলে বেশীদিন ছিল না। বোধ হয় 4th Class (Class VII)-এ উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।"[২৪]

---

২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫: আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৩।

২২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫/১৯৮৮), পৃ. ৪২।

২৩. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২১।

২৪. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ.৭: হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র কাজী নজরুল ইসলামের কোমল স্বভাব এবং আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'বাল্যকালে নজরুল দুরন্ত, ডানপিটে ছিল', এসব প্রচলিত ধারণা সঠিক নয়।[২৫]

১৯১১ সালে নজরুল ইসলাম মাথরুন স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া শেষে ৭ম শ্রেণীতে উঠার পরই আর্থিক অনটনের দরুণ লেখাপড়া করতে না পেরে স্কুল ত্যাগ করেন। অতঃপর পুনরায় জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নজরুল ইসলামের ভবঘুরে জীবন শুরু হয়। প্রথমে কিছুদিনের জন্য কবিগানের আখড়ায় যোগ দেন। এ সময়েই নজরুল ইসলাম বাসুদেবের কবিদলের জন্য গান, পালা প্রভৃতি রচনা এবং কখনো ঢোলক বাজিয়ে আসরে গানও করতেন। বাসুদেবের মহড়ায় নজরুল ইসলামের গান শুনে বর্ধমানের আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন খ্রিষ্টান গার্ড তাঁকে পছন্দ করে ফেলেন এবং একটা অদ্ভুত ধরনের চাকুরী দেন। নজরুল ইসলামের কাজ ছিল রেলষ্টেশন থেকে প্রসাদপুর বাংলোয় দেড় মাইল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে গার্ড সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এবং প্রসাদপুর থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে তার জন্য খাবার নিয়ে আসা। এছাড়া মাঝে মধ্যে আসানসোল থেকে ট্রেনে করে গার্ড সাহেবের জন্য বিদেশী পানীয় কিনে আনতে আর গান শোনাতে হত। গার্ড সাহেবের বাড়িতে এই চাকুরীও কয়েক মাসের বেশী স্থায়ী হয়নি। কর্মে অবহেলা বা কোন অপরাধের জন্য তাঁর খানসামা চাকুরী যায়নি। একান্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত এক জটিল পরিস্থিতিতে গার্ড সাহেব নজরুল ইসলামকে পচিশ টাকা হিসেবে দু'মাসের মাইনে পঞ্চাশ টাকা হাতে গুজে দিয়ে বিদায় করে দেন। সেই যে অভিমান করে চলে গিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম, জীবনে আর কোনদিন প্রসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যাননি।[২৬]

ভাগ্যের নির্মম প্রতিকূলতায় আসানসোলে এসে ১৯১১ সালে নজরুল ইসলামকে চা-রুটির একটি দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকুরী নিতে হয়। খাওয়া মিলবে, মাইনে যৎসামান্য কিন্তু থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না রুটির দোকানের মালিক হুগলী জেলার এম. বখশ-এর এখানে। অগত্যা দোকান সংলগ্ন তিন তলা বাড়ীর সিঁড়ির নীচে নজরুল ইসলামকে রাত্রি যাপন করতে হল। ঐ বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামের অধিবাসী পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ সাহেব। ভদ্রলোক একদিন সিঁড়ির নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় নজরুল ইসলামকে দেখে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে নজরুল ইসলামের জীবনের করুণ কাহিনী জানতে পারেন। ততক্ষণে দুখুর মিয়ার পারিবারিক কাহিনী শুনতে শুনতে সদাশয় সাব-ইন্সপেক্টরের মন গলে গেছে। তিনি রুটির দোকান থেকে কবিকে উদ্ধার করে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে তাঁর বাড়িতে কাজে নিযুক্ত করেন। কাজের মধ্যে প্রধান কাজ ছিল কাজী সাহেবকে তামাক সাজিয়ে দেওয়া, ঐ রুটির দোকানে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির চেয়ে হাজার গুণ ভালো। নিঃসন্তান দম্পতির অপত্যস্নেহ দুখুকে ঘিরে রাখে। অবশ্য কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা খানমের বাসায় নজরুল ইসলামকে তিন মাসের বেশী চাকুরী করতে হলো না। নবনিযুক্ত গৃহভৃত্যের মেধা ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ এবং গান ও কবিতা রচনায় দক্ষতা নিশ্চয়ই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাঁদের বিবেচনায় দুখু মিয়াকে স্কুলে ভর্তি করানোই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।[২৭]

দরিরামপুর হাইস্কুলে

দারোগা কাজী রফিজউল্লাহ সাহেব তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন নজরুল ইসলামের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে তাঁকে নিজের দেশের বাড়ীতে ময়মনসিংহের কাজীর শিমলা গ্রামে নিয়ে গেলেন এবং ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে ত্রিশাল বাজারের নিকটবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন।

---

২৫. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ১৪।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫; হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ২৩-২৬।

২৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

রফিজউল্লাহ সাহেবের বড়ো ভাই কাজী সাখাওয়াতউল্লাহ এর কাছে নজরুল ইসলাম থাকবে, পড়াশুনা করবে। থাকা-খাওয়া কাজী বাড়ীতে এবং সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে দরিরামপুর হাইস্কুলে যাওয়া-আসা। তাছাড়া লেখাপড়ার জন্য কোন খরচ নেই, কারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে নজরুল ইসলাম সে স্কুলে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এই পাড়াগাঁয়েও নজরুল ইসলামের ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত হয়নি। নজরুল ইসলাম প্রথমে কিছুদিন কাজীর শিমলা গ্রামে কাজী সাহেবদের বাড়ীতে জায়গীর থাকতেন, পরে স্কুলের কাছাকাছি আরো দু'এক স্থানে জায়গীর থেকেছেন।

১৯১৪ সালে দরিররামপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রী মহিমচন্দ্র খাসনবীশ নজরুলদের ক্লাসে ইংরেজী ট্রান্সলেশন শিক্ষা দিতেন। তাঁর বিবরণীতে জানা যায়, নজরুল ইসলামকে ক্লাসে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রথমে হক্‌চকিয়ে যেতেন, যেন এইমাত্র জেগে উঠলেন কোন স্বপ্ন থেকে, ফিরে এলেন রূঢ় বাস্তবে, তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখা যেত; কিন্তু প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি যথাযথ উত্তর দিতেন। ঐ বছর মহিম বাবুর পরিচালনায় দরিরামপুর হাইস্কুলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়, তাতে নজরুল ইসলাম কোন প্রস্তুতি-মহড়া ব্যতিরেকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) এর দুটি কবিতা 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজীর শিমলা গ্রাম বা স্কুলে নজরুল ইসলামের বিশেষ কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না বরং সুযোগ পেলেই গ্রামের বখাটে ছেলেরা তাঁকে কম-বেশী জ্বালাতন করতো। তাদের দৌরাত্মের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'শিউলি-মালা' গ্রন্থের 'অগ্নিগিরি' নামক সুবিখ্যাত গল্পে যেখানে 'বীররামপুর' গ্রামের উল্লেখ আছে; বোধ হয় 'দরিরামপুর' নামটিই গল্পে 'বীররামপুর' হয়েছে। সেই গ্রামের পলাশ-শিমূল শোভিত পথের সবুজ সৌন্দর্য কিশোর কবির মনে দিত নিবিড় আনন্দ। স্কুলের অদূরে ঠুনিভাঙ্গা বিলের তীরে একটি গাছের নীচে নজরুল ইসলামকে মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিয়ে প্রায়ই উদাস দৃষ্টিতে একা বসে থাকতে অথবা মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাতে দেখা যেত। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অদম্য, কিন্তু স্কুলের ধরা-বাধা নিয়ম-কানুন তাঁর শিল্পীমন মেনে নিতে পারেনি। তাই বারবার তিনি হয়েছেন স্কুল পলাতক। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পরই নজরুল ইসলাম হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। নজরুল ইসলাম লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, কিন্তু স্কুলের পড়াশুনা নিয়মিত অভ্যাস করা তাঁর ধাতে ছিল না ; অথচ আশ্চর্য মেধাগুণে তিনি পরীক্ষায় প্রথম কি দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।[২৮]

শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে

ময়মনসিংহ থেকে দেশে ফিরে গিয়ে নজরুল ইসলাম এক বন্ধুর মাধ্যমে বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্ধুর সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হয়ে নজরুল ইসলাম তখন মনের দুঃখে তাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। সেই চিঠির ভাষা এত সুন্দর ও এত আবেগময় ছিল যে, নজরুল ইসলামের বন্ধু ঐ পত্রখানা স্কুলের হেড মাষ্টারকে দেখালে তিনি পত্রের ভাষা ও মান দেখে হতবাক হয়ে বললেন: 'এই ছাত্র যে স্কুলে থাকবে, সে স্কুলের গৌরব বাড়বে, যেখান থেকে পারো নজরুল ইসলামকে ধরে আন।' তিনিবেশ কয়েকটি সুবিধাসহ নজরুল ইসলামকে ১৯১৫ সালে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন।[২৯]

নজরুল ইসলামের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫ খ্রি.) 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে স্কুলের এ সব গল্পও লিখেছেন, "নজরুল ভর্তি হলো শিয়ারশোল ইস্কুলে। ইস্কুলে মাইনে লাগবে না। বোর্ডিং-এ থাকবার এবং খাবার খরচও লাগবে না।... আর নজরুলের থাকবার ব্যবস্থা হলো

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২২-২৪; আবদুল কাদির, 'কবির জীবন কথা', নজরুল পরিচিতি, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৩৬২), পৃ. ৩-৪।

২৯. মোহাম্মদ মোদাব্বের, নজরুল ইসলাম, (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৩৮৮/১৯৮২), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিয়ারশোল ইস্কুলের 'মোহামেডান বোর্ডিং'-এ।...একদিকের একটি জানালার পাশে ছোট একটি খাটিয়া। খাটিয়ার ওপর পরিস্কার একটি বিছানা পাতা। বিছানার ওপর ছোট দুটি বালিশ আর বই-খাতার ছড়াছড়ি। দেখলেই চেনা যায়- অগোছালো কোন এক ছন্নছাড়া ছেলের আস্তানা।"[৩০]

নজরুল ইসলাম যে তিনবছর (১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালের প্রি-টেস্ট অবধি) শিয়ারশোল স্কুলে পড়েছিলেন তখন তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল মুসলিম ছাত্রাবাস মোহামেডান বোর্ডিং-এ। মাটির দেয়াল ঘেরা একটি ছোট্ট ঘরে আরো চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে নজরুল ইসলাম সেখানে থাকতেন। নজরুল ইসলাম ক্লাশের 'ফার্ষ্ট বয়' ছিলেন বলে তাঁর স্কুলে বেতন বা বোর্ডিং-এ থাকা-খাওয়ার খরচ দিতে হত না। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর মাসিক বেতন ও ছাত্রাবাসের খরচ মওকুফ করা হয়। তদুপরি রাজবাড়ী থেকে হাত খরচের জন্য মাসিক সাত টাকা বৃত্তিও পেতেন। এই সাত টাকায় তাঁর চা-নাস্তা ও জামা-কাপড় কেনা হতো এবং কোন কোন মাসে তা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের লেখাপড়ার খরচের জন্য দিতেন।[৩১] অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ছাত্র হিসেবে যে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তাঁর সেই জীবনের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে সে সাক্ষ্য দিচ্ছেন; "স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে ডবল প্রমোশন পেয়ে দুটো ক্লাস ডিঙিয়ে একেবারে সেকেন্ড ক্লাসে চলে এসেছে।"[৩২]

কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য জীবনকথায় খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১ খ্রি.) তাঁর 'যুগশ্রেষ্ঠ নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন, "আমার জনৈক আত্মীয় জনাব সিরাজুদ্দীন আহমদ নবম শ্রেণী পর্যন্ত নজরুলের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেন: 'পড়াশুনায় নজরুল বরাবরই খুব অমনোযোগী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর ছিল আশ্চর্য মেধা। এরই বলে তিনি প্রতিবারই শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন।'

১৯১৬ সালে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এ সময়ে স্কুলে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় নজরুল পুরস্কার সামান্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা সুধীজনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্কুলের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় নজরুলের নাম উল্লেখ করেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়:

Further considering the intrinsic merit of the several papers of the competitors for the Edgely prize, the generous donor has kindly granted Rs. 4/- to each of the three other candidates viz. Balaram Mukherjee, Golak Bihari Misra and Kazi Nazrul Islam for their good production of the essay.

পরানুগ্রহে শিক্ষারত এক দরিদ্র মুসলমান বালকের নাম প্রধান-শিক্ষকের বার্ষিক বিবরণীতে স্থান পাওয়া সে যুগে একটা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক বলে মানতে হবে।"[৩৩]

কাজী নজরুল ইসলামের প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচনা 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) সওগাতে ছাপা হয়েছিল, তাতে রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজস্কুলের উল্লেখ রয়েছে। নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "ইতিমধ্যে বর্ধমান 'নিউ স্কুল' উঠে যাওয়ায়, তা ছাড়া অন্য

---

৩০. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আমার বন্ধু নজরুল, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫), পৃ. ২২।

৩১. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৪।

৩২. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬৭/১৯৬০), পৃ. ১১-১৩।

৩৩. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৮৫/১৯৭৮), পৃ.১১।

Dhaka University Institutional Repository

জায়গায় গেলে কতটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রাণীগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলের হেড মাষ্টারির পদ পেয়েছিলেন।"[৩৪]

এ স্কুলে এসে নজরুল ইসলাম অনেকটা স্থির হলেন, তাঁর বিদ্যানুশীলন ও কাব্যচর্চা দুটোই চলল অনেকটা অব্যাহতভাবে ও অভিনিবেশ সহকারে। হাফিজ নুরন্নবী (মৃ. ১৯৪৩ খ্রি.) তখন সে স্কুলে ফারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন, তাঁরই আগ্রহে নজরুল ইসলাম সংস্কৃত বিষয় ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফারসী নেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফারসী শিখেন। শিয়ারশোল রাজ-হাইস্কুলে পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটক (১৮৯১-১৯৬০ খ্রি.) বিপ্লববাদে নজরুল ইসলামকে প্রভাবিত করেন। পরবর্তী জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি নজরুল ইসলামের যে আকর্ষণ তার সূত্রপাত এখান থেকেই। অপর একজন শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ছিলেন গান পাগল মানুষ। নজরুল ইসলামের উপরে এদের উভয়েরই প্রভাব পড়েছিল। নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের কাছ থেকে দেশাত্মবোধ আর সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের নিকট থেকে সঙ্গীত পিপাসা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল। শিয়ারশোল রাজহাইস্কুলে পড়ার সময় ভোলানাথ স্বর্ণকার, হরিশঙ্কর মিশ্রসহ তিনজন শিক্ষক স্কুলে শিক্ষকতা ছেড়ে যান এবং প্রতিবারই তাদের কবিতায় লেখা বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে গুলো ছিল কাজী নজরুল ইসলামের রচনা। অভিনন্দন পত্রে নজরুল ইসলামের নাম থাকার কথা নয়, কিন্তু তাঁর বাল্যের অন্যান্য রচনার ভণিতার মতো এ রচনাগুলোতেও তিনি সুকৌশলে নিজের নাম গেঁথে দেন। শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন পত্রে যে বেদনা, বিষাদ এবং অশ্রুর আতিশয্য তাতে সুস্পষ্ট যে শিক্ষকের বিদায়কে উপলক্ষ করে কিশোর কবি তাঁর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।[৩৫]

এ সময় রায় সাহেবের দৌহিত্র স্বনামধন্য কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে পড়তেন। নজরুল ইসলামের উচ্ছলপ্রাণতা, উন্নত রুচি ও সহিষ্ণু স্বভাব, আচার-আচরণ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সমবয়সী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অচিরেই তার একনিষ্ঠ সহচর হয়ে উঠলেন। সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই উভয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য গাঢ়তর হতে লাগল। কাজী নজরুল ইসলামের তৎকালীন রচনা 'করুণ গাঁথা', 'বেদন-বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখীর ছানা' যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বর বৃত্ত ছন্দের নিদর্শন। সেই সুকুমার বয়সেই নজরুল ইসলাম বাংলার এই তিনটি মূল ছন্দ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়। এসব রচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল ইসলামের তখনকার কবিতায় লেটো-দল ও কবিয়ালদের প্রভাব তিরোহিত হয়ে শালীন আধুনিক ভঙ্গীর সূচনা হয়েছে।[৩৬]

নজরুল ইসলাম তখন ক্লাস টেনের ফার্ষ্ট বয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। বিদ্যালয় জীবনের সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। শিক্ষকদের অনেক ভরসা তার উপর, পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ভাল করবে সে। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা চলছে, এমতাবস্থায় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সৈনিক জীবনকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে বালক নজরুলের দুঃসাহসিক চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। এমনিভাবেই স্কুল পালানো ক্লাসের মেধাবী ছাত্র নজরুল ইসলামের বিঘ্নিত ঘটনাবহুল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে অজানা অচেনা গন্তব্যের পথে পা বাড়ালেন নজরুল ইসলাম, যে জীবন বিনিময়ে তাঁকে দিয়েছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিপুল সম্ভার। যে কঠিন জীবনকে বরণ করে না নিলে হয়তো তিনি পরবর্তীকালে এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বিখ্যাত কবি-শিল্পী হয়ে উঠতে পারতেন না।

---

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

৩৫. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ১৮-১৯।

৩৬. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৈনিক জীবন (১৯১৭-১৯১৯ খ্রি.)

১৯১৭ সালে নজরুল ইসলাম যখন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা দিচ্ছেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর, ইংরেজ আর জার্মানীর মহাযুদ্ধের ঢেউ বাংলাদেশে এসে লাগল। বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী এ সময় মিত্র শক্তির পক্ষে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন প্রদেশের রেজিমেন্ট ছিল । তখন কেবল বাঙালী সেনাদের নিয়ে গঠিত কোন দল ছিল না। শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জে সৈন্য সংগ্রহ অভিযান জোরে সোরে চলছে। এ সময় বাংলাদেশ থেকে বাঙালী পল্টনের দাবী উঠল, ফলে বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণে বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহী না থাকলেও গণদাবীর জন্য তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অবশেষে বাঙালী পল্টন গঠিত হয়, আর সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহরে গ্রামে সর্বত্র পোষ্টার দেওয়া হয়, রাণীগঞ্জের দেয়ালে দেয়ালেও পোষ্টার পড়লো; "কে বলে বাঙালী যোদ্ধা নয়! কে বলে বাঙালী ভীতু! জাতির এই কলংক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পারে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ বিক্রমে। বাঙালী পল্টনে যোগ দাও।"[৩৭]

বাঙালী পল্টনে যোগদান ও নওশেরায় ট্রেনিং গ্রহণ

নজরুল ইসলাম কি ভেবে আকস্মিকভাবে, হয়তো বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন চোখে রেখে, হয়তো অজানাকে চেনার উন্মাদ রোমাঞ্চতায় সেনাবাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন, সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আসানসোল মহকুমার এস. ডি. ও'র চিঠি নিয়ে দুজনই কলকাতায় যান। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নজরুল ইসলাম টিকে যান, শেষ পর্যন্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাদ পড়েন আর নজরুল ইসলাম ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগদান করলেন।[৩৮] সৈনিকরূপে মনোনীত হওয়ার পর তাদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা শহরের বুকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে, তারপর প্রশিক্ষণের জন্যে ট্রেনযোগে লাহোর, সেখান থেকে পেশওয়ার, সেখান থেকে নওশেরা। বাঙালী পল্টনের তরুণ সৈনিকেরা যখন কলকাতা থেকে তাদের সৈনিক জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন রেলষ্টেশনে তাদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। এ সংবর্ধনা নজরুল ইসলামের হৃদয়ে কি রকম দাগ কেটেছিল এবং কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তার পরিচয় নওশেরার পথে রেলভ্রমণের ছবি 'রিক্তের বেদন'এ পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম লিখেছেন; "সবচেয়ে বেশী ভীড় হয়েছিল কলকাতায় আর হাবড়ার ষ্টেশনে। ওঃ, সে কি বিপুল জনতা আর সে কি আকুল আগ্রহ আমাদিগকে দেখবার জন্যে। আমরা মঙ্গলগ্রহ হ'তে অথবা ঐ রকমের স্বর্গের কাছাকাছি কোনও একটা জায়গা হতে যেন নেমে আসছি আর কি ! যাদের সঙ্গে কখনও আলাপ করবারও সুযোগ পাইনি, তারাও আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন আর গদগদ কণ্ঠে আশিস্ করেছেন।"[৩৯]

---

৩৭. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৩৭; হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ৫১-৫২।

৩৮. বাঙালী পল্টন বা রেজিমেন্ট গঠন হওয়ার আগে প্রথমে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে মাসে বাঙালী ডবল কোম্পানী গঠিত হয়। পরে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে এর নাম পরিবর্তন করে Bengali Battalian রাখা হয়। সাত হাজার সৈনিক নিয়ে পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে এর নামকরণ করা হয় 49 th Bengalis; কাজী নজরুল ইসলাম সম্ভবতঃ ১৯১৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এ বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। এই রেজিমেন্টের বিভিন্ন কোম্পানীতে নজরুল ইসলাম ছাড়া আরো ছিলেন চট্টগ্রামের মাহবুব-উল-আলম, মির্জাপুরের রণদা প্রসাদ সাহা, কুষ্টিয়ার শম্ভু রায় এবং মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে 49th Bengali Regiment ভেঙ্গে দেয়া হয়। দ্রঃ রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২০।

৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

'রিক্তের বেদন' এর মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং যুদ্ধ যাত্রাকালীন তরুণ সৈনিক নজরুল ইসলামের মনোভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে। নজরুল ইসলাম লিখেছেন সে কথা, "আঃ! একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ? জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে কোন্ অলেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা, আমার ভাইরা! খাকি পোষাকের ম্লান আবরণে এ কোন্ আগুন-ভরা প্রাণ চাপা রয়েছে। তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ও গুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী বিজয়ের আশিষ মাল্য। বোনের দেওয়া স্নেহ বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কমহার।"[৪০]

নওশেরার পথে লাহোর পৌঁছুলে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনী রবীন্দ্রনাথের দিদি ঔপন্যাসিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রি.) এবং তাঁর স্বামী পন্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরী বাঙালী সৈনিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' গ্রন্থের 'হেনা' গল্পে উদ্ধৃত হোলি খেলার গানটি ঐ তরুণ সৈনিকদের মনে সাহস ও উন্মাদনা জাগানোর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল;

আজু তলওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি,
জমা হো গেয়ে দুনিয়া কা সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তোপোও কে পিচকারী,
গোলা বারুদ কা রঙ্গ বনি হেয়, লাগি হেয় ভারী লড়াঈ![৪১]

আজ আমি তরবারী দিয়ে হোলি খেলবো, সারা দুনিয়ার সেপাই আমরা জমায়েত হয়েছি। ঢালের ঝঞ্ঝনার আওয়াজ উঠছে, কামানের গোলা দিয়ে পিচকারী খেলা, গোলা-বারুদ নিয়ে রং তামাসা হচ্ছে-লড়াই লেগেছে দারুণ! কী উদ্দীপনাময় এমন সংবর্ধনা এহেন সাহস সঞ্চারী বরাভয় আর আশীর্বাণী শুনতে শুনতে নওশেরা পৌঁছেছিলেন সৈনিক বেশী নজরুল ইসলাম। অতঃপর যখন নওশেরাতে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন নজরুল ইসলাম তখন পেশওয়ার নিবাসী বাঙালী ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বাঙালী সৈনিকদের আপ্যায়ন করিয়েছিলেন। এ সব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালী সৈনিকদের জন্য প্রবাসী বাঙালীদের বেশ দরদ ছিল।[৪২]

নওশেরায় তিনমাস ট্রেনিং গ্রহণের পর নজরুল ইসলাম তাঁর কোম্পানীর সঙ্গে করাচীতে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় মারাঠা লাইন (Marhatta Line) এ অবস্থান করলেন। জায়গাটা করাচী ব্রিগেড গ্রাউন্ড (Brigade ground) এর পাশে। স্থান সংকুলানে অসুবিধা হওয়ায় নতুন সেনা ছাউনি তৈরীর কাজ শুরু হলো বেরিয়াল গ্রাউন্ড বা কবরস্থানের কাছে। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে, উপরে চাটাইয়ের আচ্ছাদনের উপর মাটি দিয়ে তৈরী ছাদ। এই হচ্ছে করাচী বন্দরের পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত গাজা লাইন (Gaza Line) এর ব্যারাক। মারাঠা লাইন থেকে নওশেরার দলকে গাজা লাইনে চালান করে দেওয়া হলো। নজরুল ইসলামও আছেন দলের সঙ্গে। ১৯২০ সালে বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যতদিন পল্টনে ছিলেন ততদিন এখানেই সময় কাটিয়েছেন নজরুল ইসলাম। স্কুল জীবনে যেমন ভালো ছাত্র ছিলেন তেমনি সৈনিক জীবনেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সৈন্যদলে প্রভূত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে স্বল্পকালের মধ্যেই কাজী নজরুল ইসলাম 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত হন এবং সৈন্যদলের রসদ ভান্ডারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার পেয়েছিলেন। অবশ্য মাঝখানের দুটি ধাপ 'ল্যান্সনায়েক' ও 'হাবিলদার' পদে যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েই উচ্চতর পদে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন। নজরুল ইসলামের সামরিক জীবনের অধিকাংশ সময়ই নওশেরা ও করাচীতে অতিবাহিত হয়।[৪৩]

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।

৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, হেনা, 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম. খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

৪২. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ৫৬; রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৪৪।

৪৩. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সেনা ছাউনিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা

সৈনিক জীবন কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় বাধা শারীরিক শ্রমের অন্ত নেই। তবু এরই ফাঁকে নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পাঠের, বই-পত্রিকা পড়ার, কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচনার, গান-বাজনা করার সময় বের করে নেন। নজরুল ইসলামের পল্টন জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জমাদার ডিসিপ্লিন-ইন-চার্জ অর্থাৎ প্রশিক্ষণরত সেনাদের আইন-শৃংখলা রক্ষাকর্তা শম্ভু রায় সেই সময়ের সুন্দর সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, "পল্টনে যেদিন কাজী যায় সেদিন থেকে আরম্ভ করে পল্টন থেকে যেদিন আমি চলে আসি সেদিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য কাজীর উদার প্রাণে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে তোলা কারও পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তখন আমরা সবাই জুটেছি গুলিবারুদের মুখে প্রাণ দিতে। পিছনে তাকাবার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

নিজেরা সব মিলতাম ব্রজের রাখাল বালকের মত। কাজীর পড়াশোনার প্রতি বেশ প্রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তা'ছাড়া মাসিক পত্রিকাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী সবুজ{পত্র} পত্রিকাদি প্রভৃতি কাজী রাখত। এ ছাড়াও কাজীর কাছে দেখেছিলাম Seditious Committee-র Report. এ দেখে বুঝতাম কাজী বিদ্রোহী বাঙলার বিপ্লবী দলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হাসি আনন্দ ছিল তার সম্বল। পল্টনের প্রায় ৭০০০ বাঙালীর মধ্যে নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির মানুষ ছিল।"[৪৪]

যুদ্ধে গিয়েও নজরুল ইসলাম সাহিত্য সাধনা, কাব্য চর্চা, বিশ্ব-সংবাদ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা ও জ্ঞানার্জন অব্যাহত রেখেছিলেন। নওশেরা ও করাচীতে অবস্থানকালে তাঁর কল্পনার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় বিশ্বের বিরাট দিগন্ত। বাঙালী পল্টনের ছাউনীতে ফারসী ভাষায় অত্যন্ত বুৎপন্ন ও কাব্যরসিক এক পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'মসনভী রুমী' প্রভৃতি বিখ্যাত ফারসী কাব্যগুলো পাঠ করে তিনি এক মহৎ সাহিত্যিক ও মহান জীবনের সন্ধান পান। ফারসী কবিতা পাঠ ও কাব্যরস আস্বাদনের নিয়ম-কানুন মাওলানা সাহেব তাঁর এই বাঙালী ছাত্রকে শেখাতে লাগলেন। কাজী নজরুল ইসলাম যে পরিণত বয়সে সরাসরি মূল ফারসী ভাষা থেকে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করতে পেরেছিলেন তার ভিত্তি এখানেই রচিত হয়। এভাবে তাঁর রচনায় সৌকর্য ও শালীনতা প্রাণলাভ করে। রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যানুবাদের মুখবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, "আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেই দিন থেকেই তাঁর কাছে ফারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফারসী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।"[৪৫]

এ সেনাজীবনে শুধু ফারসী ভাষাই ভালোভাবে শেখা নয় উর্দু-হিন্দীও তিনি শেখার সুযোগ লাভ করেন। ভারতের সব জায়গা থেকেই উর্দুভাষী, হিন্দীভাষী লোকজন এসেছিল সেখানে; তাই ভাষা শিখতে কোন অসুবিধাই হয়নি নজরুল ইসলামের। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর ফারসী জ্ঞানে দক্ষতা বৃদ্ধি করেন এবং ফারসী কবিতা অনুসরণে কিছু কবিতা ও গান লিখেন। ব্যারাক জীবন ছিল স্বভাবতই কঠোর; তাঁর অনুভূতিশীল তরুণ মনে ব্যারাক জীবনের অভিজ্ঞতার যে ছাপ পড়েছিল তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেন তাঁর লেখক জীবনের শুরুতে। সৈনিক জীবনে তিনি অনেক ছোট গল্প লিখেন, পরে এগুলো

---

৪৪. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ৫৮-৫৯।

৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', নজরুল রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৭৬/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০, ৩য় প্রকাশ, পৌষ, ১৩৯১ ডিসেম্বর, ১৯৮৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

'রিক্তের বেদন' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এসময় তিনি কবিতা এবং গানও লিখেন। করাচী থেকে তিনি এসব লেখা কলকাতার সাময়িকী 'সওগাত'-এ পাঠাতেন। সওগাত পত্রিকার সাথে তখনকার তরুণ মুসলমান লেখকরা অবিভাজ্যভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর নাম স্বাক্ষর দিতেন 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' হিসেবে। স্বকীয়তা ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের ফলে তিনি প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করেন এবং গর্বের সাথে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর প্রতিটি রচনাই প্রকাশিত হচ্ছে।[৪৬] করাচীর সেনানিবাসে নজরুল ইসলামের সাহিত্যচর্চা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য আশ্রিতই ছিল না, বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের সঙ্গেও তাঁর বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল। তিনি কলকাতার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলোর গ্রাহক ছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তাঁর নিয়মিত গ্রাহক হন এবং বেশ কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে দেন। 'সওগাত' পত্রিকায় সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল, "নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সওগাত পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মৌলবী কাজি নজরুল ইসলাম; বাঙালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার, করাচী।"[৪৭]

নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া বা যুদ্ধ করার জন্যে ফলপ্রসু হয়নি বরং তা সাহিত্য সাধনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল, নজরুল ইসলামের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের সূচনা যেন সৈনিক জীবন থেকেই। এ সময়ই তাঁর ভেতর-বাহিরে নির্ভীক বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ ঘটে। সামরিক জীবন নজরুল ইসলামকে স্থিরভাবে কাব্য ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ এনে দেয়। খুব কম বাঙালী কবির সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সম্ভবতঃ নজরুল ইসলামই একমাত্র আধুনিক বাঙালী কবি যিনি প্রায় আড়াই বছর পূর্ণ সামরিক জীবন যাপন করেন । নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবে যদি তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা ট্রান্স ককেশাসের রণাঙ্গনে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, তাহলে সে যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে নিশ্চয়ই আরো সুসমৃদ্ধ করত। নজরুল ইসলামের সামরিক জীবনে যুদ্ধের নৃশংসতা ও তৎসংজ্ঞাত হতাশা বা ক্ষোভ নেই বটে, তবুও বাঙালী পল্টনে যোগদানের ফলে সৈনিক জীবনের শিক্ষা যে তাঁর অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত দৃষ্টিতে উদার সর্বোপরি কবি হওয়ার প্রস্তুতিকে পরিপূর্ণতা দান করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সৈনিক জীবন নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের প্রাদেশিক গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের পটভূমিকায় স্থাপন করে। ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম শুধু বাংলাদেশকে অতিক্রম করেননি, বরং ঐতিহ্য চেতনায় তিনি ভারতবর্ষকেও ছাড়িয়ে গেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক চেতনাবোধেও একাত্ম হয়েছেন। সৈনিক জীবনের নিয়ম-শৃংখলা ও সুসংঘবদ্ধ সমবায়ী জীবন, বাল্য ও কৈশোরের বাঁধনহারা স্বাধীনচেতা নজরুল ইসলামকে এক পূর্ণ দায়িত্বশীল প্রাণবন্ত যুবকে পরিণত করেছিল।[৪৮]

---

৪৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনূদিত,(ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮), পৃ. ২৫।

৪৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৪; কাজী নজরুল ইসলাম কে, কোথাকার লোক ইত্যাদির কোন পরিচয় জানা ছিল না বলে সওগাত পত্রিকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্রে নজরুল ইসলামের আগে 'মৌলবী' শব্দটি ছাপা হয়। তখনকার দিন মুসলমানদের নামের পূর্বে 'মৌলবী' লেখা রীতির প্রচলন ছিল। দ্রঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ২১।

৪৮. বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের পূর্বে বাঙালী মুসলিম কবি সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি.) ছিলেন প্রথম শুধু সৈনিক নয়, স্বভাব কবি। তিনি ১৯২২ সালে ডাঃ আনসারীর মেডিকেল মিশনের সদস্যরূপে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য তুরস্কে গিয়েছিলেন। তাঁর ধমনী রক্তে ছিল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জিহাদী যুদ্ধ প্রবৃত্তি। ইসলাম ও মুসলমানকে ভালবেসে এবং তাকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর এই সংগ্রামী চরিত্রকে ব্যক্ত করেছেন। দ্রঃ রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় সাহিত্য জীবন

বাংলা সাহিত্য জগতে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মপ্রকাশ গল্পের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'সাহিত্য সাধনার গল্পেই নজরুলের হাতে-খড়ি; কবিতা তিনি পরে লিখতে চেষ্টা করেছিলেন।' করাচীতে নজরুল ইসলাম সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতেন। 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪ খ্রি.) এর ভাষায় নজরুল ইসলাম সে সময় করাচী থেকে ভুরি ভুরি কবিতা ও ছোট গল্প পাঠাতেন। করাচীতে বসে লেখা এবং করাচী থেকে পাঠানো কাজী নজরুল ইসলামের নিম্নলিখিত রচনাবলী ১৩২৬/১৯১৯ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় :

১.	বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	(গল্প)	সওগাত, জ্যৈষ্ঠ
২.	মুক্তি	(কবিতা)	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ
৩.	স্বামীহারা	(গল্প)	সওগাত, ভাদ্র
৪.	কবিতা সমাধি	(হাসির কবিতা	সওগাত, ভাদ্র
৫.	তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা	(প্রবন্ধ)	সওগাত, আশ্বিন
৬.	হেনা	(গল্প)	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,কার্তিক
৭.	আশায়	(হাফিজের গজল)	প্রবাসী, পৌষ
৮.	ব্যথার দান	(গল্প)	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ
৯.	মেহের নিগার	(গল্প)	নূর, মাঘ-ফাল্গুন
১০.	ঘুমের ঘোরে	(গল্প)	নূর, ফাল্গুন

উপরোক্ত তালিকায় 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (মে, ১৯১৯) শীর্ষক গল্পটি কবি নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা আর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (জুলাই, ১৯১৯), প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'তুর্ক-মহিলার ঘোমটা খোলা' (আশ্বিন, ১৩২৬) এবং প্রথম প্রকাশিত ব্যঙ্গ কবিতা হলো 'কবিতা সমাধি' (ভাদ্র, ১৩২৬)।[৪৯]

১৯১৯ সাল থেকে নজরুল ইসলামের সাত্যিকার সাহিত্য জীবন শুরু হয়। এ সময়ই তাঁর মনে সাহিত্যের ফুল ফোটে, আবার বিদ্রোহেরও আগুন জ্বলে। সেনানিবাস থেকেই নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনা পরিপূর্ণরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। বাংলাভাষী জনগণ এই সময় থেকে নজরুল ইসলামকে শক্তিমান কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে চিনতে পারে। প্রথমদিকে নজরুল ইসলাম কবিতার চাইতে গদ্যই লিখতেন বেশী এবং কবিতার চাইতে গদ্যের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এসময় নজরুল ইসলামের কবিতা অপেক্ষা ছোটগল্পই তখন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বেশী। অবশ্য এ কথা সত্য যে, তাঁর গদ্য রচনা সর্বত্র সুসংহত নয়; তাতে ভাবের অপরিপক্কতা কবিত্বময় ভাষাতেও ঢাকা পড়েনি, নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে কয়েকটি ভালো গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে সেগুলোই যথেষ্ট নয়। অথচ মজার কথা এই যে, নজরুল ইসলাম পাঠক মহলে প্রধানতঃ গল্প লেখক হিসেবেই প্রথম পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[৫০]

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে নজরুল ইসলাম করাচীর পল্টন থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে একবার দেশে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে তিনি কলকাতায় তিনদিন এবং চুরুলিয়া গ্রামে মায়ের নিকট চারদিনের সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে যান। কলকাতায় এসে নজরুল ইসলাম তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে উঠলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বেড়িয়ে নজরুল ইসলামকে সংগে

---

৪৯. হায়াৎ মামুদ, প্রতিভার খেলা নজরুল, পৃ. ৮৫: রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৪।

৫০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, পৃ. ২৫: আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীর দোতলায় নিয়ে এলেন। এখানে সমিতির মূল উদ্দেশ্য বাঙালী মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা, আধুনিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত করা, ধর্মের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি দৃঢ়তর করা, উভয় সমাজের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করা।[৫১] সমিতির পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা বের হত। দু'জন সম্পাদকের একজন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.), অন্যজন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি.)। আরেক জন সহযোগী সম্পাদক ও পত্রিকার প্রকাশক কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.)। দেশের নামকরা সব কবি ও সাহিত্যিক এখানে আসতেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুল ইসলাম যখন এলেন তখন সবাই তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে এখানেই নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎ। অবশ্য ১৯১৮ সালে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। নজরুল ইসলামের পল্টনের জীবনে করাচী সেনানিবাস থেকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে লেখালেখির মধ্য দিয়ে যে যোগসূত্র ঘটেছিল এবারে তা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে পরিণত হল, যা নজরুল ইসলামকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। আর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে মুজফ্ফর আহমদের মত বিশ্বস্ত সুহৃদ ও নিঃস্বার্থ বন্ধু লাভ নজরুল ইসলামের জন্য বিশেষ কল্যাণকর হয়েছিল।[৫২] মুজফ্ফর আহমদ চমৎকারভাবে সেই সময়কার কথা লিখেছেন;

"হ্যা, কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে যে কোন লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা হলো। তাকে আমি কলকাতায় এসে থাকতে বললাম। সাহিত্য সমিতির ঘরগুলো তাকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এখানেই তার থাকার জায়গা হবে। উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট তখন ভাঙ্গনের মুখে। হয়তো দু'এক সপ্তাহের ভেতরেই তার ভাঙ্গন শুরু হয়ে যাবে এই রকম ছিল তার অবস্থা। আমি নজরুল ইসলামকে বলে দিলাম রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে সে যেন সোজা সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসে। তাতেই সম্মতি জানিয়ে সে চলে গেল।"[৫৩]

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে অবস্থান

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের (ভার্সাই সন্ধি, ২৮ শে জুন, ১৯১৯ খ্রি.) পর ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল মোতাবেক ১৩২৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হলে নজরুল ইসলাম করাচী থেকে কলকাতা এসে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রামকান্ত বোস স্ট্রীট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের বোর্ডিং-এ অতিথি হয়ে উঠলেন। এখানে আসার পর নজরুল ইসলামকে এমন এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এ সম্বন্ধে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪ খ্রি.) তাঁর 'চলমান জীবন' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫ খ্রি.) 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নজরুল ইসলাম মুসলমান জেনে মেসের চাকর ছেলেটি ওর এঁটো বাসন ধুতে অস্বীকার করে এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে তা পরিষ্কার করতে হয়, ফলে নজরুল ইসলামকে নিয়ে তিনি ঐ মেস ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অবশেষে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং থেকে নজরুল ইসলাম ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে উঠলেন এবং এখানে কমরেড মুজফ্ফর

---

৫১. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ৬৬-৬৭।

৫২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৯-৩০।

৫৩. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৭৩, ৩য় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭), পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদের সঙ্গে একই কামরায় বসবাস করতে লাগলেন।[৫৪] শুরু হলো হাবিলদার কবির যথার্থ সাহিত্য জীবন। মাত্র একুশ বছর বয়সের তারুণ্যে দীপ্তমান কবির বিজয় কেতন ওড়াবার পালা। এ সময় নজরুল ইসলামের সঙ্গে জিনিসপত্র কি কি ছিল তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে মুজফ্ফর আহমদ তাঁর নজরুল স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন;

"আমি সাহিত্য সমিতির অফিসের পাশের দিককার একখানা ঘরে থাকতাম। সেই ঘরেই নজরুল ইসলামের জন্য আর একখানা তখ্তপোশ পড়ল। কৌতুহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোচকাগুলি খুলে দেখলাম। তাতে লেপ, তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছেদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচ্কান), টাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি, যা তখনকার দিনে করাচীর লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ, তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নীচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল। অনেক দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই গ্রন্থখানা, আরও কিছু পুস্তক, কিছু চিঠি-পত্র, অনেক দিনের পুরনো কবিতার খাতা, বিছানা, ফিট-ব্যাগ, সুটকেস্ এবং 'ব্যথার দান' পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা খোয়া যায়। মিউজিয়ামে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো নজরুল এই কাঁটাটিও রক্ষা করে আসছিল। উৎসর্গে লেখা আছে-'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করনি তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।'কে ছিলেন এই কাঁটার মালিক তার নাম সে আমায় কোনো দিন বলেনি।"[৫৫]

নজরুল ইসলাম কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে দু'দিন থাকার পর সেখানে নিজের জিনিসপত্র রেখে চুরুলিয়া যান। গ্রামের বাড়ীতে সাত-আট দিন ছিলেন এ সময় মায়ের সঙ্গে মান-অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। তারপরে মা জাহেদা খাতুন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নজরুল ইসলাম আর গ্রামে আসেননি। এমনকি মায়ের মৃত্যুর পরে সম্বিত থাকা অবস্থায়ও তিনি আর কখনও চুরুলিয়ায় ফিরে যাননি।[৫৬]

নজরুল ইসলাম চুরুলিয়া থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে সাব-রেজিস্ট্রার পদে চাকুরীর জন্য একখানা দরখাস্ত দিয়ে আসেন। সে সময় পল্টন ফেরত প্রাক্তন সৈনিকরা ঐ ধরনের চাকুরীর ব্যাপারে সুবিধা পেত। নজরুল ইসলাম যথারীতি কলকাতায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের ঠিকানায় সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি পেয়েছিলেন। কিন্তু মুজফ্ফর আহমদ, আফজাল-উল-হক (১৮৯১-১৯৭০ খ্রি.) প্রমুখ বন্ধুর পরামর্শে নজরুল ইসলাম ইন্টারভিউ দিতে যাননি। এজন্য যে সাব-রেজিস্ট্রারের চাকুরী হলে তাঁকে কোথাও দূরে গ্রামের মত জায়গায় পড়ে থাকতে হবে; মফস্বলে ঘুরে ঘুরে তাঁর দুর্লভ কবি-ক্ষমতা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। সেখানে কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশ পাওয়া যাবে না। আর এই পরিবেশে হারানো তাঁর লেখনী শক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ঘটবে। অন্যদিকে শুধু সাহিত্য করেও উদর পূর্তি সাধন হবে না। এজন্য নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সেবার পথ বেছে নিয়ে বন্ধুদের

---

৫৪. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, চলমান জীবন, (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড), দ্বিতীয় পর্ব, পৃ.৬৪; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আমার বন্ধু নজরুল, পৃ. ২২৬-২২৭।

৫৫. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, পৃ. ৪৩-৪৪।

৫৬. অবশ্য নজরুল ইসলামকে পরে দুবার চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অসুস্থ সম্বিতহারা অবস্থায়, যখন তাঁর জ্ঞান ছিল না, মুখে কথা ছিল না, হাতের কলম দিয়ে লেখা বের হয় না। একবার ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ভারত সরকার কর্তৃক কাজী নজরুল ইসলামের উপর একটি প্রামান্য ছবি তোলার ব্যাপারে; আর একবার ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে,কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুলের মৃত্যুর পর তার লাশ দাফনের সময়। প্রমীলাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী চুরুলিয়াতে সমাধিস্থ করা হয়, তার ধারণা ছিল নজরুল ইসলামের কবরও চুরুলিয়াতেই হবে। দ্র: রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মত সরকারী চাকুরে হওয়ার পরিবর্তে সার্বক্ষণিক লেখক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর লেখক জীবনের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদানের চেয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং পরবর্তীকালে পালিত প্রতিশ্রুত জীবনের জন্য ছিল পরিকল্পিত পদক্ষেপ।[৫৭]

কবি-সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুল ইসলাম ডেরা বাধার পর সমিতির অফিস তখন সরগরম হয়ে উঠল। দলে দলে কবি-সাহিত্যিক ও গায়কদের নিত্যদিনের আনাগোণায় সমিতির সাহিত্য আসর একেবারে জমজমাট। যে সব কবি-সাহিত্যিক এখানে আসতেন তন্মধ্যে হেমেন্দ্র কুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩ খ্রি.), হেমেন্দ্র লাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫ খ্রি.), প্রেমাঙ্কুর আতর্থি (১৮৯০-১৯৬৪ খ্রি.), কান্তি ঘোষ, ধীরেন গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ (১৯০৫-১৯৬৩ খ্রি.), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৩৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় নজরুল ইসলাম তাঁর বন্ধুদের সাথে কাজে আনন্দে ভরপুর দিন কাটাতেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমিতিতে থাকাকালীন কবিতা লিখে আর গান গেয়ে নজরুল ইসলামের অখণ্ড অবসর সময় কাটত। তিনি আগ্রহদীপ্তভাবে কথা বলতেন আর অস্বাভাবিক গতিশীলতা নিয়ে লিখতেন। তাঁর বন্ধুদের কাছে তিনি সুগায়ক হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন। নজরুল ইসলামের গলা খুব ভাল ছিল না। প্রাণের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে তিনি খুব সুরেলা নয় কিন্তু আবেদনময়ী কণ্ঠে গান গাইতেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান কেরানী ও ছাত্রদের বিভিন্ন মেস, হোস্টেলে গানের আসরে প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন এবং যোগ দিতেন। অনেক হিন্দু পরিবারেও তিনি গান করেছেন। আর এজন্যই তাঁর গান সকলের মন কেড়ে নিত। তখন কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজের লেখা গান খুব কমই গাইতেন। বেশীর ভাগ তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান করতেন। এত অধিক রবীন্দ্র সঙ্গীত তিনি শিখেছিলেন যে, লোকে তাঁকে বলতো রবীন্দ্র সঙ্গীতের হাফেজ। এতদ্ব্যতীত নজরুল ইসলাম অনেক সময় বস্তিতে চটকলের মজুরদের মধ্যে গিয়েও উর্দু ও হিন্দী গান গাইতেন। সেজন্য কুলি-মজুরদের মধ্যেও নজরুল ইসলাম ছিলেন একটি প্রিয় নাম; এভাবে নজরুল ইসলাম তাঁর কলকাতা জীবনের প্রথম বছরই কলকাতায় সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর তাই নজরুল ইসলামের ভক্তদের দল হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল।[৫৮]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি

কলকাতায় যখন নজরুল ইসলাম স্থায়ীভাবে থাকার মনস্থ করলেন তখনও তিনি বিখ্যাত নন। কবিতা কিন্তু তখন অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। বরং তার চেয়ে বেশী গল্প বেরিয়েছে। তবু সব মিলিয়ে সেসবও যে সংখ্যায় অনেক, তাও নয়। আসলে যে নজরুল ইসলাম যুগান্তকারী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠবেন তার পদধ্বনি এবার শুনতে পাওয়া যাবে। কলকাতায় সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাস বা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে নজরুল ইসলামের যে সব লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার খতিয়ান হল:[৫৯]

১.	বাঁধন হারা (১ম কিস্তি)	পত্রোপন্যাস	মোসলেম ভারত
২.	বোধন	হাফিজের অনুবাদ	মোসলেম ভারত
৩.	প্রিয়ার দেওয়া শরাব	হাফিজের অনুবাদ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪.	মানিনী বধুর প্রতি	কবিতা	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৫.	জননীদের প্রতি	গদ্য অনুবাদ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৬.	পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব	গদ্য অনুবাদ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

---

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৫৮. মোহাম্মদ মোদাব্বের, নজরুল ইসলাম, পৃ. ২৩।

৫৯. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ.৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৭.	জীবন-বিজ্ঞান	গদ্য অনুবাদ	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৮.	চিঠি	গাঁথা কবিতা	বঙ্গনূর
৯.	উদ্বোধন	গান	সওগাত

১৩২৭ সালের বৈশাখে আফজাল-উল-হক (১৮৯১-১৯৭০ খ্রি.) এর পিতা কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.)এর সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা বের হয়। এর প্রথম সংখ্যা বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পযন্ত আটটি সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, এর ছয় বৎসর পর ১৯২৭ খ্রি./ ১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসে 'বাঁধন-হারা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে 'মোসলেম ভারতে' ক্রমান্বয়ে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'শাত-ইল-আরব', আষাঢ় সংখ্যায় হাফিজের ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে 'বাদল প্রাতের শরাব', শ্রাবণ সংখ্যায় অন্যতম বিখ্যাত 'খেয়াপারের তরণী' এবং কাজরী উৎসব অবলম্বনে গল্প 'বাদল বরিষণে', ভাদ্র সংখ্যায় 'কোরবানী', আশ্বিনে অপর বিখ্যাত কবিতা 'মোহররম', কার্তিকে একটি গান 'বন্ধু আমার থেকে থেকে', অগ্রহায়ণে সুবিখ্যাত 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' (আবির্ভাব) এবং টীকাসহ 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' গজল (১,২), পৌষ সংখ্যায় গজল (৩,৪) ও গানের প্রথম স্বরলিপি 'হয়তো তোমার পাব দেখা', মাঘ মাসে কাবুলি কবি খোসহালের ভাব অবলম্বনে কবিতা 'বিরহ বিধূরা', 'হাফিজের গজল' (৫,৬), ফাল্গুন সংখ্যায় দুটি গান 'মরমী' ও 'স্নেহভীতু' এবং চৈত্র সংখ্যায় আর একটি গান 'আমার ঘরের পাশ দিয়ে প্রকাশিত হয়।

কলকাতায় সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বছরে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পুরো একবছরে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের যে পরিচয় পাওয়া গেল এতে প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল ইসলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কবিতা, গল্প, গান, পত্রোপন্যাস, অনুবাদ প্রভৃতি রচনায় প্রভূত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। বাইশ বৎসর বয়স্ক উদ্দমী কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'বোধন', 'শাত-ইল-আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'অবেলায়', ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' মাত্র সাত মাসের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত হয়। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ কবিতাবলী বাংলা কাব্য সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং 'বিদ্রোহী' বা 'কামাল পাশা' রচনার পূর্বেই ঐ সব সার্থক সৃষ্টি নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দেয়। কলকাতায় সাহিত্য জীবনের প্রথম বছরে বিভিন্ন রচনার জন্য নজরুল ইসলামের নামের পূর্বে 'হাবিলদার কবি', 'বাঁধন-হারার কবি', 'শাতিল আরবের কবি', 'সৈনিক কবি' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বিশেষণ ব্যবহার হত। অবশ্য 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা লাভের পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ঐসব বিচিত্র বিশেষণে দারুণভাবে শোভিত হয়েছিল। [৬০]

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' করাচী থেকে পাঠানো গল্প, কবিতা প্রকাশ করে নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, আর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বর্ষে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা প্রতি সংখ্যায় কবিতা, গান, গল্প, অনুবাদ প্রভৃতি ছাপিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিমন্ডলে নজরুল ইসলামকে এক নতুন প্রতিভারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতোপূর্বে যে সব কাগজে যেমন- সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী বা নূর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় সবখানেই তিনি গল্প লিখেছেন। যে প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় কবি ও গীতিকাররূপে তাঁর আবির্ভাবই ঘটলো 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকাকে উপলক্ষ করে 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কামাল পাশা', 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি একটির পর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতায়। সমকালীন কবি ও বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' পাঠ করে বিমুগ্ধ হয়ে কবিতা দুটির প্রশংসা করে 'মোসলেম ভারত' সম্পাদককে একটি পত্র লিখেন, পত্রটি পত্রিকার ১৩২৭, ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়। নবীন মুসলিম কবি নজরুল ইসলামকে মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ খ্রি.) এ চিঠিতে অকুণ্ঠ প্রশংসা, সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ পত্রটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল;

"আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া...আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি- মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে... কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।... আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙলার সারস্বত-মন্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতে আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।" [৬১]

প্রকৃতপক্ষে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত কবি মোহিতলাল মজুমদারের ঐ পত্রটি বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের কবিতার প্রথম সাহিত্য সমালোচনা। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের ক্ষণেই একজন প্রতিভাবান মহৎ কবিকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাও প্রকাশনার প্রথম বর্ষে নজরুল রচনাবলী অবলম্বন করেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বস্তুতঃ একজন সাহিত্যিকের জন্য যেমন প্রয়োজন সাহিত্য পত্রিকার তেমনি পত্রিকার জন্যেও অপিরিহার্য নিয়মিত লেখক। নজরুল ইসলাম ও মোসলেম ভারত পত্রিকা পরস্পরের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

বিদ্রোহী কবিতা রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন

১৯২১ সালের আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', 'ভাঙার গান' ও 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতার ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়ীর নীচতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটিতে বসে নজরুল ইসলাম রাত্রিতে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি প্রথমে 'বিজলী' পত্রিকায় ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২ খ্রি./২১ শে পৌষ, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় কার্তিক, ১৩২৮ সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল।[৬২] কবির ভাষায়:

বল বীর-
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি' আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !...
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্ ।
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার...
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না...
আমি চির-বিদ্রোহী বীর-

---

৬১. মোহিতলাল মজুমদার, 'একখানি পত্র', মোসলেম ভারত, (১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৭), পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৬২. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির ![৬৩]

'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিজলী' এবং 'মোসলেম ভারত' ছাড়াও 'প্রবাসী' এবং আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি ছাপা হওয়া মাত্র দেশব্যাপী তুমুল সাড়া জেগে উঠে এবং রাতারাতি সুখ্যাতি লাভ করে হাবিলদার সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' উপাধিতে ভূষিত হন। তখন মাত্র ২২ বছর বয়স্ক বাংলা সাহিত্যে একজন তরুণ কবির বিস্ময়কর সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতার অনেক প্রশংসা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।[৬৪]

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.) এর অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "কবিতা ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক।" [৬৫]

'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার জন্য শুধু নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা আর অভিনন্দনই কবির ভাগ্যে জোটেনি বরং কাজী নজরুল ইসলামে অবিস্মরণীয় সাফল্য ও সুখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ নজরুল ইসলামের সমালোচনায় মুখর হয়ে পড়েছিলেন। তন্মধ্যে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.) যিনি নজরুল ইসলামের 'খেয়াপারের তরণী', 'বোধন', 'নিকটে' প্রভৃতি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক সমীপে অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং কবি নজরুল ইসলামকে 'বাংলার সারস্বত সমাজে' সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন যে 'মানসী' পত্রিকায় পৌষ, ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা 'আমি' প্রবন্ধের ভাবসম্পদ নিয়ে নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত এর কোন ঋণ স্বীকার না করে প্রকাশিত।[৬৬] এ প্রসঙ্গে কবি সুকুমার সেনের মতামত জানা যায় যে, মোহিতলাল 'আমি' প্রবন্ধের ভাবসম্পদ ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' থেকে গৃহীত। আর মোহিতলাল 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পূর্বেই নজরুল ইসলামের উপর বিরূপ হয়েছিলেন; কারণ নজরুল ইসলাম তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে চলছিলেন না। ফলে তিনি নজরুল ইসলামের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন এবং 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পরে খ্যাতির বিড়ম্বনায় তিনি নজরুল ইসলামের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। [৬৭]

প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামকে কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রভাবিত করেননি উপরন্তু নজরুল ইসলামই মোহিতলাল মজুমদারকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবিত করেছিলেন। তাছাড়া ১৯২০ সালে নজরুল ইসলামের সাথে পরিচয়ের মাসখানেক পর একদিন নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে মোহিতলাল মজুমদার তার 'আমি' প্রবন্ধটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। সুতরাং প্রায় এক বছর আগে শোনা একটি প্রবন্ধ অবলম্বন করে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করা অস্বাভাবিক ব্যাপারই বটে। এতদ্ব্যতীত মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' প্রবন্ধটি এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার বিভিন্ন স্তবক তুলনা করলেই মোহিতলাল মজুমদারের দাবীর অসারতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং 'আমি' এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার

---

৬৩. কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী, 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭/ মে, ২০০০), পৃ. ৭-১১; নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-১২।

৬৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ৮৩।

৬৫. সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, (কলকাতা: ডি.এম. লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

৬৬. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ২০৬।

৬৭. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতা: বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬৫), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তথাকথিত সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক এবং দু'টি ভিন্নধর্মী প্রবন্ধ ও কবিতা সৃষ্টির মূল সুরও ভিন্ন একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়।[৬৮]

যাহোক, 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করে সুখ্যাতি অর্জনের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সুদৃঢ় আসন লাভ করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে অজস্রধারায় সাহিত্য রচনা সম্ভার সৃষ্টিতে বিশেষভাবে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

কলকাতায় নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম কয়েকমাস মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে অতিবাহিত হয়। পরে তারা অন্যত্র চলে যান কিন্তু সাহিত্য সমিতির প্রতি নজরুল ইসলামের কৃতজ্ঞতাবোধ চিরদিন অক্ষুন্ন ছিল। ১৯৪১ সালের ৫-৬ এপ্রিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে (নজরুলের শেষ ভাষণ) তিনি সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করে বলেছিলেন, "সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম তা আমি জানি না। এই ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম যে নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কি না আমার জানা নেই।"[৬৯]

এভাবেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে প্রথম জীবনের ঋণ শোধ করেন। অবশ্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুল ইসলামের বসবাসের জন্যে কবি-সাহিত্যিকদের আগমনে সাহিত্য সমিতিও অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

সাংবাদিক জীবন (১৯২০-১৯৪২ খ্রি.)

কবি নজরুল ইসলামের বৈচিত্রময় জীবনে সাংবাদিকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি যে কি রকম রাজনীতি ও কালসচেতন ছিলেন তা বুঝা যায় তাঁর সাংবাদিকধর্মী রচনায়। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারারও প্রবর্তন করেছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পল্টন ফেরৎ হাবিলদার কবি নজরুল ইসলামের তখন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত। এসময় একদিন মুজফ্ফর আহমদ জানতে চান যে, নজরুল ইসলাম রাজনীতিতে যোগ দেবে কি না? নজরুল ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্য?' রাজনীতি করার বাসনা থেকেই একখানা ছোট্ট বাংলা দৈনিকের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা জীবনে প্রবেশ ঘটে। এভাবেই 'নবযুগ' প্রকাশনার সূচনা হয়। সেই সাথে সাংবাদিক হিসেবে কবি নজরুল ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেন। যে মানুষ কবি হতে জন্মেছিলেন তিনি রাতারাতি সাংবাদিক হয়ে গেলেন।[৭০]

১. দৈনিক নবযুগ

১৯২০ সালের ১২ জুলাই, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। চওড়ায় বিশ ইঞ্চি, লম্বায় ছাব্বিশ ইঞ্চি সাইজের ছোট্ট এক শীট কাগজ, মূল্য ছিল মাত্র এক পয়সা। কলকাতার ২২ নং টার্ণার স্ট্রীটে 'নবযুগে'র প্রেস আর ৬ নং টার্ণার স্ট্রীটে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২ খ্রি.) এর বাড়ীর নীচ তলায় 'নবযুগ' কার্যালয়। নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। পত্রিকার কাজের সুবিধার জন্য নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদ বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির অফিস ছেড়ে ৮-এ, টার্ণার স্ট্রীটে বাড়ী নিয়েছিলেন। অবশ্য কিছুদিন তাঁরা 'নবযুগ' অফিসেও থাকতেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথেই 'নবযুগ' পত্রিকাটি

---

৬৮. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ৮৪।

৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'যদি আর বাঁশী না বাজে', নজরুল রচনা সম্ভার, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬/১৯৬৯), পৃ. ৩০১।

৭০. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ডিসেম্বর, ১৯৮২), পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নজরুল ইসলামের শাণিত ভাষায় হেডিং এবং সংবাদ পরিবেশনের বৈচিত্র্য পাঠকদের আকৃষ্ট করে। খুব অল্পদিনের মধ্যে নবযুগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।[৭১]

'নবযুগে'র বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার পেছনে সাংবাদিক হিসেবে নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, "নির্দিষ্ট দিনে, ১৯২০ সালের ১২ ই জুলাই তারিখে, কাজী নজরুল ইসলাম ও আমার সম্পাদনায় 'নবযুগ' বের হলো। নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু-মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন। ফজলুল হক সাহেবের মেশিন খোঁড়া ছিল বলে আমরা চাহিদা মেটাতে পারলাম না। রয়েল সাইজের এক শীট কাগজের দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজে নজরুল ও আমার নাম ছাপা হতো না। প্রধান পরিচালক হিসেবে এ. কে. ফজলুল হকের নাম ছাপা হতো। দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভেতরে একজনেরও ছিল না। নজরুল ইসলাম কোনো দিন কোনো দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকে নি। তবু সে বড় বড় সংবাদগুলি পড়ে সে গুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান। তারপরে নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যেও 'নবযুগ' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেই সব কবিতার কিছু কিছু উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ করে সে হেডিং দিয়েছিলঃ

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা ফয়সুল হে আমার!"[৭২]

'নবযুগ' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলামের সমাজ ও যুগচেতনার পরিচিতি পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশের সমকালীন ঘটনাবলী নজরুল ইসলামের সংবাদ পর্যালোচনায় সঠিকভাবে ফুটে উঠে। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় রচনায়, হেড লাইন প্রভৃতিতে নজরুল ইসলামের স্বকীয়তা বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে ছিল প্রায় অতুলনীয়। 'নবযুগ' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের কতগুলো প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'নবযুগ' পত্রিকা। সে সময় অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে টালমাটাল করে তোলে। বলাবাহুল্য যে, এই সময়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজেও নবতর প্রেরণা বা জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বদেশী ও সশস্ত্র সংগ্রাম দেশের গণমানসে যে বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ঢেউ এসে মুসলমান সমাজকেও উদ্বেলিত করে তুলেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন হয়েছিল যার নাম ছিল 'হিজরত আন্দোলন'। এই আন্দোলনের ফলে সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় আঠারো হাজার কিংবা তারও বেশী মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। 'হিজরত' মানে স্বেচ্ছা নির্বাসন। যিনি এই নির্বাসন বরণ করেন তাকে বলা হয় 'মুহাজির' অর্থাৎ নির্বাসিত। নজরুল ইসলাম তখন নবযুগের পাতায় এই গৌরবময় আত্মত্যাগের স্বপক্ষে 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেন।[৭৩]

খিলাফত আন্দোলনের সময় আফগানিস্তান যাত্রী দেশত্যাগী ভারতীয় মুসলমানদের উপর যে গুলি চলে, নজরুল ইসলামের প্রবন্ধে মুহাজিরদের সেই ট্রাজেডি জলন্তভাবে রূপায়িত হয়। এ লেখাটি

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৭২. মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ৬৫।

৭৩. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ৬-৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে বৃটিশ সরকারের কাছে অসহ্যবোধ হয়েছিল। এজন্য ইংরেজ সরকার এই পত্রিকাকে সতর্ক করে দেয়। স্বাধীন রাজ্য আফগানিস্তানে বসবাসে আগ্রহী বা তুরস্কের পক্ষে সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প এবং বলশেভিক বিরোধীদের বিপক্ষে সংগ্রামকারী ভারতত্যাগী মুহাজিরদের জন্য নজরুল ইসলামের সহানুভূতি ইংরেজ সরকার সহ্য করতে পারেনি, তাই তাঁর ঐ প্রবন্ধের জন্য নবযুগের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধও হয়ে গিয়েছিল।[৭৪]

মূলতঃ কাজী নজরুল ইসলামের আগুন ঝরানো লেখার জন্যই 'নবযুগ' বৃটিশ সরকারের রাজরোষে পড়েছিল। মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম যুগোচিত সমাজচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তখন 'নবযুগ' পরিচালনা করতেন। তাঁরা 'নবযুগ' পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে অপরদিকে কৃষক-শ্রমিকের দাবী তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। পত্রিকার মালিক এ. কে. ফজলুল হক প্রথমদিকে তাদের প্রয়াসে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি, কিন্তু ইংরেজ সরকার যখন দু' তিনবার সতর্ক করে দিয়ে নবযুগের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিল, তখন কাগজের প্রধান পরিচালক এ. কে. ফজলুল হকের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর আর কাগজ বের করবেন কি না, সে বিষয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদের রাজনৈতিক মতবাদ ও তাঁর কাগজে এতোটা বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করলেন না। শেষ পর্যন্ত 'নবযুগ' পুনঃপ্রকাশের জন্য অনেক ইতস্ততঃ করে এ. কে ফজলুল হক সাহেব দু'হাজার টাকা জামানত দিলে 'নবযুগ' পুনর্বার প্রকাশিত হয়, কিন্তু মতভেদ দেখা দেওয়ায় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম এবং এক মাস পর মুজফ্ফর আহমদ 'নবযুগ' ছেড়ে চলে যান। নজরুল ইসলামকে অনেকে বলেছিলেন যে, পত্রিকার কাজ করতে গিয়ে তাঁর নিজের রচনায় ব্যাঘাত হচ্ছে। নজরুল ইসলাম মাত্র আট মাস নবযুগের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর এটাই ছিলো সংবাদপত্রে তাঁর প্রথম চাকুরী। নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' ছেড়ে দেওয়ার মাত্র একমাস পরই ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁর প্রথম সাংবাদিক জীবনের অবসান ঘটে। পরে অবশ্য ১৯২১ সালে বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেমকে সম্পদনার দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় 'নবযুগ' প্রকাশ করা হলো বটে, তবে পাঠকসমাজ তাকে গ্রহণ করলো না। নজরুল ইসলামকে তখন ফের ডেকে আনা হয়, তিনি আর্থিক অনটনের কারণে বাধ্য হয়ে পুনরায় কাজে যোগ দেন। সম্ভবতঃ অস্বস্তিকর পরিবেশে তিনি আর পূর্বের ন্যায় মন প্রাণ ঢেলে লিখতে পারছিলেন না। কিন্তু কাগজের প্রচার ও কাটতি না হওয়ায় পত্রিকাটি অচল হয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে নজরুল ইসলামও বরাবরের মত 'নবযুগের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। আরো কিছুদিন চলার পর একসময় কাগজও বন্ধ হয়ে গেল।[৭৫]

দৈনিক 'নবযুগ'-এ নজরুল ইসলাম যে সব প্রবন্ধ লিখেন তার অধিকাংশ উত্তপ্ত লেখা ও বাজেয়াপ্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে পরবর্তীকালে 'যুগবাণী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, 'নবযুগে' প্রকাশিত 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' এবং 'কালা আদমীকে গুলী করা' প্রভৃতি প্রবন্ধের সংকলন 'যুগবাণী' পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার বিশ বছর পরেও বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে হোম ডিপার্টমেন্টের আমলারা যে নোট দিয়েছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল;

"I have examined the book 'Yugabani It breathes bitter racial hatred directed mainly against the British, Preaches revolt against the existing

৭৪. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ১৩২।

৭৫. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

administration in the country and abuses in the very strong Language the 'slave-minded' Indians who upholds the administration. The three articles on 'Memorial to Dyer', Who was responsible for the Muslims massacre?' and 'shooting the blackmen' are specially objectionable. I don't think it would be advisable to remove the ban on this book in the present crisis. On the whole it is a dangerous book, forceful and Vindictive."[৭৬]

সুতরাং নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সংকলন 'যুগবাণী' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার প্রায় ২০ বছর পরও বইটি সম্পর্কে সরকারী মহলে কত যে শংকা ছিল তা সহজেই অনুমেয়, বৃটিশ সরকারের আমলাদের কাছে 'যুগবাণী' যে কত বিপদজনক বই ছিল উপরোক্ত মন্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে পুনরায় নবযুগ প্রকাশিত হয় এবং নজরুল ইসলাম প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ধুমধামের সাথে নবযুগ পুনর্বার বের হল। নবপর্যায়ে কবি নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' পত্রিকায় সাড়ে তিনশ টাকা বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাবে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করে এভাবেই জড়িত হলেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'নবযুগের' সম্পাদক থাকাকালীন নজরুল ইসলামের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।[৭৭]

২. সেবক ও মোহাম্মদী

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রি.) 'সেবক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নজরুল ইসলামকে মাসিক একশত টাকা বেতন দিয়ে পত্রিকায় চাকুরী দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়। পত্র পেয়েই নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালের মে মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 'সেবক' এ যোগদান করেন। এই 'সেবক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্ভবতঃ নজরুল ইসলামের 'সেবক' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যদিও পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সাথে নজরুল ইসলামের তখন বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তথাপি ঐ পত্রিকায় নজরুল ইসলামের 'সেবক' কবিতা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল মূলতঃ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪ খ্রি.)এর প্রচেষ্টায়। কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কবিতাটি সংগৃহীত হতে পেরেছিল।[৭৮]

নজরুল ইসলাম মাত্র কয়েক সপ্তাহ 'সেবক' পত্রিকায় কাজ করেছিলেন। এ সময় তাঁর লেখায় 'হিন্দুয়ানী ভাব' ছিল বলে মাওলানা সাহেব আপত্তি তোলেন। 'সেবক এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও মাওলানা সাহেবের মতের অনুসারী হওয়ায় এ আপত্তিতে সায় দেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে (২৪ শে জুন, ১৯২২) তাঁর অকৃত্রিম ভক্ত নজরুল ইসলাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পত্রিকার জন্য খুব আগ্রহ করে গভীর অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা মিশিয়ে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেন কিন্তু সম্পাদকীয়টি পরদিনের ভোরের কাগজে যথাযথভাবে ছাপা হয়নি। সম্পাদক ও পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকগণ মিলে তাঁর প্রবন্ধটি কাট-ছাট করে 'হিন্দুয়ানী ভাব' বদলে দিয়ে তা 'সেবক' এ প্রকাশ করেন। নজরুল ইসলাম নিজের লেখার এই অভাবনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দারুণ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত

---

৭৬. শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল: (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯২), পৃ. ১০-১১।

৭৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৬।

৭৮. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠেন এবং কর্তৃপক্ষের এহেন ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে সাথে সাথেই পত্রিকার কাজে ইস্তফা দেন। এরপর আর কোন দিনই নজরুল ইসলাম 'সেবক' অফিসে যাননি।[৭৯]

নজরুল ইসলামের চাকুরী ত্যাগের পর 'সেবক' এর প্রচার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় এবং কয়েক মাস পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। মূলতঃ সে সময় মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৮-১৯৪৮ খ্রি.) এর বিরাট ও ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে দেশের পরিস্থিতি উত্তাল, উদ্বেলিত। মাওলানা সাহেবের এক উত্তপ্ত প্রবন্ধ তখন প্রকাশিত হওয়ার দরুণ 'সেবক' এর জামানত তলব হয় এবং মাওলানা সাহেব রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসরের জন্য কারাবাস করতে বাধ্য হন, ফলে 'সেবকে'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তখন 'সেবকের' সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও অন্যান্য সহকর্মীরা মিলে পরামর্শ করে 'দৈনিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। এ সময় সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা চালু থাকায় তার একটা দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করতে নতুন কোনো ডিক্লারেশন দরকার হবে না বলে উকিলরা পরামর্শ দিলে ১৯২২ সালে 'দৈনিক মোহাম্মদী' যথারীতি প্রকাশিত হল। এর কিছুদিন পর নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ওয়াজেদ আলীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই এসে দৈনিক মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করলেন। দৈনিক মোহাম্মদীতে নজরুল ইসলাম প্রায় মাস খানেক কর্মরত ছিলেন।[৮০]

এ সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮ খ্রি.) লিখেছেন, "কয়েকদিনের মধ্যেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হলো 'দৈনিক মোহাম্মদী' অফিসে। এসেই তিনি বললেনঃ আমি কিন্তু ব্যঙ্গ রসাত্মক কলামটি লিখবো। ওয়াজেদ মিয়া আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেনঃ কি বলেন, শামসুদ্দীন সাহেব? আমি বললামঃ খুব ভালো হবে। নজরুল তো এ কলাম লেখার সবচাইতে যোগ্য লোক। নজরুল এ কলামের নতুন নামকরণ করলেন 'কাতুকুতু'। প্রতিদিন 'কাতুকুতু' বেরুতে লাগলো। 'দৈনিক মোহাম্মদী'র পাঠকদের মুখে হাসির হুল্লোড় উঠলো। শুধু কাতুকুতুই নয়, সংবাদের 'কাতুকুতু' হেডিং ও তাঁর ছোঁয়ায় কবিতাময় হয়ে উঠলো। দু'একটি হেডিং এর নমুনা দিচ্ছিঃ 'নেহারি নেহরু মতিলালরা সব আঁখি অতিলাল; ফিজির হিজিবিজি; জাপানের চাপান'। দৈনিক মোহাম্মদী নিয়ে পাঠক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। কাগজের প্রচার হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো।"[৮১]

অল্পদিনেই 'দৈনিক মোহাম্মদী'তে নজরুল ইসলাম বেশ জমিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তিনি 'দৈনিক মোহাম্মদী' ছেড়ে চলে যান। তাঁর এই আকস্মিক চলে যাওয়ার ফলে সাংবাদিকতার সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক অচিরেই ঘুচলো না। বরং তিনি পরে আরো কয়েকটি পত্রিকার সাথে পরিচালক, সম্পাদক ও লেখক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন।

৩. ধূমকেতু

নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রকাশের উদ্দাম ইচ্ছায় নিজেই একটি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসময় চট্টগ্রাম জেলার হাফিজ মাসউদ নামে এক ধনাঢ্য লোক একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিলে নজরুল ইসলাম তাঁর আর্থিক সাহায্য নিয়ে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেন এবং পত্রিকার নাম স্থির করেন 'ধূমকেতু'। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ই আগষ্ট ১৩২৯ সালের ২৪ শে শ্রাবণ, শুক্রবার ৩২নং কলেজ স্ট্রীট থেকে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' প্রথম প্রকাশিত হয়। ধূমকেতুর সাইজ, প্রকাশনা ও প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, "আসলে নজরুল ইসলামের

---

৭৯. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৫০-৫১।

৮০. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৮।

৮১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮), পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

'ধূমকেতু' কিন্তু সপ্তাহে দু'বার বের হতো। 'হপ্তায় দু'বার দেখা দেবে' এই ঘোষণা কাগজেই থাকত। 'ধুমকেতু' কখনও 'সাপ্তাহিক' থেকে 'অর্ধ-সাপ্তাহিক' হয়নি। 'ধূমকেতু'র প্রতি পৃষ্ঠার সাইজ ছিল লম্বায় পনের ইঞ্চি ও চওড়ায় দশ ইঞ্চি অর্থাৎ ক্রাউন ফলিও সাইজ। এই রকম আট পৃষ্ঠার কাগজ ছিল 'ধূমকেতু'; একখানা 'ধূমকেতু'র নগদ দাম ছিল এক আনা আর তার এক বছরের গ্রাহক হওয়ার চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা। 'ধূমকেতু'র সারথি (সম্পাদক) ও স্বত্ত্বাধিকারী ছিল কাজী নজরুল ইসলাম। তার কর্মসচিব (ম্যানেজার) শ্রী শান্তিপদ সিংহ। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন আফ্জালুল হক সাহেব।"[৮২]

'ধূমকেতু'র প্রকাশনা উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম বাণী চেয়ে পাঠান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৮৩ খ্রি.), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.) সহ আরো অনেকের কাছে। অনেক বাণী তাদের নিকট এসেছিল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কয়ছত্র কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই আশীর্বাণীকে শিরোভূষণ করে 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল;[৮৩]

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন!

২৪ শ্রাবণ, ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান, এ বাণীটি 'ধূমকেতু'র ২৭ শে জানুয়ারী, ১৯২৩ সংখ্যায় ছাপা হয়; [৮৪]

কল্যাণীয় বরেষু-

তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করবেন।

তোমাদের
শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মপ্রকাশের সাথে সাথেই 'ধূমকেতু' শিক্ষিত তরুণদের ভিতরে খুব বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু 'ধূমকেতু' কেন এত জনপ্রিয় হয়েছিল? 'ধূমকেতু'র মধ্যে কি এমন নতুনত্ব থাকত যার জন্য বিপুল সংখ্যক পাঠক পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতো। সরাসরি রাজনীতির কথা, দেশবাসীর

---

৮২. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৮৩. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণীটি ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় আর ৭ম সংখ্যা থেকে ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে ছাপা হতো। দ্রঃ রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃজীবন ও কবিতা, পৃ. ৮৮-৮৯।

৮৪. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাছে স্পষ্টভাবায় বিদ্রোহের ডাক। নজরুল ইসলাম একাই একশ; কখনো লিখছেন সম্পাদকীয়, কখনো কবিতা, কখনো বা প্রবন্ধ। এ সম্পর্কে আবদুল আজিজ আল-আমান 'ধূমকেতুর নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন, "এ প্রসঙ্গ প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় নিবন্ধাবলীর কথা। গতানুগতিক সম্পাদকীয় নয়, এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল যেন তার লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করতেন। দারুণ জ্বালাময়ী লেখা, অত্যন্ত উত্তেজক। সুতরাং পত্রিকা হাতে পেয়ে পাঠকবর্গ প্রথমেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। নজরুলের লেখা আগুন ঝরানো কবিতাবলী ছিল এ পত্রিকার অন্যতম দ্বিতীয় আকর্ষণ।"[৮৫]

'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের এ কবিতা বাংলা কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে এলো এক আশ্চর্য তেজস্বিতা! বাণীর মশালে লেলিহান শিখায় জ্বলন্ত আগুন লক্ষ্য করে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হলো। 'বিদ্রোহী'তে ছিল আবহমান মানব সত্তার দুর্বার-দুর্দম জয়যাত্রার বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা আর 'ধূমকেতু'তে প্রজ্জ্বলিত হলো প্রত্যক্ষ মহাবিপ্লবের লেলিহান অগ্নিবান। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এহেন শৌর্যের বিকাশ সম্পূর্ণ নতুন। ধূমকেতু' বের করে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যকে তেজস্বী বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত করে দিলেন। বাংলা কবিতা এর আগে বিপ্লবের সে মুখ আর কখনো দেখেনি, যা সকলের অজ্ঞাত ছিল-যা কোনদিন কোন কাব্যসেবীর চেতনাকে উদ্ভাসিত করতে পারেনি। ধূমকেতুতে নজরুল ইসলাম এলেন তাতেই আবাহন করে; তাঁর বীণা হলো অগ্নিবীণা, দৃষ্টিভঙ্গী অগ্নিশিখা এবং তাঁর এক একটি শব্দ ও বাক্য হলো লক্ষ্যভেদী অব্যর্থ অগ্নিশির! নজরুল ইসলামের সৃষ্ট বাংলা ভাষা কতো যে তেজোদীপ্ত তার পরিচয় পাওয়া গেল ধূমকেতুতে।[৮৬] এ কবিতায় নজরুল ইসলামের যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তাকে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'মুখবন্ধ' বলা যেতে পারে যাতে তিনি স্বগোক্তির মতো বলেছেন:

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।...
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি!
আমি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও!
তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও।[৮৭]

'ধূমকেতু'র মধ্যে দিয়ে নজরুল ইসলাম অসহযোগ খিলাফতের ব্যর্থতায় হতাশাগ্রস্ত সমাজ ও রাজনীতিতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট করে তুলতে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যায় 'সারথির পথের খবর' সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'ধূমকেতু'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছিল। 'ধূমকেতু' কি মেজাজ নিয়ে প্রকাশিত হয় তা এই সম্পাদকীয় নিবন্ধের নিম্নের উদ্ধৃত অংশ থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে, যাতে নজরুল ইসলাম পত্রিকার রূপরেখা ও উদ্দেশ্যের চিত্র অংকন করেছেন, "মাভৈ বাণীর ভরসা নিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি নমস্কার করছি আমার সত্যকে। দেশের যারা শত্রু, যারা দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভন্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী। ...'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"[৮৮]

---

৮৫. আবদুল আজিজ আল-আমান, ধূমকেতুর নজরুল, (কলকাতা, ১৯৭৪), পৃ. ৩৯।

৮৬. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৫২-৫৩।

৮৭. কাজী নজরুল ইসলাম , 'ধূমকেতু', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০।

৮৮. আবদুল আজিজ আল-আমান, ধূমকেতুর নজরুল, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

'ধূমকেতু'র ১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ শে আশ্বিন, ১৩২৯ বাং, ১৩ ই অক্টোবর, ১৯২২ সালের পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে লিখেছিলেন, "সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন । ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকার টুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"[৮৯]

'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের ঐ বলিষ্ঠ ঘোষণার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সে যুগে এমন স্পষ্টভাষায় বিপ্লব ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা অসীম সাহসের কাজ ছিল। মহান উর্দু কবি মৌলানা হসরৎ মোহানী এক বৎসর পূর্বে এমন কথা উচ্চারণ করায় কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন; নজরুল ইসলাম সেই ঘটনা জানতেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুর তোয়াক্কা করেননি।[৯০] যে সময়ে ভারতীয় নেতাগণ স্বরাজ বা স্বায়ত্ত শাসনের দাবী নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, সে সময়েই নজরুল ইসলাম পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পর খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে নজরুল ইসলাম তাঁর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দান করেন। এ সম্পর্কে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন যে, "অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছাছোলা ভাষায় খবরের কাগজে ঘোষণা করে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জানা নেই।" [৯১]

'ধূমকেতু'র প্রথম সাতটি সংখ্যা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত হয়, অষ্টম সংখ্যা থেকে 'ধূমকেতু' অফিস ৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে স্থানান্তরিত হয়। 'ধূমকেতু'র ১২শ সংখ্যা, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্রি. শারদীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। ভীরুদের প্রতি প্রচন্ড ধিক্কার, বৃটিশ সমর্থকদের প্রতি দুর্বার ঘৃণা, আর দেশপ্রেমীদের কাছে বিদ্রোহের ডাক; এ হলো কবিতার মূল সুর। ফল যা হওয়ার তাই হলো, সরকারের টনক নড়লো। পুলিশ এসে তল্লাশী করে গেল 'ধূমকেতু'র অফিস পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হলো, নিষেধাজ্ঞা জারী হলো কবিতাটির উপর অর্থাৎ 'আনন্দময়ীর আগমনে' আর কখনো কোথাও ছাপা যাবে না। 'ধূমকেতু'তে নজরুল ইসলাম এর চেয়ে অগ্নিময় অনেক কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু এ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি রাজরোষে পতিত হন, নজরুল ইসলামকে পরে গ্রেফতার এবং রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারে তাঁকে এক বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। কবিতাটি নজরুল ইসলাম রচনা করেছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যার (আশ্বিন, ১৩২৯) জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধূমকেতুতে ছেপে দেন। ঐ সময় অসহযোগ, খিলাফত, সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে দেশে যে হতাশা বিরাজ করছিল কাবতাটিতে সে চিত্র ছিল। সেইসাথে দেশের নেতৃবৃন্দের অবস্থা ও ভূমিকার জন্য ক্ষোভ, কবিতায় গান্ধীজি, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বারীন ঘোষ প্রমুখের

---

৮৯. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক নজরুল, (কলকাতা: ১৯৭৮), পৃ. ৩৬।

৯০. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ১০৪।

৯১. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, পৃ. ২৪২-২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ক্রিয়তায় ব্যঙ্গ এবং ধর্মের নামে ভন্ডামী ও অহিংসার নামে কাপুরুষতার প্রতি কটাক্ষ ছিল।[৯২] এটি একটি রূপক কবিতা যাতে মহিষাসুর মর্দিনী দূর্গা দেবীকে আবাহনের ছলে দেশের সমকালীন হতাশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক পরিস্থিতি উনআশি পংক্তিতে তুলে ধরা হয়েছিল। কবির ভাষায়:

আর কতকাল থাকবি, বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব জুতো,
মুখে ভজে আল্লাহ হরি, পূজে কিন্তু ডান্ডা গুঁতো!
'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে
ধর্ম্ম-ধ্বজা উঁড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে।[৯৩]

নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'র প্রথম বর্ষের ২১ সংখ্যা ২৮ শে কার্তিক, ১৩২৯; ১০ ই নভেম্বর, ১৯২২ পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন, বস্তুতঃ 'ধূমকেতু'র ২০শ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকা নির্বিবাদে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন 'ধূমকেতু' অফিসে এবং প্রেসে পুলিশ হানা দেয়। ১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর সকালে 'ধূমকেতু' অফিসে তল্লাশী চালানো হয়, পরওয়ানা অনুসারে 'ধূমকেতু'র দুটি লেখা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, একটি নজরুল ইসলামের 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১২শ সংখ্যা) শীর্ষক কবিতা এবং অপরটি 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' (১৫শ সংখ্যা) শীর্ষক লীলা মিত্রের একটি প্রবন্ধ। পুলিশ ধূমকেতুর সারথী কাজী নজরুল ইসলামকে খোঁজ করে, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দন্ডবিধি আইনের ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতারী পরওয়ানা ছিল। 'ধূমকেতু' অফিসে তখন উপস্থিত ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) ও আবদুল হালিম (১৯০৪-১৯৬৬ খ্রি.)। তারা পুলিশকে জানান যে, নজরুল ইসলাম কলকাতার বাইরে; তখন পুলিশ বাজেয়াপ্ত কাগজপত্র নিয়ে চলে যায়। সরকারের সাথে সাথে গোড়া মুসলমান সমাজ থেকেও নজরুল ইসলামের লেখনীকে কেন্দ্র করে আঘাত আসে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকার আশ্বিন (১৩২৯) সংখায় ধূমকেতুকে 'অমঙ্গলের অগ্রদূত' আর নজরুল ইসলামকে উঁহার স্বেচ্ছাচারী সারথী আখ্যা দিয়ে 'ধর্ম বিবর্জিত' ধূমকেতুকে সতর্ক করে দিয়ে সংযত হতে বলা হয়। অবশেষে কুমিল্লা থেকে ১৯২২ সালে ২৩শে নভেম্বর 'ধূমকেতু'র সারথী কাজী নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পরদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়।[৯৪]

৪. লাঙল

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর সংসারী হলেও নজরুল ইসলাম ধীরে ধীরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি কুমিল্লা, মেদিনীপুর, হুগলী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং অন্যান্য স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালের শেষদিক থেকে কবি নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ রাজনীতি শুরু করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা কেবল শহর অঞ্চলে বা শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মফস্বলে কৃষক ও জেলেদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করে দেন। নজরুল ইসলাম তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য হন। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে কাজী নজরুল ইসলাম হেমন্ত কুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহমদ ও শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় একটি নতুন পার্টি গঠন করলেন, পার্টির নাম রাখা হয় 'ভারতীয় জাতীয়

---

৯২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ৮৫-৮৬; মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৫৫-৫৬।

৯৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আনন্দময়ীর আগমনে', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পরিশিষ্ট, পৃ. ৮৯৯-৯০০।

৯৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ৯০-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress) বা 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল'।

এ পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে 'লাঙল' নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়। এর প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম আর সম্পাদক হিসেবে নজরুল ইসলামের পল্টন জীবনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপ হত। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।'লাঙল' পত্রিকার শুরুতে চন্ডীদাসের 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- অমর বাণীটি ছাপা থাকতো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'লাঙল' পত্রিকার জন্য আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন;

ধর হাল বলরাম, ধরো তব মরু ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, শুধু করো ব্যর্থ কোলাহল।[৯৫]

'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সাংবাদিক নজরুল ইসলামের আর একটি সত্তার অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষকে তিনি যে সবার উপরে স্থান দিতেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ যে ছিল না তার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠে এসময়। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ ছাপা হয়;

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান,
গাহি সাম্যের গান।...
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম-জাতি
সবদেশে সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[৯৬]

'লাঙলে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (১লা জানুয়ারী, ১৯২৬) নজরুল ইসলামের 'কৃষকের গান', তৃতীয় সংখ্যায় (৭ই জানুয়ারী, ১৯২৬) 'সব্যসাচী' কবিতা ছাপা হয়েছিল। তারপর 'শ্রমিকের গান', 'ছাত্র দলের গান' প্রভৃতি কবিতা লিখে নজরুল ইসলাম 'লাঙল' কে জনপ্রিয় করে তুলেন। কিন্তু 'লাঙলে'র আদর্শগত অনুভূতির তাড়নায় নিদারুণ অর্থ কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহানোর মধ্যে থেকেও তিনি হুগলী থেকে কলকাতায় এসে অফিস করে 'লাঙল' পত্রিকা পরিচালনা করতেন। অনেক সময় 'লাঙল' অফিসে যাতায়াতের খরচও নজরুল ইসলামের কাছে থাকতো না। পত্রিকা অফিসে নজরুল ইসলামের আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে আলোচনা হতো, কিন্তু লাঙলগোষ্ঠীর কেউ তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিশেষ উপকার করতে পারেন নি। এ সময় হুগলীতে নজরুল ইসলাম ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। এ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থান করেই নজরুল ইসলাম কৃষক, শ্রমিক, চাষী, মজুর এবং উৎপীড়িত জনগণের জন্যে অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করলেও তাঁর আর্থিক অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি। আর এ সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন যে, বিপ্লবী দলের সংগে প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বহারা শ্রেণীর কোন সম্পর্ক নেই। নজরুল ইসলামের পরিচালনায় 'লাঙল' পত্রিকার মোট ১৬ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'লাঙল' তার স্বল্পায়ু অবস্থানের মধ্যেই বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আর্থিক অসাচ্ছলতা হেতু ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিলের

---

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৯, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৩-১৪; উদ্ধৃত সৌমেন্দ্র ঠাকুর, যাত্রী, (কলকাতা, ১৩৫৭),পৃ. ১২৬।

৯৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৭৪/ ডিসেম্বর, ১৯৬৭; ২য় প্রকাশ, পৌষ, ১৩৯১/ ডিসেম্বর ১৯৮৪), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৭।

৯৭. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, 'বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুল', পৃ. ৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

পর আর 'লাঙল' প্রকাশিত হয়নি। লাঙলের শেষ সংখ্যাতে কলকাতায় সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর খবরাখবর ও মন্তব্য ছিল।[৯৭]

৫. গণবাণী

১৯২৬ সালের ১২ ই আগষ্ট থেকে 'লাঙল' পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গণবাণী'তে রূপান্তরিত হয়। নজরুল ইসলাম তখন সম্পাদকের চাকুরী ছেড়ে দেন, কিন্তু পত্রিকার জন্য লেখা বন্ধ করেননি। এ সময় 'গণবাণী' পত্রিকা মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে ৩৭, হ্যারিসন রোড থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। গণবাণীতে লেখা থাকতো 'একসাথে লাঙল একীভূত হয়েছে'। 'গণবাণী' যদিও সম্পাদক ভিন্ন এখন, লাঙলের ভূমিকাই গ্রহণ করলো। গণবাণী পত্রিকার সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু গণবাণীতে নজরুল ইসলাম শুধু লেখক হিসেবে জড়িত ছিলেন।গণবাণীতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ বিষয়ে নজরুল ইসলামের কয়েকটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। গণবাণীর ১৯২৬ সালের ২৬ আগষ্ট/ ৯ ই ভাদ্র, ১৩৩৩ সংখ্যায় 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২রা সেপ্টেম্বর/১৬ ই ভাদ্র সংখ্যায় 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখ 'গণবাণী' অফিসে বসে নজরুল ইসলাম 'গণবাণীর জন্য রচনা করেছিলেন 'ইন্‌টার-ন্যাশনাল', 'রেড ফ্ল্যাগ' ও ইংরেজ কবি শেলি (১৭৯২-১৮২২ খ্রি.) এর ভাব অবলম্বনে অনূদিত 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত পতাকার গান' ও 'জাগরে তূর্য'। এ গণবাণীতে নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'সর্বহারা' ছাপা হয়েছিল।[৯৮]

এতদ্ব্যতীত গণবাণীর সাথে নজরুল ইসলাম যে আত্মিকভাবে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি চিঠি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খ্রি.) এর স্বরাজ দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক আত্মশক্তি পত্রিকায় 'গণবাণী'র আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তার চমৎকার জবাব দিতে গিয়ে নজরুল ইসলাম 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তৎকালীন শ্রী গোপাল সান্যালকে যে পত্র লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল;[৯৯]

"গণবাণী কৃষক শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক- শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যারা 'গণবাণী' তাঁদেরই জন্য। কৃষক-শ্রমিকদলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর হৃদয়ের মুক মুখের বাণী- 'গণবাণী'। তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে 'গণবাণী'।

বিনীত

৮ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ। নজরুল ইসলাম।

নজরুল ইসলামের উপরোক্ত চিঠিটি থেকে কৃষক-শ্রমিকদলের বা তার কর্মীদের ও দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র যে পরিচয় মেলে তা থেকে সাংবাদিক কবির রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

৬. নওরোজ

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এর পরিচালক মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০ খ্রি.) ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে নব উদ্দমে কলকাতা থেকে 'নওরোজ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কবি বেনজীর আহমদ। নজরুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে 'নওরোজ'

---

৯৮. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ১২২-১২৪।

৯৯. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৫, উদ্ধৃত কাজী নজরুল ইসলাম, 'একটি চিঠি' নজরুল একাডেমী পত্রিকা, (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট,বসন্ত, ১৩৭৬), পৃ. ৮৪-৮৫।

পত্রিকায় যোগদান করেন এবং তাঁকে একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক হিসেবে মাসে একশ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় নজরুল ইসলাম কলকাতা ও কৃষ্ণনগর দুঁজায়গায় যাতায়াত করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঁচটি সংখ্যা বের হওয়ার পরই 'নওরোজ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

'নওরোজ' প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩৪) নজরুল ইসলাম 'নওরোজ' নামে একটি কবিতা এবং 'ঝিলিমিলি' নামে একটি একাঙ্কিকা লিখেন। শ্রাবণ সংখ্যা 'নওরোজে' নজরুল ইসলামের গান 'আসিলে এ ভাঙ্গা ঘরে' ও 'সেতুবন্ধ' একাঙ্কিকা ছাপা হয়। ভাদ্র সংখ্যা নওরোজে উপন্যাস ছাড়াও 'ভীরু' ও 'চিরঞ্জীব জগলুল' শীর্ষক দুটি কবিতা ও একটি গান প্রকাশিত হয়। 'নওরোজে' নজরুল ইসলামের বিপ্লবাত্মক কোন রচনা ছাপা হয়নি। 'নওরোজে' স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্যে নজরুল ইসলামের সাথে কথা হয়েছিল। এ কাগজে কয়েকটি কবিতা-গান ছাড়াও তিনি তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পরই 'নওরোজ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১০০]

৭. সওগাত

১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নজরুল ইসলাম নির্ধারিত বেতনে 'সওগাত' পত্রিকায় কাজে যোগদান করলেন। অবশ্য ১৩৩৩ সাল থেকে তিনি সওগাত পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.)এর সাথে কবির পুনঃযোগাযোগ হয়। এ মাসিক পত্রেই দশবছর আগে নজরুল ইসলামের সর্বপ্রথম রচনা 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল ইসলাম যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন যেন সওগাতেরই একচেটিয়া লেখক তিনি। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার পরে সওগাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী লিখেছেন। মুক্ত চিন্তার মানুষ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কাগজে কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার কোন স্থান ছিল না। সওগাত সম্পাদক ও নজরুল ইসলামের মধ্যে একটি নিয়োগপত্র তথা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, "চুক্তির শর্ত ছিল এই:

১. কাজী নজরুল ইসলাম 'সওগাত' ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকায় কাজ করবেন না।

২. তিনি প্রতি সংখ্যায় 'সওগাতে' কবিতা, গান ও একটা ধারাবাহিক উপন্যাস দেবেন। গল্প লিখলে তা-ও 'সওগাতে' দেবেন।

৩. অপরাহ্নে 'সওগাত' অফিসে আসবেন। সন্ধ্যায় এখানে সাহিত্য মজলিস বসবে। সেখানে নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা-গান শোনাবেন, সাহিত্যালোচনা করবেন, তরুণ দলের লেখকদের উৎসাহ দেবেন।

৪. সাপ্তাহিক 'সওগাতে'র 'চানাচুর' বিভাগ পরিচালনা করবেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতিক দুর্নীতি ও ভন্ডামীর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করবেন- ইত্যাদি।

চুক্তিপত্রে নজরুল ইসলাম ও আমি দস্তখত করলাম। ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হলো এবং অগ্রহায়ণ মাস থেকে নজরুলের কার্যকাল নিরূপিত হলো । তাঁর মাসিক বেতন ১৫০ টাকা ধার্য করা হলো। এর উপর 'সওগাত' অফিসে যাতায়াতের খরচ দিতেও স্বীকৃত হলাম। তখন 'সওগাতের' মূল্য কম ছিল। ৮০ পৃষ্ঠার চিত্রবহুল 'সওগাতে'র মূল্য ছিল মাত্র পাঁচ আনা। এই স্বল্প মূল্যের কাগজ থেকে এর চেয়ে বেশী দেওয়া সম্ভব ছিলনা। সেকালের ভাল সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ ৪০/৫০ টাকা বেতনে পত্রিকার অফিসে কাজ করতেন। অধিকাংশ মাসিক পত্রিকাই অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যেত। যাহোক, আমার প্রস্তাবে নজরুল খুব সন্তুষ্ট হলেন। বেতন সম্পর্কে তাঁর কোন আপত্তি রইল না।" [১০১]

---

১০০. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম , পৃ. ৬০-৬১, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ১৭ ;আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৩৬।

১০১. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ১২৪-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'সওগাত' পত্রিকার কাজে যোগদানের পর নজরুল ইসলামের উৎসাহ-উদ্যম আরো বেড়ে গেল। 'সওগাত' অফিস সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের কলরবে মুখরিত হলো। সওগাতের সাহিত্য মজলিসও সরগরম হলো। ঘুমন্ত বাংলার মুসলিম বিশেষ করে তরুণদের কবিতা ও গান দিয়ে জাগাতে না পারলে নিদ্রিত সমাজের আর কোন আশা নেই, নজরুল ইসলাম তা ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই সওগাতে যোগদান করেই তিনি ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখলেন 'অগ্রপথিক' নামে এক জাগরণী কবিতা, সওগাতের-সাত পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর এই কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হল;

অগ্রপথিক হে সেনাদল
জোর কদম্ চলরে চল।
অভিযান সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্ব্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি সব তস্‌নস্ করি পায়ে পিষে।[১০২]

স্বরচিত কবিতাটি নজরুল ইসলাম সওগাতের সাহিত্য আসরে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন। ভক্তের দল আনন্দে আত্মহারা হলো। তরুণদের জন্য এরূপ জাগরণী কবিতা তারা যেন নজরুল ইসলামের মুখেই প্রথম শুনলেন। প্রবল করতালির মধ্যে তারা কবিকে জড়িয়ে ধরলেন, নজরুল ইসলাম মনের মত পরিবেশ পেয়ে খুব খুশী হলেন। ইতোমধ্যে অগ্রহায়ণ সংখ্যা সওগাত থেকেই নজরুল ইসলাম তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' লিখতে আরম্ভ করেন। এই উপন্যাস ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ক্রমশঃ ছাপা হয়ে তিন বছরে ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাসটিও ধারাবাহিকভাবে এ কাগজে বের হয়। তরুণদের উদ্দেশ্য করে নজরুল ইসলাম সওগাতে আরো অনেক কবিতা লিখেন। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে একটা জাগরণী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য নজরুল ইসলাম মাসিক সওগাত ও সাপ্তাহিক সওগাতে (১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশ) অবাধে লেখনী পরিচালনা করতে লাগলেন। কবির দুটি বিখ্যাত কবিতা বার্ষিক সওগাতে ছাপা হলো। তার উপর সোনায় সোহাগা ছবিতে ছবিতে বার্ষিক সওগাত ভরে দেওয়া হয়েছিল। 'বার্ষিক সওগাত' যেদিন প্রকাশ হলো সেদিন দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী আনন্দিত হয়েছিল। মুসলমানদের অধঃপতনে কত গভীর বেদনা নিয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর 'খালেদ' কবিতা লিখেছিলেন পড়লেই তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'খালেদ' কবিতার ক'টি পংক্তি উদ্ধৃত হল;

খালেদ ! খালেদ! শুনিতেছ নাকি সাহারার আহাজারি?
কত 'ওয়েসিস' রচিত তাহার মরু নয়নের বারি।...
খালেদ! খালেদ! ফজর হলো যে, আজান দিতেছে কৌম,
ঐ শোন শোন, "আস্ সালাতু খায়রুম্ মিনান নৌম!"[১০৩]

১৩৩৪ সালের শেষের দিকে 'বার্ষিক সওগাত' দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যায় নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'উমর ফারুক' শীর্ষক দশ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ কবিতা ছাপা হলো। এটিও প্রথম বর্ষের বার্ষিকীর মত পাঠকবর্গের উপভোগ্য হয়েছিল। 'উমর ফারুক' কবিতায় নজরুল ইসলাম তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় লিখলেন;

নাই, তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ!
মোরা, "আস্‌হাব-কাহাফে"র মত দিবানিশা দিই ঘুম,

---

১০২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'অগ্রপথিক', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩।

১০৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

'এশা'র আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃঝুম নিঃঝুম।[১০৪]

মুসলমানদের মধ্যে যারা পূর্বে নজরুল ইসলামের নামও শুনতে চাইতেন না, এরূপ ধরনের কবিতা ও গান লেখার পর থেকে তারাও কবির ভক্ত হয়ে উঠলেন। তারাও নজরুল ইসলামকে দেখার জন্য দলে দলে 'সওগাত' অফিসে এসে ভীড় করতে লাগলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্যও নজরুল ইসলামের ডাক পড়তে লাগলো। নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে যে 'সওগাত দল' গড়ে উঠেছিল কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা ছাড়াও এই দলের চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।[১০৫]

এরূপ আন্দোলনের জন্য প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সওগাত' পত্রিকা যথেষ্ট নয় বলে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সওগাত' ১৩৩৫ সালের বৈশাখ, ১৯২৮ খ্রি. এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে। সাপ্তাহিক সওগাত ও নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে তখন একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। বুদ্ধির মুক্তি, নারী স্বাধীনতা, দেশের আজাদী প্রভৃতি ছিল এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মূলমন্ত্র। মুসলিম সমাজের সেই ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের যুগে স্বাধীন চিন্তার এ সব মতবাদ 'সওগাত' ভিন্ন অন্য কোন কাগজে কেউ প্রকাশ করতে সাহসী হয়নি। নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ তরুণ দল ধর্মীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবাধে দুর্বার লেখনী চালনা শুরু করেন। এ সময়ে 'সাপ্তাহিক সওগাতে' সওগাত দলের পক্ষ থেকে নজরুল প্রসঙ্গে গোড়া সমাজের আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য সওগাতি দলের পক্ষ থেকে 'নজরুলিস্তান' নামে একটা বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল, এতে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে খবরাখবর ছাপা হতো। এ পত্রিকা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) লিখেছেন,"সাপ্তাহিক সওগাত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সুচিন্তিত লেখায় এবং নজরুল ইসলামের রস রচনায় অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। তৎকালে কাগজের জন্য অপেক্ষমান হকারদের ভিড় একমাত্র সাপ্তাহিক সওগাতের বেলায়ই দেখা যাইত। এতে নজরুল ইসলাম 'চানাচুর' শিরোনামায় যে একটি ফিচার লিখিতেন সেটি পড়িবার জন্য পাঠক মহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত।"[১০৬]

৮. 'মোহাম্মদী' বনাম 'সওগাত'

মাসিক সওগাতের প্রচার সংখ্যার ন্যায় সাপ্তাহিক সওগাতের জনপ্রিয়তা যখন হু হু করে বাড়তে লাগলো তখন নজরুল ইসলামের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত কিছু মুসলমান লেখক এই সুযোগে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে 'সওগাত' ও নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনায় রত হন। সাপ্তাহিক সওগাতের প্রকাশনাকাল থেকেই মুসলমান সাহিত্যিকরা প্রকাশ্যে দু' দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। রক্ষণশীল ও প্রবীণ লেখকরা গেলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে 'মোহাম্মদী' দলে আর মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতার পরিবেশক তরুণরা এলেন নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে সওগাতের দলে। এ সময় মোহাম্মদী ও সওগাত যথাক্রমে দুই দলের মুখপত্র হয়ে পড়ল। ১৩৩৫ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নজির আহমদ চৌধুরী 'এছলাম ও নজরুল ইসলাম' শিরোনামে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটিতে কবিকে 'নাস্তিক' এমনকি 'আজাজীল'রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়। নজরুল ইসলামকে 'ইসলামের প্রধান শত্রু' বলেও চিহ্নিত করা হয়। সেসময় মুসলমানদের আরো দু'একটি ধর্মীয় পত্র-পত্রিকায় নজরুল ইসলামকে 'ঘোর ইসলাম বিরোধী' বলে প্রতিপন্ন করা হয় এবং কবিকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সওগাত ও সাপ্তাহিক সওগাত উভয় পত্রিকায় বাংলাদেশের উদারমনা

---

১০৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

১০৫ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ১২৯।

১০৬. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, পৃ. ২০ উদ্ধৃত আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, (১৯৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাশীল তরুণ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ নজরুল ইসলামের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে থাকেন। এসময় সওগাত ভিন্ন নজরুল ইসলামের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন ও প্রচারের আর কোন মাধ্যম মুসলমান সমাজে ছিল না বললেই চলে।[১০৭]

মোহাম্মদীর 'সওগাত' ও 'নজরুল' বিরোধী প্রচারণায় যে সব মুসলমান কবি-সাহিত্যিক অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.)। তিনি তখন মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন বিধায় তাঁকে দিয়ে মাওলানা সাহেব বিরুদ্ধচারীদের দলপতির কাজ করাতেন। গোলাম মোস্তফার এ ভূমিকা দেখে তার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য নজরুল ইসলামকেও কলম ধরতে হয়।

'সাপ্তাহিক সওগাত' ও 'মাসিক মোহাম্মদীর' পাতায় নজরুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফার ঠোকাঠুকি লেগেই থাকত। 'মোহাম্মদী' নানাভাবে নজরুল ইসলামকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করতো। 'সওগাতে'র সাহিত্য মজলিসে কেউ সে সম্বন্ধে আলোচনা করলে নজরুল ইসলাম হেসে তা উড়িয়ে দিয়ে বলতেন: 'ওটা মোহাম্মদী অফিস নয়, মহানুদীখানা। মুদীর যা স্বভাব তাই তো করবে।' সাপ্তাহিক সওগাতের 'চানাচুর' বিভাগে নজরুল ইসলাম রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যঙ্গ রচনা লিখতেন। এতে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে প্রগতিবিরোধীদের দারুণভাবে আক্রমণ করা হতো। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতেন বলে নজরুল ইসলাম তার নাম দিয়েছিলেন 'আক্রমণ খাঁ।' তদ্রূপ 'সাপ্তাহিক হানাফী' ও নজরুল ইসলামকে আক্রমণ করে লিখতো। নজরুল ইসলাম বলতেন: ওটা 'হানাফী' নয়- হাঁপানী। হাঁপানী রোগীর কথা কেউ কানে তুলো না।' বিপক্ষ দলের অনেকের নাম নিয়েই নজরুল ইসলাম হাস্যরসিকতা করেন। সাপ্তাহিক সওগাতের চানাচুর বিভাগে নজরুল ইসলাম সমসাময়িক কবি গোলাম মোস্তফার কবিতার বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা করেছেন কয়েকবার। পরে গোলাম মোস্তফা ক্ষান্ত দিলে নজরুল ইসলামও ক্ষান্ত দিয়েছিলেন এই বলে- "কবি গোলাম মোস্তফা-দিলাম ইস্তফা।' এরপরে কবি গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আর লিখেননি। বহুক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের গুণগানই করেছেন। পরবর্তী কালে তাঁদের বন্ধুত্বের ভাব বিরাজ করছিল।[১০৮]

সাংবাদিক জীবনে সাহিত্যিক নজরুল ইসলাম কোন পত্র-পত্রিকার অফিসে বেশী দিন কাজ করেননি। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কার্যকালের পরিসর ছিল কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু 'সওগাতের' বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। সওগাতের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নজরুল ইসলাম যথারীতি পত্রিকায় লিখতেন, আবার আলাদাভাবে বই প্রকাশনার জন্য লিখতেন। নাট্য বা সাংস্কৃতিক কিংবা সভা-সমিতির জন্য গান দেওয়ায় আপত্তি ছিল না। এসবের জন্য তিনি কিছু কিছু টাকা পেতেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটে এবং ১৯৩৫ সালে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর পূর্ণকালীন সঙ্গীত রচয়িতা নিযুক্ত হন।[১০৯] নজরুল ইসলাম গানের রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর (১৯৩৩-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত) ঘনিষ্ঠভাবে সওগাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরপর গান রচনা করা, রেকর্ড করা প্রভৃতি কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ততার দরুণ তিনি আর 'সওগাতে' তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না। সুতরাং সওগাতে কাজ করার জন্য নজরুল ইসলামের সাথে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা আর কার্যকর রইল না। অবশ্য নজরুল ইসলাম একেবারে 'সওগাতের' সাথে সম্পর্কচ্যুত হলেন না, সবসময় 'সওগাতের' খোঁজখবর রাখতেন এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'সওগাতের' জন্য তাঁর গান ও মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতা লিখতেন।

---

১০৭. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৮২- ১৯৬।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৬।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬।

Dhaka University Institutional Repository

এর জন্য কবিকে তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। রোগাক্রান্ত হওয়ার চার মাস পূর্বে 'সওগাতে' নজরুল ইসলামের শেষ কবিতা 'আধুনিকী' ছাপা হয়।[১১০]

কারাজীবন (১৯২২-১৯২৩ খ্রি.)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্বক কবিতা রচনার অভিযোগে রাজরোষে পতিত হয়ে ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর গ্রেফতার হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী আলীপুর সেন্ট্রাল, হুগলী ও বহরমপুর জেলে মোট এক বৎসর তিন সপ্তাহ কারাবাসের পর ১৯২৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ধূমকেতু পত্রিকার ১২ শ সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্রি.) 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্বক একটি প্রতীকধর্মী রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ার ছয় সপ্তাহ পরে ৮ ই নভেম্বর রাজদ্রোহের অভিযোগে ধূমকেতুর সারথী কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হলে পুলিশ 'ধূমকেত' অফিসে এবং প্রেসে হানা দেয়। শুভার্থীজনের পরামর্শে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে কলকাতার পুলিশের চোখের আড়াল হয়ে নজরুল ইসলাম বিহারে সমস্তিপুর হয়ে কুমিল্লায় চলে যান। শেষপর্যন্ত প্রায় দু'মাস পর ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় কুমিল্লা থেকে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ দিনই কবিকে পুলিশ প্রহরায় চট্টগ্রাম মেলে চাপিয়ে পরের দিন ২৪ শে নভেম্বর, ১৯২২ ইং তারিখ সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে এনে হাজির করা হয় এবং ১২৪-ক ধারা অনুসারে আদালতে রাজদ্রোহিতার মামলা চলতে থাকে।[১১১]

কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে

নতুন এক পর্ব শুরু হলো নজরুল ইসলামের কারাজীবনে। ১৯২২ সালের ২৫শে নভেম্বর, শনিবার সাদার্ণ ডিভিশন পুলিশ কোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার সুইনহো (Swinhoe) এর আদালতে নজরুল ইসলামকে হাজির করা হয় এবং ২৯ শে নভেম্বর বুধবার শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। বেশ কয়েকজন আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে নজরুল ইসলামের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, তন্মধ্যে একজন তরুণ উকিল শ্রী মলিন মুখোপাধ্যায় আদালতে কবির পক্ষে মামলা চালাতে লাগলেন। একই মামলার আসামী এবং জামিনে মুক্ত নজরুল ইসলামের বন্ধু 'ধূমকেতু'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক এ মামলায় নজরুল ইসলামের বিপক্ষে সরকারের রাজসাক্ষী (Approver) হয়ে সাক্ষ্য দেন। বিচারের দিন ম্যাজিস্ট্রেট ও অসংখ্য জনতার সম্মুখে নজরুল ইসলাম তাঁর জবানবন্দী লিখিতভাবে পাঠ করলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে কবি আদালতে যে বিবৃতি দেন তা বাংলা সাহিত্যে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পরিচিত। নজরুল ইসলামের এই বিবৃতি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বলে সাহিত্যিক মহলে সর্বজন স্বীকৃত। ১৯২৩ সালের ৭ ই জানুয়ারী, রবিবার দুপুরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে তীক্ষ্ণ আবেগমন্দ্রিত ভাষায় কবি তাঁর অবিস্মরণীয় নির্ভীক বক্তব্য 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা করেছিলেন।[১১২] দীর্ঘ রচনার সারকথা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ;

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজ-কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত! একধারে রাজার মুকুট আর একধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য; হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজ-বেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান।... আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন, আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী

---

১১০. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৩০৩।

১১১. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, 'রাজবন্দী কবি', পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য, স্বরূপ। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে।"[১১৩]

আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে

১৯২৩ সালের ১৬ ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার সাদার্ণ ডিভিশন পুলিশ কোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সুইনহো মামলার রায় দেন। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা অনুযায়ী 'ধূমকেতু' রাজদ্রোহ মামলায় কাজী নজরুল ইসলাম এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কবিতা রচনার জন্য কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে এই প্রথম কারাবরণ ঘটল। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে নজরুল ইসলাম এতদিন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। কিন্তু বিচার শেষে সাজাপ্রাপ্ত কবিকে ১৭ই জানুয়ারী কবিকে বুধবার সকালে কবিকে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। আলীপুর জেলে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে নজরুল ইসলাম কয়েকমাস ছিলেন। এখানে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের খাওয়া-দাওয়া উন্নত তো ছিলই, তথাপি হাজতীদের বাড়ীর পোশাকের মত পোশাক পরিধান করতে দেওয়া হত। এভাবে নজরুল ইসলামের কারা জীবনের ক'মাস আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কাটল।[১১৪]

এসময় 'ধূমকেতু' পত্রিকার ২৭ শে জানুয়ারী, ১৯২৩ খ্রি. ৩২ শ সংখ্যাটি 'কাজী নজরুল সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়, এতে নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশ ছাড়াও কবির একটি ছবি, 'ধূমকেতুর গ্রহণ' শিরোনামে তাঁর কারাদণ্ডের খবর এবং 'কাজী নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয়। কবি নজরুল ইসলাম কারারুদ্ধ রাজনৈতিক কারণে- এ সংবাদে তখন সারাদেশ তোলপাড়। নজরুল ইসলাম কারাবরণ করে সমগ্র দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করে সেই শ্রদ্ধার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। নজরুল ইসলাম যখন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী নজরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে 'বসন্ত' নাটিকার উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন,

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু

১০ ই ফাল্গুন, ১৩২৯

'বসন্ত' নজরুল ইসলামকে আলীপুর জেলে পৌঁছে দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪ খ্রি.) কে জোড়াসাঁকোয় ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভক্তজন পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। পবিত্র বাবুকে তিনি বললেন, 'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি।'[১১৫]

এ ঘটনার স্মৃতিচারণ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "কে যেন দু'কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তাকে বলো,

---

১১২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৯৩

১১৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪০।

১১৪. হায়াৎ মামুদ, প্রতিভার খেলা নজরুল,পৃ. ৯০; মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

১১৫. রফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা, বিয়াল্লিশ বর্ষ , প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫), পৃ. ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা যোগাবার কবিও তো চাই।"[১১৬]

সেদিন জেলখানায় ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার বিস্মিত হয়েছিলেন 'টেগোর ঐ প্রিজনারকে বই ডেডিকেট করেছেন' শুনে, আর নজরুল ইসলাম গুরুদেবের উৎসর্গপত্র দেখাতেই 'বসন্ত' খানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ উৎসর্গ নজরুলের কারাজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার অনেকটা বেদনা উপশম করতে পেরেছিল। এ সম্পর্কে নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্বজ্বালা, যন্ত্রণা ক্লেশ ভুলে যাই।' নজরুল ইসলাম আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বসেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' রচনা করেন। কবিতাটি 'কল্লোলে' (মে-জুন, ১৯২৩ খ্রি.) পত্রস্থ হয়। সঙ্গে পরিচয় লিপিতে বলা হয়েছিল, 'জ্যৈষ্ঠের প্রথমে আপনাদের অভিনন্দন করি, বন্দী কবি নজরুল 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' আত্মহারা হয়ে যে সুর লহরী তুলেছেন আপনাদের সেই সুখের ভাগ নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করছি।' রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটিকার উৎসর্গ এ কবিতা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কবি ছিলেন ৮৭ দিন।[১১৭]

হুগলী জেলে আমরণ অনশন

১৯২৩ সালের ১৪ ই এপ্রিল মোতাবেক ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ, শনিবার আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে কবিকে হুগলী জেলের ৫ নম্বর সেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অথচ তাঁকে বলা হয়েছিল বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরূপে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে রাখা হবে। কিন্তু হুগলী জেলে নিয়ে এসেই জানানো হলো নজরুল ইসলাম ও তাঁর সঙ্গীগণ রাজবন্দী নন, সাধারণ কয়েদী মাত্র। হুগলী জেলে তাদের সাধারণ কয়েদীদের পোশাক অর্থাৎ জাঙ্গিয়া ও খাটো কুর্তা ইত্যাদি পরিধান করতে হলো আর লোহার থালায় সাধারণ কয়েদীদের খাবার দেওয়া হলো। হুগলী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিষ্টার আর্স্টন তখন রাজবন্দীদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেন এবং নিত্যনতুন অত্যাচার চালাতেন ; ফলে কয়েদীরাও জেল-জুলুমের প্রতিবাদে জেলের আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। এ সময়ে হুগলী জেলের অবস্থার বিস্তারিত চিত্র নজরুল ইসলামের সহবন্দী খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১ খ্রি.) এর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' শীর্ষক বইয়ের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, হুগলী জেলে রাজবন্দীরা সুপার ও তার সহযোগী অফিসারদের সাধারণ কয়েদীদের মতো 'সরকার-সালাম' জানাতে অস্বীকার করে, সুতরাং শাস্তিস্বরূপ তাদের দু'এক জনকে পায়ে 'ডান্ডা-বেড়ী' আর ভাতের বদলে দেওয়া হয় মাড়ভাত (penal diet)। তাতে ডাল, তরকারী, লবণ, কিছু না দিয়ে কতগুলো চালের গুঁড়া পাতলা করে রেঁধে তাদের সামনে হাজির করা হয়। সরকার সালামের বদলে রাজবন্দীরা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারই গেহে, পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে' এই বিখ্যাত গানের একটি প্যারডি ধরেন 'তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।' তৎক্ষণাৎ সুপার ক্রুদ্ধ হয়ে কবির সামনে গিয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে বললেন: 'ইউ ড্যাম, ফুল,-সোয়াইন', বীর সেনানীর মত দাঁড়িয়ে কবিও ঐ কথাগুলোই আবার তাকে ফিরিয়ে বললেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীদের নির্জন সেলে আটক করে রাখা হয়। রাজবন্দীদের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের এসব অন্যায়-অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৯২৩ সালের ১৪ ই এপ্রিল থেকে হুগলী জেলে নজরুল ইসলামের অধিনায়কত্বে সকল রাজবন্দীর অনশন ধর্মঘট শুরু হয়।[১১৮]

---

১১৬ হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ১০৭-১০৮।

১১৭. রফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

১১৮. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮), পৃ. ৩৪-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামের আমরণ অনশনের সংবাদ জেলের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা দেখা দেয়; জেলের অভ্যন্তরে সহবন্দীদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে নজরুল ইসলাম দিনের পর দিন অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় অনশনরত অবস্থায় কবির উপর নিপীড়ন বাড়তে থাকে। ডান্ডাবেড়ী, হ্যান্ডক্যাপ, সেলকয়েদ, ফোর্স, ফিডিং-এর প্রয়াস সব ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা চলতে থাকে; ফলে নজরুল ইসলাম ক্রমশঃ অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন। হুগলী জেলে অনশনরত নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহবন্দীদের দুরাবস্থা সম্পর্কে সমকালীন 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত সংবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। প্রখ্যাত নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তাঁর 'অজানা নজরুল' গ্রন্থের 'রাজবন্দী কবি' শীর্ষক আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৮ এপ্রিল, ১৯২৩ ইং সংখ্যায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়, "২১ জন বন্দীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ভগবান না করুন যে কোন সময়ে তাঁহাদের জীবননাশ হইতে পারে। কাজী নজরুল, মৌলবী সিরাজুদ্দীন এবং গোপাল বাবু যথাক্রমে ১৪,১২ এবং ১৩ দিন যাবৎ সম্পূর্ণ অনাহারে আছেন। কাজী নজরুলের রাত্রিতে ভয়ানক জ্বর হয় এবং মাথায় রক্ত উঠিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। জ্বরের সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন।"[১১৯]

হুগলী জেলে আমৃত্যু অনশনরত নজরুল ইসলামের স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবস্থা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৫ ই মে, ১৯২৩ ইং সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখা হয়, "কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলবী সিরাজুদ্দীন এবং বাবু গোপাল চন্দ্র সেন প্রায় একমাস পূর্বে হুগলী জেলের মধ্যে প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তাঁহারা সেই অবস্থায় আছেন।...কাজী নজরুল ইসলাম কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। ৫ ই মে পর্যন্ত তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হয় নাই। ২৪ শে এপ্রিল হইতে অনাহারে থাকিয়া তাঁহার জ্বর হইতে আরম্ভ করে। এই জ্বর অবস্থায় এতদিন অনাহারে থাকিয়া তাহাঁর শরীরের ওজন প্রায় ১৩ সের কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাঁহার অবস্থা এতদূর খারাপ যে, যে কোন মুহর্তে কোনরূপ দুঃসংবাদ আসিতে পারে।" [১২০]

সমসাময়িক 'অমৃতবাজার পত্রিকা, 'সাপ্তাহিক ছোলতান' প্রভৃতি বাংলা, ইংরেজী সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজবন্দী কবি নজরুল ইসলামের অনশনের সংবাদ পরিবেশিত হলেও এ ব্যাপারে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বিজলী'র ভূমিকা ছিল অধিকতর সহানুভূতিশীল। 'হুগলী জেলের বর্বরতা' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৩ শে মে, ১৯২৩ ইং সংখ্যায় অনশনের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সম্পাদকীয় নিবন্ধে কবির মর্মান্তিক অবস্থার বিবরণে লেখা হয়, "আজ ৪০ দিন হইল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।...অনশনের পঞ্চম দিনে নাকের ভিতর দিয়া জোর করিয়া খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। তারপর হইতে কাজী নজরুল প্রায় অনশনেই আছেন; মাঝে দুঃসংবাদ আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিতে পারে।"[১২১]

নজরুল ইসলামের আমরণ অনশনের খবরে কলকাতা থেকে কবির সাহিত্যিক বন্ধুদের কেউ কেউ হুগলী জেলে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে চেষ্টা করে সাক্ষাত লাভে বিফল হন। এমতাবস্থায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলং থেকে নজরুল ইসলামের অনশনের সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায় কাজী নজরুল ইসলামকে টেলিগ্রাম পাঠালেন :[১২২]"Give up hunger strike, Our literature claims you." (অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য দাবী করছে তোমাকে) এই টেলিগ্রামটি জেল কর্তৃপক্ষ হুগলী জেলে কবি নজরুল ইসলামের কাছে পাঠানো প্রয়োজন

---

১১৯. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ২৯৮।

১২০. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ২৯৯-৩০০।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , 'নজরুল জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদককে লেখা পত্র', নজরুল পরিক্রমা, পৃ. ৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বোধ করেনি। বরং সেটি সরাসরি প্রেরকের কাছে ফেরৎ পাঠানো হয়। তাতে লেখা ছিল:"Addressee not found"(প্রাপককে পাওয়া গেল না)। এই Memo কবিগুরুর কাছে ফেরৎ গেলো। এ প্রসঙ্গে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রেরিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে, "ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। অতএব, নজরুলের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।" [১২৩]

সমসাময়িক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রি.)ও নজরুল ইসলামের আমরণ অনশনে বিচলিত হয়ে বাজে শিবপুর, হাওড়া থেকে ১৯২৩ সালের ১৭ ই মে হুগলী জেলখানায় গিয়ে কবিকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানানোর জন্য তাঁর সাথে দেখা করতে চেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারেননি। এ সময় কোন এক চিঠিতে কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে লীলা রাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেন যে, 'একজন সত্যিকার কবি, রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এমন কেহ আর এত বড় কবি নাই'। কলকাতায় গোলদীঘি ময়দানে ভারত বিখ্যাত জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫ খ্রি.)এর সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইসলামের অনশনের জন্য আহুত এক বিরাট জনসভায় কবির প্রতি সরকারী আচরণের নিন্দাসহ বৃটিশ সরকারকে ধিক্কার জানানো হয়। এ সময় চুরুলিয়া থেকে নজরুল ইসলামের মাকে সঙ্গে করে বড় ভাই কাজী সাহেবজান হুগলী জেলগেটে আসেন, কিন্তু মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। শেষ পর্যন্ত চল্লিশতম দিবসে কুমিল্লা থেকে আগত কবির মাতৃসমা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস পান করে কবি নজরুল ইসলাম অনশন ভাঙ্গতে রাজি হন। কাজী নজরুল ইসলাম হুগলী জেলে ছিলেন ৬৫ দিন।[১২৪]

বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে

১৯২৩ সালের ১৮ ই জুন সোমবার হুগলী জেল থেকে কবিকে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বদলী করা হলো। এবার রাজবন্দীর পূর্ণ মর্যাদাসহ জেল কর্তৃপক্ষ নজরুল ইসলামের সব দাবী মেনে নিলেন। বহরমপুর জেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বসন্ত ভৌমিক বইপত্রের সাথে কিছুদিনের জন্য কবিকে একটা হারমোনিয়াম সরবরাহ করেছিলেন। অতঃপর নজরুল ইসলাম এখানে বিখ্যাত সব রাজবন্দীদের সাথে ছ' মাস বেশ আনন্দেই কাটিয়েছিলেন। কবি বহরমপুরে থাকাকালীন ১৯২৩ সালের ২৯ শে জুন, শুক্রবার 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'দোলন-চাঁপা'র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। জেলে বসেই সহবন্দী মাদারীপুর শান্তি সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্নচন্দ্র দাসের অনুরোধে তাঁর চারণ দলের জন্য নজরুল ইসলাম 'জাত জালিয়াত' শিরোনামে যে গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন তা এখন 'জাতের নামে বজ্জাতি' নামে পরিচিত। জেলে থেকেই নজরুল ইসলামের 'দোলন-চাঁপা' (১০ নভেম্বর, ১৯২৩ খ্রি.) ও 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১০ নভেম্বর, ১৯২৩ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। বহরমপুর গ্রান্ট হলে কবি শরদিন্দু রায়ের স্মৃতিসভায় নজরুল ইসলাম স্বরচিত 'ইন্দুপ্রয়াণ' কবিতা পাঠ করেন। তার মানে এ নয় যে, কবিতা লিখে আর গান গেয়ে নজরুল ইসলামের বহরমপুর কারাজীবন কেটেছিল বরং 'প্রিজন এ্যাক্ট' (Prision Act) ভাঙ্গার অপরাধে বহরমপুর জেলে থাকাকালেই নজরুল ইসলাম আরেকটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন।[১২৫]

জেল আইনের ৪২ ধারায় অভিযুক্ত করে বহরমপুরের মহকুমা হাকিম এন. কে. সেনের এজলাসে কবি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আরেক দফা মামলা দায়ের করা হয়। ১৯২৩ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর, সোমবার দুপুর বেলা কবিকে যখন বহরমপুর সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির

---

১২৩. রফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৩০৯; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ৩৫।

১২৪. হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ১১৫।

১২৫. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৩১১-৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় তখন বিচার পালা শুরু হওয়ার আগে থেকেই এ দেশবরেণ্য বিদ্রোহী কবিকে দেখতে আদালত প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। বাবু ব্রজভূষণ গুপ্তের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কয়েকজন সহৃদয় উকিল বিনা পারিশ্রমিকে কবির পক্ষে মামলা পরিচালনায় এগিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের অনুরোধে ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ ইং শুক্রবার পর্যন্ত জেল আইন ভাঙ্গার এই মোকদ্দমায় মুলতবী ঘোষণা করেন। পরে ৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রি./ ২৪শে মাঘ, ১৩৩০ বাং, বৃহস্পতিবার বহরমপুর এস. ডি. ও. কোর্টের রায়ে মামলা থেকে বাদীপক্ষের জবানবন্দীতেই নজরুল ইসলাম নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেকসুর খালাস পান বলে 'সাপ্তাহিক ছোলতান' পত্রিকায় ৩ রা ফাল্গুন, ১৩৩০ সালে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে 'ধূমকেতু' সম্পাদনা সংক্রান্ত রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল ইসলামের যে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল, তদানিন্তন 'প্রিজন এ্যাক্ট' অনুযায়ী দশমাসে নজরুলের ত্রিশদিন সাজা মওকুফ হয়ে গিয়েছিল, সাজা পাওয়া ও মুক্তি পাওয়ার মাসে কোন অব্যাহতি ছিল না। ঐ হিসেবে ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ ইং তারিখেই কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তি পেলেন। তাহলে বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে কবির কারাবাস হয়েছিল ১৮১ দিন। অন্যদিকে নজরুল ইসলাম ২৩ শে নভেম্বর, ১৯২২ সালে কুমিল্লায় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং সর্বমোট এক বৎসর তিন সপ্তাহ বিভিন্ন জেলে কারাবাসের পর ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালে বহরমপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় 'কাজী নজরুল ইসলামের মুক্তি' শিরোনামে এ খবরটি ছাপা হয় যে, "গত ১৫ ই ডিসেম্বর বহরমপুর জেল হইতে কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তি লাভ করেছেন।" তখন বহরমপুরের স্থানীয় লোকজন কবিকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নজরুল ইসলাম বহরমপুরে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বহরমপুর সায়েন্স কলেজ হোষ্টেলে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময়ে বহরমপুরে নজরুল ইসলামের সঙ্গে শিল্পী জগৎ ঘটকের সাক্ষাৎ ঘটে। পরবর্তীকালে উভয়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সহযোগিতা করেছিলেন।[১২৬]

কারামুক্তির পর মেদিনীপুরে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

কারাজীবন থেকে মুক্তি লাভের পর মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান ছিল কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯২৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে চারদিনব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ অধিবেশনের দ্বিতীয়দিন প্রাতঃকালে কবি রজনীকান্তের জীবন-চরিতকার নলিনীরঞ্জন পন্ডিতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর অনুরোধে নজরুল ইসলাম স্বরচিত কয়েকটি কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করে সভাস্থ সকলকে বিমুগ্ধ করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ ইং রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন জানান হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪ খ্রি.)। এরপর নজরুল ইসলাম তাঁর স্বভাবসুলভ সরল মধুর উক্তি সহকারে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন এবং শ্রোতামন্ডলীর অনুরোধে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও 'বিদ্রোহী' কবিতা পরিবেশন করেন। এর পরের দিন ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ ইং সোমবার বিকেলে মেদিনীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে নজরুল ইসলামের ভক্ত মহিলারা পৃথকভাবে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এ সভাকে কেন্দ্র করে একটি বেদনা বিধুর ঘটনার অবতারণা হয়।[১২৭] এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের বাসিন্দা আজহারউদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন;

"তৃতীয় দিন ১৩ ই ফাল্গুন, ১৩৩০, মেদিনীপুর কলেজে বিকেল ৪ টায় মহিলারা পৃথকভাবে কবির সম্বর্ধনার্থে একটি সভার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সভায় কবি স্বরচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর গান ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় টাউন স্কুলের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ দাসের কন্যা কমলা নিজের

---

১২৬. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ১১৫-১১৬।

১২৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য , পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

গলার হার খুলে কবিকে উপহার দেন। তখনকার সমাজ এই সামান্য জিনিসটাকে সুস্থচিত্তে ও খোলাচোখে গ্রহণ করতে পারেনি; তাঁর পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন ধিক্কারের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি নাইট্রিক এসিড পান করে আত্মহত্যা করেন। সন্ধ্যায় বাংলা স্কুলে (অধুনা নাম বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ) এক জনসভায় মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কবিকে অভিনন্দন পত্র দেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি শুধু কতকগুলি গান গেয়েছিলেন। চতুর্থ দিন (১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩০), বিকেল পাঁচটায় ঈদগাহ প্রাঙ্গণে একটি সম্বর্ধনা সভা হয়। মৌলবীরা কুরআন শরীফ থেকে আয়াত উদ্ধৃত করে কবিকে আশীর্বাদ জানান এবং তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।... বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ভদ্র মহোদয়েরা নজরুলকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এরকম হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা অন্য কোন কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।"[১২৮]

নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৯৪ খ্রি.) সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী' (৪র্থ বর্ষ, ১৬ শ সংখ্যা, পৃ. ৩৫৪; ১৭ ফাল্গুন, ১৩৩০/২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ ইং শুক্রবার) পত্রিকার 'খড়কুটো' কলামে মেদিনীপুরে নজরুল সম্বর্ধনা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়; "গত সোমবার মেদিনীপুরের জনসাধারণ কবি নজরুল ইসলামকে বিশেষরূপে সম্বর্ধিত করেছে। মঙ্গলবার সেখানকার মহিলা সভা কবিকে সম্বর্ধনা করেছিলেন। আজ বুধবার স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতারা কবি নজরুলকে অভিনন্দন প্রদান করেছেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণ কবিকে সম্বর্ধনায় নগদ টাকা ও মহিলারা কেহ কেহ গায়ের অলঙ্কার খুলে দিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা করেছিলেন। কবির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সে সমস্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। মেদিনীপুরবাসী যে কবি নজরুলের কবি প্রতিভা, তাঁর দেশ হিতৈষণা, তাঁর জীবন উৎসর্গ করা ত্যাগের মহিমার যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন, এজন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"[১২৯]

বিজলীর প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেদিনীপুরে এই প্রথমবার সফরকালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। এই আন্তরিক সম্বর্ধনার কথা স্মরণ করে পাঁচ মাসের মধ্যে কবি মুগ্ধ হয়ে মেদিনীপুরবাসীদের উদ্দেশ্যে ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত তাঁর নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙার গান' উৎসর্গ করেছিলেন।

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনটাই ট্রাজেডিতে পরিপূর্ণ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৩ রা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৭ ই জুন, ১৯২১ ইং, ১০ ই শাওয়াল, ১৩৩৯ হিজরী, নজরুল ইসলামের বিবাহের জন্য ধার্য এই দিনটিতে কবির জীবনে এক বেদনা বিধুর ও দুঃখজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। নজরুল ইসলামের জীবন ট্রাজেডির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার দৌলতপুর গ্রামের সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানম (পরবর্তী নাম কবি-প্রদত্ত, এ নামেই উক্ত মহিলা তার জীবদ্দশায় পরিচিত ছিলেন) এর সাথে তাঁর প্রেম-প্রণয়, বিবাহ নামক প্রহসন বিরহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষাদময় করুণ উপাখ্যান।

নজরুল-নার্গিস বিবাহ প্রসঙ্গ

১৩২৭ সালের চৈত্র মাসে আলী আকবর খান (১৮৮৯-১৯৭৭ খ্রি.) নজরুল ইসলামকে কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামে নিজের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যান। দৌলতপুর যাবার পথে আলী আকবর খান কুমিল্লায় তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের সাথে দেখা করতে যান। এ সময় আলী আকবর খান সেন পরিবারের সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে গিরিবালা সেন গুপ্তার একমাত্র কন্যা প্রমীলা ওরফে দুলীর সাথেও নজরুল ইসলামের সাক্ষাত ঘটে।

---

১২৮. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ১২০।

১২৯. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৩১৯-৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লার দৌলতপুরে আলী আকবর খানের বাড়ীতে কবি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। নজরুল ইসলামও তাঁর স্বাভাবিক হাসিখুশী দ্বারা সেখানে একটি আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আলী আকবর খান তাঁর বিধবা ভগ্নীর একমাত্র মেয়ে নার্গিস খানমের সাথে নজরুল ইসলামের আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ করে দেন। ক্রমে তাঁদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং কিছুকাল পরে স্বয়ং আলী আকবর খান নার্গিসের সাথে নজরুল ইসলামের বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৩ রা আষাঢ় বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করা হয়।

বিয়ের দিন আলী আকবর খান এবং তার কয়েকজন আত্মীয়ের এমন কি নার্গিস খানমের কয়েকটি অশোভন উক্তি ও আচরণে নজরুল ইসলাম নিজকে অপমানিতবোধ করেন। তিনি এ বিয়েকে একটি প্রহসন মনে করে তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করেন; কিন্তু বিয়ের আসর সজ্জিত ছিল এবং নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন কাজেই বাধ্য হয়ে নজরুল ইসলামকে আক্‌দ সম্পন্ন করতে হয়।এরপর কালবিলম্ব না করে সে রাত্রিতে নজরুল ইসলাম আলী আকবর খানের বাড়ী ছেড়ে নৌকাযোগে কুমিল্লার দিকে রওনা হন এবং কান্দিরপাড়ে সেন পরিবারের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। বিয়ের রাতে বাসর যাপনের ভাগ্য নজরুল ইসলামের হয়নি, কাজেই বিয়েটা যথারীতি সুসম্পন্ন হয়েছে বলা চলে না। এরপর নার্গিসের সাথে নজরুল ইসলামের আর সাক্ষাৎ হয়নি। কাজী নজরুল ইসলামের বিয়ের ব্যাপারে যারা অনুসন্ধান করেছেন, তাদের মতে আলী আকবর খানের ইঙ্গিতে নার্গিস আসার খানম ভালবাসার অভিনয় করেছিলেন। আলী আকবর খান ঢাকায় তাঁর পুস্তক প্রকাশনা কাজের সুবিধার জন্য নার্গিসের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে নজরুল ইসলামকে তার আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।[১৩০]

ঘটনা চক্রের কুটিলতার আবর্তে দুর্ভাগ্যবশতঃ নজরুল ইসলামের বিবাহ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি ঠিকই; কিন্তু গোটা ব্যাপারটা নজরুল ইসলামের জীবনে এক করুণ অধ্যায়ে পর্যবসিত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। নজরুল-নার্গিস বিয়ে প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ অনুসন্ধান করে তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যে সৈয়দা খাতুন ওর্ফে নার্গিস বেগমের বিয়ে (আক্‌দ) হয়নি এই সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসা হতে যে ক'জন নিমন্ত্রিত দৌলতপুরে গিয়েছিলেন তাদের ভিতরে সন্তোষ কুমার সেন নামক পনের ষোল বছর বয়স্ক এক কিশোর ছিল। ... অবশেষে সন্তোষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার দেওয়া তথ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আলী আকবর খানও বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মুসাবিদা করা কাবিননামায় একটি শর্ত এই ছিল যে, কাজী নজরুল ইসলাম দৌলতপুর গ্রামে এসে নার্গিস বেগমের সঙ্গে বাস করতে পারবে, কিন্তু নার্গিস বেগমকে অন্য কোথাও সে নিয়ে যেতে পারবে না। এই শর্ত নজরুল ইসলামের পৌরুষে বেধেছিল। তাই সে বিয়ে না করেই বিয়ের মজলিস্ হতে উঠে রাত্রেই পায়ে হেঁটে সে কুমিল্লা চলে যায়।"[১৩১]

কাবিননামায় ঘরজামাই করার শর্ত থাকলে নজরুল ইসলামের আত্মসম্মানহানি ঘটা ও বিবাহের আসর থেকে প্রস্থান করাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য কোন কোন লেখক ও নজরুল গবেষক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নজরুল ইসলাম ও নার্গিস খানমের বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এ যে, নজরুল ইসলাম বিয়ের রাতেই দৌলতপুর ছেড়ে পায়ে হেঁটে কুমিল্লা চলে গিয়েছিলেন এবং আর কোনদিন নার্গিস খানমকে গ্রহণ করেন নি। তবে নজরুল ইসলাম ও নার্গিসের আক্‌দ হয়ে থাকলে তাঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়েছিল কিনা স্বভাবতঃই সে প্রশ্ন উঠে। এ প্রসঙ্গে কবি-সম্পাদক

---

১৩০. মুহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ২৫৪।

১৩১. মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি.) 'নজরুল রচনা সম্ভারে' লিখেছেন, "নজরুল তখন ৩/৪ সি, তালতলা লেনে মিঃ আহমদের সঙ্গে বাস করেছেন, সেই সময় এই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।" [১৩২]

অবশ্য মুজফ্‌ফর আহমদ এটি সমর্থন করেননি। তিনি 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, "নজরুলের কোন বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়িতে হয়নি।... শ্রী সন্তোষকুমার সেনের সঙ্গে আমার দেখা ও কথা হওয়ার পরে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আষাঢ় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের আক্‌দ বা বিবাহ হয়নি।"[১৩৩]

যাহোক, নজরুল ইসলাম ও নার্গিস খানমের আনুষ্ঠানিক বিয়ে (আক্‌দ) বা বিবাহ-বিচ্ছেদ (তালাক) হয়েছিল কি না তা সংশয়াচ্ছন্ন, তবে আসল কথা হল নজরুল ইসলাম বিয়ের রাতেই দৌলতপুর তথা নার্গিস খানমকে ছেড়েছিলেন আর কোন দিন তাদের দেখা হয়নি। কিন্তু নার্গিস খানমকে ত্যাগ করে আসার পনের বছর পর নজরুল ইসলাম নার্গিস খানমের একটি চিঠি পান এবং কলকাতা ১০৬ আপার চিতপুর রোডের গ্রামোফোন রিহার্সেল-রুমে বসে ১/৭/১৯৩৭ ইং তারিখে 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধনে নার্গিস খানমের চিঠির উত্তর দেন। এ পত্রখানাই নার্গিস খানমকে লেখা নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম ও শেষ পত্র। যার নিম্ন উদ্ধৃত অংশ বিশেষ নার্গিস খানমের প্রতি নজরুল ইসলামের গভীর ভালবাসা ও অসীম বেদনার অকপট স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, "আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমি নিজেই পুড়েছি তা নিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি 'অগ্নিবীণা' বাজাতে পারতাম না। আমি 'ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, সে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম যে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে।"[১৩৪]

নার্গিস খানমের সাথে বন্ধনচ্যুত হওয়ায় নজরুল ইসলামের মনে যে ব্যথার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার দরুণই তিনি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন। নজরুল ইসলাম ও নার্গিস খানমের প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল নার্গিসের পত্রের উত্তরে তাকে লেখা নজরুল ইসলামের প্রথম ও শেষ চিঠি থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। নজরুল ইসলাম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন যে, নার্গিসকে কোন বিষয়ে বারণ বা আদেশ করার কোন অধিকার তার নেই। যারা নার্গিসকে কবির প্রথম স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেন তারা নজরুল ইসলামের ঐ পত্র থেকে সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারেন। সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় উদঘাটিত প্রকৃত তথ্য হল এই যে, নজরুল ইসলাম নার্গিস আসার খানমকে ভালবেসে ও স্ত্রীরূপে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েও তা করতে পারেননি। আর সে জন্য দায়ী নার্গিস আসার খানমের মামা আলী আকবর খানের অসংযত ও অসংগত কার্যাবলী।[১৩৫] তথাপি নার্গিস আসার খানম কবি নজরুল ইসলামের চিরজনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী, জন্ম জন্মান্তরের মানসপ্রিয়া। নার্গিস নজরুল ইসলামের গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া পরশমাণিক। কবির জীবন সমুদ্রের নিঃসঙ্গ সৈকতে স্মরণ পারের অশ্রুমতি প্রিয়া। একটি ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নজরুল-নার্গিসের আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলেও নজরুল

---

১৩২. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল জীবনের এক অধ্যায়, নজরুল রচনা সম্ভার, (কলকাতাঃ ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, ১৩৭২/১৯৬৫), পৃ. ১৩৬।

১৩৩. মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম :স্মৃতিকথা, পৃ. ১২৮।

১৩৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৬২; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ২০৯।

১৩৫. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের জীবন ও কাব্যে নার্গিস আসার খানম ছিলেন এক জ্বলন্ত প্রেরণার উৎস।বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ (জন্ম-১৩৪২ বাং/ ১৯৩৬ ইং) এর ভাষায়: " প্রিয়াকে তিনি পেয়ে হারালেন আর সেই হারানো হিয়ার নিকুঞ্জে পাঠালেন অজস্র বিরহ দীপ্ত-সঙ্গীত। ... নার্গিসকে হারিয়ে সে আঘাতে বেজে ওঠে তার 'অগ্নিবীণা' আর 'বিষের বাঁশী' সুরের প্রজ্বলিত বহ্নি আকাশের বুককে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।"[১৩৬]

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক, মুসলিম বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দিশারী প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮ খ্রি.) বলেছেন, "নার্গিস আসার বেগমের প্রেম এবং বিরহ নজরুলকে শুধু 'অগ্নিবীণা' বাজাতেই সাহায্য করে নাই, নজরুলের সমগ্র জীবনে এবং সৃষ্টিতে নার্গিসের প্রভাব অনস্বীকার্য। কবির জীবন, কাব্য সঙ্গীতে যে হাহাকার, পেয়ে হারানোর বুক ফাটা কান্না ধ্বনিত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইঁহার উৎস যে নার্গিস, তাহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহাদের দাম্পত্য জীবন স্থায়িত্ব লাভ করিলে নজরুলের জীবনে দুঃসহ দুর্ভোগ আসিত না, অন্যভাবে তাহার জীবন লিখিত হইত।"[১৩৭]

নজরুল-প্রমীলার বিবাহ

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম আশালতা সেনগুপ্তা (১৯০৮-১৯৬২ খ্রি.) কে বিবাহ করেন, যিনি প্রমীলা নজরুল ইসলাম নামে পরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৩২৮ সালের ৪ঠা আষাঢ়, দৌলতপুরে নার্গিস আসার খানমকে চিরতরে পরিত্যাগ করে যাওয়ার পরের বছর নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে পুনরায় কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় আগমন করেন। এখানে অবস্থানকালে ইন্দ্রকুমার তনয় বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুল ইসলামের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেন পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে এ সময় গিরিবালা দেবীর মেয়ে ত্রয়োদশী কিশোরী আশালতা সেনগুপ্তার সাথে নজরুল ইসলামের প্রণয়ের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে তা গভীরতা লাভ করে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ; মে, ১৯০৮ ইং সালে প্রমীলার জন্ম হয়। বাল্য নাম আশালতা সেনগুপ্তা, ডাকনাম ছিল দোলনা দেবী। গুরুজনেরা আদর করে ডাকতেন 'দুলী'। কৈশোরে তার গাত্র বর্ণ ছিল চাঁপা কলির মতো। প্রমীলার পিতা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যে নায়েবের পদে চাকুরী করতেন। প্রমীলার পিতার অকাল মৃত্যুর পর মাতা গিরিবালা দেবী শিশুকন্যা প্রমীলাকে নিয়ে কুমিল্লায় বসন্তকুমার সেনগুপ্তের ভ্রাতা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন।[১৩৮]

১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে নজরুল ইসলাম চতুর্থবার কুমিল্লায় এসে কান্দিরপাড়ে বসে প্রমীলাকে উপলক্ষ করে 'বিজয়িনী' কবিতাটি রচনা করেন। কবির ভাষায়:

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে!
ওগো জীবন-দেবী !
আমায় দেখে কখন তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,

---

১৩৬. শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী, (ঢাকা: ১৯৮৭), পৃ. ১৪।

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৩৮. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, পৃ. ৭৩-৭৪; আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

যত তণ আমার আজ তোমায় মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।[১৩৯]

'বিজয়িনী' কবিতাটি প্রমীলার কাছে নজরুল ইসলামের প্রেম নিবেদনের একটি অপূর্ব নিদর্শন। পরবর্তীতে নজরুল ইসলাম 'দোলন' নামটি স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন 'দোলন-চাঁপা'।[১৪০] দোলনের সাথে নজরুল ইসলামের হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। নজরুল ইসলাম দৌলতপুরের নার্গিস আসার খানমের বিরহ-বেদনা ভুলতে পেরেছিলেন কান্দিরপাড়ের প্রমীলারূপী দোলনের সুরভিতে। কুমিল্লায় নজরুল ইসলাম হারিয়েছিলেন তাঁর প্রথম প্রিয়াকে আবার কুমিল্লাতেই তিনি একান্তভাবে খুঁজে পেলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনীকে। গিরিবালা সেনগুপ্তার কন্যা প্রমীলার সাথে নজরুল ইসলামের প্রণয়ের কথা ক্রমে জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু অসহযোগ খিলাফতের সেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের দিনেও কুমিল্লার রক্ষণশীল হিন্দু মহলে এ ব্যাপারে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়, এমনকি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতাবশতঃ গুন্ডা লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য কুমিল্লায় অসাম্প্রদায়িক উদারপন্থীদের সতর্কতায় শেষ পর্যন্ত নজরুল ইসলামকে তেমন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। পরিশেষে নজরুল ইসলামের সাথে প্রমীলার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু বিনা বাধায় এ পরিণয় সুসম্পন্ন হতে পারেনি। প্রথম বাঁধা এসেছিল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবার থেকেই। মাতৃসমা বিরজা সুন্দরী দেবী এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তও এ বিয়েতে সম্মতি দিতে পারেন নি। শেষপর্যন্ত গিরিবালা দেবীর সম্মতি ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নজরুল-প্রমীলার বিবাহ স্থির হয়েছিল। এই বিবাহের জন্যই ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত তথা বিরজাসুন্দরী দেবীর পরিবার ছেড়ে গিরিবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় ব্রাহ্মণ সমাজও নজরুল-প্রমীলার বিবাহে ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু গিরিবালা দেবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সকল বাধা উপেক্ষা করেছিলেন । বিভিন্ন মহলের বিরোধিতার কারণে কোন জাঁকজমক ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রিয়াকে বরণ করার সৌভাগ্য কবির হয়নি। নজরুল ইসলামের বিবাহ অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন হুগলীর তদানীন্তন সরকারী উকিল খান বাহাদুর মাযহারুল আনওয়ার চৌধুরীর কন্যা 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের লেখিকা মিসেস এম. রহমান (১৮৮৪-১৯২৬ খ্রি.), তিনি নজরুল ইসলামকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। আর কবিও তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে আয়োজিত বিবাহ অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলামের কতিপয় মুসলমান বন্ধু উপস্থিত থাকলেও সঙ্গত কারণেই হিন্দু বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। নজরুল ইসলামের বিবাহের জন্য কলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের একটি বাসা ভাড়া করা হয় এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রিল; ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১২ ই বৈশাখ, শুক্রবার বাদ জুম্'আ ঐ বাড়ীতে নজরুল-প্রমীলা শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে কাজী ছিলেন সাহিত্যিক মঈনুদ্দীন হোসেন, উকিল ছিলেন কুমিল্লার আবদুস সালাম। সাক্ষী ছিলেন সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪ খ্রি.) এবং কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১ খ্রি.)। নজরুল ইসলামের বয়স তখন তেইশ আর প্রমীলার ষোল। পাত্রীর বয়স তখন আঠারো পূর্ণ না হওয়ায় 'সিভিল ম্যারেজ' সম্ভবপর ছিল না। তাই 'আহলে কিতাব' মতানুযায়ী বিবাহ পড়ান হয়, যাতে বর-কনে স্ব স্ব ধর্মমত বজায় রাখতে পারেন। কাবিননামায় দেনমোহর লেখা হয় এক হাজার টাকা।[১৪১]

কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহ প্রসঙ্গে 'যুগশ্রেষ্ঠ নজরুল' গ্রন্থে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, "বিয়ের আগে কথা উঠেছিলঃ কোন মতে বিয়ে হবে? হিন্দু মতে হতে

---

১৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিজয়িনী', 'ছায়ানট', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

১৪০. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

১৪১. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ১০৩; শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী, পৃ. ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। এক হতে পারে সিভিল ম্যারেজ। আর হতে পারে মুসলমানী মতে। সিভিল-ম্যারেজ আইন অনুযায়ী বর-কনে উভয়কে এক স্বীকৃতি এই বলে দিতে হয় যে, 'আমি কোন ধর্ম মানি না।' কবি এতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ 'আমি মুসলমান- মুসলমানী রক্ত আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত, এ আমি অস্বীকার করতে পারবো না।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কোনো কোটিপতি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নাকি তাঁকে লক্ষ টাকার বিনিময়ে আর্য ধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কবি তাতে রাজি হন নাই। যাক। অনেক আলাপ-আলোচনায় স্থির হয়েছিল, মুসলমানী মতেই বিয়ে হবে। আমরা বললামঃ 'কনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হোক।' কবি এতে রাজী হলেন না। বললেনঃ 'কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নাই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে পরেও করতে পারবেন।'

ইতিহাসের বহু নজীর তিনি উপস্থিত করলেন। কবির মত মেনে নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হলোঃ আহলে কিতাবদিগের সঙ্গে স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে হওয়া মুসলমানী আইন মতে অসিদ্ধ নয়। এখন কথা এই যে, হিন্দুগণ 'আহলে কিতাব' কিনা। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন। এই সকল পয়গম্বর যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষেও পয়গম্বরের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। অতএব, এ বিয়ে হওয়া সম্ভবতঃ আইনমতে অন্যায় হবে না।"[১৪২]

নজরুল-প্রমীলার বিবাহের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এর প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরাও এই বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে। তবে সংবাদপত্র মারফত এসব বিরোধিতার জবাব দিয়েছিলেন গিরিবালা দেবী। এ প্রসঙ্গে 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, "প্রমীলা ও নজরুলের বিয়ে নিয়ে বিরোধিতা কম হয়নি। আমার মনে হয় ব্রাহ্মরা বিরোধিতা করেছিলেন সবচেয়ে বেশী। 'প্রবাসী' গোষ্ঠির ব্রাহ্মরাই ছিলেন এই ব্যাপারে অগ্রণী। তারাই বের করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'। 'প্রবাসী'তে কবিতা ছাপালে নজরুলকে টাকা দেওয়া হতো। সেই 'প্রবাসী' তে তাঁর কবিতা ছাপানো একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মরা পরম হিন্দু হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা ছাড়া অন্য হিন্দুরাও কিছু কিছু বিরোধিতা করেছিলেন।"[১৪৩]

অনেক সংবাদপত্র আবার এ বিয়ে সমর্থন করে অভিনন্দন জানায়। এ বিবাহে মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া ৪ ঠা আষাঢ়, ১৩৩১ সালের 'মোসলেম জগত' পত্রিকায় সৈয়দ তাজাম্মুল আলী ও খান বাহাদুর একিনউদ্দীন আহমদের পত্র থেকে জানা যায়। খান বাহাদুর লিখেছিলেন;

"কবিবর নজরুল ইসলাম সাহেবের শুভ পরিণয় সংবাদে যারপর নাই আহলাদিত হইলাম। খোদা তা'লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই পরিণয় শুভ হউক।....কবি নজরুল ইসলাম মুসলমান থাকিয়া হিন্দু কন্যাকে বিবাহ করিলেও আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, শিক্ষিত হিন্দু কন্যা পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফে আস্থাবতী এবং একত্বে স্বীকারকারিনী বটে। সুতরাং মুসলমান ধর্মের সারমর্ম তিনি দৃঢ় রূপে স্বীয় জীবনের মূলমন্ত্র করিতেছেন। তজ্জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি। ভরসা করি নজরুল ইসলাম ও তাঁহার সহধর্মিনী বঙ্গদেশের চিন্তার ধারা নতুন দিকে প্রবাহিত করবেন। বিবাহের দায়িত্বপূর্ণ জীবন ধীরগম্ভীরভাবে স্বদেশে ও সমাজের সেবায় উৎসর্গ করুন। তাহাদের

---

১৪২. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ৪৯-৫০।

১৪৩. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ২৭৭।

400504

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্যজীবন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হউক। ইহাই আমার প্রার্থনা। আমিন।"[১৪৪]

নজরুল ইসলাম বিয়ের পর হুগলীতে নতুন সংসার পাতেন। তবে হুগলীতে পছন্দমতো বাসা পেতে নজরুল ইসলামকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। নজরুল ইসলাম মুসলমান হয়ে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করায় হুগলীর হিন্দু বাড়িওয়ালারা তাঁকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায়নি। নজরুল ইসলাম প্রমীলাকে নিয়ে প্রথমে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী খগেন ঘোষের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। পরে শ্রী ভূপতি মজুমদারের সহায়তায় হামিদুন নবী মোক্তারের বাড়ি ভাড়া নেন। এ বাড়িতেই নজরুল ইসলাম বেশ কিছুদিন স্থায়ীভাবে শান্তিতে বাস করেছিলেন। প্রমীলার মা গিরিবালা দেবীর পক্ষে আর স্ব সমাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনিও শেষে নজরুল ইসলামের সংসারে স্থায়ীভাবে থেকে যান। বিবাহের পর নজরুল ইসলামের আর্থিক সংকটের মধ্যে প্রমীলা দুঃখ-কষ্টে সংসারধর্ম স্বাচ্ছন্দ্যভাবে পালন করতে থাকেন।[১৪৫]

সন্তান-সন্ততি

১. আজাদ কামালের জন্ম ও অকাল মৃত্যু

হুগলীর চকবাজারের 'রোজ ভিলা'র একাংশে থাকাকালে ১১ ই আগষ্ট ১৯২৫ ইং, ২৬ শে শ্রাবণ, ১৩৩২ বাং, মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম পুত্র কাজী আজাদ কামাল ওরফে কৃষ্ণ মুহাম্মদের জন্ম হয়। ছেলের বয়স একুশ দিন হলে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পুত্রের আকীকা উপলক্ষে কবির বিয়েতে যে বন্ধুদের ডাকা হয়নি তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানান হয়। কলকাতা থেকে কবি-সাহিত্যিকরা বিশেষতঃ দীনেশ রঞ্জন দাস(১৯১৫-১৯৮৫ খ্রি.), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৩ খ্রি.), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩ খ্রি.), মুরলীধর বসু, ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬ খ্রি.), মঈনুদ্দীন হোসেন, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১ খ্রি.), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪ খ্রি.) প্রমুখ এ উপলক্ষে নজরুল ইসলামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির ঐ সুখ ও আনন্দ দীর্ঘস্থায়িত্বতা লাভ করেনি। কিছুদিন পরেই নজরুল ইসলামের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের অকাল মৃত্যু হয়।[১৪৬]

২. বুলবুলের জন্ম ও অকাল মৃত্যু

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ই অক্টোবর, শনিবার, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজে বসবাসকালে কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয়পুত্র কাজী অরিন্দম খালিদ ওরফে বুলবুলের জন্ম হয়। এ সময় নজরুল ইসলাম ভগ্ন স্বাস্থ্য ও আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বুলবুলের জন্মের পর থেকে এক নব উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। পুত্রের 'বুলবুল' নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও গানের বুলবুলি হয়ে উঠেন। তখন নজরুল ইসলাম তাঁর শিল্পী জীবনের মধুরতম সৃষ্টি গজল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[১৪৭] ১৯২৮ সালের ৮ এপ্রিল সোমবার কৃষ্ণনগরের বাসা ছেড়ে কবি সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন। ইতোমধ্যে ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ , ১৩৩৬ বাং , ২৮ মে, ১৯২৮ খ্রি. সোমবার কবির মাতা জাহিদা খাতুন প্রায় ৫৫ বছর বয়সে চুরুলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। খবর পেয়েও অজ্ঞাত কারণে নজরুল ইসলাম চুরুলিয়ায় 'মা'কে দেখতে যাননি।[১৪৮] আকস্মিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের অকাল

---

১৪৪. এয়াকুবউদ্দীন আহমদ, মোসলেম জগত, ৪ আষাঢ়, ১৩৩১, উদ্ধৃত খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ৫১-৫২।

১৪৫. শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী, পৃ. ৫৫।

১৪৬. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ১০৫।

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১৪৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু হয় মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে ৭ মে, ১৯৩০ ইং, ২৪ শে বৈশাখ, ১৩৩৭ বাং, তারিখে বুধবার কলকাতার ৫০/২-এ মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রীটের ঠিকানায়। বুলবুলের মৃত্যু নজরুল ইসলামের মানসলোকে বিপর্যয় আনে এবং পুত্রশোকে মুহ্যমান কবি গভীরভাবে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন।[১৪৯]

প্রাণপ্রিয় পুত্র বুলবুলের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে নজরুল ইসলামের ভেতর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। বুলবুলের অকাল মৃত্যুর ফলে সৃষ্টিজগৎ ও মানব জীবন সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন এসে যায়। এতদ্ব্যতীত সন্তানের মৃত্যু তাঁকে স্রষ্টার অসীম রহস্যালোকে উত্তীর্ণ করে, যার প্রতিক্রিয়া নজরুল ইসলামের কবি জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'চির নির্ভর' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে;

> পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্রশোক!
> সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
> ভুলিনু পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন;
> বন্ধুরা দেখে কহিল, "পিতা, না পাষাণ এ অচেতন?"[১৫০]

৩. কাজী সব্যসাচীর জন্ম-মৃত্যু

কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম, ডাক নাম সান্ইয়াত সেন বা সানি কলকাতার ৮/১, পানবাগান লেনের ঠিকানায় ১৯২৯ সালের ৯ ই অক্টোবর বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। সংস্কৃতি জগতে সুপরিচিত খ্যাতনামা আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী বহুদিন কলকাতা বেতারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ২রা মার্চ কবি-পুত্র কাজী সব্যসাচী মাত্র ৪১ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে যান।[১৫১]

৪. কাজী অনিরুদ্ধর জন্ম-মৃত্যু

কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম, ডাক নাম লেনিন বা নিনি কলকাতার ৩৯ সীতানাথ রোডের ঠিকানায়, ১৯৩১ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও নিপুণ গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ তাঁর পিতা নজরুল ইসলামের সৃষ্ট অমর সুর সম্পদ সংরক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কবি নজরুল ইসলামের দুস্প্রাপ্য, লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত গানের সঠিক সুর উদ্ধার, স্বরলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি তার কাজ অসমাপ্ত রেখে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরলোক গমন করেন।[১৫২]

কবি-পত্নী প্রমীলার অসুস্থতা ও পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যুবরণ

কলকাতায় ৫৭/১, সীতানাথ রোডের বাড়িতে অবস্থানকালে কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম ১৯৩৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। প্রমীলার প্রাণে বেঁচে থাকার আশা ছিল না, যদিও তিনি বেঁচে গেলেন কিন্তু সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ করে তোলার জন্য নজরুল ইসলাম চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। নজরুল ইসলাম চিকিৎসার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মোটর বালিগঞ্জের জমি বিক্রি করে, বইয়ের স্বত্ব ও রেকর্ডের রয়ালটি বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক সব ধরনের শুশ্রুষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলেন না। বাকী জীবন তাকে বিছানায় শুয়ে বসে কাটাতে হয়েছে।

---

১৪৯. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৫২৯; কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২২।

১৫০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চির-নির্ভর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯২২।

১৫১. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৫৯৯; কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২২।

১৫২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২২; নজরুল জীবনী, পৃ. ৫৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আর প্রমীলার মা গিরিবালা দেবী ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। প্রমীলার অসুস্থতায় নজরুল একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। ট্রাজেডি ও চরম দুঃখ তাঁর নিজের জীবনেও ঘনিয়ে এসেছিল। অসুস্থতা ও সম্বিত হারানোর মধ্য দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেলেও প্রমীলা কিন্তু ভেঙে পড়েননি। প্রমীলা নজরুল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। পরের তেইশ বছর প্রমীলাকে সজ্ঞানে বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণে তার নিম্নাঙ্গ অবশ হলেও শরীরের উপরের ভাগ সুস্থ্যই ছিল। এমতাবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি সংসার চালিয়েছেন, অসুস্থ স্বামীর সেবা করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রমীলা এভাবে জীবন যাপন করেছেন। অবশেষে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ শে জুন, শনিবার ৫৪ বছর বয়সে ফ্ল্যাট নং- ৪, ব্লক এল, সিআইটি বিল্ডিং ৪/২ ক্রিস্ট্রোফার রোড, কলকাতা-১৭, এই ঠিকানায় অবস্থানকালে কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম পরলোক গমন করেন। অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে চুরুলিয়ার পীর পুকুরের পাশে প্রমীলার কবর হয়েছিল।[১৫৩]

জাতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত কবি সংবর্ধনা

১৯২৯ সালের, ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার বিকেলে কলকাতার এলবার্ট হলে 'সওগাত লেখক গোষ্ঠী'র উদ্যোগে জাতির পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিরাট জনসমাগমে পরিপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিখ্যাত রসায়নবিদ, বিজ্ঞানী ও স্বদেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪ খ্রি.)। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১ খ্রি.), সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.)। সদস্য ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ। 'সাপ্তাহিক সওগাত' পত্রিকায় নিয়মিত নজরুল সংবর্ধনার খবর প্রকাশ হতো। ১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যা, মাসিক সওগাতে 'কবি সংবর্ধনা' শিরোনামে জাতির পক্ষ থেকে নজরুল-সংবর্ধনার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল;

"গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে মহাসমারোহে সংবর্ধিত করা হইয়াছে। সভারম্ভের অনেক পূর্বেই বিরাট হলটি জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অনুরাগী শত শত ভদ্রলোককে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সভায় বহু সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যানুরাগী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলা ঠিক দুইটার সময় একখানি পুষ্পসজ্জিত মোটর-কারে করিয়া কবিকে সভায় আনা হয়। তিনি সভা-মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র উপস্থিত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।"[১৫৪]

কবির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' গানটি গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য। এরপর সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কবির প্রতি অপরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেন, "আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্র নাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হইয়া আছে। তাই অন্যের প্রতিভা লোকচক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দুইজন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি-প্রতিভাবান মৌলিক কবি! রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রিষ্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙালীরূপেই পাইয়াছিল। আজ

---

১৫৩. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৫৯৭-৫৯৮;কাজী নজরুল ইসলাম:জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২১৬ ও ২২২।

১৫৪. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ২৩০-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধাই নিবেদন করিতেছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু; কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাঙালীর প্রণে এক নুতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।"[১৫৫]

সভাপতির ভাষণ শেষে নজরুল সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত গদ্য লেখক এস. ওয়াজেদ আলী জাতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এরপর বিপুল করতালির মধ্যে সভাপতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কবিকে সোনার দোয়াত-কলম ও রূপার চোঙ্গায় (Casket-এ) অভিনন্দন পত্রখানি উপহার দেন, এসময় শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪ খ্রি.) কর্তৃক বিশেষভাবে রচিত একটি আবাহন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অভূতপূর্ব এ সম্মাননার প্রত্যুত্তর দেয়ার জন্য কবি আবেগ মথিত চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। সভায় উপস্থিত জনমন্ডলী এমন জয়োল্লাস ও আনন্দধ্বনি করে কবিকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন যে, কবি প্রায় ১৫ মিনিট কাল শুধু অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জনতা শান্ত হলে তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে অভিনন্দনের জবাবে সুদীর্ঘ লিখিত ভাষণ পড়ে শোনালেন তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল;

"বন্ধুগণ!

আপনারা যে, সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বণিত হয়ে উঠেছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম!...আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে' টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন।...

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তুর্য বাদকের একজন আমি- এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।...আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।...আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি। আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ!"[১৫৬]

কবি নজরুল ইসলামের কৃতজ্ঞতা নিবেদন শেষ হলে খ্যাতনামা শিল্পী গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং উমাপদ ভট্টাচার্য পুনরায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সভাপতির অনুরোধে উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবির অনন্য ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দেশবরেণ্য জননেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ খ্রি.) স্বভাবসুলভ আনন্দমধুর কণ্ঠে আবেগস্পন্দিত বক্তব্য রাখেন, "স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারেনা। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম-অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বোঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।কারাগারে আমরা

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২: হায়াৎ মামুদ, নজরুল, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

১৫৬. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ১২৩-১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই যাই। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেলখানার প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক পাওয়া যায়।...

তার লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছে হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এখন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব-তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়-সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।" [১৫৭]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতার পর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯ খ্রি.) জাতির পক্ষ থেকে নজরুল সংবর্ধনার ফলশ্রুতিতে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা করিবার জন্য যেভাবে হিন্দু মুসলমানে মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেক মঙ্গল আয়োজনে যদি সেইভাবে আমরা মিলিতে পারি; যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান; শুধুই যদি আমাদের মনে জাগে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নজরুল-সংবর্ধনা সার্থক হইবে।"[১৫৮]

পরিশেষে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি ও সমবেত সুধী মন্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর বিপুল আনন্দ উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে অপূর্ব গণ-সংবর্ধনা সমাবেশ সভা ভঙ্গ হয়। উল্লেখ্য যে, জাতির পক্ষ থেকে অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে নজরুল সংবর্ধনা সুসম্পন্ন হওয়ার পর কলকাতার ইংরেজী-বাংলা সকল প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকায় সংবর্ধনার সংবাদ বিশদ বিবরণ সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় বিরুদ্ধবাদী নজরুল ও সওগাতকে পরাজিত করায় ব্যাপারে দারুণ ভাবে নিরাশ হলেন। এমনিভাবে অসাধারণ কবিত্বশক্তির স্বীকৃতি হিসেবে এত অল্প বয়সে জাতির পক্ষ থেকে বিরাট সংবর্ধনা লাভ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের একটি অন্যতম প্রধান ও চির স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকলো।[১৫৯]

অসুস্থ ও সম্বিতহারা জীবন (১৯৪২-১৯৭৬ খ্রি.)

১৯৪২ সালের ৯ ই জুলাই, কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম দুরারোগ্য মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হন। ঐদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে নজরুল ইসলামের দশ মিনিটের একটি গল্প বলার অনুষ্ঠান ছিল। যথাসময়ে নজরুল ইসলাম গল্প বলতে শুরু করেই থেমে গিয়েছিলেন, শেষ করতে পারেননি। তখন বহু চেষ্টা করেও তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আসরের পরিচালক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩ খ্রি.) তৎক্ষণাৎ কবির আকস্মিক অসুস্থতাজনিত অপারগতা বেতার শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা করে দেন এবং তিনি নজরুল ইসলামকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেন।[১৬০]

---

১৫৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ১৮৪।

১৫৮. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১৫৯. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪১।

১৬০. হায়াৎ মামুদ, প্রতিভার খেলা নজরুল, পৃ. ৯৫; রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

কবির চিকিৎসা

নজরুল ইসলামকে প্রথম পরীক্ষা করেন কবির ভাড়াটে বাসার মালিক ডাঃ ডি. এল. সরকার; কিন্তু সপ্তাহখানেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি, এসময় তাঁর হাতের কম্পন বা জিহ্বার আড়ষ্টতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কবি প্রথমে বাকশক্তি তারপরে লেখনী শক্তি হারিয়ে ফেললেন। চিন্তাগ্রস্ত কবির স্বাস্থ্যক্ষয় শুরু হয়। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়, অনিয়ম ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ তাঁর মস্তিষ্কের উপর একটা চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। পুত্র-শোক, স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যধির জন্য গভীর মনোবেদনা, সর্বোপরি নানা প্রকার অনিয়ম ও ঝঞ্ঝাটের ফলে কবির মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নজরুল ইসলামের মন ও মস্তিষ্ক ক্রমশঃ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তার মধ্যে নানা রকমের অস্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা দেখা দেয়। কখনো পীর ফকিরের দরগায় চলে যান, আবার কখনো দেব-দেবীর মন্দিরে ধর্ণা দেন। কখনো বা অসীমের সন্ধান করেন আর বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকেন। প্রলাপের মাধ্যমে তাঁর সব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগলো। কবির মস্তিষ্ক তখন আর সুস্থ রইল না। এ প্রসঙ্গে 'রোগাক্রান্ত নজরুল' শিরোনামে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.) লিখেছেন, "মানুষের শারীরিক, মানসিক ও চিন্তাশক্তি পরিচালনার একটা সীমা আছে। নজরুল সবটাতেই সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, অনিয়ম, বিশ্রামহীনতা, অতিরিক্ত চা-জর্দা পান, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা, পুত্র-শোক, স্ত্রীর নিদারুণ ব্যাধির জন্য মানসিক বেদনা, প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং চেষ্টা করেও নিষ্ফল হওয়া, শেষপর্যায়ে অর্থ সংকট প্রভৃতি নজরুলের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ।"[১৬১]

কাজী নজরুল ইসলাম আকস্মিকভাবে অসুস্থ ও সম্বিতহারা হয়ে পড়লে পরিবারের আয়ের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। কবির নিজস্ব কোন সঞ্চয় ছিল না উপরন্তু তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কবি-পত্নী প্রমীলা তখন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। কবি-পুত্র কাজী সব্যসাচী (১৯২৯-১৯৭৯ খ্রি.) ও কাজী অনিরুদ্ধ (১৯৩১-১৯৭৪ খ্রি.) এর বয়স তখন যথাক্রমে বার ও দশ বছর মাত্র। ইত্যবসরে কবি জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৫ খ্রি.) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২ খ্রি.) এর সাথে সাক্ষাত করে নজরুল ইসলামের অসুস্থতার কথা জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩ খ্রি.) কে জরুরী ভিত্তিতে কবির চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। এ সময় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নজরুল ইসলামকে দেখতে যান এবং ঐদিনই কবিকে সপরিবারে মধুপুর যাতায়াতের খরচের জন্য পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করে দেন। অতঃপর ১৯শে জুলাই রাত্রিতে কবি সপরিবারে মধুপুরে গিয়ে ডাঃ ডি. এল. সরকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীন ছিলেন, কিন্তু দুইমাস মধুপুরে অবস্থান করেও কবির অবস্থার কোন উন্নতি না ঘটায় ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ নজরুল ইসলামের চিকিৎসা করেন। কবিরাজী চিকিৎসায় প্রথম অবস্থায় কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল ইসলামের মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে কবিকে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে বিখ্যাত মনঃস্তত্ত্ববিদ ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু (১৮৮৭/১৯৫৩ খ্রি.) ও ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দের চিকিৎসাধীনে ভর্তি করা হয়। এখানে মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনও কবিকে পরীক্ষা করেছিলেন। নজরুল ইসলাম 'লুম্বিনী পার্কে' চারমাস ছিলেন কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীর শেষদিকে আরোগ্যহীন কবিকে মানসিক হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কবির সংসার তখন আর্থিক অনটনে অচল। এমতাবস্থায় নজরুল ইসলামের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য গঠিত 'নজরুল সাহায্য কমিটি', 'নজরুল এইড ফান্ড' প্রভৃতির উদ্যোগে আর্থিক সাহায্য এবং সরকারী-বেসরকারী কিছু কিছু সাহায্য ছাড়া কবির যথার্থ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি।

---

১৬১. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৩১০।

শেষপর্যন্ত বঙ্গীয় সরকার কবি নজরুল ইসলামকে মাসিক দুইশত টাকা সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। নজরুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার পর দশটি বছর কলকাতায় প্রায় বিস্মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। অতঃপর ১৯৫২ সালের ২৭ শে জুন কলকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করেন এবং কবি ও কবি-পত্নীকে চিকিৎসার জন্য ১৯৫২ সালের ২৫শে জুলাই রাঁচী মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করেন। নজরুল ইসলাম সেখানে হাসপাতালের অধ্যক্ষ মেজর ডেভিসের চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু চার মাস ব্যর্থ চিকিৎসার পরেও রাঁচীতে কবির রোগ নির্ণয় সম্ভবপর হয়নি।[১৬২]

চিকিৎসার্থে বিদেশ প্রেরণ

কবিরাজী এবং হোমিওপ্যাথি মতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা সত্ত্বেও কিছুতেই নজরুল ইসলামের ব্যাধির উপশম হলো না। শেষে নিরুপায় হয়ে 'নজরুল নিরাময় সমিতি'র উদ্যোগে কবিকে চিকিৎসার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১০ই মে নজরুল ইসলাম তাঁর রুগ্ন স্ত্রী প্রমীলা, কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ও একজন শিক্ষিতা নার্সকে নিয়ে 'নজরুল নিরাময় সমিতি'র রবিউদ্দীন আহমদ সিন্ধিয়া কোম্পানীর 'জল-আজাদ' জাহাজযোগে কলকাতা থেকে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৮ই জুন সেখানে পৌঁছেন। লন্ডনে ছ'মাস অবস্থানকালে কবির রোগ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নজরুল ইসলামকে চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডে ডাঃ উইলিয়াম স্যারগান্টের প্রাথমিক পরীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে কবির সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া আশাতীত। এরপর মেডিকেল বোর্ডের অপর দু'জন ডাঃ ই. এ. বার্নেট ও স্যার রাসেল ব্রেন অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ডাঃ রাসেল ব্রেনের মতে, কবির মস্তিষ্কের সেল (Cells) যেভাবে নষ্ট হয়েছে তা আরোগ্যের অতীত; কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। এরপর লন্ডনের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ উইলি ম্যাককিস্‌ক কবির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সুপারিশ করেন, কিন্তু ডাঃ রাসেল ব্রেন এই মতের বিরোধিতা করেন। এ অবস্থায় ডাঃ রাসেল ব্রেন কোন প্রকার চিকিৎসাই বিধেয় বলে মনে করলেন না। একদল চিকিৎসক অবশ্য বলেছিলেন যে, কবি 'ইনভলুশনাল সাইকোসিশ' রোগে আক্রান্ত। লন্ডনের বিশেষজ্ঞরা কবিকে পরীক্ষা করে একটি বিষয়ে একমত হন যে, কবির প্রাথমিক চিকিৎসা অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন যাবত মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন; তাঁর মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা ঘটেছে; ঔষধে বা অস্ত্রোপচারে তাঁর উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আর বিশেষ নাই।[১৬৩]

অতঃপর কবির রোগ বিবরণী ও পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ 'ভিয়েনা' ও ইউরোপের অন্যান্য বহুস্থানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়। তারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, অস্ত্রোপচারে কবির আরো ক্ষতি হতে পারে। ১৯৫৩ সালের ৭ ই ডিসেম্বর কবিকে লন্ডন থেকে সুইজারল্যান্ডের ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশ্ববিশ্রুত স্নায়ুবিদ্যাবিদ প্রফেসর ডাঃ হান্‌স হফ এর চিকিৎসাধীন রাখা হয়। ভিয়েনায় ৯ই ডিসেম্বর বুধবার নজরুল ইসলামের উপর 'সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফী'[১৬৪] পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ হান্‌স হফ্‌ এই পরীক্ষার ফলদৃষ্টে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন যে, কবি 'পিক্‌স ডিজিস' নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। এ ব্যাধিতে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কবির ব্যাধি এত পুরাতন হয়ে গেছে যে, নিরাময়ের বিশেষ কোন আশা নেই।' লন্ডন ও ভিয়েনায় মেডিকেল রিপোর্ট রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের কাছেও মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা জানান যে, কবির আরোগ্যের ব্যাপারে তাদের বিশেষ কিছু করার নেই। অনন্তর রোগ মুক্তির আশা না থাকায় ১৯৫৩ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর রোম থেকে হাওয়াই

---

১৬২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২০-২২১।

১৬৩. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২১-২২২।

১৬৪. 'সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফী' এমন এক প্রকারের পরীক্ষা, যাতে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে গন্ডদেশ ছিদ্র করে মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত সঞ্চারণ করে মস্তিষ্কের X-Ray ছবি গ্রহণ করা হয়। দ্রঃ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

জাহাজযোগে কবি ও কবি-পত্নীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। নজরুল ইসলামের অবস্থা আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কবি এই ভাবে বেঁচে ছিলেন। আমৃত্যু তিনি জীবন্মৃত ও সম্বিতহারা অবস্থায় নিদারুণ এক মর্মান্তিক জীবন যাপন করেন।[১৬৫]

বার্ধক্য জীবনঃ কবিকে বাংলাদেশে আনয়ন ও ঢাকাস্থ ধানমন্ডিতে অবস্থান

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণসহ বিশেষ অনুরোধে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী ভারত সরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের ১৪ ই মে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১০ ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার সকাল ১১ টা বেজে ৪০ মিনিটে বাকশক্তি ও লেখনী শক্তিহারা অসুস্থ বাঙালী কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশ বিমানে করে ঢাকায় আনয়ন করা হয়। ঐদিন বিশেষ কক্ষার ফ্রেন্ডশীপ বিমানের অবতরণকালে তেজগাঁ বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের এক নজীরবিহীন সমাবেশে উপস্থিত অগণিত জনতা কবিকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহুকাল পরে অসুস্থ ও বাকশক্তিহীন নজরুল ইসলাম তাঁর প্রিয় বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সকাল থেকেই বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের ভীড় জমতে থাকে। বিমান বন্দর ভবনের ছাদ, রানওয়ের একাংশ সকাল ১০ টার মধ্যে সকল বয়সের নারী-পুরুষে ভরে যায়। প্রিয় কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও বরণ করে নেয়ার জন্য প্রায় সবার হাতেই ছিল ফুলের তোড়া ও স্তবক। প্রাণপ্রিয় কবি ও রাষ্ট্রীয় অতিথিকে বিপুল জনতা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, বিমান বন্দরে অবিরাম পুষ্পমাল্য আর ফুল বর্ষণের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবিকে বাংলার আপামর জনগণ হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিলেন। সেই অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় দৃশ্য বন্দী হলো বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমের আলোকচিত্র শিল্পীদের এবং অন্যান্যদের ক্যামেরায়, রিপোর্টারদের কলমে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনাকারী ও দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও নবীন-প্রবীণ শিল্পীবৃন্দ। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত নজরুল অনুরাগী সাধারণ মানুষ। গগনবিদারী শ্লোগান ও জনতার প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে অসুস্থ কবিকে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে তোলাই এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এ সময় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে আসা দর্শনার্থী বিশাল জনতাকে সামলানোর উদ্দেশ্যে কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামকে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করতে হলঃ "কবি অত্যন্ত অসুস্থ। আপনাদের খুশী করার জন্য তবু আমরা তাঁকে বাংলাদেশে এনেছি। সামনের দরজা দিয়ে কবিকে কোনমতে একটি এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। জনতা এ্যাম্বুলেন্সের উপর অবিরাম পুষ্পবর্ষণ করে।

কবিকে এ্যাম্বুলেন্সযোগে বিমানবন্দর থেকে কবির বাংলাদেশে অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮ নং সড়কে ৩৩০ / বি, নং ফ্ল্যাটের খোলামেলা সবুজ লনে ঘেরা এক দোতলা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.) কবি ভবনে গিয়ে কবিকে মাল্যভূষিত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।[১৬৬] রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কবির রচনাবলীর প্রকাশ এবং তা বাংলাদেশের আগামী নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে ভক্তি নম্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাংলাদেশ আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে

---

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০; মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃ. ৩৭২-৩৭৩; রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২২।

১৬৬. রফিকুল ইসলাম , কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ.২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে।...স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমরা নজরুলের কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তার 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গান চিরদিন মানুষকে সংগ্রামের প্রেরণা দেবে।"[১৬৭]

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সময়ে কবিভবনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কবির জন্য মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করেন। ঢাকায় কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অবস্থান এবং কবিভবনে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখা হয়। ১৯৭২ সালের ২৫ শে মে কবির ৭৩ তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশে প্রথম মহাসমারোহে 'নজরুল জন্মজয়ন্তী' উদযাপিত হয়। প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে সেদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কবি ভবনে গিয়ে নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর থেকেই ধানমন্ডির 'কবিভবন' হয়ে উঠে এক তীর্থকেন্দ্র। অগণিত নজরুল ভক্ত আর কবির দর্শনপ্রার্থীর ভীড়ে কবিভবন হল সদা মুখরিত। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত জাতীয় 'দৈনিক ইত্তেফাকে' খবর প্রকাশিত হয়, "রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ সর্বশ্রেণীর নাগরিক এইবার প্রথম বাংলাদেশে কবির জন্মোৎসব নানান স্থানে জাতীয় মর্যাদায় উদযাপন করেন।"[১৬৮]

"দৈনিক সংবাদে" এর প্রতিবেদনে লেখা হয়, "বাকহারা কবি সমাগত শিল্পীদের কণ্ঠে তার গান শুনে এক সময় হেসে ওঠেন আবার কাঁদেন, আদর করে শিল্পীদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।"[১৬৯]

কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনয়নের পর প্রথম দিকে কবির স্বাস্থ্যের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছিল। তাঁর কোমরের নীচে ও পিঠে যে ঘাঁ হয়েছিল তা সরকারীভাবে যথাযথ চিকিৎসার দরুণ সেরে উঠেছিল। কবির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডকে ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ডাঃ ইউসুফ আলী, ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী ও ডাঃ আলী আশরাফ সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করতেন। বাংলাদেশের মাটি-মানুষ আর আবহাওয়ার সংস্পর্শে ও নিয়মিত পরিচর্যায় কবি শারীরিক দিক থেকে অনেকটা সজীব হয়ে উঠলেন। ধানমন্ডির 'কবি ভবনে' পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে এবং বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত সঙ্গীত জলসায় তাকে বেশ প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ দেখা গেল। সেবা যত্নের ফলে তাঁর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থতার লক্ষণ ফুটে উঠল। বাকশক্তিহীন কবিকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে, সঙ্গীত জলসায় ও সাহিত্য সম্মেলনে নিয়ে যাওয়া হতো। নির্বাক কবির উপস্থিতিই দর্শক-শ্রোতা ও দেশবাসীর মনে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা জোগাতো। কবিকে সকাল-বিকাল দু'বেলা গান শোনানো হতো এবং সম্বিতহারা কবি এতে বেশ খুশী হতেন। কবিকে গাড়িতে করে নিয়মিত বেড়িয়ে আনা হত, এতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।[১৭০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সন্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান

বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের আসনে অধিষ্ঠিত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালের ২৩ শে মার্চ, শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে কবিকে ডি. লিট. খেতাবে ভূষিত করার যে সুপারিশ করে তা ১৩ ই এপ্রিল শনিবার সিন্ডিকেটের সভায় গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ৯ ই ডিসেম্বর, সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট, (ডক্টর অব্ লিটারেচার) ডিগ্রী প্রদান করে। এ উপলক্ষে কবিকে প্রদত্ত দীর্ঘ সম্মাননাপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন চৌধুরী পাঠ করেছিলেন;

---

১৬৭. আবদুল মুক্তিত চৌধুরী, 'শেষ সালাম', (ঢাকাঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮৪),পৃ. ২০২-২১৭।

১৬৮. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৫৪৪।

১৬৯. প্রাগুক্ত।

১৭০. রফিকুল ইসলাম , কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ.২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

"দেশ কালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে প্রজ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।...বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবি-প্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন সচ্ছন্দ, নির্দ্বন্দ্ব। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্ত র্জাতিক উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বায়ত্বশাসিত চেতনার শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবন সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধ, ধর্ম-কথার সীমাবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালী ঐতিহ্যের পুনঃনির্মাতা, নবভাষ্যকার।... আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার সাহসী অভিযাত্রী-মানসের সৃষ্টি-ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত। আপনার দু' দশকের সৃষ্টি-সম্ভারের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃতজ্ঞ বাঙালী জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ আপনাকে সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।"[১৭১]

১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী, ১৩৮১ বঙ্গাব্দের ১১ মাঘ, শনিবার বঙ্গভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মাহমুদুল্লাহ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রী পত্রটি উপহার দেন। ঐদিন বঙ্গভবনে সবুজ লনে কোন প্রকার সাহায্য ছাড়া একাকী পূর্ণ সুস্থ লোকের মতো নজরুল ইসলাম ঘুরে বেড়িয়ে সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন।[১৭২]

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব , একুশে পদক ও আর্মি ক্রেষ্ট প্রদান

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। নজরুল ইসলাম প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে এলেও বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রাণ প্রিয় কবিকে আপনজনের মতো নিজেদের মধ্যে দেখতে চান। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ আশা করে যে কবিকে এদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হবে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১ খ্রি.) এর শাসনামলে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' উপলক্ষে ফৌজী সরকার প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এ মহান কবিকে সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করেন। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম কবির কণ্ঠে পদক পরিয়ে দেন।[১৭৩] এটাই ছিল কবি-জীবনের শেষ অনুষ্ঠান।

১৯৭৬ সালের ২৪ মে ৭৭ তম জন্মদিনের প্রাক্কালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পি. জি. হাসপাতালে কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেষ্ট' উপহার দেন। বাংলাদেশের রণসঙ্গীত 'চল্ চল্ চল্' গানটির স্রষ্টা হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম পেলেন এক অনন্য উপহার। ১৪ ই জ্যৈষ্ঠের 'বাসস'-এর বরাত দিয়ে Bangladesh Times এ খবর টি এভাবে প্রকাশিত হয়;

''Major General Zia-ur-Rahman, Chief of Army Staff and Deputy Chief Martial Law Administrator visted the Rebel Poet Kazi Nazrul Islam at the P.G. Hospital on Tuesday and presented him the Creast of Bangladesh Army''.[১৭৪]

---

১৭১. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৫৪৫।

১৭২. রফিকুল ইসলাম , কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২৪-২২৫।

১৭৩. শেখ দরবার আলম, নজরুল ইসলাম, অজানা নজরুল, পৃ. ৫৪৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬।

১৭৪. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, 'বাংলাদেশে নজরুলঃ বিদায়ী সালাম', নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮২; তৃতীয় প্রকাশ, জুন, ১৯৯৭), পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালবাসা, যথাযথ সম্মান আর স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল বাংলাদেশে কবি জীবনের শেষ অধ্যায়ের এই দিন চির স্মরণীয় । কিন্তু আশা ও আনন্দের এই ধারা চিরস্থায়ী হলো না।

উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৩ হি. / ১৩৯০ বাং / ১৯৮৩ ইং সাল থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। প্রথম বছরেই সাহিত্যে অনন্য অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মরনোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়। এ পুরস্কারে থাকে একটি সম্মানপত্র ও দশ হাজার টাকা।[১৭৫]

অন্তিম শয্যায় কবি

১৯৭৫ সাল থেকেই কবির স্বাস্থ্য দ্রুত আবনতির দিকে যেতে থাকে। অসুস্থতার কারণে কবির সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার্থে সরকারীভাবে চিকিৎসকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে ধানমন্ডির 'কবিভবন' থেকে ২২ শে জুলাই পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পি. জি. হাসপাতালের ১১৭ নং কেবিন হয়েছিল কবির শেষ আশ্রয়। এখানেই তিনি ১৯৭৫ সালের ২২ শে জুলাই থেকে ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগষ্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন অবস্থান করেছিলেন। একদিন ঘনিয়ে এলো বিদ্রোহী কবি, এদেশের মানুষের হৃদয়ের আসনে অধিষ্ঠিত কবির অন্তিম শয্যা।

ইন্তেকাল

পি. জি. হাসপাতালে আসার পর থেকে স্থায়ী শয্যার বন্দী দশায় গুরুতর অসুস্থ কবির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে; তাঁর বার্ধক্য ও বাড়ছিল। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে কবির শরীরে পানি দেখা দেওয়ায় তাঁকে বেশ মোটা দেখাচ্ছিল। ২৭ শে আগষ্ট, শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে কবির দেহে সামান্য জ্বর আসে। পরদিন ২৮ শে আগষ্ট, শনিবার সকাল ১১ টায় পর থেকে দেহের উত্তাপ বাড়তে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯ শে আগষ্ট, রবিবার সকালে দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একশ পাঁচ ডিগ্রী (১০৫) ছাড়িয়ে যায়। সে সময় কবি অস্থিরভাবে করুণ দু'চোখে কাকে যেন খুঁজছিলেন। কবিকে তখন অক্সিজেন দেওয়া হয়। সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুস্‌ফুস্‌ থেকে কফ ও কাশি বের করারও সর্বাত্মক প্রয়াস চালনো হয়। কবির দেহের তাপ নামিয়ে আনার জন্য শেষ চেষ্টা হিসেবে কবির শরীরে স্পঞ্জও করানো হয়। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে নির্বাক কবির জীবনে নেমে আসে চির যবনিকা। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট ; ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র; ১৩৯৬ হিজরীর ২রা রমজান, রবিবার সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে পি. জি. হাসপাতালের ১১৭ নং কেবিনেই বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মৃত্যুশয্যায় কবির চিকিৎসার দায়িত্বে নিযুক্ত ডাঃ নুরুল ইসলাম, মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী প্রমুখ চিকিৎসক, সেবিকা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, কবির সেবক ওয়াহিদুল্লাহ ভুইয়া এবং পি. জি. হাসপাতালের সুপার ডাঃ খান সহ উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। কবির আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ছুটে এলেন প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল মোশাররফ হোসেন খান প্রমুখ।[১৭৬]

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লাশ দাফন

কবির মৃত্যু সংবাদ বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র জাতি অত্যন্ত গভীর শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সর্বস্তরের অসংখ্য অগণিত শোকাতুর মানুষ ছুটে গিয়ে

---

১৭৫. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল , পৃ. ২৩২।

১৭৬. রফিকুল ইসলাম , কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২৬-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তিম শয্যায় শায়িত কবি নজরুল ইসলামকে শেষবারের মত এক নজর দেখতে পি. জি. হাসপাতালে ভীড় জমালো। সকাল এগারটার দিকে তাঁর মরদেহ কেবিন থেকে বের করে আউট ডোরে দোতলায় মঞ্চে স্থাপন করা হয়; কিন্তু দর্শনার্থীদের স্থান সংকুলান অপ্রতুল হওয়ায় দুপুর দু'টোর দিকে কবির মরদেহ কফিন সহকারে শোক শোভাযাত্রায় দর্শনার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গনে নেওয়া হলে হাজার হাজার নর-নারীর ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল কবির শবাধার। বিকেল সাড়ে চারটায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত কবির নামাজে জানাজায় শরীক হলেন রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন দেশের কুটনীতিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকসহ ঢাকা মহানগরী ও বাংলাদেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত লাখো লাখো শোক-বিধুর মানুষ। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ নামাজে জানাজার পর কবির লাশ দাফনের জন্য শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে। এরপর বিকেল পাঁচটায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবির লাশ সমাহিত হয়। একুশ বার তোপধ্বনির সাথে সাথে কাফনের উপর থেকে ফুলের স্তুপ সরিয়ে কবির লাশ যখন কবরে নামানো হয় তখনও তিন মিনিট ধরে কেঁপে কেঁপে বাজছিল বিউগলের লাষ্ট-পোষ্ট তথা শেষ বিদায়ের করুণ সুর। তখন মসজিদের পাশে কবি-সৈনিকের কবরে সবাই ছড়িয়ে দেন এক মুঠো করে মাটি। বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে সমাধিতে মাল্যদান সমাপ্ত হলে তিন বাহিনী প্রধান যথাক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ সৈনিক কবিকে শেষ সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে সামরিক সরকার প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'চল চল চল' কে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রণ সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করলেন। শোকের প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হলো এবং দু'দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালিত হয়।[১৭৭]

কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কবিকে মসজিদ প্রাঙ্গণেই সমাহিত করা হয়। কবির অন্তিম ইচ্ছা ছিল মসজিদের পাশে তাঁর সমাধি হলে তিনি পাঁচ বার আজান শুনতে পাবেন। মসজিদের মুসল্লীগণ তাঁর কবর যিয়ারত করবে। তাইতো ভক্ত মরমী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একদিন গান বেধেছিলেন;

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।[১৭৮]

নজরুল ইসলামের জন্মস্থান চুরুলিয়ার পীর পুকুরের পাশেও মসজিদ ছিল। সেখানে এক সময় ইমাম ছিলেন কবি স্বয়ং। তবুও এই মসজিদের কথাও তিনি নির্দিষ্ট করে বলে যাননি। তথাপি এই বিখ্যাত গানের ভিত্তিতেই অন্তিম শয্যায় নজরুল ইসলামের সেই মনোবাঞ্ছাই যেন পূর্ণ হলো। চিরনিদ্রায় কবি শায়িত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে, সবুজ উদ্যানে সুরম্য ইটের গাঁথুনীতে কবির সমাধিতে গড়ে উঠেছে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিসৌধ আর সম্মুখের ঐতিহাসিক রাজপথটি 'কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ' নাম ধারণ করেছে।

একদিন প্রেমের কবি, গানের বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করেছিলেন;

---

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ২৩৭-২৩৮।

১৭৮. কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতাঞ্জলি, নজরুল রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ,১৩৮৪/ মে, ১৯৭৭; ২য় প্রকাশ, পৌষ, ১৩৯১/ ডিসেম্বর, ১৯৮৪), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮০।

Dhaka University Institutional Repository

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়!
কে আজি সমাধিতে মোর।
এতদিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর ॥[১৭৯]

অবশেষে মসজিদের পাশে কবির সমাধি ছেয়ে গিয়েছিল অগণিত শোকাহত মানুষের দেয়া ফুলের স্তবকে, সেই ধারা আজও অব্যাহতভাবে চলেছে। কাজী নজরুল ইসলামের মাজার অনুরাগী ও ভক্তজনের দেয়া ফুলের স্তবকে স্তবকে ছেয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে কবিকে প্রতিনিয়ত নতুন ভাবে স্মরণ করে এদেশের মানুষ। কবির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে বাঙালী জাতি সাম্প্রতিককালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকীও উদযাপন করেছে।

শোকবাণী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করে এক শোকবার্তায় বলেন, "কবির মৃত্যু বাংলা সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারিয়ে গেলো। কবি তাঁর অসাধারণ ও বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তা-ই নয় জাতিকে একটি স্বাধীন সত্তা অর্জনের সংগ্রামে প্রেরণাও যুগিয়েছেন।"[১৮০]

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন ষ্টাফপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক প্রকাশ করে বলেন, "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ছিলেন মানবতা ও সাম্যের কবি। বিদ্রোহী কবি তাঁর কবিতা, গান, গজল ও অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।"[১৮১]

দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ কবির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নে সোচ্চার হন। কাজী নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতগণও শোক বার্তা প্রেরণ করেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভায় কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে কবির রূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমদ এক শোকবাণীতে বলেন, "কবির দেশপ্রেম এবং বিপ্লবী চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।"[১৮২]

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৭৭ খ্রি.) নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক শোকবার্তায় বলেন, "কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। দীর্ঘদিন তিনি বাকশক্তি রহিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর লেখনী মারফত মৃতপ্রায় জাতি স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বোধিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে ভারত শোকমগ্ন।... তাঁর সক্রিয় জীবনে কবি যা

---

১৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বন-গীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

১৮০. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'বাংলাদেশ নজরুল: বিদায়ী সালাম', নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নজরুল স্মারক সংখ্যা, (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা: গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৩৮৪), উদ্ধৃত নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৯০।

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০।

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০।

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। তাঁর মৃত্যু ভারত ও বাংলাদেশকে রিক্ত করে দিয়েছে।"[১৮৩]

এমনিভাবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে অসংখ্য সভা-সমিতি, সংগঠন, ব্যক্তিত্ব এবং বাইরের আন্তর্জাতিক মহলের শোকবাণীর দ্বারা কবির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

সর্বদলীয় শোকসভা

কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পর ১২ ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় ১০৯ জন বুদ্ধিজীবী মিলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক সর্বদলীয় নাগরিক শোকসভার আয়োজন করা হয়। ইতোপূর্বে কবি-সাহিত্যিক লেখক-সাংবাদিক তথা সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী একত্রে মিলিত হয়ে কারো জন্য এতবড় শোকসভার আয়োজন করা হয়নি। এ মহতী শোকসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.), শোকসভায় উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রেখেছিলেন অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮ খ্রি.), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮০ খ্রি.), এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৮খ্রি.), কবির চৌধুরী (জন্ম-১৯২২ খ্রি.), কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি.) প্রমুখ।[১৮৪] উক্ত সভায় সভাপতির ভাষণে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বলেন, "কবি নজরুলের মৃত্যুতে আমরা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক শোক প্রকাশ করেছি, পুষ্পমাল্যে ভরে তুলেছি তাঁর সমাধিস্থল, সাথে সাথেই আজ বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এই নাগরিক শোক-সভার আয়োজন। আজ কবির শোকে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হলেও তাঁকে বাংলার মাটিতে রাখতে পেরে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসা নিবেদন করতে পেরে আমরাও অশ্রুসজল চোখে কবির ভাষায় বলবো- 'আমরা ধন্য হলুম, আমরা ধন্য হলুম।'

যার স্মৃতিচারণের জন্য আমরা সর্বদলীয় নাগরিক আজ এখানে সমবেত হয়েছি তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত। একদা জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনার উত্তরে নজরুল বলেছিলেন-'আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে।'

কেন নজরুলের স্মৃতি রক্ষা করতে হবে ? কারণ নজরুল ছিলেন মানবতার কবি, দেশাত্মবোধের কবি, সর্বহারাদের কবি, গানের কবি, সৌন্দর্যবোধের কবি, বিপ্লবী কবি, জাতীয় জাগরণের কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার ইত্যাদি বহুগুণের অধিকারী। সে যুগের আর কোন রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনায় এমন শক্তি সাহস আর উদ্দীপনা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে নজরুল এনে দিয়েছিলেন অপরিসীম শক্তি ও সাহস। মানুষকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। উৎপীড়িত জনগণের বেদনাই তাঁর কাব্যে ও গানে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের জীবনে, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নজরুলের দানের কথা স্মরণ করে আমরা বিস্মিত হই...আজ তাঁর মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত এই সর্বদলীয় শোকসভার সভাপতিরূপে শোক-প্রস্তাবে স্বাক্ষর দান করলাম।"[১৮৫]

কবির ইন্তেকালের পর পত্র-পত্রিকার মূল্যায়ন

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চির বিদায়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ গভীর শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। জনতার অন্তরের অন্তঃস্থলে তাদের প্রাণপ্রিয় কবিকে চির বিদায় জানাতে গিয়ে অশান্ত উম্মাদনায় অভিভূত হয়ে উঠে। কবির প্রতি

---

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ২৩৯।

১৮৪. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ.২৩৯।

১৮৫. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ.৩২৫-৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সীমাহীন। সেই অফুরন্ত আবেগ আর গভীর শ্রদ্ধার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কবির ইন্তেকালের পর স্থানীয় পত্র-পত্রিকায়। বাংলাদেশের প্রতিটি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সারা পাতা জুড়ে কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ চিত্র সহকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। সেদিনের খবরের শিরোনামগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

দৈনিক বাংলার প্রধান সংবাদঃ 'চিরনিদ্রায় বিদ্রোহী কবি নজরুল'। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'চির-বিদ্রোহী বীর' শিরোনামে লেখা হয়, "বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল পুরুষদের তিনি সম্ভবতঃ শেষ প্রতিনিধি যিনি সাহিত্যের সংগে জীবন, স্বাদেশিকতা আর সংগ্রামকে সিদ্ধহস্তে সংযুক্ত করেছিলেন।...বাংলা সাহিত্যের অংগনে কোমল-কঠোর মিশ্রিত এমন ব্যক্তিত্ব আর চোখে পড়ে না।...নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার অনন্য প্রতীক-বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে তিনি যেমন পরিপুষ্ট করেছেন, তেমনি পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমান সমাজকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন উজ্জল আলোকবৃত্তে।...সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর মহত্ব, ঔদার্য আর মানবপ্রেম।...আমাদের সান্ত্বনা, কবি নজরুল অনন্ত, কবি নজরুল অনিঃশেষ, অমর তাঁর স্বাধীনতা আর বিদ্রোহের বাণী। ...স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর সম্মুখে যাত্রায় নজরুলের কাছ থেকে খুঁজে নেবে শক্তি, সাহস আর অনুপ্রেরণা। ... জাতি হিসেবে আমরা তাঁর কাছে ঋণী।"[১৮৬]

জাতীয় কবির ইন্তেকালে 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনামে লেখা হয় 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে।' পত্রিকাটি কবির মর্যাদার দিকে আলোকপাত করে বলেন, "ভাবাহীন বোধশক্তিহীন কবি ও সুরকার জীবিত থেকেও অনুভব করে যেতে পারেন নি যে, বাংলা ভাষী সকল মানুষেরই শ্রদ্ধার মালা তিনি জয় করে নিয়েছেন। দুঃখ শুধু এটুকু যে, স্রষ্টা তাঁর সার্থক সৃষ্টির প্রভাব অনুভব করতে পারলেন না, অতৃপ্ত অন্তরেই তাঁর মহাপ্রয়াণ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো।... নজরুল-বিয়োগে বাঙালী আজ হতবাক। বিদ্রোহী কবিকে তাঁর অনন্তলোকে যাত্রায় শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরাও বলি- 'কে বলে মরেছ তুমি, হে অমর আছো চিরদিন।" [১৮৭]

সেদিনের 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'আমাদের কবি আর নাই'। পত্রিকাটি নজরুল ইসলামকে 'মুসলিম সমাজের জাগরণের চারণ কবি' হিসেবে মূল্যায়ন করে বলেন, "নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণ জাতির জন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যামোদীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও আমাদের একটি প্রধান দায়িত্ব।...সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়- বিশ্ব সাহিত্যেও বিস্ময় সৃষ্টির দাবী রাখে।" [১৮৮]

কাজী নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে 'Bangladesh Times' এর 'Undying Flame' সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,

"The Rebel Poet is dead. But the lame will burn undyingly. Blood, imagination and intellect ran together in him to produce one of the finest artisans of words. The brevity of his stay did not stand in the way of making him an immortal figure of Bengali literature. As long as Bengali is spoken. Kazi Nazrul Islam will be remembered with appropriate reverence. His melodies will ring in

---

১৮৬. আবদুল মুকীত চৌধুরী, 'বাংলাদেশে নজরুলঃ বিদায়ী সালাম', প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

our minds eternally. A brilliant era in Bengali literature has come to an end the sparks from which will inspire posterity for earring new laures in literature." ১৮৯

দৈনিক ইত্তেফাক 'বিদ্রোহী কবির মহাপ্রয়াণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়, "ভোরের কান্নার মত আজ প্রতিজনের হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিতেছে একটি করুণ বেহাগ। 'তোমাদের পানে চাহিয়া আয় আমি জাগিব না'- কবির এই ব্যথিত উচ্চারণ আজ শাব্দিক অর্থে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে সত্য, সেখানে মৃত্যুর চিহ্ন নাই। পাবক শিখার মত তিনি জ্বলন্ত ও দেদীপ্যমান।... হিমালয়ের মত উঁচু ও অটল শির ছিল তাঁর এবং গোটা জাতিকে তিনি চারণ মন্ত্র গাহিয়া উন্নত করিয়া গিয়াছেন সেই আত্মবোধের পর্যায়ে। তোলপাড় করা এক কীর্তির তিনি সম্রাট, বলিষ্ঠ জীবনবোধের নায়ক। শতাব্দীর অন্ধকার তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। আলোর দীপ্ত মশাল উচ্চে তুলিয়া ধরার অন্যতম প্রধান ভূমিকা তাঁরই। ... সাহিত্যের যেখানেই হাত দিয়েছেন, ফলাইয়াছেন সোনার ফসল।... বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের এমন উচ্চকিত প্রাণস্ফূর্তির নজীর আর দ্বিতীয়টি নাই।"

নজরুল বলিতেই বুঝায় বেদনা-বিহ্বল ঘা খাওয়া একটি চিরন্তনী প্রেমিককে, বুঝায় সংসার বিরাগী এক পুরুষকে। শিশুর মতো সরল সুন্দর চোখ। সিংহের কেশরের মতো বাবরি, বজ্রের মতো কণ্ঠ-এই ইমেজও নজরুলের বাংলা সাহিত্যে তিনি শুধু নতুন বাণীই সংযোজন করেন নাই, নতুন সাহিত্য-ব্যক্তিত্বেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপ-মহাদেশে মুসলমান জাতির আত্মবোধের বিকাশে কবি জাতীয় কবির ভূমিকা পালন করিয়াছেন। নজরুল কখনো আপোস করেন নাই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়া অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেই নজরুল সত্য ও অমর। কবির মৃত্যু আছে। কবি ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টির মৃত্যু নাই। যতদিন সুধা ও সৌন্দর্যের জগত আছে, ততদিন থাকবে নজরুল। সম্মুখে না থাকিলেও তিনি থাকিবেন আমাদের নয়নের মাঝখানে।" ১৯০

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম ও কাব্য প্রতিভা

আধুনিক আরবী সাহিত্যে আহমাদ শাওকীর বিস্ময়কর অবদান অপরিসীম। তিনি শুধু একজন কবি ছিলেন না, বরং তিনি একাধারে একজন সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিশুতোষ রচয়িতা ছিলেন। 'গদ্যের ন্যায় পদ্যও যে কোন বিষয়বস্তুর উপযোগী হতে পারে এবং কবি তাঁর ছন্দোবদ্ধ কাব্যের সাহায্যে সাহিত্যের যে কোন শাখায় অবাধ বিচরণ করতে সক্ষম' এ বিষয়ের বশবর্তী কবি আহমাদ শাওকী অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ, গদ্য, ছন্দোবদ্ধ গদ্য, উপন্যাস, নাটক, কাব্যনাটক, কাব্যানুবাদ, সঙ্গীত, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমানভাবে সাহিত্যচর্চা করে অমর কীর্তির অতুলনীয় স্বাক্ষর স্থাপন করেছেন।

আহমাদ শাওকীর রচনাবলী দুই ভাগে বিভক্তঃ কাব্য রচনা ও সাহিত্য রচনা। উভয় শ্রেণীর রচনাবলী উত্তম ও উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল।

কাব্যক্ষেত্রে শাওকীর অবদান

আহমাদ শাওকী আধুনিক আরবী কবিতার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। নিম্নে আমরা কাব্যক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

১. আল-শাওকিয়্যাত (চার খণ্ড)

আহমাদ শাওকীর কাব্য রচনাসমগ্র 'আল-শাওকিয়্যাত' اَلشَّوْقِيَّاتُ নামে চারটি বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত এক বৃহদাকৃতির 'দীওয়ান' دِيْـــوَانٌ বা কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। কবি কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কবিতাবলী আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। যা ১৩১৭ হি./১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে আহমাদ শাওকীর শৈশবের কবিতা, খেদীব তাওফীক পাশা ও দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী পাশার স্তুতি কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কবিতা। এ খন্ডের ভূমিকায় আহমাদ শাওকী কবি, কবিতা ও নিজের জীবন চরিত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[১]

আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর দীর্ঘ ২৭ বছর আহমাদ শাওকীর অন্য কোন কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়নি। এ সময় আহমাদ শাওকী বিরচিত কাসীদাগুলো তাঁর সাহিত্যামোদীগণের নিকট অথবা এগুলোর প্রকাশকারী পত্রিকাসমূহের নিকট পরিবেশন করা হত। কবি এগুলোকে একত্রিত করতে আগ্রহী হয়ে তাঁর পুত্রের বন্ধু আহমাদ মাহফুযকে স্বীয় কবিতাবলী থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে যা কিছু পাওয়া সম্ভব সেগুলোকে একত্র করার জন্য সচেষ্ট হতে নির্দেশ দেন। ফলে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করে কবিতার বিপুল সম্ভার একত্রিত করে আহমাদ শাওকীর নিকট তা পেশ করেন। অনন্তর আহমাদ শাওকী তাঁর কাব্য সংকলনের পরবর্তী সংস্করণে উক্ত সমষ্টি থেকে কিছু সংযোগ করেন, কিছু অংশ উপেক্ষা করেন এবং অপর কিছু অংশ বিশেষ করে খেদীব তাওফীক পাশা ও খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী পাশার প্রশংসায় রচিত কবিতাগুলো বাদ দেন। এখান থেকেই একটি নতুন সংকলনের প্রকাশনা শুরু হয়। স্তুতিমূলক কবিতা اَلْمَدِيْحُ শোকগাঁথা اَلرِّثَاءُ সঙ্গীত

---

১. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৪০-৪৪১; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ.৭৫; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ম, 'আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১৩-২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

اَلْأَنَاشِيْدُ এবং কাহিনী কাব্য اَلْحِكَايَاتُ প্রভৃতি বাদ দিয়ে ১৩৪৩ হি./১৯২৫ সালে আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খণ্ড পুনঃমুদ্রিত হয়। দীওয়ানের এ খণ্ডের পরিমার্জন ও সংশোধনের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করেন ড. সাঈদ আবদুহ। [২]

শুধু সমাজ اَلْاِجْتِمَاعُ রাজনীতি اَلسِّيَاسَةُ ও ইতিহাস اَلتَّارِيْخُ বিষয়ক কাসীদা সম্বলিত এ সংকলনের ১ম খণ্ডে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্য সমালোচক ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৩০৫-১৩৭৬ হি./১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.) আহমাদ শাওকী সম্পর্কে একটি মূল্যবান ভূমিকা مُقَدِّمَةٌ লিপিবদ্ধ করেন। এ ভূমিকায় তাঁর কবিতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। [৩]

আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খণ্ডে মিসরের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থঃ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও দলীয় বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে। কবি স্বীয় কাব্য প্রতিভাবলে এর অধিকাংশকে মৌলিক সাহিত্যরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। দীওয়ানের এ খণ্ডে মোট ৬১ টি শিরোনামে দীর্ঘ গীতি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতাবলীর শিরোনাম হচ্ছে ; 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِـيْ وَادِي النِّيْـلِ 'আল-হামযিয়্যা আল নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ 'ইনতিসার আল-আত্‌রাক ফী আল-হারবি ওয়া আল-সিয়াসা' اِنْتِصَارُ الأَتْرَاكِ فِي الْحَرْبِ وَالسِّيَاسَةِ 'বা'দ আল-মান্‌ফা' بَعْدَ الْمَنْفَـى 'যিক্‌রা আল- মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ 'আল্লাহু ওয়া আল-ইল্‌ম' اَللّٰهُ وَالْعِلْمُ 'আইয়্যুহা আল-উম্মাল' أَيُّهَا الْعُمَّالُ 'নাজাত' نَجَاةٌ 'ইলা 'আরাফাত' إِلَى عَرَفَاتِ 'খিলাফাত আল-ইসলাম' خِلَافَـــةُ الإِسْـــلَامِ 'ইন্‌তিহার আল-তুল্‌বা' اِنْتِحَارُ الطَّلَبَةِ 'আবুল হাউল' أَبُو الْهَوْلِ 'ফী সাবীল আল-হিলাল আল-আহ্‌মার' فِيْ سَبِيْلِ الْـهِلَالِ الأَحْمَرِ 'তাকলীল আনকারা ওয়া আ্‌ল আল-আস্তানা' تَكْلِيْلُ أَنْقَرَةَ وَعَزْلُ الأَسْـتَانَةِ 'ঈদ আল-দাহ্‌র ওয়া লায়লাতু আল-কাদ্‌র' عِيْدُ الدَّهْرِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ 'আল-ইল্‌ম ওয়া আল-তা'লীম ওয়া ওয়াজিব আল-মু'আল্লিম' اَلْعِلْمُ وَالتَّعْلِيْمُ وَ وَاجِبُ الْمُعَلِّمِ 'ব্যাংক মিস্‌র' بَنْكُ مِصْـــرَ 'মারহাবান বিল হিলাল' مَرْحَبًا بِالْهِلَالِ 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ 'দাজীজ আল-হাজীজ' ضَجِيْجُ الْحَجِيْـــجِ 'আল-উসতূল আল-ওসমানী' اَلْأُسْطُوْلُ الْعُثْمَانِيُّ 'আল-আন্দালুস আল-জাদীদা' اَلأَنْدَلُـــسُ الْجَدِيْـــدَةُ 'দায়ফ আমীর আল-মুমিনীন' ضَيْفُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আল-হিলাল আল-আহ্‌মার' اَلْـــهِلَالُ الأَحْمَـــرُ 'তূত আন্‌খ আমূন' تُوْتُ عَنْخُ آمُوْن 'আল-সালীব আল-আহ্‌মার' اَلصَّلِيْبُ الأَحْمَرُ 'আল-দাস্‌তুর আল উসমানী' اَلدُّسْتُوْرُ الْعُثْمَانِيُّ প্রভৃতি। [৪]

আহমাদ শাওকী ১৩৪৫ হি./১৯২৭ সালে তাঁর 'আল-শাওকিয়্যাত' শীর্ষক কাব্য সংকলনের পুনঃপ্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে কবির জন্য সম্মানসূচক অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হয় এবং এতে বিরাট সংখ্যক পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানমালার একটি বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নীলনদের কবি হাফিজ ইব্‌রাহীম (১২৮৮-১৩৫১হি./ ১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.) আহমাদ শাওকীর

---

২. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী আমীর আল-শু'আরা ওয়া নাগ্‌ম আল-লাহ্‌ন ওয়া আল-গিনা, পৃ. ৭৯; হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৬।

৩ ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা.বি.; প্রথম প্রকাশ, কায়রো, ১৯২৫), ১ম খন্ড, পৃ. ৩-১৬।

৪. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), ১ম খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট কাব্য নেতৃত্বের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে 'আমীর আল-শু'আরা' أَمِيْرُ الشُّعَرَاءِ তথা 'কবিদের সম্রাট' উপাধি প্রদান করেন।[৫]

আল-শাওকিয়্যাতের ২য় খণ্ডটি ১৩৪৮ হি./১৯৩০ সালে কায়রোতে প্রথম মুদ্রিত হয়। এই খন্ডে বর্ণনা اَلْوَصْــــف ও প্রণয়গীতি اَلنَّسِيْبُ অধ্যায় এবং সমাজ اَلاِجْتِمَاعُ রাজনীতি اَلسِّيَاسَةُ ও ইতিহাস اَلتَّـــارِيْخُ সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী স্থান লাভ করেছে। এছাড়া আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খন্ডের কিছু কবিতাও এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সমন্বয়কারী হিসেবে দীওয়ানের এ খণ্ডের নিরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করেন আহমাদ মাহফুয ও কবিপুত্র আলী শাওকী।[৬]

আলোচ্য ২য় খণ্ডের বিষয় শিরোনামগুলো নিম্নরূপঃ

ক. বর্ণনা অধ্যায় بَابُ الْوَصْفِ : যাতে ৩৭ টি শিরোনাম সম্বলিত কবিতা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

খ. প্রণয়গীতি অধ্যায় بَـــابُ النَّســـيْبِ :যাতে ১৪ টি 'কাফিয়া' قَافِيَةُ বা শ্লোকের অন্ত্যমিলসহ শিরোনামহীন অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে।

গ. বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী اَلْمُتَفَرِّقَاتُ :এখানে রয়েছে ১৬ টি শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা।

উল্লেখ্য যে, আল-শাওকিয়্যাতের ২য় খণ্ডে বর্ণনা اَلْوَصْفُ দৃশ্যাবলীর চিত্রায়ণ تَصْوِيْرُ الْمَشَاهِدُ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী اَلْحَـــوَادِثُ الْكَوْنِيَّـــةُ আধুনিক আবিষ্কার مُخْتَرَعَاتُ الْعَصْــــرِ প্রভৃতি বিষয়ক কবিতাবলীও স্থান লাভ করেছে।[৭]

আল-শাওকিয়্যাতের ৩য় খণ্ডটি ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ সালে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দীওয়ানের এই খণ্ডটির নিরীক্ষণ, প্রকাশনা ও চরণগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক মাহমূদ আবূ আল-ওয়াফা।[৮] যিনি ৩য় খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী ভূমিকা লিপিবদ্ধ করে দেন। এতে উল্লেখ আছে যে, কেবলমাত্র ২০ দিনের মধ্যে তাঁর এ কার্য সম্পাদন করতে তিনি বাধ্য হন। তিনি অপারগ হলেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন কবির স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি।[৯]

এ খন্ডটি শুধু শোকগাঁথা اَلرِّثَاءُ অধ্যায় শীর্ষক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ যেখানে আরব বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তি ত্বদের স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করা হয়েছে এবং মিসরের খ্যাতনামা মরহুম কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দের সৌন্দর্যের স্বীকৃতি রয়েছে। ৩য় খণ্ডে আহমাদ ফাত্হী যগলুল ও আবদুল লতীফ আল-সূফী সম্পর্কে রচিত দু'টি শোকগাঁথা ব্যতীত কবির সকল শোকগাঁথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এদের শোকগাঁথায় কবি এমন রচনাশৈলী অবলম্বন করেছিলেন যাতে তাঁর কাব্য প্রতিভা ও দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ খণ্ডটি ৬০ টি কবিতার শিরোনাম সমৃদ্ধ।[১০]

---

৫. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৩; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৯-৮০।

৬. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৭৯।

৭. আহমাদ শাওকী,আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), দ্রঃ ২য় খণ্ড।

৮. মাহমূদ আবু আল-ওয়াফা, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা.বি.।; প্রথম প্রকাশ, কায়রো, ১৯৩৬), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭ ।

৯. ইয়াহ্ইয়া হাক্কী, হায়া আল-শি'র, পৃ. ৮২-৮৩।

১০. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), দ্রঃ ৩য় খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী যাদের উদ্দেশ্যে শোকগাঁথা কবিতা নিবেদন করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশার পরিবার-পরিজন থেকে খেদীব আব্বাস হিলমী পাশার মাতা উম্মুল মুহ্সিনীন (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), রাজকুমারী ফাতিমা ইসমাঈল (মৃ. ১৯২০ খ্রি.), স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আবদুল হালীম আল-আলয়লী বেক (মৃ. ১৯৩২ খ্রি.), হুসাইন শিরীন বেক (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), মুহাম্মদ সাবিত পাশা (মৃ.১৯০১ খ্রি.), মুস্তাফা বেক খুলুসী, হাসান বেক আনওয়ার (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), আহমাদ ফুয়াদ (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), আবদুল্লাহ বেক আল-তাবীর (মৃ. ১৯১৫ খ্রি.) প্রমুখ।

মিসরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুলায়মান পাশা আবাযা (মৃ. ১৯০১ খ্রি.), মুস্তাফা পাশা ফাহ্মী (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.), আবদুল হামীদ বেক আবূ হায়ফ (মৃ. ১৯২৬ খ্রি.), শায়খ সায়্যিদ দারবীশ (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), ইয়াকুব নকূলা সারুফ (মৃ. ১৯২৮ খ্রি.), শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু (মৃ. ১৯০৫ খ্রি.), মুস্তাফা রিয়াদ পাশা (মৃ. ১৯১১ খ্রি.), উসমান পাশা গালিব (মৃ. ১৯২০ খ্রি.), মুহাম্মদ ফরীদ বেক (মৃ. ১৯২০ খ্রি.), আবদুল খালেক সারওয়াত পাশা (মৃ. ১৯২৮ খ্রি.), শায়খ আবদুল আযীয জাবীশ (মৃ. ১৯২৯ খ্রি.), কাসেম বেক আমীন (মৃ. ১৯০৯ খ্রি.), উমর বেক লুত্ফী (মৃ. ১৯১১ খ্রি.), মুস্তাফা কামিল পাশা (মৃ. ১৯০৮ খ্রি.), 'আতিফ বরকত পাশা(মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), 'আলী পাশা আবুল ফুতুহ (মৃ. ১৯১৩ খ্রি.), সাঈদ যগলুল বেক (মৃ. ১৯২২ খ্রি.), আমীন বেক আল-রাফিয়ী' (মৃ. ১৯২৬ খ্রি.), বুট্রোস পাশা যালী (মৃ. ১৯১১ খ্রি.), সা'দ যগলুল পাশা (মৃ. ১৯২৭ খ্রি.), ইসমাঈল আবাযা পাশা (মৃ. ১৯২৭ খ্রি.), আলী বাহ্জাত (মৃ.১৯২৪ খ্রি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পকলায় প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবদুল হাই হিল্মী (মৃ. ১৯১২ খ্রি.), আবদুহু আল-হামূলী (মৃ. ১৯০২ খ্রি.), শায়খ সালামাহ হিজাযী (মৃ.১৯৩১ খ্রি.); কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে হাফিজ বেক ইবরাহীম (মৃ. ১৯৩২ খ্রি.), মুহাম্মদ তায়মুর (মৃ. ১৯২১ খ্রি.), অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), মুস্তফা লুতফী আল-মানফালুতী (মৃ. ১৯২৪ খ্রি.), মুহাম্মদ আল-মুওয়াইলিহী (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), ইসমাঈল পাশা সাব্রী (মৃ. ১৯২৩ খ্রি.), জুরজী যায়দান (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.), অনারব মুসলিম প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মৃ. ১০৩১ খ্রি.), উমর আল-মুখ্তার (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), ফাওযী আল-গাযযী (মৃ. ১৯২০ খ্রি.), ফাত্হী ও নূরী আদ্হাম পাশা, উসমান পাশা আল-গাযী, শরীফ হুসাইন (মৃ. ১৯৩১ খ্রি.), আল-আমীর সায়ফ নাজ্ল আল-ইমাম ইয়াহ্ইয়া (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), ইউরোপের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হুগো (মৃ. ১৮৮৫ খ্রি.), রুশ দার্শনিক লিউ টলস্টয় (মৃ. ১৯১০ খ্রি.) ও ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ কবি ফারদী (মৃ. ১৯০১ খ্রি.) প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত আহমাদ শাওকী তাঁর প্রাণপ্রিয় পিতা-মাতা ও মাতামহের মৃত্যুতে প্রচন্ড বেদনাবিধুর হয়ে শোকগাঁথা নিবেদন করেন।[১১]

আল-শাওকিয়্যাতের ৪র্থ খণ্ডটি ১৩৬২ হি./১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দীওয়ানের এই খন্ডের নিরীক্ষণ, কবিতা রচনার প্রসঙ্গ, প্রকাশের তারিখ, কঠিন শব্দের শাব্দিক ও প্রায়োগিক অর্থসহ প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে অধ্যাপক সাঈদ আল-উরইয়ান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন।[১২] কবি কর্তৃক উপেক্ষিত বিবিধ স্তুতি কবিতাবলী এতে স্থান লাভ করেছে। অনুরূপভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কবির বন্ধু ড. মাহজুব সাবিত ও তাঁর ভ্রাতৃগণের সম্পর্কে রচিত 'ইখ্ওয়ানিয়্যাত' إخوانيـــات বিষয়ক কবিতাবলী। এ খণ্ডে স্বীয় সন্তানদের সম্পর্কে রচিত কবিতাবলী এবং কুসংস্কার বিষয়ক উপমাবলী শীর্ষক কবিতাও উল্লিখিত হয়েছে।[১৩]

---

১১. প্রাগুক্ত; ইয়াহইয়া হাক্কী, হায়া আল-শি'র, পৃ. ৬১-৬৬।

১২. সাঈদ আল-উরওয়ান, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.: ১ম প্রকাশ, কায়রো, ১৯৪৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩-৭।

১৩. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আল-শাওকিয়্যাতের ৪র্থ খণ্ডের বিষয়াবলী বহুমুখী বিশেষতঃ শিক্ষা ও উপদেশমূলক কবিতা اَلشِّعْرُ التَّعْلِيْمِيُّ , ছোট গল্পমূলক কবিতা قَصَصٌ خَفِيْفَةٌ قَصِيْرَةٌ এবং পশু-পাখীদের মুখে বর্ণিত বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনাবলী حِكَايَاتٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُوْرِ সংক্রান্ত কবিতার আধিক্যই স্থান পেয়েছে। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় সঠিক পথ নির্দেশনামূলক এ সকল কবিতায় ছোট বড় সকলের জন্য রয়েছে জ্ঞানের খোরাক। আলোচ্য ৪র্থ খণ্ডের বিষয়াবলী নিম্নরূপ:[১৪]

ক) সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী مُتَفَرِّقَاتٌ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّارِيْخِ وَالاجْتِمَاعِ : যাতে রয়েছে ৩৮ টি শিরোনাম।

খ) বিশেষ বিষয়ক কবিতাবলী اَلْخُصُوْصِيَّاتُ : যা ২১ টি শিরোনাম সমৃদ্ধ।

গ) কাহিনী বিষয়ক কবিতাবলী اَلْحِكَايَاتُ : যাতে রয়েছে ৫৫ টি শিরোনাম।

ঘ) শিশুদের কাব্য সংকলন دِيْوَانُ الأَطْفَالِ :এতে রয়েছে ১২৩ শ্লোকবিশিষ্ট ১০টি কবিতা।

ঙ) শৈশবকালে রচিত কবিতা شِعْرُ الصِّبَا : এতে ৯৯ পংক্তি বিশিষ্ট ৭ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চ) ড. মাহজুব সাবিত সম্পাদিত কবিতা مَخْطُوْطَاتٌ :যাতে ৬৩ চরণ বিশিষ্ট ৪ টি কবিতা স্থান পেয়েছে।

২. আল-শাওকিয়্যাত (দুই খণ্ড)

বর্তমানে প্রচলিত আল-শাওকিয়্যাতের চারখন্ডে প্রকাশিত দীওয়ানের কবিতাগুলোকে ড. ইয়াহ্ইয়া শামী নতুনভাবে পুনঃবিন্যাস করে 'আল-শাওকিয়্যাত' اَلشَّوْقِيَّاتُ শিরোনামেই দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করেন এবং কবিতার প্রসঙ্গ, রচনাকাল, প্রকাশের তারিখ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখসহ কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ অথবা ভাবের অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি 'কাসীদা' (গীতিকবিতা) অথবা 'মাক্‌তু'আ' (খণ্ড কবিতা) এর ছন্দের অন্ত্যমিল বর্ণ (কাফিয়া) অনুসারে বর্ণানুক্রমিকের ভিত্তিতে কবিতাগুলোকে সাজিয়েছেন।[১৫]

উল্লেখ্য যে, চার খণ্ডের মূল আল-শাওকিয়্যাতে প্রতিটি কাসীদা যেভাবে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রয়েছে ড. ইয়াহ্ইয়া শামী আল-শাওকিয়্যাতের নবতর সংকলনে সেই ধারা অনুসরণ করেননি। তিনি যথাক্রমে রাবীয়্যুল-হাম্‌যা, রাবীয়্যুল-বা রাবীয়্যুল-তা, রাবীয়্যুল-হা, রাবীয়্যুল-দাল, রাবীয়্যুল-রা, রাবীয়্যুল-যা, রাবীয়্যুল-সীন, রাবীয়্যুল-দোয়াদ, রাবীয়্যুল-আইন, রাবীয়্যুল-ফা, রাবীয়্যুল-কাফ, রাবীয়্যুল-কাফ, রাবীয়্যুল-লাম, রাবীয়ুল-মীম, রাবীয়ুল-নূন, রাবীয়্যুল-হা, রাবীয়্যুল-ওয়াও, রাবীয়ুল-ইয়া; এই মোট ১৯ টি অন্ত্যমিল বর্ণে ছন্দোবদ্ধ আহমাদ শাওকী বিরচিত কবিতাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে দীওয়ানের শেষের দিকে প্রদত্ত একটি বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র অনুযায়ী নতুন আলোকে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ নতুন সংকলনের প্রথম সংস্করণ ড. ইয়াহইয়া শামীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ লেবাননের রাজধানী বৈরূতস্থ দার আল-ফিক্‌র আল-আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে মুদ্রিত হয়।[১৬]

---

১৪. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.), দ্র: ৪র্থ খণ্ড।

১৫. ড. ইয়াহ্ইয়া শামী সম্পাদিত, আল-শাওকিয়্যাত, (বৈরুতঃ দার আল-ফিক্‌র আল-আরবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৭।

১৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৯-৭৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল-শাওকিয়্যাত আল-মাজহুলাহ (দুই খণ্ড)

আহমাদ শাওকীর মৃত্যুর পর ড. মুহাম্মদ সাবৃরী আল-সারবুনী দু'টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত 'আল-শাওকিয়্যাত আল-মাজহুলাহ' اَلشَّــوْقِيَّاتُ الْمَجْهُوْلَــةُ নামক গ্রন্থখানা সংকলন করেন। এতে তিনি আহমাদ শাওকী লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের রচনাবলী যা কবির প্রকাশিত দীওয়ান 'আল-শাওকিয়্যাতে' স্থান লাভ করেনি সেগুলো সংগ্রহ ও একত্রিত করে বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করেন। এ সংকলনটি দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা থেকে ১৯৬১-১৯৬২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।[১৭]

'আল-শাওকিয়্যাত আল-মাজহুলাহ' শীর্ষক সংকলনে আহমাদ শাওকীর ১২ টি শোকগাঁথা কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার কোন কোনটি সম্পূর্ণ কাসীদা এবং কোনটি বিচ্ছিন্ন চরণমালা। ড. মুহাম্মদ সাবৃরী আল-সারবুনী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় আহমাদ শাওকীর রচনাবলীর এক বিরাট অংশ কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে নিঃসন্দেহে।[১৮]

৪. দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম

'আল-শাওকিয়্যাত' ছাড়াও আহমাদ শাওকীর অনেক দীর্ঘ কবিতা রয়েছে। সেগুলো 'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' دُوَلُ الْعَرَبِ وَعُظَمَاءُ الإِسْلَامِ অর্থাৎ 'আরব বিশ্ব ও ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গ' নামক কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ মূল্যবান পুস্তকটি 'আরজুযাত আল-আরব' أَرْجُوْزَةُ الْعَــــرَبِ নামে পরিচিত। বিশেষ খণ্ডে প্রকাশিত আহমাদ শাওকীর সুদীর্ঘ দ্বিতীয় ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থে রয়েছে 'রাজায' ছন্দে রচিত কবিতাবলী, যেমন-স্পেনীয় প্রখ্যাত আরব কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও লেখক লিসান আল-দীন ইবন আল-খাতীব (৭১৩-৭৭৬ হি./১৩১৩-১৩৭৪ খ্রি.) 'রাক্ম আল-হুলাল ফী নুযুম আল-দুওয়াল' رَقْمُ الْحُلَلِ فِي نُظُمِ الــدُّوَلِ শীর্ষক শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। উভয় কবির বিখ্যাত 'আরজুযাত' أَرْجُوْزَة এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে।[১৯]

উল্লেখ্য যে, আহমাদ শাওকী তাঁর বিখ্যাত 'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' নামক ১৭২৬ শ্লোক বিশিষ্ট বৃহৎ কাব্যখানা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্পেনে নির্বাসনকালে (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.) রচনা করেন। কবির ইসলামী চিন্তাধারার ফলশ্রুতিস্বরূপ মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আরবী ভাষা ও কাব্য, নবী চরিত, খুলাফায়ে রাশেদীন প্রভৃতি এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত এতে আরো সন্নিবিষ্ট রয়েছে আরবদের অলংকার শাস্ত্রের পরিচিতি, আরবদেশ ও এর প্রকৃতি, বায়তুল হারামের ইতিহাস, জাহেলী যুগে আরব এবং পুস্তকটিতে উল্লিখিত হয়েছে খিলাফতে রাশেদা থেকে আরবের ইতিবৃত্ত, মুসলিম বীর সেনাপতি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (মৃ. ২১ হি. / ৬৪১খৃ.) ও 'আমর বিন আল-আস (মৃ. ৪৩ হি./৬৬৪ খ্রি.) এর বিজয়গাঁথা, সিরিয়া ও স্পেনে উমাইয়া খিলাফত থেকে আব্বাসীয় খিলাফতসহ ফাতেমীদের শাসন আমলের বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কাব্যরূপ।[২০]

---

১৭. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়ৃব, আন আল- লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২১৫; ড. মুহাম্মদ সা'দ বিন হুসাইন, আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু, 'আল-আসর আল-হাদীস', (রিয়াদঃ নাতাবি' জামি'আ আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়্যা, ৫ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.: ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৫০।

১৮. ইয়াহইয়া হাক্কী, হায়া আল-শি'র, পৃ.৬১।

১৯. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৮০; ড. মুহাম্মদ মানদুর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ ও ৬২।

২০. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ.৮০; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল কবিতায় কবি আহমাদ শাওকী ফাতেমীয় খিলাফতকাল (২৯৬-৫৫৭ হি./ ৯০৯-১১৭১ খ্রি.) পর্যন্ত ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও মুসলিম মনীষীদের গৌরবগাঁথা অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে চিত্রণ করেছেন এবং এক এক করে ধনে-মানে স্বদেশের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলে করীম (সা.) এর জীবন চরিতই কাব্যের প্রধান অংশ দখল করে আছে। এ সকল বিষয়ে কবি ভাষায় সরলতা, বর্ণনায় প্রাঞ্জলতা ও বিবরণে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থটি কবির মৃত্যুর পর ১৩৫২ হি./১৯৩৩ সালের ৫ ই মার্চ মিসর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২১]

'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি অলংকারপূর্ণ 'রাজায' ছন্দে রচিত হলেও কবির বিস্ময়কর কবিতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো অনেকটা শিক্ষামূলক কাব্যরচনা। আর এর মধ্যে আহমাদ শাওকী বিরচিত 'সাক্র কুরাইশঃ আবদুর রহমান আল-দাখিল' صَقْرُ قُرَيْش: عَبْدُ الرَّحْمَـــــنِ الدَّاخِـــلُ শিরোনামের 'মুওয়াশ্শাহা'[২২] مُوَشَّحَةٌ কবিতাটি সর্বোৎকৃষ্ট। 'রাজায' ছন্দে রচিত কবিতাগুলোর সাথে এই 'মুওয়াশ্শাহা' কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ সেগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে, যদিও ছন্দ ও চেতনার দিক থেকে এটির ধরণ অনেকটা স্বতন্ত্র।[২৩]

এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলো সাহিত্যের মুকুট, কাব্য ললাটের দীপ্তি। কবি সম্রাট এর মালাকে গ্রথিত করেছেন এবং এর ভাব ও শব্দকে রূপায়িত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মুসলমানদের গড়া স্পেনের মনোরম ভূমিতে তিনি নির্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং মাতৃভূমি ত্যাগের দূরত্বের বেদনা ধুকে ধুকে উপলব্ধি করেছেন। ঐ সকল চমকপ্রদ স্থান ও দৃশ্যাবলী কবিকে তাঁর চিরস্থায়ী মাত্রাতিরিক্ত অলংকারপূর্ণ কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এহেন কথাশৈল্পিক কবিতাগুলো

---

২১. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৭; আব্বাস হাসান, মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৪৮; আহমাদ কাব্বিশ , তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৫।

২২. 'মুওয়াশ্শাহা' مُوَشَّحَةٌ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল পরবর্তী ধরনে রচিত স্তবকে বিণ্যস্ত এক প্রকার অভিনব আরবী কবিতা। যা নির্ধারিত অন্ত্যমিল ও ছন্দসমূহে লিখিত হয় এবং এতে রচয়িতা একটি মাত্র ছন্দের আষ্টেপৃষ্টে জড়িত হন না। আর এটি স্পেনীয়দের আবিষ্কৃত কাব্যধারা। এর ছন্দ স্পন্দনের মধ্যে পদ-বিন্যাস, সাজ-ভূষণ রচনায় কবিদের পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং শিল্প-নৈপূণ্য বিদ্যমান থাকার দরুণ একে 'মুওয়াশ্শাহা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ নামকরণের কারণ হল, এ জাতীয় কবিতা আকৃতিগত দিক দিয়ে কোমরবন্ধ বা ঘাঘরা সদৃশ, কবিরা যেন একে নারীদের গ্রীবাদ্বয় ও কটিদেশে বেধে রাখা মণিমুক্তা খঁচিত চওড়া চামড়া খণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। এজন্য এ শ্রেণীর কাসীদাকে 'মুওয়াশ্শাহা' বলা হয়। দ্রঃ ড. জুদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদব আল-উন্দুলুসী, (মিসরঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫), পৃ. ২৯৩; আল-আব লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ, পৃ.৯০১; Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, P. 1071.সাহিত্যিক পরিভাষায় স্পেনীয় তাওশীহ্ تَوْشِيْحٌ এর ধারায় প্রচলিত গীতি কবিতাকে 'মুওয়াশ্শাহা' বলে। আর তাওশীহ্ বলতে স্পেনীয় আরব কবিদের প্রবর্তিত এক বিশেষ ছন্দে গ্রথিত নতুন আঙ্গিকের এমন কতিপয় কাব্যমালাকে বুঝায়, যা একাধিক নমুনা أَسْمَاطٌ শাখা أَغْصَانٌ ও ভিন্ন ভিন্ন পদকলি أَعَــارِيْضُ সম্বলিত আরবী লিপিকলার এক বিস্ময়কর উদ্ভাবনা। কবিগণ উর্ধ্বেসাত পংক্তির মাধ্যমে 'মুওয়াশ্শাহা' শ্রেণীর কবিতার যবনিকাপাত ঘটান। দ্রঃ মাজমা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, (মিসরঃ দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩৩; আল-সায়্যিদ মুহাম্মদ মুরতাদা আল-যুবায়দী, তাজ আল- আরূস, (বৈরুতঃ মাক্তাবি' দার সাদির, ১৯৬৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

২৩. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

মন ও কল্পনাকে অত্যন্ত আন্দোলিত করে। ফলে কবিতাগুলো অলংকার শাস্ত্রের পরম বিকাশের বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত। এ কাব্যগ্রন্থে ২৫ টি শিরোনামের কবিতা রয়েছে।[২৪]

কাব্যানুবাদ

আহমাদ শাওকী ফরাসী ভাষা থেকে আরবীতে কাব্যানুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রখ্যাত ফরাসী মহাকবিদের রচনাবলী থেকে চয়নকৃত কবিতা ও উপাখ্যানের আরবী অনুবাদ আহমাদ শাওকীর চরম উৎকর্ষের একটি অনুপম নিদর্শন।

১. আল-বাহীরাহ

আহমাদ শাওকী উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সে অধ্যয়নকালীন (১৮৮৭-১৮৯১ খ্রি.) সময়ে ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচিত বিশিষ্ট কবি লা-মারটিনি (La-Martine) বিরচিত 'আল-বাহীরাহ' اَلْبُحَيْرَةُ নামক কবিতাটি আরবীতে কাব্যানুবাদ করেন। এটি ফরাসীয় অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম নমুনা। মূল ফরাসী ভাষা থেকে আরবী পদ্যে 'আল-বাহীরাহ' কবিতার সার্থক অনুবাদ ফরাসী সাহিত্যে আহমাদ শাওকীর অসাধারণ পারদর্শিতার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরেকজন বিখ্যাত ফরাসী কবি লা-ফন্টেইনে (La-Fontaine) রচিত কতিপয় কাহিনী-উপাখ্যান আত্মস্থ করে জীব-জন্তুর ভাষায় অনুকরণ করেন এবং নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গীর রচনাশৈলীতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দোবদ্ধ আরবী কাব্যে রূপায়ণ করেন।[২৫]

কাব্যনাটক

আহমাদ শাওকী ছিলেন আরবী ভাষায় কাব্য নাটকের প্রথম পথিকৃত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে তিনিই সর্বপ্রথম আরবী নাটকের ভাষায় অভিনব কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন। কর্মবহুল জীবনের শেষলগ্নে ১৩৪৮-১৩৫১ হি./ ১৯২৯-১৯৩২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ৭টি কাব্য নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে ৫ টি বিয়োগাত্মক (Tragedies) নাটক হলো যথাক্রমে 'মাস্‌রা' ক্লিওবাত্‌রা', 'মাজনূন লায়লা', 'কাম্‌বীয', 'আলী বেক আল-কাবীর' ও 'আনতারা'। আর ২ টি মিলনাত্মক (Comedy) নাটক হচ্ছে 'আল-সিত্ত্ব হুদা' ও 'আল-বাখীলা'।[২৬]

নিম্নে আহমাদ শাওকী বিরচিত কাব্যনাটকগুলো রচনাকাল, পটভূমি, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ আলোচিত হল :

---

২৪. আহমাদ শাওকী বেক, দুওয়ান আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১; ১ম প্রকাশ মাতবা'আতু মিসর, ১৯৩৩), পৃ. ৫।

২৫. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আল-শি'র আল-মিসরী বা'দা শাওকী, পৃ. ৫।

২৬. আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, শু'আরাউ মিসর ওয়া বী'আতুহুম ফী আল-জায়ল আল-মাদী, (কায়রোঃ ১ম প্রকাশ, ১৯৩৭), পৃ. ১৫৫-১৮৮; আহমাদ কাফিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ.৭৫; হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৯; John A. Haywood, Modern Arabic Lterature. 1800-1970, P. 86.

Dhaka University Institutional Repository

১. মাস্‌রা' ক্লিওবাত্‌রা

১৩৪৮ হি./ ১৯২৯ সালে আহমাদ শাওকী সর্বপ্রথম 'মাসরা' ক্লিওবাত্‌রা' مَصْرَعُ كِلْيُوبَاتْرَا বা 'ক্লিওপেট্রার পরাজয়' নামক কাব্য নাটকটি রচনা করেন।[২৭] প্রাচীন মিসরের পঞ্চম রাণী ক্লিওপেট্রা (খ্রিষ্টপূর্ব ৫১-৩০ অব্দ) এর প্রতি রোমান সেনাপতি এন্টোনীর প্রেম এবং রাণীর সামনে রোমের প্রতিরোধের ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, অতঃপর এর বিরুদ্ধে রোমকদের যুদ্ধ এবং মিসরের উপর তাদের প্রাধান্য লাভ এসব হচ্ছে নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকে কয়েক স্থানে মিসরীয় জাতীয়তাবাদের গৌরব বর্ণিত হয়েছে।[২৮]

'মাস্‌রা' ক্লিওবাত্‌রা' কাব্যনাটকের ঘটনাবলী প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ সালে বাতালেসাদের শাসনামলের শেষের দিকে যখন রোমকরা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ও এর আশেপাশে সংঘটিত হয়। প্রথম দৃশ্যে মিসরের রাণী ক্লিওপেট্রা তাঁর সভাসদদের সাথে একত্রিত হন। এখানে ক্লিওপেট্রা ও তাঁর প্রেমিক এন্টোনীর বহর এবং এন্টোনীর সাথে রোমান সেনাপতি ওকতাফীয়ুসের বহরের মধ্যে সংঘটিত 'আকসিয়ুম' যুদ্ধে মিসরীয় বহরের বিজয় জাতির উল্লাসধ্বনি শুনছিলেন। এ দৃশ্যে ক্লিওপেট্রা স্বজাতিকে তাঁর নৌবহর সহী-সালামতে সংরক্ষণ, রোমান নৌবহরকে ধ্বংস ও বিনাশ বর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যে এন্টোনী এখানে এসে পৌঁছে রাণীকে সংবাদ দেন যে, তিনি তার প্রতিপক্ষ ওক্‌তাফীয়ুসের উপর বিজয় লাভ করেছেন এবং রাণীর প্রতি প্রেমাতিশয্যের টানে 'আল-গাদ' অঞ্চল পর্যন্ত পরাজিত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়েছেন। এই অবহেলার কারণে রাণী বিরক্ত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলেও তিনি তার গভীর ভালবাসা উপলব্ধি করেন এবং তার জন্য আল-গাদের যুদ্ধে উৎসাহব্যঞ্জক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে তিনি ঐ সকল সেনাপতিদেরকে আমন্ত্রণ জানান যারা রোমের প্রতি ক্লিওপেট্রার ঘৃণা এবং মিসরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অনন্তর তারা আল-গাদের যুদ্ধে এন্টোনীর পক্ষ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে এন্টোনী জল ও স্থল যুদ্ধে পরাজিত হয়।

এদিকে এন্টোনী কর্তৃক রোমানদের পক্ষ ত্যাগ করায় যে সকল রোমীয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা এন্টোনীর চিকিৎসক 'অলম্পুস'কে প্রলুব্ধ করে যে, যেন সে এন্টোনীকে এই মিথ্যা সংবাদ প্রদান করে যে, যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করেছে। এতদশ্রবণে এন্টোনী শোক বিহ্বল হয়ে আত্মহত্যা করে। অপরদিকে রাণী ক্লিওপেট্রাও সব কিছু জেনে বুঝতে পারে যে, সেনাপতি ওক্‌তাফীয়ুস তাকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। ফলে উপায়ন্তর না পেয়ে রাণী ক্লিওপেট্রাও আত্মহননের পথ বেছে নেয়।[২৯]

'মাস্‌রা' ক্লিওবাত্‌রা' শীর্ষক বিয়োগাত্মক নাটকটি মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দুইটিসহ বেশ কয়েকটি দৃশ্য আছে। আর নাটকটিতে মোট ৯ টি চরিত্র বিদ্যমান রয়েছে।[৩০] 'মাস্‌রা' ক্লিওবাত্‌রা' নাটক রচনার মাধ্যমে আহমাদ শাওকী প্রখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (৯৭২-১০২ হি./১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.)এর প্রসিদ্ধ 'এন্টোনী ও ক্লিওপেট্রা'(Antony and

---

২৭. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৪; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়ুব উল্লেখ করেন যে, আহমাদ শাওকী 'মাসরা' ক্লিওবাত্‌রা' শীর্ষক কাব্যনাটকটি ১৩৪৬ হি./১৯২৭ সালে রচনা করেছেন। দ্রঃ 'আন আল-লুগাহ ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১৫।

২৮. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী পৃ. ৯৯৭; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৪।

২৯. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৫-১৮৬; হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৯৭-১০০১।

৩০. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, মাসরা' ক্লিওবাতরা, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

Cleopatra) নাটকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছেন। তিনি যেন তাঁর সমালোচক ও সমসাময়িকদের নিকট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু গীতিকাব্যেই নয়, বরং নাট্যকাব্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের তুলনায় কাব্যনাট্যেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[৩১]

প্রকৃতপক্ষে আহমাদ শাওকীর নাট্য কাহিনী আরবী থিয়েটারের ইতিহাসে আলোকবর্তিকার কার্য সম্পাদন করে। এ কাব্য নাটক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরব ও মিসরের ইতিহাসে যুদ্ধ বিষয়ে রচিত কাব্যনাটকসমূহ ভবিষ্যতে উন্নতি করে মহাকাব্যে রূপান্তরিত হতে পারে এবং বিপুল সংখ্যক দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে।[৩২]

২. মাজ্নুন-লায়লা

আহমাদ শাওকী 'মাজ্নূন-লায়লা' مَجْنُوْنُ لَيْلَى শীর্ষক কাব্য নাটকটি ১৩৫০হি./ ১৯৩১ সালে রচনা করেন। নিঃসন্দেহে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'রোমিও-জুলিয়েট' (Romeo and Juliet) নাটক অধ্যয়ন করতঃ এর বিষয়বস্তু দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েই মূলতঃ তিনি 'মাজ্নূন-লায়লা' নাটকটি রচনায় প্রয়াস পান।

উমাইয়া আমলের শুরুর দিকে লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী আরবের নাজ্দ ও হিজাযের মরু অঞ্চলকে ঘিরেই এই নাটকের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে। এই নাটকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ লায়লী ও মজ্নুর অমর প্রেমকাহিনী কেন্দ্রিক আরব্য-উপন্যাসের রূপকথার প্রতিবিম্ব। এ ধরনের কল্পনার ক্ষেত্রে নাট্যকার হিসেবে আহমাদ শাওকী পথিকৃত নন। কেননা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী (২৮৪-৩৫৬ হি./৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.) বিরচিত কিতাব 'আল-আগানী' اَلْأَغَانِي তে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।[৩৩]

এ নাটকের ঘটনাবলী এই যে, 'কায়স' নামক এক আরব যুবক তার চাচাতো বোন 'লায়লী' নাম্নী এক যুবতীর প্রেমে মত্ত হন। লায়লীর প্রতি কায়সের প্রেম ও তার ভালবাসায় অত্যধিক আসক্ততায় ফলে তার বুদ্ধিমত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর সে তার উদ্দেশ্যে গান গাইতে থাকে এবং তাকে প্রেমের কবিতা নিবেদন করে। এই প্রেমোন্মত্তার জন্যই তাকে 'মাজ্নূন' বা পাগল' আখ্যা দেওয়া হয়। লায়লী-মজনুর প্রণয়কাহিনী আরব গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে তা লায়লীর পিতা 'আল-মাহ্দীর নিকট পৌঁছে। লায়লীর পিতা আল-মাহ্দীর নিকট মজনু বিয়ের প্রস্তাব দিলে ক্রুদ্ধ আল-মাহ্দী আরবদের জন্য তা লজ্জাস্কর বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উপরন্তু তিনি খলীফার নিকট তাকে হত্যার নির্দেশ কামনা করেন। ইত্যবসরে হিজায প্রদেশের আল-সাদাকাতের প্রশাসক ইব্নে আওফ কায়সকে ক্ষমা করার জন্য আল-মাহ্দীকে পরিতুষ্ট করে। এসময় কায়সের প্রতিপক্ষ 'মানাযীল' লায়লীকে নির্জনে কাছে পাওয়ার জন্য মজনুকে হত্যা করার ব্যাপারে লায়লীর গোত্রকে প্ররোচিত করে।

এদিকে কায়স উপজাতীয় ঐতিহ্যচ্যুত হওয়ায় লায়লী তাকে বিবাহ করতে পারছে না। অন্যদিকে মানাযীলকে তার বংশের লোকেরা ঘৃণা করার কারণে তার দিকেও ঝুঁকতে পারছে না। পরবর্তীতে 'ওয়ার্দ আল-সাকাফী' এর সাথে লায়লী বিবাহে সম্মত হওয়ায় 'লায়লী-মজনু'র প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং এ থেকে সংঘাত শুরু হয়। ফলে 'কায়স' লায়লী ও তার স্বামী যেখানেই অবতরণ করে সেখানেই তাদের সাথে মিলিত হয় এবং ওয়ার্দ আল-সাকাফীর নিকট জানতে পারে

---

৩১. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২০২ ; হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৯।

৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

৩৩. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২৪৬-২৪৭; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

যে, লায়লী এখনো কুমারী রয়েছে। আর সে লায়লীর সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দেয় এবং তাদের নির্জনে পরস্পর অভিযোগ ও কানাঘুষার জন্য ছেড়ে দেয়। তখন কায়স তার সাথে লায়লীকে পলায়ন করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু গোত্রীয় মর্যাদা ও পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে লায়লী এতে অসম্মতি জানায়। এ সময় কায়স ব্যথিত ও রাগান্বিত অবস্থায় অপ্রকৃতস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর কায়সের শোকে লায়লী অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কায়সের নিকট লায়লীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে সে তার কবরের উপর রোদন করার জন্য গমন করে এবং অল্পকালের মধ্যে লায়লীর গভীর ভালবাসায় শোকে-দুঃখে মুহ্যমান কায়সেরও অপমৃত্যু ঘটে।[৩৪]

'মাজনূন লায়লা' শীর্ষক বিয়োগাত্মক কাব্যনাটকটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। এর প্রতিটি অধ্যায়ে একটি করে দৃশ্যসহ চতুর্থ অধ্যায়ে দু'টি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আর এ নাটকটিতে ৬ টি মূল চরিত্র আছে।[৩৫]

বস্তুতঃ 'মাজনূন লায়লা' নাটকটি যে আহমাদ শাওকীর অমর সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। লায়লী-মজনুর ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী অবলম্বনে অনেকেই নাটক রচনা করেছেন বটে, কিন্তু আহমাদ শাওকীর রীতি কাব্য নাট্য। তাঁর ভাষা সরল, নাটকের সংলাপ গতিশীল তবে বড় বেশী আবেগধর্মী। এজন্যই লায়লী মজনুর প্রেম আরো ঘনীভূত হয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে।[৩৬]

৩. কামবীয

১৩৫০ হি./১৯৩১ সালে আহমাদ শাওকী 'কামবীয' قمبيز নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের ঘটনাবলী খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন মিসর ও পারস্যের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সংঘটিত হয়। তখন মিসর 'আল-বাতালেসা' যুগের ২৬ তম পরিবার কর্তৃক শাসিত হত। পারস্য সম্রাট 'কাম্বীয' (খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৯-৫২১ অব্দ) কর্তৃক মিসর আক্রমণের ঘটনাবলী এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। তৎকালীন মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক চালচিত্র এমন সঙ্গীন ছিল যে, সেখানে না ছিল কোন সৈন্যসামন্ত, না ছিল শান্তি, না ছিল আইনের শাসন। ফলশ্রুতিতে পারস্য সম্রাট 'কাম্বীয' (Cambyses) খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে মিসরকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৩৭]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মূলতঃ এই নাটকটি প্রাচীন রূপকথা নির্ভর। ঘটনাটি হচ্ছে, পারস্য সম্রাট 'কাম্বীয' মিসরের ফির'আউন 'আমাযীছ' এর নিকট তার কন্যা 'নাফ্রীত' কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ফির'আউন এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু ফির'আউন কন্যা 'নাফ্রীত' রাজপ্রহরী 'তাসূ' কে ভালবাসত এবং অন্য কারো নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অপছন্দ করতো। তাই সে বিদেশে বিবাহ বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। এ দিকে রাজকন্যা 'নাফ্রীত' দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও চিন্তা বিহ্বল হলে পূর্ববর্তী ফির'আউন 'আরইয়াস' কন্যা 'নাতীতাস' তার নিকট আসে। ইতোপূর্বে নাতীতাসের পিতা 'আরইয়াস'কে নাফ্রীতের পিতা 'আমযীছ' হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করেছিল। অনন্তর 'নাতীতাস' তার বান্ধবী 'নাফ্রীত' কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও বিবাহে অস্বীকৃতির ফলে মিসরের উপর যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসবে তা উপলব্ধি করলো। তখন সে নাফ্রীতকে এ আশ্বাস দিল যে সে তার বান্ধবীর স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর বিবাহ আসরে 'নাতীতাস' 'নাফ্রীত' নাম ধারণ করে কাম্বীযের নিকট নিজকে উপস্থাপন করলো।

---

৩৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৬-১৮৭; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০১-১০০৬।

৩৫. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, মাজনূন লায়লা, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

৩৬. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৪), পৃ. ১৬৯-১৭৬।

৩৭. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২১৯; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৬-১০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টি সকলের নিকট প্রায় জানাজানি হওয়ার উপক্রম হলো। বিশেষ করে 'ফানিস' নামক একজন গ্রীক সেনাপতি মিসরের ফির'আউনের পক্ষ ত্যাগ করে কাম্‌বীযের পক্ষ অবলম্বন করে পারস্যে আসে এবং কাম্‌বীযকে এ প্রতারণার কথা জানিয়ে বলে যে, তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে 'নাতীতাস', 'নাফ্‌রীত' নয়। এতদশ্রবণে কাম্‌বীয তখন মিসর ও নাতীতাসের উপর ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ে এবং সৈন্য সামন্ত নিয়ে মিসর আক্রমণ করে এবং এতে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন করে তা দখল করে নেয়। ফলে মিসরীয়রা দখলদার কাম্‌বীযের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে মিসর থেকে বের করার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তখন কাম্‌বীয তাদের উপর খড়গহস্ত হন। ইত্যবসরে কাম্‌বীয নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নাফ্‌রীতের আত্মহত্যার খবর জানতে পেরে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেল এবং নতুন ফির'আউন বিসমাতিক ও প্রতারক সেনাপতি ফানিসকে হত্যা করলো। অতঃপর যখন মিসরীয়রা তাকে বহিষ্কার করার জন্য বারবার আক্রমণ করতে থাকলো তখন ক্রোধান্বিত কাম্‌বীয তাদের দেবতা 'আবীস' এর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলে সে তাকে সহৃদয় হওয়ার উপদেশ দেয়। ইতোমধ্যে কাম্‌বীযের মধ্যে জিঘাংসা ও দ্রুত উন্মাদনা বেড়ে গেল। ফলে মিসরীয়দেরকে তাদের সম্রাজ্ঞী, তাদের সম্রাট ও তাদের উপাস্য গো-শাবকের উপর শোকাহত এবং পারস্যবাসীকে তাদের সম্রাট ও সেনাপতির মৃত্যুতে ক্রন্দনরত অবস্থায় সে নিজেই বক্ষে ছুরিকাঘাত করে আত্মহত্যা করে।[৩৮]

আহমাদ শাওকীর 'কাম্‌বীয' নামক বিয়োগাত্মক নাটকটি তিনটি অধ্যায়ে পরিবেষ্টিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে। নাটকটির বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রধান ১০ টি চরিত্র রয়েছে।[৩৯]

৪. আলী বেক আল-কাবীর

আহমাদ শাওকী কর্তৃক 'আলী বেক আল-কাবীর' عَلِي بِكْ اَلْكَبِيْرُ অথবা 'মা হিয়া দাওলাতু আল-মামালিক' مَا هِيَ دَوْلَةُ الْمَمَالِيْكِ শিরোনামের নাটকটি মূলতঃ দু'বার রচিত হয়েছে। প্রথমতঃ ১৩১১ হি./১৮৯৩ সালে খেদীব তাওফীক পাশার শাসনামলে আহমাদ শাওকী তখন ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। নাটকটি সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি না থাকার কারণে এটিকে তিনি প্রকাশ করেননি। পরবর্তীতে কবির জীবনসায়াহ্নে এতে কিছু পরিবর্তন সাধন করে ১৩৫১ হি./ ১৯৩২ সালে এটির রূপরেখাকে পুনঃ বিন্যাস করে প্রকাশ করেন।[৪০]

১১৮৪ হি./১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রশাসনের বিরোধ সম্পর্কে কায়রোর ফুস্‌তাত, সিরিয়ার সালিহিয়া ও ফিলিস্তিনের আক্কায় সংঘটিত রাজনৈতিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনাবলীই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[৪১]

ঘটনাটি এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় শাসনামলের শেষ ভাগে আলী বেক আল-কাবীর (১৭২৮-১৭৭৩ খ্রি.) মিসরে মামলুক রাজবংশের প্রধান ও নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ওসমানীয়রা তাকে মিসরের শায়খ নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির ও উচ্চাভিলাষী। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তিনি অটোমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে মিসরকে স্বাধীন করেন। অতঃপর সিরিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় শ্বশুর ও

---

৩৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৭-১৮৮; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৪।

৩৯. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, কামবীয, (বৈরুতঃ দার আল-'আউদা, ১৯৮১)।

৪০. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৫; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌ব, আল আল-লুগাহ ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১৩; ড. মুহাম্মদ মান্দূর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৩৫।

৪১. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাপতি মুহাম্মদ বেক আবু আল-যাহ্‌ব (মৃ. ১৭৭৫ খ্রি.) কে সেখানে অভিযানে প্রেরণ করেন।এ সময় 'আক্কার শাসক তাঁকে সামরিক সাহায্য করলে তিনি তৎকালীন সিরীয় অধিপতিকে পরাজিত করে দামেশ্‌ক অধিকার করে নেন। কিন্তু আলী বেকের নিকট ফিরে আসার পূর্বে ওসমানীয়রা তাঁকে মিসর রাজ্য করায়ত্ত করার জন্য প্ররোচিত করলে তিনি স্বহস্তে মিসরের কতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলী বেকের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য দ্রুত মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।

ওসমানীয়দের উপর প্রায় বিজয় অর্জনের প্রাক্কালে আলী বেকের বিরুদ্ধে তাঁর শ্বশুর মুহাম্মদ আবু আল-যাহ্‌ব ও তাঁর দাস মুরাদ বেক বিদ্রোহ করে বসে। উভয়ে এমন এক সময়ে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করলো যখন তিনি মিসরের স্বাধীনতার আলো দেখছিলেন। অতঃপর এ দুজন বিদ্রোহী তুর্কীদের সাথে গোপন চুক্তি করে এবং আক্কার শাসক 'দাহির আল-উমর' কে তাঁর বন্ধু আলী বেককে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করে। এমতাবস্থায় উপায়ান্তর না পেয়ে আলী বেক তাঁর পৃষ্ঠপোষক আক্কার শাসকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তার স্ত্রী 'আমাল', পরিচারিকা ও সেবিকাদেরকে সাহায্য করেন। অপরদিকে আবু আল-যাহাবের লালসা চরিতার্থ হয়নি। যদিও আবু আল-যাহাব সিরিয়াস্থ সালিহিয়্যার রণাঙ্গনে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ও তাকে হত্যা করে। কিন্তু মিসরে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বন্দী হন এবং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

আহমাদ শাওকী তাঁর এই ঐতিহাসিক নাটকটিতে আলী বেকের স্ত্রী ক্রীতদাসী 'আমাল' এর প্রতি অপর ক্রীতদাস মুরাদ বেকের ভালবাসা সংক্রান্ত সাহিত্যিক বিষয়টি সংযুক্ত করেন। অথচ 'মুরাদ বেক' জানত না যে 'আমাল' তার আপন বোন। এভাবে নাটকটিতে আহমাদ শাওকী দুইটি দূরবর্তী বিষয়কে পরপর প্রবেশ করিয়ে দেন। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে যথার্থভাবে সমন্বয় না করে কয়েকটি বাৎসল্য ঘটনা এতে প্রবিষ্ট করানোর ফলে এটির নাট্যশিল্পের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে নিঃসন্দেহে। তথাপি এর কিঞ্চিৎ মানক্ষুণ্ন ও ত্রুটি সত্ত্বেও এতে মামলুকদের অত্যাচার ও প্রতারণার চিত্রাংকনে আহমাদ শাওকী যথেষ্ট সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুরূপভাবে এই সামাজিক নাটকটিতে তিনি প্রাচীন মিসরীয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যবলীর খণ্ডচিত্র অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।[৪৩]

'আলী বেক আল-কাবীর' শিরোনামের বিয়োগাত্মক কাব্য নাটকটি মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর কতক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ৬ টি চরিত্র রয়েছে।[৪৪]

৫. আনতারা

আহমাদ শাওকীর 'আনতারা' عَنْتَرَةُ নামক বিয়োগাত্মক কাব্য নাটকটি ১৩৫১ হি./১৯৩২ সালে রচিত, যা কবির মৃত্যুর এক মাস পর প্রকাশিত হয়। এই নাটকে হিজরী পূর্ব শতকের মাঝামাঝি সময়কালীন নাজ্‌দ মরু অঞ্চলের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। কিতাব 'আল-আগানী' সহ অন্যান্য আরবী সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত আরবদের গোত্রীয় ঘটনাবলী এই নাটকের উপজীব্য। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে 'আল-সাবউল মু'আল্লাকাত'[৪৫] السَّبْعُ الْمُعَلَّقَاتُ গোষ্ঠীভুক্ত

---

৪২. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৭; ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২৩৩; M. M. Badawi, Modern Arabic Literature, p. p. 358-359.

৪৩. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

৪৪. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, আলী বেক আল-কাবীর, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

৪৫. ইমরুউল কায়স (৫০০-৫৪০ খ্রি.), ত্বারাফা বিন আল-আব্‌দ (৫৪৩-৫৬৯ খ্রি.), যুহায়র বিন আবী সুলমা (৫৩০-৬২৭ খ্রি.), লাবীদ বিন রাবী'আ (৫৩১-৬৬১ খ্রি.), 'আমর বিন কুলসুম (মৃ. আনু. ৬০০ খ্রি.), 'আনতারা বিন শাদ্দাদ (৫২৫-৬১৫ খ্রি.) ও হারিস বিন হিল্লিযা (মৃ. আনু. ৫৮০ খ্রি.) এই সাতজন প্রাক-ইসলামী খ্যাতনামা আরব কবির সাতটি বিখ্যাত কাসীদা সংগৃহীত হয়ে একত্রে গ্রথিত হয়েছে বলে একে 'আল-সাবউল মু'আল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক' নামে অভিহিত করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাম্মাদ আল-রাবিয়্যাহ (মৃ. ১৫৫ হি./ ৭৭২ খ্রি.) প্রখ্যাত সপ্তগীতি কাব্য মু'আল্লাকাতের সংকলক। এই কাব্য সংগ্রহই

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম খ্যাতনামা কবি আনতারা বিন শাদ্দাদ আল আব্‌সী (৫২৫-৬১৫ খ্রি.) এর সংগ্রামবহুল জীবন কাহিনীই চিত্রায়িত হয়নি, বরং তৎকালীন আরবদের সমাজ ব্যবস্থার এমন একটি চিত্র অংকিত হয়েছে; যা দর্শকদের সামনে জীবন্ত হয়েই প্রতিভাত হয়।

নাটকটির ঘটনা পরিক্রমা জাহেলী যুগের শেষাংশে 'আব্‌স' ও 'আমের' এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রাক-ইসলামিক আরবের আব্‌স বংশের যুবক 'আনতারা বিন শাদ্দাদ' স্বীয় চাচা মালেকের কন্যা 'আবলা' কে ভালবাসতো। আবলাও আনতারাকে তাঁর ভাষার স্পষ্টতা ও তারুণ্যের দীপ্ততায় বিমুগ্ধ হয়ে সেই ভালবাসার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আনতারার পিতা উভয়ের পরিণয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে যে, আনতারা ছিল কৃষ্ণবর্ণের হাব্‌শী দাসীর সন্তান। যেজন্য আনতারা প্রথমতঃ শাদ্দাদের পুত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু পরে আনতারার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও অসামান্য শৌর্য-বীর্যের গুণাবলী শাদ্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাকে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে জন্মগত সম্বন্ধ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন এবং তার চাচাতো বোনের সাথে বিবাহে সম্মতি দেন।

এদিকে আব্‌লার পিতা তার কন্যাকে আনতারার সাথে বিবাহ দিতে অসম্মত হয় এবং সাখ্‌র আল-আমেরীর নিকট বিবাহ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর 'আবলা'কে আমের গোত্রের তাবুসমূহের দিকে অশ্বারোহী সৈনিকরা পাহারা দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় 'আনতারা' কাফেলার উপর বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়ে অনেককে হত্যা করে, অনেককে তাড়িয়ে দেয় এবং প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আব্‌লাকে ছিনিয়ে নেয়। আর সাখ্‌রের নিকট তার প্রিয়তমা 'নাজিয়া' নাম্নী এক যুবতীকে আব্‌লার বস্ত্র, চাদর ও ওড়না পরিধান করিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সাখ্‌রের কাছে কৌশলটি অনাবৃত থেকে যায়। ফলে সে 'নাজিয়া' কে আব্‌লা মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলে যা ঘটে গেছে তাতে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে থাকে। অনন্তর 'সাখর' 'নাজিয়া' কে বিবাহ করে নেয় এবং 'আনতারা' তার প্রেমিকা 'আবলা' কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়।[৪৬] 'আনতারা' শীর্ষক কাব্য নাটকটি চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে। আর এতে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মোট ১৪ টি প্রধান চরিত্র স্থান লাভ করেছে।[৪৭]

'আনতারা' নাটকটিতে আনতারা ও আব্‌লার কণ্ঠে আরব ঐক্যের প্রতি আহ্বান প্রাধান্য পেয়েছে। আর এটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রতি নির্দেশ করছে যা আহমাদ শাওকী তাঁর কাব্য নাটকগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আনতারা' নাটকের প্রধান চরিত্র আনতারার বিবাহের দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য। এতদ্ব্যতীত আনতারার 'দাহিস' ও 'ঘাবরা' যুদ্ধ বিজয় দুঃসাহসিক এক বীরত্বপূর্ণ পরিচয়ের অভিব্যক্তি। আনতারা স্বীয় অতুলনীয় কাব্যপ্রতিভা ও অসাধারণ বীরত্বের গুণাবলী দ্বারা সংগ্রামী জীবনের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। নিঃসন্দেহে আরবদের অতীত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'আনতারা' নাটকটি আহমাদ শাওকীর এক অমর সৃষ্টি।[৪৮]

প্রাক-ইসলামী যুগের আরবী কাব্য সংকলনগুলোর মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ও বিশ্ববিখ্যাত। দ্রঃ নূরুদ্দীন আহমদ, আস-সাব্‌উল মু'আল্লাকাত, (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২), পৃ.২৬; আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪০-৪৬; মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, ইমরুউল কায়স-এর জীবন ও তাঁর মু'আল্লাকায় প্রণয়গীতি, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৬৯, ফেব্রুয়ারী,২০০১, ফাল্গুন, ১৪০৭), পৃ. ১২৫।

৪৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৮-১০০৯; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯০; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৫।

৪৭. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, আনতারা, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

৪৮. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল-সিত্তু হুদা

আহমাদ শাওকী জীবন সায়াহ্নে 'আল-সিত্তু হুদা' الست هدى নামক মিলনাত্মক কাব্য নাটকটি রচনা করেন। অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে সঠিকভাবে এ নাটক রচনার সন-তারিখ উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৪৯] তবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জীবনী লেখকদের মতে আহমাদ শাওকী এটিকে তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচনা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আর প্রবল ধারণা এই যে, কবি নাটকটি ত্রিশের দশকের শুরুতে রচনা করেছেন।

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-সিত্তু হুদা' নাটকটির বিষয়বস্তু কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে নয়, বরং সমাজে বিস্তৃত সাধারণ জীবনের প্রেক্ষিত থেকে গ্রহণ করেন। আহমাদ শাওকী এতে একজন কৃপণ ধনাঢ্য মহিলার বৈবাহিক জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী অংকন করেছেন। এই নাটকটির কাহিনী বিংশ শতাব্দীর নয়। এই নাটকের নায়িকাও এ সময়কালের নয়, বরং উনবিংশ শতাব্দীর। আর নাটকটির পটভূমি ছিল কায়রো নগরীর হানাফী মহল্লায়, যেখানে ছিল কবির আবাসস্থল।

নাটকের ঘটনাবলী এই যে, 'আল-সিত্তু হুদা'(Madam Huda) নাম্নী প্রধান চরিত্রের ধনাঢ্য মহিলাটির ছিল সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লিপ্সা। কারণ সে জানত যে, লোকেরা সম্পদের জন্যই তার প্রতি ধাবিত হয়। তাই মহিলার বয়স চল্লিশোর্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে যুবতী হিসেবে উপস্থাপন করতে সদা তৎপর থাকত। মহিলাটি একাধিক বিবাহ করে। কিন্তু সে কোনটিতেই সুখী হতে পারেনি। কেননা তাঁর সকল স্বামীই তাকে কেবল ধন-সম্পদের লালসায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। ইতোপূর্বে নয়জন স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়, যারা একের পর এক তার পানি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করে অথবা তার আশা-আকাঙ্খার নিকটবর্তী হয়। এতে সে তাদের চরিত্র ও হীনমন্যতা নিয়ে কৌতুকাভিনয় করে। স্বামীদের কেউ তাকে তালাক দেয়, আর কেউ মৃত্যুবরণ করে। সর্বশেষ যে ব্যক্তি মহিলাটিকে বিবাহ করে তার বন্ধনেই মহিলাটি পরলোকগমন করে।

এই মহিলা যে কিভাবে নিজেকে তার জনৈক স্বামীর লালসার কবল থেকে মুক্ত করেছে আলোচ্য নাটকে আহমাদ শাওকী সেই খণ্ডচিত্রটি তুলে ধরেন। মহিলার দশম স্বামী 'সায়্যিদ আল-আজিযী' ছিল মদ্যপানে আসক্ত ও দরিদ্র প্রকৃতির। নাটকের শেষ পর্যায়ে মহিলার মৃত্যুর পর তার শেষ স্বামীর পরিচিতি দেওয়া হয়। তার স্বামী ভাবে যে, সে তার মৃত স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদের একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু সে মহিলাটির অসিয়তনামার সন্ধান পেয়ে এতে দেখতে পেল যে, তার স্ত্রী সমুদয় সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক কতিপয় মহিলার নামে আর বাদবাকী সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর সংস্থার নামে দান করে গেছে। মহিলা এমনভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে, সে তার স্বামীর জন্য এক কপর্দকও রেখে যায়নি। সুবিধাবাদী স্বামী তার স্ত্রীর এহেন প্রকৃত অবস্থা জানতে পেয়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং নাটকের শেষাংশে অট্টহাসিতে ও আবেগে ফেটে পড়ে মঞ্চ থেকে বের হয়ে যায়।[৫০]

'আল-সিত্তু হুদা' শিরোনামের কাব্যনাটকটি মোট তিনটি অধ্যায়ে পরিবেষ্টিত হয়েছে। এতে অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রধান ২৬ টি চরিত্র স্থান লাভ করেছে।[৫১] নাটকটিতে মিসরীয় সামাজিক

---

৪৯. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮৫; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৯; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়্যুবের বর্ণনা মতে, আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-সিত্তু হুদা' শীর্ষক কাব্যনাটকটি ১৩০৮ হি./১৮৯০ সালে রচনা করেন। দ্রঃ 'আল-আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্বদ, পৃ. ২১৩।

৫০. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২৮৯-২৯৮; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; John A. Haywood, Modern Arabic Literature 1800-1970, P..P. 91-92.

৫১. আহমাদ শাওকী , আল-সিত্তু হুদা, (বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের হাল-হাকীকত, স্বভাব, চরিত্র, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি চিত্রায়িত হয়েছে। পরিবর্তনশীল জীবনের গভীরতা ও মিসরীয় সমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্কের নৈকট্য বর্ণনা করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। আহমাদ শাওকী এ নাটক রচনায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও নাটকটি চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুর্বল। এতে বিবাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন এবং অন্যের সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেয়ে সম্পদ হরণের প্রতি অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও এই নাটক পাঠ করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না এবং কাহিনীটি হাস্যরস ও কৌতুক বর্জিত, তবুও 'আল-সিত্তু হুদা' নাটকটিতে বেশ কিছু হাস্যরসাত্মক কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমানে মুদ্রিত এ নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী।[৫২]

৭. আল-বাখীলা

আহমাদ শাওকী বিরচিত 'আল-বাখীলা' اَلْبَخِيْلَة নামক আরেকটি মিলনাত্মক কাব্যনাটকের সন্ধান পাওয়া যায় যা প্রকাশিত হয়নি। ১৩২৫ হি./ ১৯০৭ সালে আহমাদ শাওকী 'আল-বাখীলা নাটকটি রচনা করেন। কিন্তু এটি পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে যায়। অবশ্য 'আল-শাওকিয়্যাত আল-মাজহুলাহ' গ্রন্থটি 'আল-বাখীলা' নাটকের যে অংশগুলো আহমাদ শাওকী লিখেছিলেন তা অন্তর্ভুক্ত করেছে।[৫৩]

তবে 'আল-বাখীলা' শীর্ষক নাটকটির অধিকাংশ অংশ হারিয়ে গিয়েছে বলে প্রবল ধারণা করা হয়। আর প্রকৃতই কবি কর্তৃক রচিত নাটকটির মূল পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ হারিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে আহমাদ শাওকী তাঁর জীবদ্দশায় এর প্রতি পুনরায় আত্মনিয়োগ করতে পারেননি।[৫৪]

কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যাবলী

আহমাদ শাওকীর কাব্যনাটকসমূহ একদিকে ইতিহাস দ্বারা এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত বলে পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে আহমাদ শাওকী তাঁর কাব্যনাটকসমূহে ইতিহাসের দীর্ঘ মেয়াদী ও অত্যাধিক অতিরঞ্জন করেছেন। এতে তিনি তাঁর বিষয়বস্তুসমূহের ঘটনাবলী চয়ন করেছেন। কিন্তু আরবী চলমান গতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহ থেকে ঘোমটা খুলে দেয়ার কারণে এবং পাশ্চাত্য উপকরণাদির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরুণ তিনি সেগুলোকে খুব একটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। বরং তিনি শুষ্ক বিষয়াদিতে দুর্বল আন্দোলন প্রবেশ করাতে সচেষ্ট হন, যা তাঁর নাটককে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষতঃ ঘটনাবলীতে বিভ্রান্তিকর বিষয় ও কুসংস্কারাদি সংযোজন করার ফলে ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং কাম্য সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক লক্ষ্যবস্তুসমূহ সুদূর পরাহত হয়েছে।[৫৫]

নাটকের প্রধান উপজীব্য তথা বিষয়বস্তুতে প্রেমের কাহিনী সন্নিবিষ্ট করার কারণে ঐতিহাসিক মূল্য যেমনভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে তেমনি প্রেমের ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বিবরণাদির সাথে একই বন্ধনে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত না হওয়ার ফলে নাট্য উপন্যাসের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতার কারণ হয়েছে এবং কিঞ্চিৎ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এটি শৈল্পিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিষয়বস্তুর চরিতার্থ করার জন্য ও কাল্পনিক বিষয়াদিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি ইতিহাস বিকৃতি

---

৫২. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

৫৩. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়ূব, আল-আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২১৪।

৫৪. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯১।

৫৫. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯১-১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ফলশ্রুতিতে যা ঐতিহাসিক তথ্যাদির সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।[৫৬] আহমাদ শাওকী ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত কোন কোন নাটকে ঘটনাবলীর সংরক্ষণে সক্ষম হলেও ঐ সকল বিষয়বস্তুর চেতনা সংরক্ষণে সক্ষম হননি। এর বহুবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন- অপরাপর দৃষ্টান্তের মধ্যে আব্‌লার পিতা 'মালেক' আরবীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাকে ধূর্ত, নিকৃষ্ট, লোভী ও হিংসুক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। অথচ ঐতিহাসিকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, আরবরা তাদের নেতৃবৃন্দের নির্বাচনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর তিনি 'আনতারা' ও 'আব্‌লা' কে আরব ঐক্যের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে চিত্রায়ণ করেছেন। অথচ জাহেলী যুগের লোকেরা স্বভাবতই এককভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে থাকত এবং তারা জাতীয়তার মধ্যে উপজাতীয় স্বজনপ্রীতিকে অতিক্রম করত না।[৫৭]

উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারাও আহমাদ শাওকী ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তাঁর নাট্যকবিতার জন্য পাশ্চাত্য নাটকের প্রতিটি আন্দোলনকে উদ্ধৃত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ চয়ন কাজে তিনি দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর বিপরীতে পৌঁছেছেন।[৫৮]

শাওকীর নাট্যদক্ষতা সম্পর্কে সমালোচকদের মূল্যায়ন

আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পন্ডিত ও বিশিষ্ট সাহিত্য সামালোচক ড. ত্বাহা হুসাইন (১৩০৭-১৩৯৩ হি./১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) আহমাদ শাওকীর নাট্যদক্ষতা সম্পর্কে যথাযথ মন্তব্য করে বলেছেন যে, "নিশ্চয়ই শাওকী আরবী কবিতায় নাট্যকাব্যের জনক বা স্রষ্টা।"[৫৯]

এতদ্ব্যতীত ড. ত্বাহা হুসাইন নাট্যকার হিসেবে আহমাদ শাওকীর বিরল প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "অভিনয়ের ক্ষেত্রে শাওকী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, গেয়েছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন; কিন্তু তিনি নিজে অভিনয় করেননি। কেননা অভিনয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে করা যায় না এবং এর প্রতি তিনি ধাবিত হননি। এটি এমন একটি শিল্প যাতে যৌবন, অধ্যয়ন ও পঠনের প্রয়োজন হয়।...তাই তার অভিনয় ছিল আকৃতিগতভাবে, যাতে আত্মার ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়েছে। যদি ও তিনি মানুষের নিকট এটি জনপ্রিয় করেছেন তবে এতে সঙ্গীতের উৎকর্ষতা নেই।"[৬০]

ড. ত্বাহা হুসাইনের উপরোল্লিখিত উক্তির বিরোধিতা করে আধুনিক আরবী সাহিত্য জগতের খ্যাতনামা লেখক, সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. শাওকী দায়ফ (জন্ম-১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি.) মন্তব্য করেন যে, "বরং আমরা বলব যে, নিশ্চয়ই শাওকী অভিনয় করেছেন ও গেয়েছেন; অথবা সঙ্গীতের জন্য অভিনয়ের বিরাট সুযোগ প্রদান করেছেন, আর এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং তিনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তা সম্পাদন করেছেন।"[৬১]

আহমাদ শাওকীর কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনায় সমকালীন প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও জীবনী লেখক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ (১৩০৭-১৩৮৪ হি./১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন যে, "আহমাদ শাওকীর নাট্যসমূহ সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের তথ্যাদি সংরক্ষণ করেছে, আর কোথাও তা উপেক্ষিত ও পরিবর্তিত হয়ে

---

৫৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৯।

৫৭. মুহাম্মদ হামেদ শওকত, আল-মাসরাহিয়্যাতু ফী শি'র শাওকী, (কায়রো, ১৯৪৭), পৃ.৭৮।

৫৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯২।

৫৯. ড. ত্বাহা হুসাইন, হাফিজ ওয়া শাওকী, (কায়রো: মাত্‌বা'আতু আল-ই'তিমাদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৩৩), পৃ.২২৪।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৬১. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে এতে দোষের কিছু হয়নি। কারণ কবি তো একজন ঐতিহাসিক নন, আর নাটক ইতিহাসের গ্রন্থও নয়।"[৬২]

এতদসম্পর্কে বিশিষ্ট পন্ডিত ও সাহিত্য সমালোচক ড. মুহাম্মদ মানদূর (১৩২৫-১৩৮৫ হি./১৯০৭-১৯৬৫ খ্রি.) এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, "নিশ্চয়ই শাওকীর নাটক বিশেষ করে বিয়োগান্ত কাব্যনাটক শীর্ষচূড়ায় উপনীত হয়, যখন এতে সুরারোপ করা হয় এবং অপেরা হাউজের ন্যায় নাট্যমঞ্চে পরিবেশন করা হয়।" [৬৩]

মোদ্দাকথা এই যে, আহমাদ শাওকীর নিকট নাট্য উপন্যাস হচ্ছে কাব্য ইতিহাস তথা সঙ্গীত তথা চলচ্চিত্র; যা নাট্যউপন্যাস ছাড়া সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। এহেন ক্রটি সত্ত্বেও বিয়োগান্ত নাটকের চারিত্রিক মূল্য বিরাট। কারণ এতে ব্যক্তির অহংকার , চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, বীরত্ব এবং সামাজিক মহৎ গুণাবলীর প্রতি উৎসাহ, দেশপ্রেম, স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব, দাসত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অত্যাচারিতের প্রতি সাহায্য করার উৎসাহ প্রদান বিষয়ক দৃশ্য সম্বলিত চরিত্রগুলোর মূল্য অপরিসীম। তাই আমরা আহমাদ শাওকীকে আরবী কাব্য নাটকের জনক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কেননা তিনিই প্রথম আরবী কবিতাকে গতানুগতিক বন্ধনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে একে আধুনিক নাটকের চাহিদাসমূহের বশীভূত করেন।[৬৪]

গদ্যসাহিত্যে শাওকীর অবদান

পদ্যের ন্যায় গদ্যেও আহমদ শাওকীর অবদান অসামান্য। তাঁর গদ্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা সম্ভারের মধ্যে রয়েছে চারটি উপন্যাস, একটি নাটক ও কতিপয় সামাজিক প্রবন্ধ।[৬৫] নিম্নে গদ্য ক্ষেত্রে তার অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

উপন্যাস

আহমাদ শাওকী বিরচিত উপন্যাস চারটি হচ্ছে যথাক্রমে 'আযরাউল হিন্দ' عَذْرَاءُ الْهِنْدِ 'লাদিয়াস' لَادِيَـاسْ 'ওয়ারাকাত আল-আস' وَرَقَـةُ الآسِ ও 'মুহাওয়ারাতু বিনতাউর' مُحَاوَرَةُ بِنْتَاوُر। এগুলো ধারাবাহিকভাবে কায়রোর বহুল প্রচারিত ও প্রখ্যাত 'আল-আহ্‌রাম' الأَهْرَام পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৬৬] এ উপন্যাসগুলো রচনাকাল, পটভূমি, বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. আযরাউল হিন্দ

আহমাদ শাওকী কর্তৃক ১৩১৫ হি./১৮৯৭ সালে রচিত ও মুদ্রিত 'আযরাউল হিন্দ' عَذْرَاءُ الْـهِنْدِ বা 'ভারতবর্ষের কুমারী' শীর্ষক উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রাচীন মিসরীয় ইতিহাস থেকে গৃহীত। যার কাহিনী পরিব্যাপ্ত হয়ে মিসরের প্রাচীনতম ফির'আউন দ্বিতীয় রামেসীস (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০১-১২৩৫

---

৬২. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, রিওয়ায়াতু কামবীয ফী আল-মীযান, (কায়রো, তা. বি.), পৃ. ২০-৪৮।

৬৩. ড. মুহাম্মদ মানদূর, মুহাদারাতু 'আন মাসরাহিয়্যাতু শাওকী, (কায়রোঃ ১ম প্রকাশ, ১৯৫৪), পৃ. ৫৮।

৬৪. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০১১-১০১২।

৬৫. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, শু'আরাউ মিসর, পৃ. ১৫৫-১৮৮।

৬৬. হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

অব্দ) যিনি 'সীয ওয়া সাতরীস' নামে পরিচিত; এর সময়কালীন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।[৬৭]

২. লাদিয়াস

আহমাদ শাওকীর 'লাদিয়াস' لَادِيَاسْ অথবা 'আখির আল-ফারা'আনা' آخِرُ الْفَرَاعِنَةِ শীর্ষক উপন্যাসটি ১৩১৬ হি./১৮৯৭ খ্রি. মতান্তরে ১৮৯৯ সালে রচিত ও মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বিস্মাতিক (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৪-৫৮৯ অব্দ) এর যুগের পরবর্তী খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মিসরের হালচিত্রের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে সর্বশেষ ফির'আউন 'লাদিয়াস' উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়।

আহমাদ শাওকী ১৩১৮ হি./১৯০০ সালে 'দিল ওয়া তীমান' دِلْ وَتِيْمَانْ নামক একটি উপন্যাস রচনা করেন, যা অপ্রকাশিত থেকে যায়। এ উপন্যাসটিকে 'লাদিয়াস' এর উপসংহার বলে গণ্য করা হয়।[৬৮]

৩. ওয়ারাকাত আল-আস

১৩২৩ হি./১৯০৫ সালে আহমাদ শাওকী বিরচিত ও মুদ্রিত 'ওয়ারাকাত আল-আস' وَرَقَــةُ الآسِ নামক উপন্যাসটির কাহিনী পারস্য সম্রাট সাবূর (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭২-২৪১) অব্দ এর সময়কালের ঘটনাবলী নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এতে 'লাদিয়াস' উপন্যাসের চেয়ে অনেক কম ছন্দ রয়েছে। আর এ থেকে সমালোচকগণ দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে, এটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে রচিত হয়েছে।[৬৯]

৪. মুহাওয়ারাতু বিনতাউর

'মুহাওয়ারাতু বিন তাউর' مُحَاوَرَاتُ بِنْتَاوُرْ নামক গ্রন্থটি আহমাদ শাওকীর আরেকটি সামাজিক সমালোচনামূলক নিবন্ধ তথা উপন্যাস, যার অধিকাংশগুলো ছন্দযুক্ত ছাঁচে রচিত হয়েছে।[৭০] ১৩১৯ হি./১৯০১ সালে আহমাদ শাওকী 'শয়তান বিনতাউর: আউ লাবুদ লুকমান ওয়া হুদহুদ সুলায়মান' شَيْطَانُ بِنْتَاوُرْ: أَوْ لُبَدُ لُقْمَانَ وَهُدْ هُدْ سُلَيْمَانَ শীর্ষক উপন্যাসটি রচনা করেন। এটি একটি কথোপকথনমূলক গ্রন্থ, যাতে আহমাদ শাওকী মিসরের প্রাচীনতম ফির'আউন রা'মেসীস আল-আকবার (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩১৪-১৩১২ অব্দ) এর কবি 'বিনতাউর' এর সাথে গোপন কথা বলেছেন। যাকে তিনি দীর্ঘজীবি শকুন 'লাবদ' لُبَدْ এর আকৃতিতে কল্পনা করেছেন। যাহোক, আহমাদ শাওকী ছিলেন কাঠ ঠোক্‌রা 'হুদহুদ' هُدْ هُدْ পাখী এবং দু'জন কবির মধ্যে মিসর সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিকতায় মিসরের পরিবর্তন প্রসঙ্গে সংলাপ পরিচালনা করেন।[৭১]

---

৬৭. আহমাদ যাকিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৫-৭৬; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৭; ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৩০৬।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌য, 'আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১৩-২১৪; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৬৯. প্রাগুক্ত; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯৮।

৭০. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ.৮১।

৭১. ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয্‌য, 'আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নাটক

কাব্যনাটকের ন্যায় গদ্যেও নাটক রচনায় আহমাদ শাওকী যে সিদ্ধহস্ত এ বিষয়টি প্রমাণের উদ্দেশ্যেই তিনি 'আমীরাত আল-আন্দালুস' নামক একটি বিয়োগাত্মক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। আহমাদ শাওকীর বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচকগণ 'তিনি গদ্য নাটক লেখায় পারদর্শী নন' এরূপ অভিযোগ করলে কবি তাদের ভিত্তিহীন দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন।[৭২]

এ নাটকটি রচনাকাল, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ আলোচিত হল:

১. আমীরাত আল-আন্দালুস

আহমাদ শাওকী তাঁর জীবন সায়াহ্নে ১৩৫১ হি./১৯৩২ সালে 'আমীরাত আল-আন্দালুস' أَمِيرَةُ الأَنْدَلُس তথা 'স্পেনের রাজকুমারী' শীর্ষক একমাত্র গদ্য নাটকটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।[৭৩] এ নাটকটির ঘটনাবলী উপজাতীয় রাজবংশের শাসনামলে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী মোতাবেক একাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে স্পেন ও সুদূর মরক্কোতে পরিব্যপ্ত। এতে স্পেনীয় আরবদের ঐতিহাসিক আন্দোলন সমূহ বিধৃত হয়েছে।[৭৪]

'আমীরাত আল-আন্দালুস' নাটকটির বিষয়বস্তু প্রধানত: দু'টি সর্গে বিভক্ত, প্রথম অংশে ইশবেলীয় বাদশাহ মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (৪৩১-৪৮৮ হি./১০৪০-১০৯৫ খ্রি.) যিনি আল-মু'তামীদ বিন আব্বাদ নামে পরিচিত; তিনি কিভাবে পরাজিত হন এবং মরক্কোর 'ইগ্মাত' এ সপরিবারে নির্বাসনের হাল-হাকীকাত ও তাঁর সামগ্রিক অবস্থার বিবরণাদি চিত্রিত হয়েছে। ঘটনা এই যে, আল-মু'তামীদ এবং তাঁর আশেপাশের রাজাদের মধ্যে আল-আসবানের বাদশাহ আল-ফুন্স ও স্বীয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের উপজাতীয় বাদশাহগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিগ্রহ বিদ্যমান ছিল। মরক্কোর বাদশাহ ইউসুফ বিন তাশ্ফীন, তাঁর সেনাপতিগণ ও মন্ত্রীবৃন্দ আন্দালুসের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং আল-আসবানের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আর উপজাতীয় বাদশাহগণ তাদের এই সশস্ত্র প্রতিবেশীর ভয়ে আতংকিত ছিল। আল-মু'তামীদের প্রজাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অনতিবিলম্বে চক্রান্তকারীদের আক্রমণে কর্ডোভার পতন ঘটে। অতঃপর আল-মু'তামীদ পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে সমুদয় পরিবার সহ মরক্কোর 'ইগ্মাত'-এ নির্বাসিত হন।

দ্বিতীয় অংশটি ইশ্বেলীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী আবুল হাসান এর পুত্র 'হাসূন' এর সাথে আল-মু'তামীদের কন্যা 'আমীরাত আল-আন্দালুস' তথা স্পেনের রাজকুমারী 'বুসায়না' এর প্রেম উপাখ্যান। ঘটনাটি এই যে, বুসায়নার প্রতি হাসূনের দৃষ্টি বিনিময়ের পর তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে ছদ্মবেশে বুসায়না তার প্রেমিকের সাথে কথাবার্তায় নিমগ্ন থাকাকালে জানতে পারে যে, সে তার ভাই জাফরের ঘাতক। এতে সে সম্বিত হারিয়ে ফেলে এবং তার মাথা থেকে টুপিটি পড়ে যায়। তখন হাসূন তার গভীর প্রেমে পড়ে যায়। অতঃপর যখন আল-মু'তামীদ সপরিবারে নির্বাসিত হন তখন 'বুসায়না' জনৈক মরক্কোবাসীর হাতে বন্দী হলে সে তাকে বিক্রি করতে চায়। ব্যবসায়ী আবুল হাসান তাকে স্বীয় পুত্র হাসূনের জন্য ক্রয় করে নেয়। অনন্তর তার সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হলে বুসায়না তার পিতার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে

---

৭২. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২৭৫।

৭৩. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৮; উল্লেখ্য যে, আহমাদ শাওকী স্পেনে স্বেচ্ছা নির্বাসনকালীন (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.) সময়ে ইশ্বেলীয় সুলতান আল-মু'তামীদ বিন আব্বাদের সপরিবারে নির্বাসনের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে বসেই 'আমীরাত আল-আন্দালুস' নাটকে পাণ্ডুলিপি রচনায় প্রয়াস পান। দ্র: ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৫; ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল-আয়ূব, 'আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ, পৃ. ২১৪।

৭৪. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে তারা আল-মু'তামীদের নির্বাসনস্থলে গিয়ে তার সম্মতি লাভ করে এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৭৫]

আহমাদ শাওকী বিরচিত 'আমীরাত আল-আন্দালুস' শীর্ষক নাটকটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে। এ নাটকটিতে মূল ১৬ টি চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গদ্য নাটকে আহমাদ শাওকী তাঁর চিরাচরিত ছন্দোবদ্ধ রচনা থেকে বিরত থাকেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত আন্দালুসের রাজা-বাদশাহ্ ও তাদের জীবন কাহিনী এই নাটকের প্রধান উপজীব্য।[৭৬]

প্রবন্ধ

আহমাদ শাওকীর বিভিন্ন বিষয়ে রচিত সামাজিক প্রবন্ধাবলীর সংকলন রয়েছে, যথা- 'আস্ওয়াক আল যাহ্ব'। এর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১. আস্ওয়াক আল-যাহ্ব

আহমাদ শাওকী বিরচিত সামাজিক প্রবন্ধাবলী 'আস্ওয়াক আল-যাহ্ব' أَسْوَاقُ الذَّهَب শিরোনামে গ্রন্থাকারে ১৩৫১ হি./১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। এগুলোর বিবিধ বিষয়বস্তু যেমন - স্বাধীনতা اَلْحُرِّيَّةُ স্বদেশ اَلْوَطَنُ সুয়েজ খাল قَنَاةُ السُّوَيْسِ পিরামিড اَلأَهْرَامُ মৃত্যু اَلْمَوْتُ অজ্ঞাত সৈনিক اَلْجُنْدِيُّ الْمَجْهُوْلُ প্রভৃতি। এর পরিশিষ্টে অনেকগুলো উপদেশাবলী, ছোট ছোট নীতিবাক্য ও জ্ঞানের কথা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যাতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনেক শিক্ষণীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে।[৭৭]

সাধারণ ধারণা এই যে, আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইব্ন উমর জারুল্লাহ আল-যামাখ্শারী (৪৬৭-৫৩৮ হি./১০৭৫-১০৪৫ খ্রি.) ও আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী (২৮৪-৩৫৬ হি./৮৯৮-৯৬৮ খ্রি.) বিরচিত 'আত্বাক আল-যাহ্ব' أَطْبَاقُ الذَّهَب শীর্ষক দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের শিরোনামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আহামদ শাওকী স্বীয় প্রবন্ধাবলীর জন্য 'আস্ওয়াক আল-যাহ্ব' শিরোনামটি বেছে নেন।[৭৮] আহমাদ শাওকী স্বয়ং এ প্রবন্ধ সংকলন সম্পর্কে বলেছেন, "এটি হচ্ছে গদ্যের কয়েকটি অধ্যায়, যাকে আমি মনে করি যিয়াদের উজ্জ্বলতা, অথবা ইয়াদের অলংকারপূর্ণ পরিচ্ছেদ অথবা মিয়াদের ডালের শাখায় উপর হার পরিহিত ছন্দ।"[৭৯]

'আস্ওয়াক আল-যাহ্ব' নামক এ গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ ছন্দযুক্ত গদ্যে লিখিত। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে ছন্দের মিল হাল্কা হয়েছে বলে মনে হয়। যদিও আহমাদ শাওকী গদ্য ছন্দের প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী। এজন্য তাঁর গদ্যকে বলা হয় 'শি'র আল-আরবী আল-ছানী' شِعْرُ الْعَرَبِيّ

---

৭৫. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৮৯-১৯০; ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২৭৫-২৮৮।

৭৬. দ্রঃ আহমাদ শাওকী, আমীরাত আল-আন্দালুস, (বৈরুতঃ দার আল-আউদা, ১৯৮১)।

৭৭. আহমাদ কাফিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৬; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৭; হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আরবী, পৃ. ৪৪১।

৭৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৯৮।

৭৯. আহমাদ শাওকী, আস্ওয়াক আল-যাহাব, (কায়রো, মাতবা'আত আল-ইসতিকামা, ১৯৫১), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

الثاني বা 'দ্বিতীয় আরবী কাব্য'। আর তিনি নমনীয় পদ্য ছন্দ সমূহের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন, যা সাধু আরবীর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।[৮০]

আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা

আহমাদ শাওকীর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং কাব্য প্রতিভা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে এবং পরিবেশের বৈচিত্র্যতার প্রভাবে। এ পরিবেশ ও উপাদানের বিভিন্নতা আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিত্বে উন্নাসিকতা ও অস্থিরতার উন্মেষ ঘটায় । যেমন-

ক) উন্নত সংস্কৃতি, যদ্বারা তিনি সংস্কৃতমনা হয়েছেন।

খ) সুদীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণ, যার মাধ্যমে তাঁর সামাজিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছে।

গ) তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা।

ঘ) তাঁর কাব্যে দক্ষতা।

ঙ) তাঁর পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের কবিতা অধ্যয়ন এবং তাঁদের রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক।

এ সকল উপাদান আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা ও সাহিত্যিক দক্ষতা অর্জনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে।[৮১]

আহমাদ শাওকীর কাব্যজগতে প্রবেশ ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল :

১. রাজপ্রাসাদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক

আহমাদ শাওকীর জন্ম হয়েছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারে এবং তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন রাজকীয় প্রাসাদে প্রাচুর্যের মধ্যে। এ প্রাচুর্যময় পারিবারিক পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং রাজপরিবারের সদস্যদের সাথে তাঁর উঠাবসা ও মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞানভান্ডার উন্মোচিত হয়।

মুহাম্মদ আলী পাশার রাজদরবারের তত্ত্বাবধানে আহমাদ শাওকী যে ভান্ডার লাভ করেছিলেন সে কথা প্রকাশ করে ড. শাওকী দায়ফ (জন্ম-১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি.) বলেছেন যে, "শাওকী জাতির ধারায় সম্পৃক্ত ছিলেন না, কেননা তিনি রাজপ্রাসাদে লালিত-পালিত হন এবং খেদীব আব্বাসের প্রভাবে জীবন-যাপন করেন। তাই যখন তাঁর শাসক আক্রান্ত হন তখন তিনি উদ্বেলিত হন, আর যখন জাতির গালে চপেটাঘাত দেয়া হয় তখন তিনি উদ্বেলিত হন না।"[৮২]

এতদসম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৩০৫-১৩৭৬ হি./১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.) বলেন, "আহমাদ শাওকী ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার প্রতিবেশিত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হন। তাই স্বভাব সুলভভাবেই তিনি রাজপ্রাসাদের নৈকট্যে থাকায় এর পরিবেশের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হন। কারণ এটি ছিল মূল রঙ্গমঞ্চ, যাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ, প্রচার, প্রসার ও আন্দোলন গড়ে উঠে এবং জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। আর একজন রাজদরবারী কবি অন্যান্য মানুষের চেয়ে এ সমুদয় অবস্থার দ্বারা বহুগুণ বেশী প্রভাবিত হয়ে থাকেন। তাই আহমাদ শাওকীর কবিতা ও তাঁর জীবনে উল্লিখিত উপকরণের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"[৮৩]

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৮১. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৫।

৮২. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২১।

৮৩. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনা অধ্যয়ন

যে গবেষণার দ্বারা প্রতিভাবান কবি হিসেবে আহমাদ শাওকী প্রসিদ্ধি লাভ করেন উচ্চ সংস্কৃতি ব্যতিরেকে বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের পদাংক অনুসরণে তিনি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হন। যথা-আবূ ফিরাস আল-হামাদানী (৩২০-৩৫৭ হি./ ৯৩২-৯৬৮ খ্রি.), আবুল আলা আল-মা'আররী (৩৬৩-৪৪৯ হি./৯৭৩-১০৫৮ খ্রি.), আবুল আতাহিয়্যা ইসমাঈল বিন আল-কাসিম (১৩০-২১০ হি./৭৪৮-৮২৫ খ্রি.), আব্বাস বিন আল-আহনাফ (মৃ. ১৯২ হি./ ৮০৮ খ্রি.) ও আল-বাহা যুহাইর আল-মুহাল্লাবী (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.) প্রমুখ কবিদের রচনা তিনি অধ্যয়ন করেন। আর যাদের দ্বারা আহমাদ শাওকী তাঁর কাব্যে সর্বাধিক প্রভাবিত হন তন্মধ্যে আবূ তাইয়্যেব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হি./ ৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্যও অধ্যয়ন করেন এবং প্রখ্যাত পন্ডিত, সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের গ্রন্থাদিতে গভীরভাবে বুৎপত্তি অর্জন করেন। যেমন-আল্লামা আবূ ওসমান আল-জাহিয (১৫৯-২৫৫ হি./৭৭৫-৮৬৮ খ্রি.) এর 'কিতাব আল-হাইওয়ান' كِتَابُ الْحَيَوَان , আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ আল-মুবারাদ (২১০-২৮৬ হি./৮২৬-৮৯৮ খ্রি.) এর 'আল-কামিল' اَلْكَـــامِلُ , আবূ আলী আল-কালী (২৮৮-৩৫৬ হি./ ৯০১-৯৬৭ খ্রি.) এর 'আল-আমালী' اَلْأَمَالِي ও আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী (২৮৪-৩৫৬ হি./৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.) এর 'আল-আগানী' اَلْأَغَانِي প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে আহমাদ শাওকী বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন।[৮৪] এতদ্ব্যতীত তিনি অভিধানসমূহের অধিকাংশ শব্দ, তার অর্থ, সেগুলোর উৎপত্তি, পরিমাপ الوزن ও মূলসমূহ মুখস্থ করায় ব্রতী হন এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে তিনি পান্ডিত্য লাভ করেন।[৮৫]

তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে রয়েছেন আল-আযহারের বিশিষ্ট অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আল-বাস্‌ইউনী আল-বায়ানী (মৃ.১৩১০ হি./১৮৯২ খ্রি.)। আর কবিদের মধ্যে যারা প্রাচীনদের কবিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং যাদের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছেন তাদের মধ্যে খ্যাতনামা কবি ইসমাঈল সাব্‌রী (১২৭১-১৩৪২ হি./ ১৯৫৪-১৯২৩ খ্রি.) ও মাহমূদ সামী আল-বারূদী (১২৫৫-১৩২২ হি./১৮৩৮-১৯০৪ খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আহমাদ শাওকীর দীওয়ানের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের নামসমূহ অবগত হওয়া যায়, যাদের দ্বারা তিনি স্বীয় কাব্য, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মীয় ও জাগতিক সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়েছেন।[৮৬]

তিনি ইতিহাস গ্রন্থাদির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, যা তাঁকে মিসর ও আরব দেশসমূহের অতীত গৌরব, ঐতিহ্য, ইসলামের সভ্যতা ও এর মহান বিধি-বিধান সম্পর্কে পান্ডিত্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করেছে। অনুরূপভাবে ফির'আউনী সভ্যতা এবং অতুলনীয় নিদর্শনাবলীর প্রভাবও তিনি লাভ করেন।

প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনা অধ্যয়নে আহমাদ শাওকী স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশস্থলে আরবীয় সম্পদের পাশাপাশি যে সব ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এর মাধ্যমে তিনি বিদেশী সংস্কৃতি একত্রিত করতে সক্ষম হন। ভাষাগুলো হচ্ছে, প্রথমতঃ তুর্কীভাষা- যা তিনি মিসরের অনুবাদ বিদ্যালয়ে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। আর দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ভাষা-যা তিনি প্যারিসে শিখেছিলেন।[৮৭]

---

৮৪. আহমাদ মাহফূয , হায়াতু শাওকী, পৃ. ১৩৩।

৮৫. আহমাদ আবদুল ওয়াহ্হাব আবুল আয , ইছ্না আশারা 'আমান ফী সোহবাতি আমীর আল-শুআরা, পৃ. ৮৬।

৮৬. আহমাদ মাহফূয, হায়াতু শাওকী, পৃ. ১৩৩।

৮৭. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিক গবেষণা

আহমাদ শাওকীর অতুলনীয় প্রতিভা ও সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. ত্বাহা হুসাইন (১৩০৭-১৩৯৩ হি./১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) বলেছেন, "শাওকী প্রথমতঃ সংস্কৃতির প্রীতিতে সংস্কৃতিবান হন, অনন্তর এর অন্বেষণে ও এর দ্বারা সমৃদ্ধ হতে তিনি অত্যন্ত তৎপর হন। কিন্তু শাওকী অন্যান্য মিসরীয় যুবকদের ন্যায় সৎপথ ব্যতীত অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনে পরিভ্রমণ করতেন, বিশেষতঃ যখন তারা ইউরোপে অধ্যয়ন করছিল। উদাহরণ স্বরূপ তারা যখন ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তখন তারা শুধু তাই অধ্যয়ন করত যা একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তির জন্য এই উন্নত নিদর্শনাবলী অধ্যয়ন করা অপরিহার্য করা হয়েছিল। সুতরাং সংস্কৃতিতে বুৎপত্তি লাভ ও সাহিত্যে আনন্দ অন্বেষণের ক্ষেত্রে তাদের কোন অংশ ছিলনা।"[৮৮]

অনুরূপভাবে আহমাদ শাওকী যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ফ্রান্সে গমন করেন এবং যখনই ফরাসী কাব্যের বর্ণনা দেন তখন তিনি 'লা-মারটিনি' (La-Martine) ও তার 'আল-বাহীরাহ' اَلْبُحَيْرَةُ গ্রন্থের উল্লেখ করেন, যা তিনি আরবীতে ভাষান্তর করেন। অথবা 'লা-ফনটেইনে' (La-Fantaine) ও তার আরবীতে অনূদিত প্রাচীন কাহিনীসমূহের উল্লেখ করেন। আর দর্শনের উল্লেখ করার সময় তিনি দার্শনিক 'সায়মন'(Simon)[৮৯] এর বর্ণনা দেন, কিন্তু তিনি 'টেইন'(Taine),[৯০] 'রেনান' (Renan),[৯১] 'বার্গসুন' (Bergson)[৯২] এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করেননি। এটি সংস্কৃতি গবেষণার তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সহজ ও সরলের প্রতি তাঁর

---

৮৮. ড. ত্বাহা হুসাইন, হাফিজ ওয়া শাওকী, পৃ. ২০০।

৮৯. কোমট ডি সায়মন (১৬৭৫-১৭৫৫/১৭৬০-১৮২৫ খ্রি.) একজন বিখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিক, পণ্ডিত, লেখক ও সাহিত্যিক। তিনি ফরাসী রাজদরবারে তাঁর জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত করেন। ফলে তিনি মূল্যবান প্রতিবেদনসমূহ রেখে যান। যাতে তিনি রাজদরবারের ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁর সমসাময়িক চরিত্র অংকন করেন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা বাতিল করার প্রতি আহ্বান জানান। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৭৭: ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৩৪৮।

৯০. টেইন হিপ্পোলেইট এডলফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক। তাঁর দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে ইংরেজ সৃজনশীল দর্শন এবং জার্মান আদর্শ দর্শনের মধ্যবর্তী। তিনি সাহিত্য সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। দ্রঃ মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৮২: ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ.২০০।

৯১. আরনেষ্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯২ খ্রি.) একজন খ্যাতনামা ফরাসী ঐতিহাসিক, দার্শনিক, লেখক ও পণ্ডিত। তিনি লেবানন ও ফিলিস্তিনে তথ্যানুসন্ধানে গুরুত্ব আরোপ কারীদের পথিকৃত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলী হচ্ছে 'হায়াতু ইয়াসু' حَيَاةُ يَسُوْعَ অর্থাৎ 'যিশুর জীবনী' (Vie de Jesus), যা ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৩১৭: মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী। আল-মাওরিদ, মু'জাম আল-অ'লাম, পৃ. ৭৪।

৯২. হেনরী বার্গসুন (১৮৫৯-১৯৪১ খ্রি.) একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক। তিনি উদ্ভাবক মতবাদ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মবাদকে সংরক্ষণ করেন। ফলে তাঁর এহেন শিক্ষার বিরাট প্রভাব পতিফলিত হয়। অস্তিত্ববাদ বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে, 'আলমুহাওয়ালা ফী দারসে আওদায়ী আল-বিজদান'; اَلْمُحَاوَلَةُ فِي دَرْسِ أَوْضَاعِ الْوِجْدَانِ 'অস্তিত্ববাদের অবস্থাবলী অধ্যয়নে প্রচেষ্টা', 'আল-মাদ্দা ওয়া আল-যাকেরাহ', اَلْمَادَّةُ وَالذَّاكِرَةُ 'জড়বাদ ও স্মৃতি', 'আল-তাতাওউর আল-খাল্লাক' اَلتَّطَوُّرُ الْخَلَّاقُ, সৃজনশীল বিবর্তন। ১৯২৭ সালে তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। দ্রঃ ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ১২৫-১২৬: মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ মু'জাম আ'লাম, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর চরিত্রের এই স্বভাবটি তাঁর কাব্য ব্যক্তিত্ব ও কাব্য-শিল্পে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।[৯৩]

সুতরাং আহমাদ শাওকীর ব্যক্তিত্ব গঠনে উন্নত সংস্কৃতির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরব্য সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন কবিতার দীওয়ান (সংকলন) সমূহ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অনেক পংক্তি ও কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক কবির উত্তম কবিতাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। কবি আবূ নুওয়াস আল-হাসান বিন হানী (১৪৫-১৯৮ হি./৭৬২-৮১৩ খ্রি.) এর নিকট থেকে আব্বাসীয় সাহিত্যের জীবন্ত আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন- তাঁর প্রণয় গীতি غَزَلٌ ও মদীরার বর্ণনা وَصْفُ الْخَمْرِ সম্পর্কিত কবিতা। আর আবূ উবাদা আল-ওয়ালীদ আল-তাঈ আল-বুহ্তরী (২০৬-২৮৪ হি./ ৮২১-৮৯৮ খ্রি.) এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন কল্পনার স্বচ্ছতা صَفَاءُ الْخَيَالِ চিত্রায়নের সূক্ষ্মতা وَدِقَّةُ التَّصْوِيْرِ এবং সুর লহরীর সৌন্দর্যতা جَمَالُ الْوَقْعِ وَالْمُوْسِيْقَى আবূ তাম্মাম হাবীব বিন আউস আল তাই (১৮৮-২৩২ হি./৮০৪-৮৪৬ খ্রি.) ও আবূ তাইয়্যেব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হি./৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন উন্নত ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান, এদের সঠিকত্বে পৌঁছার প্রচেষ্টা, এদের কবিতায় হিকমত حِكْمَةٌ ও প্রবচনের আধিক্য এবং ব্যক্তিত্বের এমন দৃঢ়তা যার প্রকাশভঙ্গিতে ছিল না কোন অস্পষ্টতা। এতদ্ব্যতীত তিনি আল-শরীফ আল-রেজা (৩৫৯-৪০৬ হি./ ৯৭০-১০১৬ খ্রি.) ও আবূ ফিরাস আল-হামাদানী (৩২০-৩৫৭ হি./৯৩২-৯৬৮ খ্রি.) প্রমুখদের নিকট থেকেও অনুরূপ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আল-বুহ্তরী ও আল-মুতানাব্বীর ষ্টাইল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে যার অনুসরণ করেছিলেন আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি মাহমূদ সামী আল-বারূদী (১২৫৫-১৩২২ হি./১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.)।[৯৪]

এমনিভাবে আহমাদ শাওকী নিজের জন্য এমন একটি ষ্টাইল বা রচনাশৈলী أُسْلُوْبٌ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা পূর্ববর্তী প্রাচীন কবিদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। অধিকন্তু তা তাঁর সময়কালের দাবীও পূরণ করতে সক্ষম ছিল। তাঁর এই ষ্টাইলটি ছিল উন্নত, বলিষ্ঠ, সহজ, সাবলীল ভাষা ও ভাবের মৌলিকত্বসম্পন্ন। এই দিক দিয়ে আহমাদ শাওকী সমসাময়িক কবি হাফিজ ইব্রাহীমের চেয়ে মাহমূদ সামী আল-বারূদীর ষ্টাইলের প্রতি অধিক নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি আহমাদ শাওকীর অধিক ঝোঁক ছিল। কেননা তিনি তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে সহজ সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন।[৯৫]

আহমাদ শাওকী ও মাহমূদ সামী আল-বারূদী উভয়ই আব্বাসীয় কবিদের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তারা হাফিজ ইব্রাহীমের চেয়ে অধিকভাবে প্রাচীন ষ্টাইল গ্রহণ করেছেন। তাই বলে আহমাদ শাওকী ও মাহমূদ সামী আল-বারূদী উভয়ের কাব্যিক ষ্টাইল অভিন্ন ছিল না। যেমনিভাবে আহমাদ শাওকীর সঙ্গীত আল-বারূদীর সঙ্গীতের চেয়ে বিশেষতঃ ধ্বনি ও সুরের দিক দিয়ে অধিক মধুর ছিল। এই কারণে মাহমূদ সামী আল-বারূদী, হাফিজ ইব্রাহীম প্রমুখের চেয়ে আহমাদ শাওকী স্বীয় কবিতাকে অধিক মাত্রায় সুরের অনুবর্তী করেছিলেন। কেননা কাব্যের গঠন সৌকর্যে তিনি সুর ছন্দের চেয়ে বর্ণনার পরিচর্যাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। তাই তাঁর কবিতা

---

৯৩. ড. ত্বাহা হুসাইন, হাফিজ ওয়া শাওকী, পৃ. ২০০।

৯৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৪; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরাবী, পৃ. ৯৭৫।

৯৫. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৫; Ismat Mahadi, Modern Arabic Literature 1900-1967, P. 49.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল আধুনিক যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সুর সমৃদ্ধ। অধিকন্তু তিনি কবিতায় প্রাচীন উপমা-উৎপ্রেক্ষার ভান্ডার ব্যবহার করেছেন। এর ফলে তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন সেখানে আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।[৯৬]

৪. ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব

এমনিভাবে আহমাদ শাওকী আরবীয় সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি যা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর অধ্যয়নের মাধ্যমে, ইউরোপীয় জীবনযাত্রার সাথে মিশ্রণের মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়, নাটকে ও তাঁর সাহিত্য প্রতিভায়। যেমন-আহমাদ শাওকী তাঁর ট্রাজেডি নাটকসমূহে লা-ফন্‌টেইনে (১০৩১-১১০৭ হি./১৬২১-১৬৯০ খ্রি.) এর নাটকের সাথে সাদৃশ্য করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁর প্রণয়মূলক কবিতার মধ্যে লা-মারটিনি (১২০৫-১২৮৬ হি./১৭৯০-১৮৬৯ খ্রি.) এর অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর উপন্যাসসমূহের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রখ্যাত নাট্যকার কর্ণেলী (১০১৫-১০৯৬ হি./১৬০৬-১৬৮৪ খ্রি.) এর অনুসরণ করেছেন। পাশ্চাত্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে রোমান্টিক আন্দোলনের নেতা ভিক্টর হুগো (১২১৭-১৩০৩ হি./ ১৮০২-১৮৮৫ খ্রি.) এর প্রভাব আহমাদ শাওকীর কবিতায় অধিক পরিলক্ষিত হয়। তিনি পাশ্চাত্যে মাতৃভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এজন্য এ সকল প্রভাব আহমাদ শাওকীর কবিতায় বিদ্যমান। অবশ্য অল্পকাল পরেই তিনি তাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপন ঐতিহ্যে বৈশিষ্ট্যময় রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হন।[৯৭] কিন্তু ফ্রান্সে কবির চার বৎসর অবস্থান এবং এর সাহিত্যের সাথে যোগসূত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সমগ্র কাব্যে প্রাচীন ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি এবং তাঁর উপর আরবী সংস্কৃতির প্রভাব থেকেই যায়। তবে তিনি নতুন কাব্যদর্শন ও বিশাল আরবী সংস্কৃতিকে একত্রিত করেছেন।[৯৮]

আহমাদ শাওকী ফ্রান্সে থাকাকালীন ধর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা দেখেছিলেন, তাই তিনি স্বধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পর অন্যান্য ধর্মের প্রতি নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যেমনিভাবে তিনি ইউরোপীয় শহরগুলোতে বিশেষতঃ প্যারিসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জীবন, দর্শন, স্বাধীনতা, যার প্রভাব আহমাদ শাওকীর কবিতায় অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর ফ্রান্স থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আহমাদ শাওকী স্বীয় কবিতায় উক্ত চিন্তাধারা ও দর্শন প্রচার করতে শুরু করলেন।[৯৯]

ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৩০৫-১৩৭৬ হি./ ১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.) আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভায় ইউরোপীয় প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, "শাওকী মিসরে অধ্যয়ন করেন, অতঃপর ইউরোপে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি ইউরোপীয় প্রচার মাধ্যমে ইউরোপীয় জীবন এবং ইউরোপীয় কবিতার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। ফলে তাঁর জীবন ও কবিতায় একদিকে যেমন তাঁর স্বীয় পরিবেশের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইউরোপীয় পরিবেশের প্রভাবও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর কাব্য সংকলনের খণ্ডসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হবে যে, আমরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তির সামনে উপস্থিত, যাদের মধ্যে কোন

---

৯৬. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১৫, গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ১৬৬।

৯৭. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৫; Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature1900-1967, P. 49.

৯৮. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আল-শি'র আল-মিসরী বা'দা শাওকী, ১ম বৈঠক, পৃ. ৬।

৯৯. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

যোগসূত্রতা নেই। তবে উভয় জনই স্বভাবসুলভ খ্যাতিমান কবি, কাব্য প্রতিভায় গগণচুম্বি মর্যাদায় উপনীত। মিসরের প্রীতি উভয়ের নিকট চূড়ান্ত মর্যাদা ও আরাধনার বিষয়।[১০০]

৫. রাজনৈতিক অস্থিরতা বা পট পরিবর্তন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি আহমাদ শাওকীর কাব্য ও নাট্য প্রতিভার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী মিসরের ভয়াবহ রাজনৈতিক ঘনঘটাময় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বড় হয়েছিলেন। তখন মিসর ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ১৩০০ হি./ ১৮৮২ সালে ইংরেজদের আগ্রাসনে মিসর বৃটিশদের অধিকারে চলে যায়। ইতোমধ্যে মিসরীয় জন-মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। ফলশ্রুতিতে মিসরে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দল 'আল-হিযব আল-ওয়াতানী' الحزب الوطني অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) সংঘটিত হয়। যার কারণে মিসরে অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ১৩৩৭ হি./১৯১৯ সালে মিসরের ঐতিহাসিক বিপ্লব সাধিত হয়। অতঃপর ১৩৪০ হি./১৯২২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৩৪১ হি./ ১৯২৩ সালে মিসরে পার্লামেন্টারী শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনা এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন আহমাদ শাওকীর কবিতার মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। ফলশ্রুতিতে আহমাদ শাওকী তাঁর দেশে জাতীয় কবি ও আমীরের রাজনৈতিক কবিতে পরিণত হন।[১০১]

৬. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রজ্ঞা প্রতিভা

অন্য একটি বিষয় যা আহমাদ শাওকীর কাব্যিক প্রতিভার ক্ষেত্রে অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত স্বভাবজাত প্রজ্ঞা-প্রতিভা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, চিন্তা-চেতনার পরিপূর্ণ অংশ দান করেছিলেন। সুতরাং তিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, অনুভূতি এবং অভিনব কাব্য পদ্ধতি তথা সব কিছু প্রয়োগ করে আরবী কাব্যের উন্নতি বিধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে যুগশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যার ফলে আহমাদ শাওকীর কবিতায় উন্নত চিন্তা, বিস্ময়কর ষ্টাইল, স্বচ্ছ কল্পনা, গভীর অনুভূতি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।[১০২]

আহমাদ শাওকীর এ ধরনের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আবদুল মুনঈম আল-খাফাজী বলেন যে, "তিনি ছিলেন প্রজ্ঞা-প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ এবং ঐশ্বরিক মহৎ প্রভাবশালী একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠ; যাকে একটি সত্য, চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ বুদ্ধিমত্তা যুগের ঘটনাবলী, ইতিহাসের আত্মচরিত এবং জীবনের উপদেশাবলী রূপদান করেছে।"[১০৩]

অনুরূপভাবে আহমাদ শাওকীর প্রতিভা সম্পর্কে মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'য়ী (১২৯৮-১৩৫৬ হি./ ১৮৮০-১৯৩৭ খ্রি.) বলেন যে, "আমার মনে হয় তিনি সেই ব্যক্তি যাকে মিসর এর অধিবাসীদের মধ্যে বাক-চেতনা সৃষ্টির জন্য তাদের মুখপাত্র মনোনীত করে। অনন্তর তাঁকে এমন সব সুযোগ-সুবিধা সহযোগিতা প্রদান করে যা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য করা হয়নি। তাঁকে মিসরের জাতীয় মর্যাদার কবি হিসেবে গড়ার জন্য এবং ইতিহাসে তাঁর রচিত কবিতা ও সাহিত্যকে মিসরের কবিতা ও সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করার লক্ষ্যে এবং নেতৃত্বের উপকরণাদি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জনে সক্ষম করার জন্য তাঁকে অঢেল অর্থ সাহায্য দান করে।

---

১০০. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

১০১. আব্বাস হাসান, আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০-৪১; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৬।

১০২. ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, মিন আদাবিনা আল-মু'আসির, পৃ. ১০৮; জি. এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য, পৃ. ৭৯।

১০৩. আবদুল মুনঈম আল-খাফাজী, মিন কিতাবি দিরাসাত ফী আল-আদব আল-মু'আসির, (কায়রো, তা. বি.), পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আর এ (শাওকী) নামটি সাহিত্যাকাশে সূর্যতুল্য, যখন পূর্বদিক থেকে তা কোন এক স্থানে উদিত হয়, তখন তা সর্বত্র উদিত হয়, আর যখন আরব বিশ্বের কোন একটি দেশে তাঁর উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র মিসরকে নির্দেশ করে। যেমন-নীল, আহ্‌রাম ও কায়রো দ্বারা শাব্দিক অর্থ না বুঝিয়ে ভাষার মাহাত্ম্যে পরিভাষাগতভাবে সমার্থক হিসেবে মিসরকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণটি অনেক সময় এজন্য হয়েছিল যে শাওকী তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি; যিনি এমন একক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত ছিল বহুমুখী রক্তধারায় সংমিশ্রিত।"[১০৪]

উপরে বর্ণিত পরিবেশ, পরিস্থিতি ও উপাদানের প্রভাবে আহমাদ শাওকী এক অসাধারণ সাহিত্যিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং স্বীয় কাব্য প্রতিভা বলে কাব্যজগতের শীর্ষে আরোহণ করে আরবী সাহিত্যের কবিদের নেতা হিসেবে 'আমীর আল-শু'আরা' (Prince of Poets) উপাধি অর্জন করে এর যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

আধুনিক আরবী কাব্যসাহিত্যে শাওকীর স্থান

আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাকাব্য গ্রন্থ 'আল-শাওকিয়্যাত' সহ অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গদ্য ও কাব্যনাটক রচনা করে আধুনিক আরবী সাহিত্যাঙ্গনে যে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন তা কবিকে তাঁর জীবদ্দশাতেই সমগ্র আরব বিশ্বের কবি সমাজের পক্ষ থেকে 'আমীর আল-শু'আরা' তথা 'কবি সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করার মাধ্যমে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।[১০৫]

সমসাময়িক যুগেও আহমাদ শাওকী ছিলেন অন্যতম প্রতিভাবান কবি। ইরাকের প্রখ্যাত কবি মারূফ আল-রুসাফী (১২৯২-১৩৬৫ হি./ ১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.), জামীল সিদ্‌কী আল-যাহাবী (১২৮০-১৩৫৫ হি./১৮৬৩-১৯৩৬ খ্রি.), লেবাননের শিবলী বেক মাল্লাত (১২৯২-১৩৮১ হি./১৮৭৫-১৯৬১ খ্রি.), জীবরান খলীল জীবরান (১৩০১-১৩৫০ হি./১৮৮৩-১৯৩১ খ্রি.), তানিয়্যুস আব্‌দুহ (১২৯২-১৩৪৫ হি./১৮৭৫-১৯২৬ খ্রি.), হালীম দামুস (জন্ম-১৮৮৮ খ্রি.), মীখাঈল নু'আইমা (জন্ম-১৮৮৯ খ্রি.), আহমাদ যাকী আবূ শাদী (১৩১০-১৩৭৫ হি./১৮৯২-১৯৫৫ খ্রি.), ঈলিয়া আবূ মাদী (১৩০৭-১৩৭৭ হি./ ১৮৮৯-১৯৫৭ খ্রি.), আহমাদ মুহার‌্যাম (১২৯৪-১৩৬৫ হি./১৮৭৭-১৯৪৫ খ্রি.), নাজীব আল-হাদ্দাদ (১২৮৪-১৩১৭ হি./১৮৬৭-১৮৯৯ খ্রি.) প্রমুখ সমসাময়িক খ্যাতনামা কবিদের থেকে বিভিন্ন গুণাবলীর কারণে আহমাদ শাওকী অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।[১০৬]

এতদ্ব্যতীত আধুনিক কাব্য জগতের পঞ্চ স্তম্ভ যথাক্রমে মাহ্‌মূদ সামী আল-বারূদী (১২৫৫-১৩২২ হি./ ১৮৩৮-১৯০৪ খ্রি.), ইসমাঈল সাব্‌রী (১২৭১-১৩৪২ হি./১৮৫৪-১৯২৩ খ্রি.), আহমাদ শাওকী (১২৮৫-১৩৫১ হি./১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), হাফিজ ইব্‌রাহীম (১২৮৮-১৩৫১ হি./১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.), খলীল মুতরান (১২৮৯-১৩৬৯ হি./১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) এদের মধ্যে 'আমীর আল-শু'আরা' আহমাদ শাওকী ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিবি।

নিঃসন্দেহে মিসরের ঐতিহ্যশীল কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে মাহমূদ সামী আল্ বারূদী, আহমাদ শাওকী ও হাফিজ ইব্‌রাহীম আরবী কাব্যকে পরবর্তী আব্বাসীয় যুগ থেকে আধুনিক আরবী রেনেঁসা আন্দোলন পর্যন্ত যে স্থবিরতা চলে আসছিল তা থেকে আরবী কবিতাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর আরবী কাব্যের ভাষায় কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী শক্তি ও সৌন্দর্য দান করার মাধ্যমে

---

১০৪. মুস্তাফা সাদিক আল-রাফিয়ী', শাওকী, 'আল-মুক্‌তাতাফ', (কায়রো, নভেম্বর, ১৯৩২), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; ড. ইবরাহীম আবু আল-খাশ্‌ব, তারীখ আল-আদব আল-আরবী ফী আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ২০৫।

১০৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১০৬. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, পৃ. ৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যময় কাব্যজগতের শীর্ষে পৌঁছেন এবং ফলশ্রুতিতে তিনি আধুনিক আরবী কবিতায় প্রাচীন সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন।[১০৭]

কারো কারো মতে, আহমাদ শাওকীর পর আরব বিশ্বে তাঁর সমকক্ষ কোন কবি জন্মগ্রহণ করেনি। জীবনের শেষ তিন বছরে কাব্যনাটক রচনা করে এর চরম উৎকর্ষ সাধনে তিনি যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন ইতোপূর্বে তা কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।[১০৮]

বিশ্বকবিদের মধ্যে আহমাদ শাওকীর মর্যাদা

বিশ্বকবিগণ উৎকর্ষতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হলেও তাদেরকে তিনটি বিশেষ দলে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমতঃ এদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ী মানব আত্মার ও জীবনের সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। এর দ্বারা সর্বযুগে সকল বিপদ-আপদে সামগ্রিক মানবতা অর্জিত হয়। বলাবাহুল্য যে, আহমাদ শাওকী কোন ব্যাপারেই এ স্তরের কবিদের অন্তর্ভুক্ত নন।

দ্বিতীয়তঃ এ স্তরের কবিরা মানবাত্মার প্রতি দৃষ্টিবিমুখ, উপরন্তু তারা মানুষের উপর আপতিত বিভিন্ন দুর্যোগাদির বর্ণনা প্রদান করেন। কোন কোন সময় তাদের কেউ কেউ অতুলনীয় এবং বিরল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। তাদের বর্ণনা মানবগোষ্ঠীর জন্য অথবা কমপক্ষে তাদের অনুসারীদের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করে। এ শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক কবিদের সাথে কোন কোন দিক দিয়ে আহমাদ শাওকীর যোগসূত্র রয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ স্তরের কবিরা পূর্ণ দরদীমনা, প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ও তাদের সমসাময়িক সকলের প্রতি স্নেহশীল। জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতিকে তারা স্থির করে থাকেন। অতঃপর তারা জাতির অনুভূতি, আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে যেসব প্রভাবিত করে সেগুলোকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে সেগুলোর প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে তারা সমসাময়িক লোকদের জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যান, আর তাদের নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য উন্নত আদর্শের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। এ শ্রেণীর অধিকাংশ কবি 'হোমার' (Homer),[১০৯] 'গোথে' (Goethe),[১১০] 'দান্তে' (Dantee)[১১১] এর ন্যায় বিশ্বের প্রতিভাবান ও বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টান্ত পেশ করেন।[১১২]

---

১০৭. ড. মুহাম্মদ মানদূর, আল-শি'র আল-মিসরী বা'দা শাওকী, ১ম বৈঠক, পৃ. ৫-৬।

১০৮. জি. এম . মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য,পৃ. ৮২।

১০৯. হোমার (খ্রিষ্টপূর্ব ৯ম অথবা ৮ম অব্দ) একজন প্রাচীন গ্রীক বিখ্যাত কবি। তিনি এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয় যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। গ্রীক সংকলকগণ হোমার লিখিত বীররসাশ্রিত কাব্যবিশেষ 'ইলিয়াড' (Iliad) ও 'ওডেসী' (Odyssey) নামক কবিতাবলী এবং 'আল-আগানী আল-হুমায়রিয়্যা' الأغاني الـــهومَيرية শীর্ষক সঙ্গীতাবলীর রচয়িতা হিসেবে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। এগুলো গ্রীক কাব্য সাহিত্যের ভবিষ্যতের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্রঃ ফায়দীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৭৩৪; মুনীর আল- বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৪৪।

১১০. গোথে জোহান ওলফগ্যাংভেন (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রি.) জার্মানির প্রখ্যাত লেখকদের অন্যতম। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে জন্মগ্রহণ করেন, তাকে সর্বযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ফুস্ত' فوســت 'ভারতার' فرتر 'হারমান ওয়া দুরুতাহ' هرمان ودوروتــة প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ ফায়দীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫১০; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ৩৯।

১১১. দান্তে আলিগিয়েরী (১২৬৫-১৩২১ খ্রি.) একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ইতালীয় প্রখ্যাত কবি ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি তার 'আল-কুমেদিয়া আল-ইলাহিয়্যা' শীর্ষক কাব্যনাট্যের দ্বারা নিজের নামকে সাহিত্য জগতে অমর করে গেছেন। এতে তিনি ফিরজিলিওস فرجيليوس ও তার বান্ধবী বিয়াতরীস (Beatriz)এর নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী এ শ্রেণীর কবিদের প্রতি ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে আহমাদ শাওকীর বক্তব্যে সেই সত্যটি পরিস্ফুট হয়েছে,[১১৩]

كَانَ شِعْرِيْ الْغَنَاءَ فِي فَرَحِ الشَّرْ * قِ وَكَانَ الْـعَزَاءَ فِي أَحْزَانِهِ

"আমার গীতিকবিতা প্রাচ্যের আনন্দে নিবেদিত আর উহার (প্রাচ্যের) বেদনায় আমার রোদন।"

আহমাদ শাওকীর কবিতার মূল্যায়ন

আহমাদ শাওকীর কাব্যকীর্তি সম্পর্কে প্রায় সকল সমালোচকই উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। কবি হিসেবে তিনি আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবূ তাইয়্যেব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাব্বীর অনুসারী ছিলেন। অনেকের মতে, আহমাদ শাওকী আব্বাসীয় যুগের পরে সবচেয়ে সার্থক কবি। ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর কবিতাবলী পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কবিতার গঠন সৌকর্যে তিনি সুর ও ছন্দের চেয়ে বর্ণনার পরিচর্যাকে অধিকতর স্থান দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন কাব্যের চিত্রায়ণে বিস্ময়কর দীপ্তিতে প্রতিভাত হয়েছে।[১১৪]

যখন আহমাদ শাওকী কাব্যজগতে বলিষ্ঠ পদচারণা করেন তখন তিনি প্রাচীন কবিতার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তা থেকে তাঁর কাব্যে পরিপুষ্টি দেয়ার উপযোগী উপাদানসমূহ গ্রহণ করেন এবং এগুলোতে চিত্র ও কল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য দান করেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি প্রাচীন কবিদের শিল্প ও উদ্দেশ্য সমূহের অনুসরণ করেন ও তাঁদের কোন কোন কাসীদাসমূহের বিরোধিতা করেন। বিশেষতঃ ধর্মীয় উপলক্ষাদিতে, যেমন- হজ্জে গমন অথবা ঈদের দিন উৎসব-অনুষ্ঠান, অথবা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অথবা রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উপলক্ষাদি যা ক্ষমতা গ্রহণের আনন্দ অথবা আমীরের শোকগাঁথা অথবা প্রাসাদের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোন বিরাট সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কবিদের ন্যায় তিনি রাজদরবারের নেতা এবং প্রাসাদের সাথে সম্পৃক্ত আমীর-উমরাহ্‌ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশংসা দিয়ে স্বীয় কবিতা শুরু করতেন। অবশ্য আহমাদ শাওকী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা থেকে বিরত থাকেন, ফলে কেউ তাঁর বিরাগভাজন হননি। সভাসদদের কারো থেকে কিছু লাভ করার ব্যাপারে তাঁর উপর পীড়াপীড়ি করলে তিনি তা অত্যন্ত দক্ষতা ও বিনয় সহকারে গ্রহণ করতেন।[১১৫] এটি হচ্ছে অভিজাত কবির জীবনের বাস্তব চিত্র। তবে প্রকৃত অভিযোগ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে নাম উল্লেখবিহীন স্বল্পসংখ্যক ব্যতিরেকে তিনি তাঁর জিহ্বাকে অহেতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনা দ্বারা কলুষিত করেননি।[১১৬]

সমালোচকগণ এ ব্যাপারে প্রায় একমত পোষণ করেন যে, আল-মুতানাব্বীর পর আরবদের ইতিহাসে সুদীর্ঘ দশ শতাব্দীর যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তার যথোপযুক্ত সম্পূরক হচ্ছেন আহমাদ শাওকী। কারণ এ সময়ে কবিতার হারিয়ে যাওয়া চেতনা ও সাহিত্য থেকে মুছে যাওয়া ধারার

তার এক কাল্পনিক ভ্রমণে 'জাহীম' নরক, পবিত্র স্বর্গ ও জান্নাতুল ফিরদাউসের স্তর সমূহের চমকপ্রদ বর্ণনা দেন। দ্রঃ কারদীনাল তূভাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ২৮১; মুনীর আল-বাঅ'লাবাকী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, পৃ. ২৩।

১১২. হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আরবী আল-আরবী, পৃ. ৪৫০-৪৫১।

১১৩. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯৩।

১১৪. গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ১৬৬।

১১৫. আলী আল-নাজদী নাসীফ, আল-দীন আল-আখলাক ফী শি'র শাওকী, (কায়রো, ১৯৬৪), পৃ. ২৫।

১১৬. ড. ইয়াহ্‌ইয়াহাক্কী, হাযা আল-শি'র, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোগকারী আহমাদ শাওকীর ন্যায় এমন কোন প্রতিভাবান কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতাকে সূক্ষ্ম ধাঁচে, সঠিক আস্বাদ ও বলিষ্ঠ চেতনায় উপস্থাপন করেন। তাঁর কবিতা ছিল সুনিপুণ, সুদৃঢ়। এতে না ছিল দুর্বলতা, না ছিল বাহুল্যতা, না সীমালংঘন, না শংকা। তিনি মুতানাব্বীর ন্যায় লোকদের মাঝে বিচরণ করেন, নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের সাথে মিশেন। ফলে তাদের স্বভাবের বর্ণনা ও বিবাদের চিত্রায়ণ করতে সক্ষম হন। তিনি বিরল কবিতা, চলমান দৃষ্টান্ত এবং উন্নত পাণ্ডিত্যের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মুতানাব্বীর সদৃশ। আহমাদ শাওকীর কবিতার শব্দ নবসৃষ্ট, দূরবর্তী অর্থের ধারায় প্রবাহিত, তাঁর ভাবধারাসমূহ অধিকাংশ নিজস্ব সৃষ্টি, তাঁর কবিতার শব্দগুলো অবস্থার বিভিন্নতার কারণে মূল ও শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল। আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় ধর্ম, ভাষা ও শিল্পের সংরক্ষণ করেছেন। তিনি নবী-রাসূল, খলীফা, আসমানী কিতাব ও পবিত্র স্থানসমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তিনি আব্বাসীয় যুগের সেরা কবিদের ধারায় কবিতা রচনাকে প্রাধান্য দিতেন। নবসৃষ্ট ছন্দসমূহে অথবা কাসীদাতে কাফিয়ার ছন্দে খুব কমই কবিতা রচনা করতেন। এহেন রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও আরবী কবিতার অভাব পূরণে কোন কিছু তাঁকে বাধা প্রদান করতে পারেনি।[১১৭]

আহমাদ শাওকীর প্রখর মেধা ও যোগ্যতা তাঁকে যথার্থ কবির মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এটা বিস্মৃত হওয়ার নয় যে, জন্মসূত্রে যে চারটি রক্তমূলধারা আহমাদ শাওকীর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল সেগুলো তাঁকে প্রতিভা বিষয়ক উপাদানসমূহের সরবরাহ করে। তাঁর নিজের মধ্যে ছিল অত্যাধিক পরিমাণ মানবতার উপাদানসমূহ যেমন ছিল তাঁর স্বভাবগত দানশীলতা, অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, প্রশস্ত চিন্তাধারা, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং উচ্চাভিলাষী মন; যা তাঁকে আল-মুতানাব্বী সদৃশ বড় বড় কবিদের সান্নিধ্যে পৌঁছায় যিনি তাঁর কবিতায় মুক্তা ও নুড়ি পাথর একত্রিত করেছেন। পক্ষান্তরে আহমাদ শাওকী দীপ্তিময় মুক্তা সন্নিবিষ্ট করেছেন।[১১৮] আর এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে আহমাদ শাওকী বিরচিত 'নাজাত' نَجَاةٌ শীর্ষক কাসীদায়, যার নিম্নোক্ত চরণটি উল্লেখযোগ্য। কবির ভাষায়:[১১৯]

وَلِيَ دُرَرُ الأَخْلاَقِ فِي الْمَدْحِ وَالْهَوَى * لِلْمُتَنَبِّي دُرَّةٌ وَحَصَاةٌ

"আর আমার জন্য রয়েছে চরিত্রের মণি-মুক্তা স্তুতি ও ভালবাসায় এবং আল-মুতানাব্বীর রয়েছে মুক্তা ও নুড়ি পাথর।"

আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় নতুন নতুন শব্দ আবিষ্কার করে কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। তিনি অনেক উপমা-উদাহরণ দিয়ে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উপমিতকে জোরালো করেছেন। খাপছাড়া বা আলগা কোন কথা তাঁর কবিতাকে এতটুকু ম্লান করেনি। তিনি কবিতা রচনায় এত অধিক পারদর্শী ছিলেন যে, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন বিষয়ে তিনি অবিরাম কবিতা রচনা করতে পারতেন। সুদীর্ঘ বিরতির পর কোন অসম্পূর্ণ কবিতা সমাপ্ত করলে মনে হতো যেন তিনি শুরু থেকে শেষতক একটানা রচনা করেছেন, মাঝে কোন বিরতি দেননি।

আহমাদ শাওকীর কবিতার বিশুদ্ধতা, মৌলিকত্ব, ভাবভঙ্গীর উৎকর্ষ, টেকনিক, শিল্প কুশলতা ও ছন্দ দক্ষতার জুড়ি আধুনিক আরবী কাব্য জগতে বিরল। তাঁর মতে, কবিতা হচ্ছে শব্দে সমর্পিত কবির মানস প্রকৃতি। যদিও অধিকাংশের মতে, কবিতা স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবে কবির মুখ নিঃসৃত বাণী। কিন্তু এর উল্টোও হয়ে থাকে। যেমন-কবিতা হল ভাব ভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল অনুশীলনযোগ্য একটি সৃজনশীল দুরূহ শিল্পকর্ম। আবার শুধু ব্যাকরণ সিদ্ধ বাক্য বিন্যাসেও কবিতা হয় না। কবির

---

১১৭ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৮০-৫৮১।

১১৮. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ৬৯-৭০।

১১৯. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের বাহনই কবিতা। আহমাদ শাওকীর কবিতাবলী নিরীক্ষণ করলে এ ধ্রুব সত্যগুলো প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।[১২০]

তাঁর কবিতা পর্যালোচনায় আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন ছন্দের যাদুকর। তাঁর কবিতা অন্য কারো অনুকরণে রচিত হয়নি। বরং তিনি নিত্য নতুন ছন্দের আবিষ্কার করতেন। সবসময় দুর্বল ছন্দ, অশ্লীলতা ও কলুষতা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সাবলীল গতি ও কলতানকে সুদৃঢ় গাঁথুনীর চিত্রায়নে অপূর্ব রূপক, কল্পনা আর অজস্র জ্ঞানভান্ডারে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর কাব্যমালঞ্চ। সাধারণ মানুষের সাথে মিশে তিনি তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কথা টেনে বের করেছেন এবং তা দিয়ে অপরূপ ছন্দের মালা গেঁথেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর কবিতায় মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ, সত্য অনুভূতি, স্বভাবসুলভ লালিত্য, অগাধ পাণ্ডিত্য ও পুষ্পের নির্যাসিত সৌরভ বিদ্যমান।

তাঁর কাব্যগ্রন্থে অনেক কবির কবিতার স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন প্রখ্যাত কবি আল-বুহ্তরীর কবিতার জটিলতা, আবূ তাম্মামের সৌন্দর্য সুষমা, আল-মুতানাব্বীর জোশ, আল-শরীফের অক্লেশ রচনা এবং আল-মিহ্ইয়ারের দীর্ঘতা।[১২১] সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন প্রথম দশ শতাব্দীর লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সদৃশ। মুতানাব্বীর পর এমন কোন কবি পয়দা হননি, যিনি আরবী কাব্যজগতে তাঁর মত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আহমাদ শাওকীই এর একমাত্র দাবীদার। এজন্যই তিনি 'আরবদের কবিসম্রাট' হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।[১২২]

মোদ্দাকথায় তিনি আরবী সাহিত্যের বড় বড় কবিদের উত্তম গুণাবলী সংগ্রহ করে প্রায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি মুতানাব্বীর কবিতায় প্রভাবিত হয়ে আপন ভুবনে কবিতা রচনা করে সমসাময়িক কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়ে 'আমীর আল-শু'আরা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

আহমাদ শাওকীর মূল্যায়নে আরব কবি-সাহিত্যিকদের মন্তব্য

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত তাঁর 'তারীখ আল-আদব আল-আরবী' গ্রন্থে আহমাদ শাওকীর কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, "আল-মুতানাব্বীর পর আরবের ইতিহাসে অতিক্রান্ত দশ শতাব্দীর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হচ্ছেন শাওকী। এ সময়ের মধ্যে ছিন্ন হয়ে পড়া কাব্য প্রেরণার সংযোগ সাধন ও মিটে যাওয়া সাহিত্য ধারার নবায়ন করার মত আহমাদ শাওকীর ন্যায় প্রতিভাধর কোন কবির আবির্ভাব ঘটেনি।"[১২৩]

'তারীখ আল-আদব আল-আরবী' গ্রন্থের লেখক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক হান্না আল-ফাখূরীর মতে, "শাওকী একজন বিরল প্রতিভাধর কবি, তাঁকে এমন কাব্য প্রতিভা দান করা হয়েছিল যা বড় বড় বিশ্বকবিদের খুব কমই প্রদান করা হয়েছে।"[১২৪]

ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৩০৫-১৩৭৬ হি./১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.) আহমাদ শাওকীর বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, "শাওকী আপনার মনের এমন ভাবের দিকে আপনাকে পরিচালিত করেন যেখানে আপনি পৌঁছুতে পারতেন না আর আপনার সামনে এমন সুস্পষ্ট

---

১২০. সিকান্দার মুমতাজী, আহমাদ শাওকী ও তাঁর আধুনিক আরবী কাব্য, পৃ. ৯-১১।

১২১. আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহির আল-আদব, (মিসরঃ আল-মাক্তাবা আল-তিজারিয়া আল-কুবরা, ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

১২২. জি. এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য, পৃ. ৮৩-৯১।

১২৩. আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, তারীখ আল আদব আল-আরবী, পৃ. ৫৮০।

১২৪. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি, উন্নত কল্পনা ও সহজ অনুভূতি চিত্রায়ণ করেন যদ্বারা আপনার অন্তর স্পন্দিত হয় এবং আপনার হৃদয় আন্দোলিত হয়।"[১২৫]

আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পন্ডিত ড. ত্বাহা হুসাইন (১৩০৭-১৩৯৩ হি./১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর 'হাফিজ ওয়া শাওকী' শীর্ষক গ্রন্থে আহমাদ শাওকীর উদগ্র প্রতিভার মূল্যায়নে যথার্থই বলেছেন যে, "শাওকী প্রথমে এমন একজন প্রভাবশালী কবি ছিলেন, যিনি নিজকে ভালবাসতেন এবং নিজের জন্য উপভোগ ও প্রাচুর্যের উপকরণাদির অন্বেষণ করতেন। অতঃপর এমন একজন চাকুরীরত কবি ছিলেন, যিনি আমীর ও সুলতানের জন্য স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করেন, অনন্তর তিনি নিজের দিকে ফিরে আসেন এবং স্বজাতির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হন। ফলে তিনি শিল্পের কবি হন ও জাতির কবিতে পরিণত হন। উপরন্তু শাওকীর কবিতা এই স্তর থেকে মিসর ও জাগ্রত আরব প্রাচ্যের স্তরসমূহে প্রসারিত হয়।"[১২৬]

ড. শাওকী দায়ফ (জন্ম-১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি.) তাঁর 'শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন যে, "সাহিত্যিক অবদানের বিভিন্নতা ও শৈল্পিক দিকসমূহের বহুমুখীতার কারণে আমাদের আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে শাওকী হচ্ছেন উজ্জ্বলতম কবি।... এটি অত্যুক্তি বলা হবে না যে, শাওকীর দীর্ঘ কাসীদা শুনে আমার মনে হয় যে, সত্যিই যেন আমি একতানতা শুনছি... নিঃসন্দেহে এর কারণ হচ্ছে শাওকীর শব্দাবলীর যন্ত্রাদি ও সেগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক স্পন্দনের দক্ষ বিন্যাস সাধন, আর এটি শুধু নৈপুণ্য ও দক্ষতার ব্যাপার ছিল না, বরং চিন্তার ক্ষেত্রে সেটি ছিল একটি দূরবর্তী ব্যাপার; আর তা হচ্ছে মেধা ও ঐশী অনুপ্রেরণা এবং কবিতার জন্য ধ্বনি নির্মাণের প্রতিভা ও উপলব্ধি।"[১২৭]

ওমর আল-দাসূকী তাঁর 'ফী আল-আদব আল-হাদীস' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "শাওকী মনে করতেন যে, একজন কবির দায়িত্ব হচ্ছে অলসকে সতর্ক করা, শ্রমিককে সুদৃঢ় করা এবং নেতাকে উৎসাহিত করা।... এমনিভাবে শাওকী তাঁর কাসীদাগুলো রচনা করেন। অনন্তর প্রতিটি কাসীদার জন্য একেকটি বিষয় গ্রহণ করেন যাতে তিনি স্বীয় নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিসমূহকে জটিলতামুক্ত সহজ পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন এবং আধুনিক আরবী কাব্যে নতুন আন্দোলন পরিচালনা করেন। আর জীবন, যুগ ও নব মানব-সংস্কৃতির উপাদানসমূহের সাথে সমন্বয় করে নতুন আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কবিতার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেন।"[১২৮]

মিসরের প্রখ্যাত গল্পকার, লেখক ও সাহিত্যিক মুস্তফা লুত্ফী আল-মানফলুতী (১২৯৩-১৩৪৩ হি./১৮৭৬-১৯২৪ খ্রি.) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "শাওকী আকাশ, পানি, বন, মরুভূমি ও জনবহুল উদ্যানের কবি। তাঁর কবিতায় বিদ্যালয়ে শিশুর বোর্ড, গীর্জায় উপাসকের আরাধনা, পথিকের ভীতির ক্ষেত্রে সামান, পানকারীর পানপাত্র, ক্রন্দনকারীর অশ্রু, প্রেমিকের আশা ও বেদনাহতের দুঃখের বর্ণনা রয়েছে। আধুনিক কবিতা দোহনে শাওকী ছিলেন মহান অগ্রদূত। তাঁর পরবর্তী কবিগণ ছিলেন তাঁরই অনুগামী। দিগন্তে সূর্যের পরিভ্রমণের ন্যায় তিনি সাহিত্য অঙ্গনে পরিভ্রমণ করেছেন।"[১২৯]

---

১২৫. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

১২৬. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ২৪৬; উদ্ধৃত ড. ত্বাহা হুসাইন, হাফিজ ওয়া শাওকী।

১২৭. ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস, পৃ. ৫-৬।।

১২৮. ওমর আল-দাসূকী, ফী আল-আদব আল-হাদীস, (কায়রো : দার আল-ফিকর আল-আরবী, ১৯৫০), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০১।

১২৯. হাসান আল-সান্দুবী, আল-শু'আরা আল-ছালাছা, (মিসর: মাত্বাআতু আল-মাক্তাবা আল-তিজারিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৩৪১ হি. /১৯৯২খৃ.), পৃ. ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকীর সমসাময়িক 'শাইর আল-কুতরাইন' شاعر القطرين তথা 'দুই ভূ-খণ্ডের কবি' নামে খ্যাত কবি খলীল মুত্‌রান (১২৮৯-১৩৬৯ হি./ ১৯৭২-১৯৪৯ খ্রি.) বলেছেন যে, "কবি তাঁর সাথীদের মাঝে কবিতা রচনা করতেন, তিনি তাদের সাথে অবস্থান করা সত্ত্বেও মানসিকভাবে তাদের সাথে থাকতেন না। তিনি যানবাহনে, রেলগাড়ীতে, সরকারী সমাবেশে, যত্রতত্র পূর্ব চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তাতে কবিতা রচনা করতেন।"[১৩০]

এতদ্ব্যতীত 'শাওকী শাইর আল-উমারা' শীর্ষক গ্রন্থে খলীল মুতরান আহমাদ শাওকীর কবি-মানস সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করে লিখেছেন যে, "তিনি প্রেম ও ভালবাসার কবি, ঘটনাবলী ও ইতিহাসের বিন্যাসক, বিস্ময়কর উপদেশাবলী ও চমৎকার উপমার জনক, দেশাত্মবোধক আবেগ-অনুভূতির ভাষ্যকার, ধর্মীয় বিশ্বাসের বলিষ্ঠকারী ধ্বংসন্মুখ নিদর্শনাবলীর জীবনদাতা এবং মহৎ কার্যাবলীর প্রতি চিন্তাসমূহের জাগরণকারী।"[১৩১]

প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ড. সালিহ্ আল-আশ্‌তার তাঁর 'আন্দালুসিয়্যাতু শাওকী' শীর্ষক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, "এভাবে শাওকীর বিপ্লবী অভিযোগসমূহের ধ্বনি উত্থিত হয়, তাঁর রক্তধারায় বেদনাপ্লুতের ক্রোধ উথলে উঠে, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যন্ত্রণার কথা বলে, ফলে তিনি মিসরীয়দের ক্রোধের চিত্রাংকন করেন এমতাবস্থায় যে, তারা প্রত্যহ তাদের স্বাধীনচেতা লোকদের একদলকে চির বিদায় দিচ্ছেন... শাওকীর অনুরূপ অভিযোগকারী চিৎকার ধ্বনি আহত অন্তর থেকে যথার্থভাবে নির্গত হতে থাকে। সুতরাং সেগুলো মানুষের মনে রেখাপাত করলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই।"[১৩২]

আহমাদ শাওকী সম্পর্কে আবদুল ওয়াহ্‌হাব হামুদা তাঁর 'নি'মাত ওয়া হিরমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "শাওকীর উপর প্রাচুর্যের প্রভাব এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিধ্বনি এমন ছিল যে, তিনি তাঁর কবিতা থেকে উত্তম সঙ্গীত রচনা করেন, মানুষের অন্তরসমূহেকে বিমুগ্ধ করেন, কর্ণসমূহকে আন্দোলিত করেন, বুদ্ধিমানদের হরণ করেন এবং হৃদয়সমূহকে আন্দোলিত করেন। অবশ্যই তিনি স্বীয় কবিতার গীটার থেকে এমন সুরমালা প্রতিধ্বনিত করেন যা সঙ্গীতের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভ করে এবং স্বজাতির মধ্যে উন্নত শিল্প ও সূক্ষ্ম চিত্রাংকনের সন্তরণে জাতিকে আবর্তিত করে।"[১৩৩]

আহমাদ শাওকীর কবি-প্রতিভা ও কাব্যনেতৃত্ব সম্পর্কে লেবাননী সাহিত্যিক মারুন আব্বুদ (১৩০৩-১৩৮২ হি./১৮৮৫-১৯৬২ খ্রি.) মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, "নিশ্চয়ই শাওকীর অসীম ও অগণিত আগ্রহ রয়েছে, কারণ তিনি বিশেষতঃ মিসরীয় প্রাচীন উন্নত সভ্যতার প্রতি, তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও খিলাফতের মহত্ত্বের প্রতি, আরবদের উচ্চাকাঙ্খাসমূহের প্রতি, ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতার প্রতি এবং প্রাচ্যের গৌরবাদির প্রতি আসক্ত। সুতরাং তিনি আবূ তাইয়্যেব আল-মুতানাব্বীর পর আমাদের জাতীয় কবি। তিনি মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর ভাষা এই জাতীয়তার ধারক-বাহক।"[১৩৪]

আমাদের মতে, আহমাদ শাওকী আরব কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল সূর্য তুল্য। তাঁর রেখে যাওয়া স্থায়ী সাহিত্য কর্মগুলো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর বহন করে, যদ্বারা তিনি সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকদের অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

---

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৩১. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী আমীর আল-শু'আরা ওয়া নাগ্‌ম আল-লাহন ওয়া আল-গিনা, পৃ. ২৪৫, উদ্ধৃত খলীল মুতরান, শাওকী শাইর আল-উমারা।

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; ড. সালিহ আল-আশতার, আন্দালুসিয়্যাতু শাওকী, (দামেশ্‌ক: ১ম সংস্করণ, ১৯৫৯)।

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬; আবদুল ওয়াহ্‌হাব হামূদা, নি'মাত ওয়া হিরমান, (বৈরুত, মাজাল্লা আল-কিতাব, অক্টোবর, ১৯৪৭)।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬, মারুন আব্বুদ, শাওক ওয়া হানীন, বৈরুত: মাজাল্লা আল-কিতাব অক্টোবর, ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভার ও কবি-প্রতিভা

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অতুলনীয় অবদান অবিস্মরণীয়। নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র একজন কবি ছিলেন না বরং তিনি একাধারে একজন লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, কাহিনীকার, সঙ্গীত পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক, বাগ্মী, আবৃত্তিকারক, পত্রিকা পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন। নজরুল ইসলামের সাহিত্য চর্চার কাল ১৯১৯-১৯৪২ খ্রি./ ১৩২৬-১৩৪৯ সাল অর্থাৎ মোট তেইশ বৎসর। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দশ বছর প্রধানতঃ কবিতা এবং পরের তের বছর গান রচনা করেন। অবশ্য প্রথম দশ বছরেও তিনি অনেক উৎকৃষ্ট গান এবং শেষ তের বছরে বেশ কিছু রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখেছিলেন। তবু তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে কবিতা এবং দ্বিতীয় পর্বে গান প্রাধান্য লাভ করেছিল। সেদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম পর্বকে প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন এবং দ্বিতীয় পর্বকে মূলতঃ শিল্পীজীবনরূপে আখ্যায়িত করা যায়।

সুস্থাবস্থায় মাত্র তেইশ বছরের সাহিত্যিক ও শিল্পী-জীবনে নজরুল ইসলাম অসংখ্য কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্যানুবাদ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে সুনিপুণভাবে কলম পরিচালনার মাধ্যমে সাহিত্য-সম্ভার সৃষ্টি করে অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর স্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে নজরুল ইসলামের অন্ততঃ সাড়ে পাঁচশত রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ২৮৫ টি কবিতা, ১৯৭ টি গান, ৪৩ টি প্রবন্ধ ও ভাষণ, ১৪ টি গল্প ও ৩ টি ধারাবাহিক উপন্যাস। আর কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র সাহিত্য সম্ভার পর্যালোচনা করে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত ৪৯ টি এবং অসুস্থতার পরে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৯৭৪ টি গান, ৬৫৩ টি কবিতা, ৭৬ টি প্রবন্ধ, ১৮ টি গল্প, ৯ টি নাটক-নাটিকা, ৩ টি উপন্যাস; গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের প্রকাশিত রচনার সংখ্যা আনুমানিক গান অন্তত ২৫০০ টি, কবিতা প্রায় ৮০০ টি, প্রবন্ধ, আলোচনা, বক্তৃতা, ভাষণ প্রায় ১০০টি। নাটক-নাটিকা, গীতিনাট্য ও সঙ্গীত বিচিত্রা প্রায় ২৯ টি, গল্প ১৮ টি, উপন্যাস ৩ টি। অবশ্য কাজী নজরুল ইসলামের প্রকাশিত রচনাবলীর সর্বশেষ পরিসংখ্যান গ্রহণ করলে উপরোক্ত সংখ্যা আরো বেশী হবে নিঃসন্দেহে, বিশেষতঃ গানের।[১] উল্লেখ্য যে,নজরুল ইসলামের অসুস্থতায় পরবর্তীতে তাঁর রচনাবলী সংকলিত হয়ে অদ্যাবধি যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কবির নিজস্ব কোন পরিকল্পনার রূপায়ন নেই।

কাব্যগ্রন্থ

কাব্যক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২২টি। তন্মধ্যে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত ১৭ টি এবং অসুস্থতার পর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫ টি নিম্নে কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভার সংক্ষেপে আলোচিত হল।

১. অগ্নিবীণা

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত প্রথম কাব্য সংকলন। নজরুল ইসলামের প্রকাশিত সকল বইয়ের মধ্যে 'অগ্নিবীণা' সর্বাধিক পরিচিত। গ্রন্থটি কবি কর্তৃক কলকাতার

---

১. রফিকুল ইসলাম, নজরুল নির্দেশিকা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে কার্তিক ১৩২৯; সফর ১৩৪১; ২৫ অক্টোবর, ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২] অগ্নিবীণা কাব্যের নামটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' গানটি থেকে গৃহীত হয়েছে।[৩] কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে,

ভাঙা-বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর-
শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রী শ্রী চরণার বিন্দেষু
অগ্নি-ঋষি! অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে;
তাই তো তোমার বহ্নি রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে।[৪]

১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন শেষে কলকাতায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবনের প্রথম আড়াই বছরে রচিত 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' এই ১২ টি কবিতা উদ্দীপনামূলক কাব্য সংকলন 'অগ্নিবীণা' তে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫]

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় পৌরাণিক কিংবা সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের মাহাত্ম্য উদঘাটনের রূপকে সমাজ, জাতি ও স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। যে সকল কবিতায় কবির আত্মস্ফূর্তি বা প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে সেসব কবিতায় সমকালীন সংকট উত্তরণের প্রয়াস মুখ্য। 'অগ্নিবীণা' কাব্য সংকলনের প্রায় প্রতিটি কবিতাই সুদীর্ঘ, আবেগময় ও নাটকীয়; ছন্দের ক্ষেত্রে সমিল স্বরবৃত্ত বা সমিল মাত্রাবৃত্ত প্রবহমান ব্যবহারে কবি নজরুল ইসলামের পারদর্শিতা এতে লক্ষনীয়। মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কবিতাগুলোতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প বিনির্মাণে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে কবির সার্থকতা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী চিন্তাধারার নতুন আবহ সৃষ্টি করেছে।[৬]

'অগ্নিবীণা' নজরুল ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বইয়ের অধিকাংশ কবিতা এই নামের মর্যাদা অনুসরণ করেছে। দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং অত্যাচারের ভীতকে যেন পুড়িয়ে দিতে চায় বিধ্বংসী আগুনের ঝলকের মতন। প্রকৃতই 'অগ্নিবীণা' অগ্নিগর্ভ কবিতার সংকলন গ্রন্থ। এর প্রত্যেকটি কবিতা যেন আগুনের লেলিহান শিখা। পাঠকের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়ার যোগ্যতা অগ্নিবীণার প্রত্যেকটি পাতায় পাতায় দেদীপ্যমান। অগ্নিবীণা একটি মহৎ কাব্যগ্রন্থ; এ কাব্য সংকলন বাংলা কবিতাকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হেলমুথ ফন গ্লাসেনপ 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন; "The Poems deserve with full right the name the author has given them; they are full of emotion like fire and sweet like the tune of vine."[৭]

---

২. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৫৭।

৩. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৩১০।

৪. কাজী নজরুল ইসলাম, উৎসর্গ, 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩; উৎসর্গ গানটি 'অগ্নি-ঋষি শিরোনামে ১৩২৮ শ্রাবণ সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৭৪৫।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'অগ্নিবীণা', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট , মাঘ, ১৪০১/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫); নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৫০।

৬. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ৩৭০।

৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

নানা দিক বিবেচনায় 'অগ্নিবীণা' কে কাজী নজরুল ইসলামের খণ্ড কবিতার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

২. দোলন-চাঁপা

নজরুল ইসলামের ভালবাসা ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত একটি কবিতা সংগ্রহ 'দোলন-চাঁপা'। কবি বহরমপুর জেলে রাজবন্দী থাকাকালীন আশ্বিন, ১৩৩০; রবিউল আউয়াল, ১৩৪২; অক্টোবর, ১৯২৩ সালে শ্রী শরচ্চন্দ্র গুহ বি.এ.কর্তৃক আর্য পাবলিশিং হাউস, ২০ নং কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা থেকে 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৮] এতে সংকলিত কবিতাবলী হচ্ছেঃ 'দোদুল দুল', 'বেলা শেষে', 'পউষ', 'পথহারা', 'ব্যথা-গরব', 'উপেক্ষিত', 'সমর্পণ', 'পূবের চাতক', 'অবেলার ডাক', 'চপল-সাথী', 'পূজারিণী', 'অভিশাপ', 'আশান্বিতা', 'পিছুডাক', 'মুখরা', 'সাধের ভিখারিণী', 'কবি-রাণী', 'আশা', 'শেষ প্রার্থনা', 'সে যে চাতকই জানে'।[৯]

উল্লেখ্য যে, কবি যখন রাজবন্দী, সেই সময় 'দোলন-চাঁপা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কোন উৎসর্গপত্র পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪ খ্রি.) 'দোলন-চাঁপা' এর প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকারূপে 'দুটি কথা' লিখে দেন, তাতেই এক ধরনের উৎসর্গের অগ্নিক্ষরা স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।[১০] নজরুল ইসলামের অন্যতম বিখ্যাত 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি কল্লোল পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০/ মে, ১৯২৩ ইং ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় এবং 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধরূপে সংকলিত হয়েছিল। 'দোলন-চাঁপা'র তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১ সালের শ্রাবণ মাসে বের হয়, যাতে কিছু কবিতা অদল-বদল করে অনেক নতুন কবিতা সংযুক্ত করা হয়।[১১]

৩. বিষের বাঁশী

'বিষের বাঁশী' গ্রন্থখানি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের কতকগুলি উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও গানের সমষ্টি। কাজী নজরুল ইসলাম হুগলীতে অবস্থানকালীন নিজেই প্রকাশক হিসেবে 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থটি ১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১; ২৯ জিলহজ্জ, ১৩৪২; ১০ আগষ্ট, ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেছেন।[১২] গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন;

"বাঙলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগত-জননী স্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে"-[১৩]

'বিষের বাঁশী'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১ খ্রি.), নজরুল ইসলামের ভাষায় 'প্রথিতযশা কবি-শিল্পী আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু'। নজরুল ইসলাম 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু নতুন কবিতা ও গান সংযোজন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত পাল্টে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করে নতুন

---

৮. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, নজরুল গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৪১৯।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'দোলন-চাঁপা', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, বৈশাখ,১৪০২/এপ্রিল, ১৯৯৫), নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১৬২।

১০. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৭৪৯-৭৫০।

১১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৪; রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, পৃ. ৩৭২।

১২. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৫৮।

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম, উৎসর্গ, 'বিষের বাঁশী', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের মতো 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের নামও সঙ্গীতযন্ত্র থেকে নেয়া হয়েছে; সুরের পরিবর্তে বীণা থেকে অগ্নি এবং বাঁশী থেকে বিষের সৃষ্টি বলেই অভিনব।[১৪]

'বিষের বাঁশী' প্রকাশের কৈফিয়ৎস্বরূপ বইয়ের ভূমিকায় নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন; "অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে সব কবিতা ও গান দেবো বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সে সব কবিতা ও গান দিয়ে এই 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করলাম। নানাকারণে 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম।.... এ 'বিষের বাঁশী'র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িত দেশ-মাতা, আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।"[১৫]

'বিষের বাঁশী'তে সংকলিত রচনার মধ্যে ৮টি কবিতা ও ১৭ টি গান। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে যেসব শিরোনাম রয়েছেঃ 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্' (আবির্ভাব), 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্' (তিরোভাব), 'সেবক', 'জাগৃহী', তূর্য্য-নিনাদ', 'বোধন', 'উদ্বোধন', 'অভয়মন্ত্র', 'আত্মশক্তি', 'মরণ-বরণ', 'বন্দী-বন্দনা', 'বন্দনা-গান', 'মুক্তি-সেবকের গান', 'শিকল-পরার গান', 'মুক্ত-বন্দী', 'যুগান্তরের গান', 'চরকার গান', 'বিদ্রোহীর বাণী', 'অভিশাপ', 'মুক্ত-পিঞ্জর', 'ঝড়' (পশ্চিমতরঙ্গ)।[১৬]

'বিষের বাঁশী'র কবিতা ও গানগুলোর ভেতর যে ঐক্য রয়েছে তা কবির প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের অনুভূতি। পরাধীনতার গ্লানিতে সারাদেশ যখন মুহ্যমান, তখন এই বইয়ে কবিতা ও গান গুলি মানুষের মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হওয়ার মাত্র দু'মাসের মধ্যে রাজরোষে পতিত হয়ে তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯২৪ সালের ২২ শে অক্টোবর বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অবশ্য পরে ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিল 'বিষের বাঁশী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং ১৬ ই শ্রাবণ, ১৩৫২, আগষ্ট, ১৯৪৫ সালে 'বিষের বাঁশী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৭]

৪. ভাঙ্গার গান

নজরুল ইসলামের 'ভাঙ্গার গান' গ্রন্থটি কবি হুগলীতে থাকাকালে শ্রাবণ, ১৩৩১; মোহররম, ১৩৪৩; আগষ্ট, ১৯২৪ সালে ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৮] সংগ্রামী ঐতিহ্যের জন্য খ্যাত 'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশ্যে' উৎসর্গীকৃত 'ভাঙ্গার গান' গ্রন্থে সংকলিত ১১ টি রচনার মধ্যে মাত্র ২ টি কবিতা, 'দুঃশাসনের রক্তপান' ও 'শহিদী ঈদ'। এ ছাড়া যথাক্রমে ৯ টি গান রয়েছেঃ 'ভাঙ্গার গান', 'জাগরণী', 'মিলন-গান', 'পূর্ণ-অভিনন্দন', 'ঝোড়োগান', 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান', 'আগু-প্রয়াণ গীতি', 'ল্যাবেন্ডিশ্ বাহিনীর বিজাতীয় সংগীত', 'সুপার বন্দনা'।[১৯]

মূলতঃ 'ভাঙ্গার গান' একখানা উদ্দীপনাময়ী গানের বই। হুগলী জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট মিস্টার আর্সটনকে উদ্দেশ্য করে নজরুল ইসলাম যে 'সুপার বন্দনা' শিরোনামে রচনা করেছিলেন এ

---

১৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৩১৯।

১৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কৈফিয়ৎ', 'বিষের বাশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩।

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিষের বাঁশী', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০১/ ফেব্রুয়ারী,১৯৯৫): নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯৩-১৪৭।

১৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৭; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, পৃ. ৬৪-৬৫; ভিভাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (কুমিল্লাঃ ভিন্নাস প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২৮ আগষ্ট, ১৯৯০/ ১২ ই ভাদ্র, ১৩৯৭), পৃ. ৩৭।

১৮. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল,পৃ. ৪২০।

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ভাঙ্গার গান', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ অক্টোবর,১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে সে গানটিও স্থান পেয়েছে। ভাঙ্গার গানের মূলগত প্রেরণা বিদ্রোহের ও বিপ্লবের। অসহযোগ আন্দোলনকেও এ বই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই এ গ্রন্থটিও তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক ১৯২৪ সালের ১১ ই নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৭/১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।[২০]

৫. ছায়ানট

নজরুল ইসলামের 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থটি ভাদ্র, ১৩৩২; সফর, ১৩৪৪; সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সালে ব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায় কর্তৃক বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২১] ছায়ানটের উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছিলেন,

"আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
ও
কুতুব উদ্দীন আহ্‌মদ
করকমলে।"[২২]

'ছায়ানট' প্রথম সংস্করণে যে উৎসর্গপত্রটি ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলোতে তা বর্জিত হয়।[২৩] ছায়ানটে যে সব কবিতা ও গান রয়েছে যথাক্রমেঃ 'বিজয়িনী', 'কমল-কাঁটা', 'চৈতী-হাওয়া', 'বেদনা-অভিমান', নিশীথ প্রীতম', 'অবেলায়', 'হার-মানা হার', 'লক্ষী ছাড়া', 'শেষের গান', 'নিরুদ্দেশের যাত্রী', 'চিরন্তনী প্রিয়া', 'বেদনা-মণি', 'পরশ-পূজা', 'অনাদৃতা', 'শায়ক-বেধা পাখী', 'হারা-মণি', 'নীলপরী', 'স্নেহ-ভীতু', 'পলাতকা', 'চিরশিশু', 'মানস-বধু', 'দহন-মালা', 'বিদায়-বেলায়', 'অকরুণ', 'পিয়া', 'ব্যথা-নিশীথ', 'সন্ধ্যাতারা', 'দূরের বন্ধু', 'আশা', 'মরমী', 'মুক্তি-বার, 'আপন-পিয়াসী', 'বিরাগিনী', 'প্রতিবেশিনী', 'দুপুর-অভিসার', 'ছল-কুমারী', 'পাপড়ি খোলা', 'বিধুঁরা', 'পথিক-প্রিয়া', 'মনের মানুষ', 'প্রিয়ার রূপ', 'বাদল-দিনে কার বাঁশী বাজিল?', 'অকেজোর গান', 'ভঙ্গ বাদল', 'চাঁদ-মুকুর', 'চির-চেনা', 'পাহাড়ী গান', 'অমর কানন', 'পূবের হাওয়া', (ঝড়ঃপূর্বতরঙ্গ), 'আলৃতা-স্মৃতি', 'রৌদ্রদগ্ধের গান'। ছায়ানটে ৫০ টি শিরোনামের মধ্যে নজরুল ইসলামের গানের সংখ্যা ৩৭ টি।[২৪]

৬. পূবের হওয়া

নজরুল ইসলামের 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থটি আশ্বিন, ১৩৩২; সফর, ১৩৪৪;সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সালে ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'পূবের হাওয়া' কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবির বিরহ- বিধুর মনের আলেখ্য। বিদ্রোহী কবির অন্তরের প্রেমের ফল্গুধারা।[২৫] এতে সন্নিবেশিত ১১ টি শিরোনামের কবিতা ও গানের মধ্যে রয়েছেঃ

---

২০. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৮; তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৭।

২১. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৬০।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম, উৎসর্গ, 'ছায়ানট', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

২৩. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৭৫৪।

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ছায়ানট', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/মার্চ, ১৯৯৭); নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ১৭৫-২৩৬।

২৫. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২১; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

'স্মরণে', 'বাদল-প্রাতের শরাব', 'মানিনী', 'হোলি', 'বে-শরম', 'সোহাগ', 'শরাবন-তহুরা', 'বিরহ-বিধুরা', 'প্রণয়-নিবেদন', 'ফুল-কুঁড়ি'।[২৬]

৭. সাম্যবাদী

সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলামের একটি বৃহৎ কবিতা। 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি মাত্র দুই আনা মূল্য দিয়েপুস্তিকা আকারে পৌষ, ১৩৩২; জমাদিয়স সানি, ১৩৪৪; ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে মৌলবী শামসুদ্দীন হুসাইন কর্তৃক বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, ৫, নূর মোহাম্মদ লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশ করা হয়। এরপর এ 'সাম্যবাদী' কবিতাটি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৭]

নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। 'সাম্যবাদী, কবিতা সমষ্টিতে 'সাম্যবাদী' ছাড়াও 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর-ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি মজুর' শীর্ষক ১১ টি কবিতা রয়েছে।[২৮]

৮. চিত্তনামা

১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫ খ্রি.) এর মৃত্যুতে নজরুল ইসলামের যেসব কবিতা ও গান বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'চিত্তনামা' সেই সকল গান ও কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থটি কবি কর্তৃক শ্রাবণ, ১৩৩২; জিলহজ্জ, ১৩৪৩; আগষ্ট, ১৯২৫ সালে হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯] নজরুল ইসলাম 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থটি "মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দে" উৎসর্গ করেন।[৩০] চিত্তনামায় রয়েছে: 'অর্ঘ্য', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'সান্ত্বনা', 'ইন্দ্রপতন', 'রাজ-ভিখারী' প্রভৃতি শিরোনামের কবিতা ও গান। তন্মধ্যে ৩ টি কবিতা ও ২টি গান।[৩১]

৯. সর্বহারা

নজরুল ইসলামের কিছু কবিতা ও গানের সমষ্টি 'সর্বহারা'। গ্রন্থটি কবি কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালীন ১৬ ভাদ্র, ১৩৩৩; ২৩ সফর, ১৩৪৫; ২সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। "মা (বিরজা সুন্দরী দেবী)র শ্রী চরণারবিন্দে" উৎসর্গীকৃত। এ গ্রন্থে সংকলিত গান ও কবিতায় শ্রেণী চেতনা আরও স্পষ্ট; 'সর্বহারা' কাব্যে নজরুল ইসলাম সর্বহারাদের জীবনকে 'ব্যথার সাঁতার পানি-ঘেরা চোরা বালির চর' আর বিপ্লবোত্তর ভবিষ্যতকে দূরের মাটির উপমায় বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেখানে কৃষক, শ্রমিক, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য গান রচনা করেছেন।[৩২]

'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে 'সর্বহারা', 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান', 'ছাত্রদলের গান', 'কান্ডারী হুশিয়ার', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'প্রার্থনা', 'গোকুল নাগ'।[৩৩]

---

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, পূবের হাওয়া, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক, ১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৩২।

২৭. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৬০; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫২-২৫৩।

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম, সাম্যবাদী, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-২১।

২৯. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২১; খান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪২।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উৎসর্গ', 'চিত্তনামা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।

৩১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চিত্তনামা',(ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক, ১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬): নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ২৪১-২৫০।

৩২. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫২।

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম , 'সর্বহারা', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০১/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫); নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

'সর্বহারা'তে রয়েছে মাত্র ৩ টি কবিতা। সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের প্রধান সম্পদ 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ। প্রথম সংস্করণের সাথে পরের সংস্করণের মিল নেই। অনেক কবিতা ওলট-পালট করা হয়েছে। বাংলা ১৩৩৩ সালে 'সর্বহারা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এতে সর্বসমেত ২১ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। নানা কারণে বর্তমান সংস্করণে পূর্বের কিছু কবিতা বর্জন করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে কিছু নতুন কবিতা এতে সংযোজিত হয়েছে।[৩৪]

১০. ফণি-মনসা

নজরুল ইসলামের কবিতা সমষ্টি 'ফণি-মনসা'। যার অধিকাংশ কবিতা সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে লেখা। কবির স্বভাবসুলভ জাগরণগীতি গ্রন্থের প্রতি পাতায় পাতায় ও প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে রয়েছে। কবির অন্তরের সারল্য এ বইয়ে সহজভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটি শ্রাবণ, ১৩৩৪; মোহররম, ১৩৪৬; ২৯ জুলাই, ১৯৭২ সালে কবি কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৫] ফণি-মনসায় সংকলিত হয়েছে ১৭টি কবিতা ও ৬ টি গান। যথা 'সব্যসাচী', 'মুক্তিকামী', 'সাবধানী', 'বর্ষা', 'বিদায়-মাভৈঃ', 'বাংলায় মহাত্মা' (গান), 'হেমপ্রভা', 'অশ্বিনীকুমার', 'ইন্দুপ্রয়াণ', 'দিল-দরিদী', 'সত্যেন্দ্রপ্রয়াণ', 'সত্য-কবি', 'সত্যেন্দ্র প্রয়াণ-গীতি', 'সুর কুমার', 'রক্ত পতাকার গান', 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'জাগরে-তূর্য', 'যুগের আলো', পথের দিশা', 'যা শত্রু পরে পরে', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ'।[৩৬] গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সাথে দ্বিতীয় সংস্করণের মিল নেই। অনেক কবিতা রদবদল করা হয়েছে।

১১. সিন্ধু-হিন্দোল

নজরুল ইসলামের কবিতা সমষ্টি 'সিন্ধু-হিন্দোল' ১৫ শ্রাবণ, ১৩৩৩; ২০ মোহররম, ১৩৪৬; ৩১ জুলাই, ১৯২৭ সালে "বাহার ও নাহার কে" উৎসর্গ করে প্রকাশিত হয়।[৩৭] এতে রয়েছে ১৯ টি শিরোনাম, যথাঃ- 'সিন্ধু' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ), 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'বিদায় স্মরণে', 'পথের স্মৃতি', 'উন্মনা', 'অতল পথের যাত্রী', 'দারিদ্র্য, 'বাসন্তী', 'ফাল্গুনী', 'মঙ্গলাচরণ', 'বধূবরণ', 'অভিযান', 'রাখী-বন্ধন', 'চাদনী রাতে', 'মাধবী-প্রলাপ', 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর'।[৩৮]

১২. জিঞ্জীর

কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কবিতা সমষ্টি 'জিঞ্জীর'। ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ এ কাব্যসংকলনটি শ্রাবণ, ১৩৩৫; মোহররম, ১৩৪৭; আগষ্ট, ১৯২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর প্রতিটি কবিতাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৯] 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ১৪টি কবিতা ও ২ টি গান। যথাঃ- 'বার্ষিক সওগাত', 'অঘ্রাণের সওগাত', 'মিসেস এম. রহমান', 'নকীব', 'খালেদ', 'সুবৃহ-উম্মেদ', 'খোশ-আমদেদ', 'নওরোজ', 'ভীরু', 'অগ্রপথিক', 'ঈদ-মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক', 'এ মোর অহঙ্কার'।[৪০]

---

৩৪. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২১-৪২২।

৩৫. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৬।

৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ফণি-মনসা', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক,১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬); নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৯০।

৩৭. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২২-৪২৩।

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সিন্ধু-হিন্দোল', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, চৈত্র, ১৪০৩/ মার্চ, ১৯৯৭): নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫-১৩৪।

৩৯. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৩; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৬৩।

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জীর', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪/ মে, ১৯৯৭); নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সঞ্চিতা

নজরুল ইসলামের বাছাইকৃত কতগুলো কবিতা দিয়ে 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতাবলী এত অধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে যে, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আগে-পিছে প্রতিযোগিতা করে দু'জন প্রকাশক সঞ্চিতার দু'টি কাব্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। "বিশ্বকবি-সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণার বিন্দুষে"-কে উৎসর্গ করে একটি প্রকাশ করেন বর্মণ পাবলিশিং হাউস এবং অপরটি ডি. এম. লাইব্রেরী। সঞ্চিতার প্রথম সংস্করণ বর্মণ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক ১৬ আশ্বিন, ১৩৩৫; ১৪ রবিউস সানি, ১৩৪৭; ২ অক্টোবর, ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। সঞ্চিতার ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী সংকলনে 'অগ্নিবীণা', 'ঝিঙেফুল', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'ছায়ানট', 'দোলন-চাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা সংগৃহীত হয়।[৪১]

এতদ্ব্যতীত 'সঞ্চিতা'র আরেকটি সংস্করণ ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক ২৮ আশ্বিন, ১৩৩৫; ২৯ রবিউস সানি, ১৩৪৭;১৪ অক্টোবর, ১৯২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ সঞ্চিতার ২২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী সংকলিত কবিতা ও সঙ্গীতে 'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চিত্তনামা', 'ঝিঙেফুল', 'বুলবুল', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা', 'চোখের চাতক', 'চন্দ্রবিন্দু' ও 'নজরুল গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত। এ সংস্করণই বর্তমানে প্রচলিত আছে।[৪২]

১৪. চক্রবাক

নজরুল ইসলামের কবিতার বই 'চক্রবাক' ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক ২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৬; ৬ রবিউল আউয়াল, ১৩৪৮; ১২ আগষ্ট, ১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৩] কবি নজরুল ইসলামের 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থখানা "বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রী চরণারবিন্দেষু"এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।[৪৪] এতে এ উৎসর্গপত্র ও গোড়ায় একটি শিরোনামহীন কবিতা ছাড়া ২১ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। যথা- 'ওগো ও চক্রবাকী', 'তোমারে পড়িছে মনে', 'বাদল-রাতের পাখী', 'স্তব্ধ রাতে', 'বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারী', 'কর্ণফুলী', 'শীতের সিন্ধু', 'পথচারী', 'মিলন-মোহনায়', 'গানের আড়াল', 'তীরু', 'এ মোর অহঙ্কার', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', 'হিংসাতুর', 'বর্ষা-বিদায়', 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে', 'অপরাধ শুধু মনে থাকে', 'আড়াল', 'নদী-পারের মেয়ে', '১৪০০ সাল', 'চক্রবাক' ও 'কুহেলিকা'।[৪৫]

১৫. সন্ধ্যা

নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যা' ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক ২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৬; ৬ রবিউল আউয়াল ১৩৪৮; ১২ আগষ্ট, ১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'মাদারিপুর শান্তিসেনা'র কর-শতদলে ও বীর সেনা নায়কের শ্রী চরণাম্বুজে" উৎসর্গীকৃত।[৪৬] এ কাব্যগ্রন্থে যে সব কবিতা রয়েছে, যথাক্রমে: 'সন্ধ্যা', 'তরুণ তাপস', 'আমি গাই তারি গান', 'জীবন-বন্দনা', 'ভোরের পাখী', 'কাল-বৈশাখী', 'নগদ কথা', 'জাগরণ', 'জীবন', 'যৌবন', 'তরুণের গান', 'চল্ চল্ চল্', 'ভোরের সানাই',

---

রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৯০।

৪১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫১।

৪২. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ.৪২৩; কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯১), পৃ. ৯-২১৮।

৪৩. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৬৪।

৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম , 'উৎসর্গ', 'চক্রবাক', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চক্রবাক', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, চৈত্র, ১৪০৩/ এপ্রিল, ১৯৯৭); নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৮৩-৫৪১।

৪৬. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৪।

Dhaka University Institutional Repository

'যৌবন-জল-তরঙ্গ', 'রীফ সর্দার', 'বাংলার আজীজ', 'সুরের দুলাল', 'নিশীথ অন্ধকারে', 'শরৎচন্দ্র', 'অন্ধ স্বদেশ-দেবতা', 'পাথেয়', 'দাড়ি-বিলাপ', 'তর্পণ', 'না-আসা দিনের কবির প্রতি'। সন্ধ্যা কাব্য গ্রন্থে রয়েছে ২০ টি কবিতা ও ৪ টি গান।[৪৭]

১৬. প্রলয়-শিখা

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত অগ্নিঝরা বই 'প্রলয়-শিখা'। কবি নিজেই প্রকাশক। 'প্রলয়শিখা'র প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৩৭; আগষ্ট, ১৯৩০ সালে মহামায়া প্রেস, ১৯৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে ছাপা হয় এবং ৫০/২ এ, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৮] 'প্রলয়-শিখা'তে সংকলিত হয়েছে ১৩ টি কবিতা ও ৫ টি গান। যথা- 'প্রলয়-শিখা', 'নমস্কার', 'হবে-জয়', 'পূজা অভিনয়', 'ভারতী-আরতি', 'বহ্নি-শিখা', 'খেয়ালী', 'রঙীন খাতা', 'বৈতালিক', 'সমর-সঙ্গীত', 'চাষার গান', 'মণীন্দ্র প্রয়াণ', 'নব-ভারতের হল্‌দিঘাট', 'যতীনদাস', 'বিংশ শতাব্দী', 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' ও 'রক্ত-তিলক'।[৪৯]

'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থে প্রলয়, যৌবন, রুদ্র, নারী, ইত্যাদি বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর ভাব চিন্তার প্রকাশ ছাড়াও সমকালীন দেশ-কাল বিশেষতঃ স্বদেশের সমকালীন রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে। ফলে রাজরোষে প্রলয়-শিখা গ্রন্থটি ১৯৩০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরে বাজেয়াপ্ত হয় এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১১ ডিসেম্বর একটি রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় কবির ছয় মাসের কারাদন্ড হয়। ১৯৩০ সালের ১৬ ডিসেম্বর কবি জামিনে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর কবি মামলা থেকে অব্যাহতি পান। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রলয়-শিখার উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।[৫০]

'প্রলয়-শিখা'র দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রকাশ ১৩৫২ সাল) এর ভূমিকায় প্রকাশক উল্লেখ করেছেন; "বিপ্লবের অগ্নিযুগে 'প্রলয়-শিখা'র প্রথম আবির্ভাব। সেদিন সমগ্র ভারত বিপ্লবোম্মুখ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা ভারতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। দিকে দিকে গণজাগরণের অপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী তাহার দীর্ঘ দিনের বন্ধন মোচন করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সে অকুতোভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল মুক্তি সাধনার অগ্নি পরীক্ষায়। সেই সময়ে, গণ-জাগরণের এই পুণ্য মুহূর্তে 'প্রলয়-শিখা' তাহার জ্বালাময়ী অনলবর্ষী বাণী প্রচার করে বিপ্লবকে সার্থক করিতে চাহিয়াছিল।

বাস্তবিকই 'প্রলয়-শিখা' বাংলাদেশে প্রলয় সৃষ্টি করিল। তৎকালীন বিদেশী সরকার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অল্প দিনের মধ্যে রাজদ্রোহিতা প্রচারের অভিযোগে কবি গ্রেফতার হইলেন। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হইল। ইতিমধ্যে সরকার 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে দিলেন।"[৫১]

১৭. নির্ঝর

নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানের বই 'নির্ঝর' মোহসীন এন্ড কোং কলকাতা থেকে ৯ মাঘ, ১৩৪৫; ১ জিলকদ, ১৩৫৭; ২৩ জানুয়ারী, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের

---

৪৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সন্ধ্যা', (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৬৬।

৪৮. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৪।

৪৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'প্রলয় শিখা', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৩৮৮।

৫০. ভিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৪১।

৫১. শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থাবস্থায় গ্রন্থটি প্রকাশের পর আর বিক্রয়ার্থে বাজারে বের হয়নি।[৫২] 'নির্ঝর' কাব্যসংকলনে রয়েছে- 'অভিমানী', 'বাঁশির ব্যথা'(রুমী), 'আশায়' (হাফেজ)' 'সুন্দরী', 'মুক্তি', 'চিঠি', 'আরবী ছন্দের কবিতা', 'প্রিয়ার দেওয়া শারাব', 'মানিনী বধূর প্রতি', 'গরীবের ব্যাথা', 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে', 'হবে জয়', 'পূজা অভিনয়', 'চাষার গান', 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না', দীওয়ান-ই-হাফিজ (৮টি রুবাইয়াৎ)।[৫৩]

১৮. নতুন চাঁদ

কবি নজরুল ইসলামের 'নতুন চাঁদ' গ্রন্থটি মোহাম্মদী বুক এজেন্সী কলকাতা থেকে চৈত্র, ১৩৫১; রবিউল আউয়াল, ১৩৬৪; মার্চ, ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৫৪] এতে যে সব কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছেঃ 'নতুন চাঁদ', 'চির-জনমের প্রিয়া', 'আমার কবিতা তুমি', 'নিরুক্ত', 'সে যে আমি', 'অভেদম, 'অভয়-সুন্দর', 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলী', 'কিশোর রবি', 'কেন জাগাইলি তোরা', 'দুর্বার যৌবন', 'আর কতদিন', 'ওঠরে চাষী, 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'শিখা', 'আজাদ'। অবশ্য পরে 'নতুন চাঁদ' কাব্য সংকলনটির দ্বিতীয় মুদ্রণকালে 'ঈদের চাঁদ' ও 'চাঁদনী রাতে' এ দু'টি কবিতা অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে।[৫৫]

১৯. সঞ্চয়ন

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানের সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চয়ন' কলকাতা থেকে ১৩৬২/ ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৫৬]

২০. মরু-ভাস্কর

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন-চরিত নিয়ে লেখা নজরুল ইসলামের একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'মরু-ভাস্কর'। এ জীবনী কাব্য নজরুল ইসলাম প্রথমে 'সওগাত' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সংখ্যায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে 'অবতরণিকা' লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও এটা তিনি শেষ করতে পারেননি। কবির ধ্যান স্তিমিত হওয়ার পর 'মরু-ভাস্কর' অসম্পূর্ণ অবস্থায় পুস্তকাকারে ১৩৫৭/১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়।[৫৭]

'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থে যে সব শিরোনামে কবিতা রয়েছে- প্রথম সর্গঃ 'অবতরনিকা', 'অনাগত', 'অভ্যুদয়', স্বপ্ন, 'আলো-আধাঁরি', 'দাদা', 'পরভৃত'; দ্বিতীয় সর্গঃ 'শৈশব-লীলা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শাক্কুস সাদ্‌র' (হৃদয়-উন্মোচন), 'সর্বহারা', তৃতীয় সর্গঃ 'কৈশোর', 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ'; চতুর্থ সর্গঃ 'শাদী মোবারক', 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নওকাবা'।[৫৮]

---

৫২. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল,পৃ. ৪২৪-৪২৫; খান মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৫।

৫৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'নির্ঝর',(ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭); নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫-৩০৮।

৫৪. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৫।

৫৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'নতুন চাঁদ',(ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬): নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫-৫২।

৫৬. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৬৯; রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৬০৬।

৫৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৯।

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মরু-ভাস্কর', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪/ জুন, ১৯৯৭): নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

২১. শেষ সওগাত

নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গানের সমষ্টি 'শেষ সওগাত' ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা থেকে ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৫; এপ্রিল, ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.) এর ভূমিকা লিখেছিলেন। তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন, "নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত'রূপে এই সংকলনে তার অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।"[৫৯]

'শেষ সওগাতে' কবিতা ও গানের সংখ্যা ৪২ টি। যথা-'জাগো সৈনিক আত্মা', 'কেন আপনারে হানি হেলা?', 'নবাগত উৎপাত', 'বন্ধুরা এসো ফিরে', 'নারী', 'নিত্য প্রবল হও' 'আগ্নেয়গিরি', 'বাঙলার যৌবন', 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে?', 'চির-বিদ্রোহী', 'ভয় করিও না', 'হে মানবাত্মা', 'সুখ বিলাসিনী পরাবাত তুমি', 'হুল ও ফুল', 'কোথা সে পূর্ণযোগী', 'রবির জন্মতিথি', 'বড় দিন', 'নবযুগ', 'শোধ কর ঋণ', 'মোহররম', 'আর কত দিন?', 'বিশ্বাস ও আশা', 'ডুবিবে না আশাতরী', 'সকল পথের বন্ধু', 'তোমারে ভিক্ষা দাও', 'বক্‌রীদ', 'আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও', 'এ কি আল্লার কৃপা নয়?', 'মোহসীন স্মরণে' (গান), 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ,' 'গোড়ামি ধর্ম নয়', 'জোর জমিয়াছে খেলা', 'বোমার ভয়', 'কচুরীপানা' (গান),' 'টাকা ওয়ালা', 'করিব মুক্তি', 'ছন্দিতা', 'পূরব বঙ্গ', 'আরতি', 'পার্থ-সারথি', 'আত্মগত', 'কাবেরী তীরে', 'অমৃতের সন্তান'।[৬০]

২২. ঝড়

নজরুল ইসলামের জাগরণমূলক কবিতা ও গানের সংকলন 'ঝড়' বিশ্ববাণী, কলকাতা থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭/ নভেম্বর, ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬১] 'ঝড়' কাব্যগ্রন্থে 'উঠিয়াছে ঝড়', 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না', 'শাখ-ই-নবাতে', 'গদাই-এর পদ বৃদ্ধি', 'কাব্যভাষা', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'ক্ষমা করো হযরত,' 'সাম্পানের গান,' 'অনামিকা' প্রভৃতি শিরোনামে রচনা স্থান পেয়েছে।[৬২]

কাব্যানুবাদ

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাস এই সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মধ্যে নজরুল ইসলামের তিনটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম যথাক্রমে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এবং 'কাব্য আমপারা' প্রকাশিত হয়। নিম্নে নজরুল ইসলামের কাব্যানুবাদগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

১. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্র কাজী অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুলের রোগশয্যায় বসে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অনুবাদ করেছিলেন। কলকাতা থাকাকালে গ্রন্থটি ১ আষাঢ়, ১৩৩৭; ১৪ জুলাই, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। পারস্যের অমর কবি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ

---

৫৯. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

৬০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শেষ সওগাত', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, বৈশাখ, ১৪০৪/ এপ্রিল, ১৯৯৭); নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২৮৬।

৬১. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৬; শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ. ৬৭০; নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২০।

৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ঝড়', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭); নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮৬৭-৮৮০।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩২০-১৩৯০ খ্রি.) এর মূল ফারসী থেকে ৭৩ টি রুবাইয়াৎ এর অনুবাদ এ কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাকী দু'টির অনুবাদ কবি গোড়ার দিকে মুখবন্ধেই দিয়েছেন।[৬৩]

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' শীর্ষক কাব্যানুবাদ গ্রন্থটি কবি তাঁর অকালপ্রয়াত শিশুপুত্র বুলবুল (১৯২৬-১৯৩০ খ্রি.) এর স্মৃতির প্রতি নিবেদন করে উৎসর্গপত্রে লিখেন;

বাবা বুলবুল!

তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সে দিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর? জানি না তুমি কোথায়? যে লোকেই থাক, তোমার শোক সন্তপ্ত পিতার এই শেষদান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ ক'রো। তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত করে তুলবে। সিরাজি-বুলবুল-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি-

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।[৬৪]

ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' এর মুখবন্ধে লিখেছেন, "সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা । সেই খানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কতগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেই দিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।

তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি।... যেদিন অনুবাদ শেষ হল সেদিন আমার খোকা 'বুলবুল' চলে গেছে। আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।... যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের জানাজা চলে গেল সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হল।... আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সী হতেই এর অনুবাদ করেছি।"[৬৫]

কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'রুবাইয়্যাৎ-ই-হাফিজ' এর ১ম সংখ্যক রুবাইর অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়
দৃষ্টি আমার পলক-হারা ।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,

---

৬৩. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫০; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল,পৃ.৪৪৮।

৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম, উৎসর্গপত্র, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, মুখবন্ধ, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হল নয়ন-তারা ॥[৬৬]

কাজী নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' এর প্রশংসা করে ১৯৩০ খ্রি. / ১৩৩৭ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' যা লেখা হয়েছিল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পত্রিকাটিতে লেখা হয়, "কবি হাফিজের অপরিমেয় প্রতিভা, তাঁহার রুবাইয়াৎ অনুবাদ করিয়াছেন কবি নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম তাঁহারও প্রতিভা আমাদের প্রশংসার অনেক উর্ধ্বে। একজন মরমী কবি ভিন্ন ভাষাভাষী আর একজন মরমী কবির অন্তরকে নিজের অন্তরে বসাইয়া বাংলা কাব্যে তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।...কবি মূল পারসী হইতে রুবাইগুলির তর্জমা করিয়াছেন এবং মূল পারসীর যে ছন্দ, অনুবাদে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কবির এ কৃতিত্বের মহিমা কেবল সমঝদার পাঠকই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ কবি নজরুল ইসলামের হাতে যেরূপ মোহন সুন্দররূপে ফুটিয়াছে, বাংলার অন্য কোন কবির হাতে সেরূপ ফুটিতে পারিত না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ পারসী কবিদের অন্তরের সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয় যেমন নিবিড় তেমনি আর কাহারো নহে। মুখবন্ধে জীবনী দিয়া কবি নজরুল অনুবাদখানিকে আরো মনোরম, আরো উপভোগ্য করিয়াছেন। মোটের উপর আমরা এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, রসিক পাঠক এই অনুবাদখানি পড়িয়া অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইবেন।"[৬৭]

২. রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

নজরুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-কর্ম 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয় অবশ্য পুস্তকাকারে নয়। মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর ১-৩১ গুচ্ছের অনুবাদ কার্তিক, ১৩৪০; অক্টোবর ১৯৩৩ সংখ্যায়, ৩২-৪৬ গুচ্ছের অনুবাদ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০/নভেম্বর, ১৯৩৩ সংখ্যায় এবং ৪৭-৫৯ গুচ্ছের অনুবাদ পৌষ, ১৩৪০/ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সংখ্যায় 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' শিরোনামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। তখনই নজরুল ইসলাম 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেজন্য কবি বইটির ভূমিকাও লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে ২৫ শে মে, ১৯৬৯ সালে কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি.) সম্পাদিত 'নজরুল রচনাসম্ভার' এ প্রকাশিত হয়।[৬৮]

'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম' এর ভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন, "আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ রুবাই বেছে নিয়েছি; এবং তা ফার্সী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ, বিবেচনায় এই গুলি ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গী বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় না।...আমি আমার ওস্তাদী দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি-অবশ্য আমার সাধ্যমত। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেগ পেতে হয়েছে।...আমি আমার যথসাধ্য চেষ্টা করেছি- ওমরের সেই ঢঙ-টির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীকে যতটা পারি কায়দায় আনতে। কতদূর সফল হয়েছি, তা ফার্সী-নবীশ্‌রাই বলবেন।"[৬৯]

পরবর্তীকালে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে ২৯৭টি রুবাইয়াৎ এর বাংলা অনুবাদসহ স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে পৌষ, ১৩৬৬/ ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত

---

৬৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।

৬৭. ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৭: তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪০৩/ জানুয়ারী, ১৯৯৭), পৃ. ২৩২-২৩৩।

৬৮. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:জীবন ও কবিতা, পৃ. ২৩১; নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৭১৯।

৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। কিন্তু নজরুল ইসলামের স্বলিখিত ভূমিকার পরিবর্তে পুস্তকে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রি.) এর ভূমিকা সংযোজিত হয়। অবশ্য নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭০]

ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় পারস্যের অমর কবি গিয়াসউদ্দীন আবুল ফতেহ ওমর ইবন ইবরাহীম আল-খৈয়াম (১০৪৮-১১২২ খ্রি.) এর এত অধিক রুবাইয়াৎ অনূদিত হয়নি। মূল ফার্সী থেকে কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদের একটি নমুনাস্বরূপ 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এর ৫৫ সংখ্যক রুবাইয়াৎটি উদ্ধৃত হল,

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শারাব চলুক আজ দেদার।
এক পেয়ালি শারাব যদি পান করো ভাই অন্যদিন,
দু' পেয়ালি পান কর আজ বারের বাদশা জুম্মাবার।[৭১]

প্রসঙ্গতঃ 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর কাব্যানুবাদ সাফল্য সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের ভূমিকায় তিনি বলেন, "কাজীর অনুবাদ সফল অনুবাদের কাজী"।[৭২]

৩. কাব্য আমপারা

কাজী নজরুল ইসলামের অমর সৃষ্টি মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের শেষ পারার কাব্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা'। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রাণপ্রতিম শিশু পুত্র কাজী অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুলের মৃত্যু শিয়রে বসে পবিত্র কুরআনের 'আমপারা' অংশের সূরাগুলির কাব্যে অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। অবশ্য নজরুল ইসলাম প্রায় একই সময় কুরআনুল কারীম এবং 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র অনুবাদ কর্ম শুরু করেন; কিন্তু তিনি কুরআন মাজীদের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ শেষ করতে পারেননি এবং 'আমপারা' ব্যতীত কুরআন পাকের আর কোন অংশের অনুবাদ কর্মে অগ্রসর হতে সক্ষম হননি।[৭৩]

নজরুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কর্ম পবিত্র কুরআনের 'আমপারা' অংশের বাংলায় রূপান্তরিত পদ্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা' শিরোনামে কলকাতার করিম বক্শ ব্রাদার্স থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০/নভেম্বর, ১৯৩৩ ইং সালে প্রকাশিত হয়, যদিও গ্রন্থের প্রকাশকাল দেখা যায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০/মে, ১৯৩৩।[৭৪] কবি নজরুল ইসলামের অনূদিত এই কাব্য আমপারার সবচাইতে চমৎকার সংযোজন হয়েছে তাঁর উৎসর্গপত্রটি-যাতে তিনি শুধু একবাক্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন,

বাঙলার নায়েবে নবী
মৌলবী সাহেবানদের
দস্ত-মোবারকে-[৭৫]

কাব্য আমপারার ভূমিকায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যানুবাদের পটভূমি উল্লেখ করে লিখেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র কুরআন শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে

---

৭০. রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ৫৪২; আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৯।

৭১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

৭২. হারুন-অর-রশীদ, নজরুলের কবিতা ও গানে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার, 'সাহিত্য-পত্রিকা', নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫/ অক্টোবর, ১৯৯৮), পৃ. ২৮৬।

৭৩. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৭৪. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৮।

৭৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উৎসর্গ', 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ততঃ পড়ে বুঝবার মতও আরবী-ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কোরআন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হত না-যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন। ...

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তা'হলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন-অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোরআন হরত মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে-কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কি না জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়। মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্পশিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন, আমার সকল শ্রম সার্থক হল মনে করব।"[৭৬]

কাজী নজরুল ইসলামের পদ্যানুবাদের সার্থকতার উদাহরণস্বরূপ 'কাব্য আমপারা' থেকে 'সূরা আল-কাফিরূন' এর অনুবাদটি চয়ন করা যেতে পারে।

বল, হে বিধর্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর,-আমি পূজা করি না তাহার।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ-আমি-ও তাহারে
পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম র'বে আমারি উপরে।[৭৭]

গল্প

নজরুল ইসলাম বিরচিত ছোটগল্প গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' আর 'শিউলি-মালা'। নজরুল ইসলামের এই তিনটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময় রচিত তাঁর মোট আঠারোটি ছোট গল্প, যার মধ্যে ষোলটিই প্রেমের কাহিনী। একমাত্র 'হেনা' ছাড়া আর সব কাহিনীই ঘটনাবলীতে ট্রাজেডি আর অনেক ক্ষেত্রে ট্রাজেডির সঙ্গত কোন কারণ নজরুল ইসলাম দেখাননি।

১. ব্যথার দান

নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' শীর্ষক গ্রন্থটি পত্রের আকারে লেখা কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। এই গল্প সংকলনটিতে নজরুল ইসলামের ছয়টি ছোটগল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাঃ- 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' এবং 'রাজবন্দীর চিঠি'। সবকয়টি গল্পেরই বিষয় প্রেম; কিন্তু একরূপে নয়, বিভিন্ন আদলে। নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' পুস্তকটি মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার (ইস্ট), কলকাতা থেকে ফাল্গুন, ১৩২৯/ সফর, ১৩৪০/ অক্টোবর, ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৭৮]

---

৭৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আরজ', 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৭৭. কাজী নজরুল ইসলাম 'উৎসর্গ, 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

৭৮. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি কবি 'মানসী'কে উৎসর্গ করে লিখেন, "মানসী আমার ! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"[৭৯]

'ব্যথার দান' গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার আগে নজরুল ইসলাম করাচী থেকে 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' গল্প দু'টি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় 'ব্যথার দান', কার্তিক, ১৩২৬ সংখ্যায় 'হেনা' এবং শ্রাবণ, ১৩২৭ সংখ্যায় 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে 'বাদল বরিষণে' শ্রাবণ, ১৩২৭ সংখ্যায় মোসলেম ভারতে এবং 'ঘুমের ঘোরে' ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬ সংখ্যায় 'নূর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বাদবাকী গল্পগুলি দিয়ে 'ব্যথার দান' পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।[৮০]

ব্যথার দান

'ব্যথার দান' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৬) গল্পের নায়ক 'দারা' তার ভালবাসার 'বেদৌরা'কে ছেড়ে যুদ্ধে চলে যায়। ইতোমধ্যে 'বেদৌরা' সয়ফুল মুলূক নামক এক তরুণের কাছে তার নারী জীবনের সম্ভ্রম সতীত্ব হারায়। কিন্তু 'দারা' বেদৌরাকে ক্ষমা করতে পারেনি। শোকে-দুঃখে সে হয়ে গেল অন্ধ আর বধির। 'মনের শুদ্ধি শরীরের অশুদ্ধিতে সব সময় নষ্ট হয় না' এ সত্য জেনে উপসংহারে সকল দ্বন্দ্বের অবসান এবং দারা-বেদৌরার পুনর্মিলনের মাধ্যমে গল্প শেষ হয়।

'ব্যথার দান' বিভ্রান্ত প্রেমের কাহিনী। এই গল্পে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে নায়ক 'দারা' প্রথমে এক দেশদর্শিতায় পথচ্যুত এবং সে সুযোগে সয়ফুল মুলূকের আবির্ভাব আর নায়িকা বেদৌরার পদস্খলন। এহেন গল্পের প্রেক্ষিত হিসেবে যুদ্ধ থাকলেও চরিত্রগুলোর দুর্ভোগ-যন্ত্রণার সাথে লেখকের সংশ্রব অধিক। এর ভাষার উদ্দামতা আর কবিত্বময়ী বর্ণনা পাঠক মনে এক নব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক কথায় একে 'গদ্যকাব্য' বলা যেতে পারে।[৮১]

হেনা

দ্বিতীয় গল্প 'হেনা' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৬)তে প্রেম আর কর্তব্য সমভাবে স্বীকৃত। 'হেনা' গল্পের নায়ক 'সোহরাব' ব্যথার দানের 'দারা'র তুলনায় অনেক স্থিতধী। সেও দেশমাতৃকার আহ্বানে চঞ্চল এবং শেষ অবধি সৈনিকে পরিণত। কিন্তু সে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে নায়িকা 'হেনা'র কাছে প্রেমের দাবীতে জীবনের পাথেয় প্রার্থনা করেছে, "আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ভিতরে আগুন , আমি চাই বাইরেও আগুন জ্বলুক। আর হয়তো আসব না। তবে আমার সম্বল কি?" তখন 'হেনা' এর জবাবে বলেছে, "আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারিনি," কিন্তু যুদ্ধ যাত্রায় উদ্যত ব্যক্তির সামনে স্বাধীন দেশবাসিনী হেনার এটি মনের কথা ছিল না। যুদ্ধের পরে সে তাই নিঃসঙ্কোচেই সোহরাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।[৮২]

'হেনা' গল্পের সমালোচনা বিষয়ে ফাল্গুন, ১৩২৬/১৯২০ ইং সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় লেখা হয়, "শ্রী কাজী নজরুল ইসলামের 'হেনা' ঠিক ছোটগল্প নহে; উল্লেখযোগ্য আখ্যান। রচনায় সম্পূর্ণ সাফল্যের পরিচয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশাপ্রদ আভাস আছে। আর একটু সংযম, আর একটু সংহতি গল্পটির আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিত। নবীন লেখক বাহুল্য বর্জনে অভ্যস্ত হইলে তাঁহার গল্প আরও মনোরম হইতে পারিবে।"[৮৩]

---

৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উৎসর্গ', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

৮০. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬৩।

৮১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনূদিত, পৃ. ৮০: দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৩৫৪।

৮২. কাজী নজরুল ইসলাম , 'হেনা', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫-৩৬৭।

৮৩. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল -চরিত মানস, পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাদল বরিষণে

বৈচিত্র্য কাহিনীসমৃদ্ধ 'বাদল বরিষণে' (মোসলেম ভারত, শ্রাবণ, ১৩২৭) গল্পটির নায়িকা প্রাকৃতজন কন্যা কাজরিয়া কৃষ্ণাঙ্গী। সে বলে, 'আমি কালো কুৎসিত...আমায় ভালবাসতে নেই-ভালবাসা যায় না, ...ভালবাসতে পারবে না।' আর নায়কের বিশ্বাস,-'কালো মানুষ বড্ডো বেশী চাপা অভিমানী। তাদের কালো রূপের জন্যে তারা মনে করে তাদের কেউ ভালবাসতে পারে না। কেউ ভালবাসছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী।' নায়কের এহেন বিশ্বাসের বাস্তব মূল্য যাই হোক না কেন, গল্পের কাহিনীতে নায়িকা কাজরিয়াকে সে শেষপর্যন্ত সত্যিই পায়নি। অপ্রত্যাশিত প্রেমের বিষম আনন্দে ও গর্বে কাজরিয়ার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। তারপর অবশ্য নায়ক তার প্রেমিকাকে খুঁজে পায় প্রকৃতির মধ্যে যেমনিভাবে ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের অগ্রদূত প্রখ্যাত কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০ খ্রি.) পেয়েছিলেন লুসিকে।[৮৪]

ঘুমের ঘোরে

'ঘুমের ঘোরে' (নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬) শীর্ষক নজরুল ইসলামের এ গল্পটিতে প্রেম আর কর্তব্যের দ্বন্দ্ব আছে। গল্পের নায়ক প্রেমকে স্বীকার করে নিয়েও দেশের ডাককে বড় বলে মেনে নিয়েছে এবং নিজের হাতেই প্রেমিকাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে।[৮৫]

অতৃপ্ত কামনা

'অতৃপ্ত কামনা' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৭) গল্পের মধ্যে একটি কবিসুলভ মনের বিরহ-বিধুর ও অশ্রুদীপ্ত প্রেমস্মৃতি মন্থনের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। অতি-উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এহেন ইতিবৃত্তগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও প্রেমিক হৃদয়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগ-অনুভূতির রৌদোজ্জ্বল রেখা চিত্রণ এবং কবিত্বময় তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক বর্ণনার মাধুর্যও এতে বর্তমান।[৮৬]

রাজবন্দীর চিঠি

নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর চিঠি' এক অযৌক্তিক আত্মনিগ্রহের কাহিনী। যার জন্য অলভ্য লাভের অবুঝ বাসনা। এই গল্পের প্রেম-ভালবাসা বা ঘটনাবলীতে কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। 'রাজবন্দীর চিঠি'তে প্রেমের পরাজয় সর্বতোভাবে স্বীকৃত। অন্য গল্পগুলিও বেহাগের সুরে অশ্রুল তালে নিবদ্ধ। কিন্তু ট্রাজেডি এগুলোতে ঘটনায় সীমায়িত এবং মূল বক্তব্যে নজরুল ইসলাম কোন না কোন পন্থায় প্রেমের জয়গান ঘোষণা করেছেন।[৮৭]

'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে মাঘ, ১৩২৯/১৯২৩ ইং সংখ্যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় যা লেখা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক গল্পেই করুণ রস নিবিড়ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। নিরাশ প্রেমের মর্মন্তুদ গভীর বেদনা এই পুস্তকের প্রত্যেক পাতায় ফুটিয়াছে। গল্পগুলিতে আখ্যান বস্তুর কারিগরি না থাকিলেও তা বৈচিত্র্য ও কাব্য

---

৮৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাদল-বরিষণে', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮-৩৭৭।

৮৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ঘুমের ঘোরে', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭-৩৯৩।

৮৬. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস', পৃ. ২৭৬; দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'অতৃপ্ত কামনা', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৪০১।

৮৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাজবন্দীর চিঠি', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১-৪১৬; আনোয়ার রহমান, নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, 'নজরুল ইসলাম', (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯), পৃ. ২৯৬-২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদে উহা মনোরম হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখকের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পগুলি ও পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের অন্তরের যোগ আছে। একটি বিপুল ব্যথার নিবিড় ক্রন্দন মনিগণের মধ্যস্থিত সূত্রখণ্ডের ন্যায় সমস্ত গল্প কয়টিকে ধারণ করিয়া আছে। শব্দ-নির্বাচনে অসামান্য কৃতিত্ব গল্পগুলিতে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। তাঁর লিখনভঙ্গি লক্ষিত গতিতে পাঠকের অন্তরের অন্তঃস্থলে যাইয়া প্রবেশ করে এবং মদির মাদকতার আবেশে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই মাদকতার বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে অবসাদ জন্মায় না, আনন্দ দেয়- তীব্র তেজে দহন করে না, রুদ্রতালে শিরায় শিরায়, রক্তকণা নাচাইয়া তোলে।... কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা গ্রন্থটির বহুস্থানে ছড়ানো রহিয়াছে। কোন কোন গল্পের যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ণনা যেরূপ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যেরূপ নূতন, সেইরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ।"[৮৮]

'ব্যথার দান' গ্রন্থের গল্পগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে মাঘ, ১৩৩০/১৯২৪ ইং সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল, "ব্যথার দান গদ্যে লিখিত গল্পপুস্তক হইলেও সাধারণ গল্প পুস্তক হইতে ইহার প্রভেদ আছে। ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতি, বর্ণনাচাতুর্য, কল্পনার বর্ণনামাধুরী সমস্ত বইখানির চারিদিকে কবিত্বের স্বপ্নজাল বুনিয়া দিয়াছে।...প্লটই গল্পের ভাবকে গতিদান করে। যে ছয়টি গল্প এ পুস্তকে আছে, তাহার প্রথমটি বাদ দিলে আর কোন গল্পতেই আখ্যানভাগের সচলতা নাই। কোন গল্পতেই প্লটের অভিনবত্ব বা মৌলিকতা নাই। নিত্য নতুন ঘটনার মধ্য দিয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ সেগুলিতে দেখিতে পাইনা। সব গল্পই প্রত্যাখ্যাত নিপীড়িত প্রতিদানহীন প্রেমের দুঃখ-বিবৃতি। প্রত্যেক গল্পের প্রথম কয়েক লাইন পড়িয়াই গল্পের আখ্যানভাগ সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। সেইখানেই আমাদের মন থামিয়া যাইত; কিন্তু কবির ভাষার অপূর্বতা, গভীর আত্মবিশ্লেষণ শক্তি ও রচনার মাধুরী অবলীলাক্রমে আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।... প্লটের মৌলিকতা না থাকিলেও গল্পের স্থানে ও নায়কগণের জীবনের ঘটনা সমাবেশে কবি মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, বাংলার শ্যামলতার মাঝে গোলেস্তা, চমন, বেলুচিস্তানের ডালিমের লালিম-ছোঁয়া লাগাইয়াছেন। বাঙালীর নিশ্চেষ্ট জীবনের মাঝে 'হিণ্ডেনবার্গ লাইনে' মৃত্যুর মধ্যে মাদকতার আশ্বাস দিয়েছেন। এককথায় বইখানি কবির কাঁচা বয়সের লেখা বলিয়া ইঁহাতে কাঁচা হাতের চিহ্ন আছে।"[৮৯]

'ব্যথার দান' পুস্তকটি সম্পর্কে আষাঢ় ১৩২৯/১৯২২ ইং সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখা হয়, "যারা সৈনিক কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ, তা'রা এই বইখানা পড়ে দেখবেন, কবির গদ্য লেখা কেমন মনমাতান। এই বইখানি ছ'টি গল্পের সমষ্টি। শুধু গল্প না বলে 'কাব্য-গল্প' বললেই ঠিক হবে, কারণ এ গল্পগুলির মধ্যে কাব্যের মত মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে, বইখানা পড়বার পর পাঠকের মনে একটা আবেশময় ঝঙ্কার রেখে যায়। 'হেনা ' ও 'বাদল বরিষণে' এ দু'টো গল্প চমৎকার। এ দু'টোর মধ্যে যে একটা ব্যথা ও করুণার সুর ফুটেছে, তার ঝঙ্কারে মনকে বিহ্বল করে ফেলে, সে সুরের মুর্চ্ছনা থেমেছে 'রাজবন্দীর চিঠি' এই গল্পে । বইখানা যিনিই পড়বেন, তিনি এর লেখার ভঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেন না।"[৯০]

২. রিক্তের বেদন

'রিক্তের বেদন' শীর্ষক গল্পগ্রন্থটি নজরুল ইসলাম হুগলীতে অবস্থানকালে ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে ১০ পৌষ, ১৩৩১/ ২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৪১/২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'রিক্তের বেদন' করাচীতে আরব সাগরের বিজন বেলায় বসে রচিত নজরুল ইসলামের গল্প সমষ্টি। 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা

---

৮৮. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আটটি। গল্পগুলোর নাম যথাক্রমে: 'রিক্তের বেদন', 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মেহের নিগার', 'সাঁঝের তারা', 'রাক্ষুসী', 'সালেক', 'স্বামীহারা' এবং 'দুরন্ত পথিক'।[৯১]

রিক্তের বেদন

'রিক্তের বেদন' (নূর, বৈশাখ, ১৩২৭) গল্পটি নজরুল ইসলামের সেনাজীবনের অভিজ্ঞতা পরিশ্রুত। গল্পের নায়ক 'হাসিন' কল্পনাপ্রবণ ও ভীষণ একগুয়ে প্রকৃতির একটি যুবক। সে শাহিদাকে ভালবাসে, কিন্তু প্রেমাস্পদার প্রেমকে উপেক্ষা করে রণাঙ্গনের আকর্ষণ তাঁর কাছে আরো চমৎকার ও প্রিয়। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, অবশেষে ছেলেটি আপন ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিতে যায়। ইত্যবসরে যুদ্ধ চলাকালীন সে সংবাদ পায় তার প্রেমিকা শাহিদার অসুখী বিয়ের। অন্যদিকে 'গুল' নামে একটি সুন্দরী বেদুঈন মেয়ে তাকে ভালবাসে, কিন্তু এ ব্যাপারে গল্পের নায়ক উদাসীন থাকে এবং প্রথম প্রণয়িনী শাহিদাকে ভুলবার প্রয়াসে নিঃসঙ্কোচেই গুলের অযাচিত প্রেমে শান্তি খুঁজেছে। পরিশেষে এই নায়কের এক গুলিতে নিহত হয় বেদুঈন কন্যা গুল। এমনিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিতে মুমূর্ষু গুলের সাথে হাসিনের শেষ মিলন বড় করুণ, বড় মধুর। গল্পটির মধ্যে মানব প্রেমের একটি বেদনাদীপ্ত রূপ প্রস্ফুটিত। কাব্যধর্মী ভাষার উষ্ণতা এই প্রেমকাহিনীকে পুষ্পিত করতে সহায়তা করেছে। বাগবাহুল্য বাদ দিলে 'রিক্তের বেদন' একটি মোটামুটি উপভোগ্য গল্প।[৯২]

বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী

'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে সংকলিত নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) গল্পের নায়ক হচ্ছে বাঙালী রেজিমেন্টের একজন উচ্ছৃংখল সৈনিক। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছেন এই সৈনিক। নায়ক উনিশ বছর বয়সে তের বছর বয়সের কিশোরী রাবেয়াকে বিয়ে করেছে। বিয়ের মাত্র দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এই তরুণী বধূর অকাল মৃত্যু হয়। ফলে তীব্র আঘাত পায় নায়ক। পরবর্তীতে সে আবার বিয়ে করে কিন্তু এই বউটিও অতিসত্ত্বর মারা যায়। এর দু'মাস পরে তার মা মারা যায়। এমন দুরাবস্থায় হতাশ হয়ে এই তরুণ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। বাঙালী পল্টনে সে বাগদাদে গিয়ে মারা পড়ে, নেশার ঝোঁকে তার আত্মস্মৃতি রোমন্থনের বৃত্তান্ত। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'তে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের যৎসামান্য প্রতিফলন ঘটেছে বলে এটি নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত। তা না হলে গল্প হিসেবে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এই কাহিনীর বিবৃতিতে লঘু পরিহাসের সুর নজরুল ইসলামের প্রাণোচ্ছল রসিকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি নজরুল ইসলামের কাঁচা হাতের লেখা সবচেয়ে দুর্বল গল্প হলেও পাঠের উপযোগী।[৯৩]

মেহের-নিগার

আফগানিস্তানের পটভূমিতে বর্ণিত 'মেহের-নিগার' (নূর, মাঘ, ১৩২৬) গল্পটি ত্রিকোণ কাঠামোতে সংস্থিত। গল্পটিতে মুসলমান যুবক য়ুসোফের সাথে মেহের-নিগার ও গুলশনের বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী কাব্যময় ভাষায় আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত। 'ব্যথার দান' এর মত এখানেও নায়িকার দৈহিক শুচিতার প্রশ্ন উত্থাপিত এবং 'রিক্তের বেদন' এর মতো এ গল্পের নায়কও প্রথম প্রণয়িনীকে ভুলবার প্রয়াসে অপরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু গুলশন নাম্নী এই অপরার এক বিচিত্র অনুভূতির কারণে তাদের মিলন সম্ভবপর হয়নি। বরং সে আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে বাঈজীর মেয়ে। যদিও মৃত্যুকালে সে বলেছে- 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও, ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না। আমি অপবিত্র কি না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।'

---

৯১. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫০।

৯২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-৪৩৪।

৯৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৪৪৪; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনূদিত,পৃ.৭৯-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং গুলশনের আত্মহননের মূলহেতু অশুচিতাবোধ নয়, বরং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যার উৎস সামাজিক সংস্কার। গুলশনের অন্তিম উক্তির মধ্যে দিয়ে নজরুল ইসলাম এহেন সংস্কারকে এমনকি গুলের জন্মের জন্য দায়ী যে সমাজ তারই শাসকরূপী মনোভাবে প্রকট স্ববিরোধকেও আঘাত হেনেছেন।[৯৪]

সাঁঝের তারা

'সাঁঝের তারা' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৭) এর কথিকা ঢঙটি প্রবল। আরব সাগর বেলায় একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর সাঁঝের তারার সাথে একটি অনুভূতিপ্রবণ কল্পনা ভরা মনের নতুন করে চেনা শোনা একটি রসঘন ইতিকথা এখানে রূপায়িত। 'অস্তপারের সন্ধ্যা-লক্ষ্মী' সাঁঝের তারার সঙ্গে মানব মনের পরিণয় কাহিনীকেই লেখক কাজী নজরুল ইসলাম বেদনার্ত ভাষায় জীবন্ত করে তুলেছেন।[৯৫]

রাক্ষুসী

নজরুল ইসলামের কিছুটা বৈচিত্র্যময় সার্থক গল্প 'রাক্ষুসী' (সওগাত, মাঘ, ১৩২৭) যাতে এক নারীর যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। গল্পটির পটভূমি অনন্য। বাগদী সমাজ। এখানে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে সমাজ বিতাড়িতা একজন নারী এই রাক্ষুসী। সে নিম্ন শ্রেণীর কিন্তু তার মধ্যে সেইসব মানবিক গুনাবলীও আছে যা মধ্যবিত্ত রমণীরা দমিত করতে বাধ্য হয়। এই গল্পটি নাটকের আকারে উপস্থাপিত। উত্তর বাংলার একটি আঞ্চলিক ভাষায় এই মহিলা তার গল্প বলেছেন। শিল্প-সাহিত্যের বিচারে মহিলার এহেন গল্পবলা খুবই সন্তোষজনক। আর নজরুল ইসলাম এখানে বীরভূমের বাগ্‌দীদের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন।[৯৬]

সালেক

মোটামুটি গল্পের আদলে নির্মিত নজরুল ইসলামের 'সালেক' (বকুল, আষাঢ়, ১৩২৭) শীর্ষক রচনাটির নায়ক পারস্যের কবি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ (১৩২৫-১৩৯০ খ্রি.) এবং বক্তব্য হাফিজের দর্শনে আশ্রিত। নিঃসন্দেহে এটি নজরুল ইসলামের গভীর হাফিজ প্রীতির ফল। সম্ভবত হাফিজের কাব্য অধ্যয়নকালেই এটি রচিত হয়। 'সালেক' এর উপসংহারে নজরুল ইসলাম ইরানী কবির দর্শনের আধারটিও পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন:

"বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন কুন্ গরৎ পীরে মার্গাঁ গোয়েদ
কে সালেক বেখবর নাবুদ জেরাহোরস্‌মে মঞ্জেল হা।"

অর্থাৎ :-

'জায় নামাজে শারাব-রঙীন কর, মুর্শেদ বলেন যদি!
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত, আদি।'

গল্পটিতে সূক্ষ্ম জীবন জিজ্ঞাসা ও ভাবের একমুখীতা চিত্তাকর্ষক। এখানে লেখকের প্রকাশভঙ্গির সংযম ও দ্রষ্টব্য গল্পটির উন্মোচনে ও কেন্দ্রগত ঐক্য রক্ষায় নজরুল ইসলাম কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন।[৯৭]

স্বামীহারা

'স্বামীহারা' (সওগাত, ভাদ্র, ১৩২৬) গল্পের উপজীব্যও একনিষ্ঠ প্রেম। কিন্তু এ গল্পের নায়িকা বিধবা এবং তার প্রেম মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে উৎসারিত । তার একনিষ্ঠতা চকমকপ্রদ হয়তো

---

৯৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মেহের-নিগার', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪৪-৪৫৭।

৯৫. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭৭-২৭৮; দ্র: কাজী নজরুল ইসলাম, 'সাঁঝের তারা', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৪৬৩।

৯৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাক্ষুসী', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৩-৪৭১।

৯৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সালেক', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নয়, কিন্তু নিন্দনীয়ও নয়। একনিষ্ঠতার বাড়াবাড়িতে সে নিজেকে ঠিক বিপর্যস্ত করেনি। গল্পটিতে নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নজরুল ইসলামের জ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে সচেতনতা অসতর্ক পাঠকের মনকেও আকর্ষণ না করে পারে না।[৯৮]

দুরন্ত পথিক

'দুরন্ত পথিক' (দৈনিক নবযুগ' থেকে মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৭) কথিকায় মানবাত্মার শাশ্বত সত্যের পথে এক মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশির সুর ধরে চির যৌবনের প্রতীক এক দুরন্ত পথিকের জয়যাত্রার ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। দুরন্ত পথিক বিশ্বের কল্যাণ মন্ত্রের সন্ধানী ও চিরন্তন মুক্তিকামী। শেষ পর্যন্ত সেই পথিক স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলো, কেননা মুক্ত মানবাত্মার কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে যে, যুগে যুগে জীবন এই মৃত্যুরই বন্দনা সঙ্গীতে রত। সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই তার মৃত্যুর সার্থকতা। যে নিজে মরে অন্যকে জাগাতে পারে তার মৃত্যুই চির জাগ্রত অমর হয়ে উঠে। 'দুরন্ত পথিক' কথিকাটিতে আবেগ প্রগাঢ়তা প্রাণস্পর্শী এবং আশাদীপ্ত পরিণতিটিও অপূর্ব সুন্দর।[৯৯]

'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের সবক'টি রচনার আশ্রয় প্রেম বিভিন্ন আদলে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে যদিও গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু 'সাঁঝের তারা,' 'সালেক' এবং 'দুরন্ত পথিক' বস্তুতঃ কথিকারূপ রচনা।

৩. শিউলি-মালা

'শিউলি-মালা' নজরুল ইসলামের ছোট গল্পের সমষ্টি। এ গল্পগ্রন্থটি ডি. এম. লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে কার্তিক, ১৩৩৮/ ৩ জমাদিউস সানী, ১৩৫০/ ১৬ অক্টোবর, ১৯৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে 'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা', 'অগ্নি-গিরি' ও 'শিউলি-মালা' শীর্ষক চারটি ছোটগল্প। 'শিউলি-মালা'র চারটি গল্পের মধ্যে তিনটিই প্রেমের উপাখ্যান এবং গ্রন্থটি বিষয়গত বৈচিত্র্যের সৃষ্টিতে উদাসীন। 'পদ্ম-গোখরা', 'জ্বিনের বাদশা' ও 'অগ্নি-গিরি' এ গল্প তিনটিতে পূর্ব বাংলার পল্লীজীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত হয়েছে।[১০০]

পদ্ম-গোখ্‌রো

'শিউলি-মালা' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'পদ্ম-গোখরো' একটি পল্লী উপকথা উপলক্ষ করে রচিত ও ট্রাজেডিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু গল্পটি প্রেমের নয়, মাতৃস্নেহের এবং সে স্নেহও এক জোড়া সাপের উদ্দেশ্যে উৎসারিত। 'পদ্ম-গোখ্‌রো' গল্পের নায়িকা 'জোহরা' নাম্নী এক গ্রাম্য কুলবধূ। কিন্তু ঘটনাবলী দু'টি সাপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উজ্জ্বল রেখায় আবর্তিত গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহিলা জোহরার দু'টি সন্তান জন্মের পরই মারা যায়। এর কিছু পরে এক জোড়া পদ্ম-গোখ্‌রোর সাথে তার আকস্মিক পরিচয়। জোহরা তখন ভেবেছে এরা তারই মৃত সন্তান; সাপের রূপে জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছে। জোহরার সন্তানহারা ক্ষুধিত মাতৃমন তাই অচিরেই সাপ দু'টিকে স্নেহের পরশে আপন করে কাছে টেনে নেয়। দু'টি সাপের প্রতি নিবিষ্ট জোহরার এই অপত্য স্নেহই গল্পটির প্রাণ এবং এরই জন্য উপসংহারে সাপের শোকে জোহরার মৃত্যু স্বাভাবিক রূপ লাভ করে। জোহরার মৃত্যুর পর গ্রামে গুজব রটে, সে এক জোড়া মৃত সাপ প্রসব করে মারা গেছে। এহেন গুজবে অবশ্য নাটকীয়তা আছে। কিন্তু পাঠক পূর্বাবধি সকল ঘটনা সম্যক অবগত। তাই গুজবটি গ্রামীণ কুসংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করে গল্পের বক্তব্য এক দ্বিমুখী উপভোগ্য রসধারা বইয়ে দিয়েছে।

---

৯৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'স্বামীহারা', 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৪৮৯; আনোয়ার রহমান, নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০০।

৯৯. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭৮; দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'দুরন্ত পথিক, রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯-৪৯২।

১০০. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫০; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনূদিত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

'পদ্ম-গোখ্‌রো'তে সাপ ও মায়ের সম্পর্ক চিত্রায়ণের মাধ্যমে মাতৃহৃদয় সম্বন্ধে নজরুল ইসলামের বোধ এবং মমতা প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সাপের প্রতি জোহরার প্রবল স্নেহই গল্পটির সার্থকতার মূল ও প্রধান কারণ। যদিও কিছু দোষ-ত্রুটি ও অসঙ্গতি এ গল্পে রয়েছে, তথাপি এটি যথার্থ সার্থক সৃষ্টি এবং নজরুল ইসলামের আঠারোটি গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কেবল বিষয়গত কারণেই নয়, শিল্পের বিচারেও। একটি অতি প্রাকৃত পরিবেশে গল্পটি গড়ে উঠলেও মানবিকতার মধুরতায় তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।। বস্তুতঃ এখানে সাপ দুটির জন্য গল্পের চরিত্র আর ঘটনাগুলি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার তুলনা বাংলা গল্প সাহিত্যে খুব বেশী নেই বললেই চলে।[১০১]

জিনের বাদশা

'জিনের বাদশা' (সওগাত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭) গল্পটি পূর্ব-পাকিস্তানের এক তরুণের বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনী। গল্পের নায়ক স্বল্পশিক্ষিত ও দুরন্ত যুবক 'আল্লারাখা' চাষী পরিবারের সন্তান। গ্রামের কিশোরী 'চান্‌ভানু'কে পাওয়ার জন্য সে তাদের বাড়িতে অভিনব পন্থায় 'জিন' এর উপদ্রব শুরু করেছে। নায়িকা চান্‌ভানু প্রথমে কিছুটা বিরূপ মনোভাব হলেও পরে ঘটনাক্রমে 'আল্লারাখা'র প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি সেরাজ হালদারের জিদের ফলে কাহিনী শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। 'জিনের বাদশা' গল্পে প্রথমে হালকা চালে গ্রামের রঙীন জীবন চিত্রিত হলেও শেষ হয় গভীর ব্যঞ্জনায়। 'আল্লারাখা'র কীর্তিকলাপ, চান্‌ভানুর সযৌক্তিক পরিবর্তন, তাদের প্রেম আর 'জিন' এর উপদ্রবকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ দলাদলি প্রভৃতির অকপট সহযোগিতায় গল্পটি উপভোগ্যরূপে নাটকীয়। গল্পের নিজস্ব সবল গতিধারা, প্রায় প্রতিটি চরিত্রের নিখুঁত চিত্রণ, পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামীণ কথ্যভাষার সরস প্রয়োগ এবং অকৃত্রিম কৌতুক। জনশ্রুতি রয়েছে, গল্পে উদ্ধৃত পত্রখানি ও তার সঙ্গেকার বাণীটির বাস্তবে অস্তিত্ব ছিল। সত্যিই এগুলো একটি ছাপাখানায় প্রেরিত হয় আর নজরুল ইসলাম সেখানে এসব পড়েই গল্পটি রচনা করেছিলেন। এতে তাঁর কল্পনাশক্তির নিপুণতা প্রমাণিত হলেও 'জিনের বাদশা'র কাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই অত্যন্ত হালকাভাবে পরিবেশিত এবং উপসংহার রীতিমত করুণ ও বিস্ময়কর। তথাপি কিছু অবান্তর ও অবাস্তব কথাও গল্পটির রস আস্বাদন বিঘ্নিত করেছে। নায়ক আল্লারাখা ও নায়িকা চানভানুর চরিত্র চিত্রণে নজরুল ইসলাম অসামান্য পরিমিতিবোধ ও জীবন-দর্শনের আশ্চর্য দীপ্তি প্রদর্শন করেছেন।[১০২]

অগ্নি-গিরি

'অগ্নি-গিরি' শুধু 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠ নয়, নজরুল ইসলামের সমস্ত বিখ্যাত গল্পগুলোরও অন্যতম। গল্পের নায়ক 'সবুর আখন্দ' লম্বাটে, শান্তশিষ্ট ও সুবোধ বালক, সরল চেহারার অধিকারী। তাই গ্রামের লোকজন তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করে, তারা নিজেদের চালাক ভেবেই অবশ্য এই সব করে। পাড়ার রুস্তমের দল নিত্য অন্যায়ভাবে তাকে উত্যক্ত করত। কিন্তু একদিন 'নূরজাহান' নাম্নী একটি মেয়ের তিরস্কারে সেই শান্ত ছেলেটি হয়ে উঠল দুরন্ত। গল্পের নায়ক সবুর যখন নূরজাহানকে ভালবাসল, যেন হঠাৎ করে অগ্নি-গিরি উদগীরণের মতো প্রবেশ করল জীবনে। নূরজাহানের প্রেমের সোনার কাঠিতে সবুরের নিদ্রিত পৌরুষ জেগে উঠল ও তার অন্তরের স্তব্ধ পাহাড় হয়ে দাঁড়াল অগ্নি-গিরি। এ গল্পের বুনন তেমন জমজমাট নয়, বিশেষতঃ প্রথমদিকে। কিন্তু এখানেও ঘটনাবলীতে নাটকীয়তা আছে, যথেষ্ট কৌতুক এবং অবশ্যই কথ্যভাষার নিপুণ ব্যবহার। গল্পটি বিয়োগান্ত হলেও 'অগ্নি-গিরি' নজরুল ইসলামের আত্মজীবনীমূলক রচনা। নজরুল ইসলাম কৈশোরে যখন দরিয়ামপুর হাই স্কুলে পড়তেন তখন গ্রামের যে বখাটে ছেলেরা তাকে খুবই জ্বালাতন করত, এ গল্পটিতে তাদেরই দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এ গল্পের 'বীররামপুর' তাঁর কৈশোর জীবনের এক বৎসরের বিচরণভূমি 'দরিরামপুর' এবং নায়ক সবুর আখন্দ লেখকের সে সময়কার প্রতিচ্ছবি। ত্রিশাল

---

১০১. আভোয়ার রহমান, নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২; কাজী নজরুল ইসলাম, 'পদ্ম-গোখ্‌রো', 'শিউলি-মালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭১-৫৮৬।

১০২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিনের বাদশা', 'শিউলি-মালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৬-৬০৩।

Dhaka University Institutional Repository

থানার নামটি গল্পে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। অভিপ্রায় ও কার্যকরতার অনন্যতা আছে বলে গল্পটি যে একটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[১০৩]

শিউলি-মালা

'শিউলি-মালা' (সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৭) নামক গল্পটি চরিত্রে ও অনেকাংশেই 'ব্যথার দান' আর 'রিক্তের বেদন' এর গল্পগুলোর স্বগোত্র। কলকাতার নামকরা তরুণ ব্যারিষ্টার আজহারের সঙ্গে 'শিউলি' নামের একটি মেয়ের বিয়োগান্ত প্রণয় কাহিনীই 'শিউলিমালা' গল্পের উপজীব্য। আজহার নিজের মুখেই তার আত্মকাহিনী বিবৃত করেছে। গল্পটি করুণ মধুর সুরে একটি রসঘন পরিণতির দিকেই সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে গেছে। একটি বেদনাতুর হৃদয়ের স্নিগ্ধ ছায়া সমস্ত গল্পটির উপর মনোহারিতা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাব্যধর্মী ভাষাও এখানে জীবন যন্ত্রণার তীব্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছে। 'শিউলি-মালা' গল্পটি ভাষায় এবং আঙ্গিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ত্রুটিহীন। কিন্তু কাহিনীর বুননে একটি বিরাট ফাঁক আছে। নায়ক-নায়িকার মিলনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এ গল্পে। অথচ নায়ক আজহার চিরকুমার রয়ে গেছে। সুতরাং একে লেখকের নির্জলা ভাবালুতা ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না।[১০৪]

উপন্যাস

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসের সংখ্যা মোট তিনটি। এগুলো হচ্ছে 'বাঁধন-হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলোতে কিছু দুর্বলতা থাকলেও চিত্রিত চরিত্রগুলো সব সময়ই মৌলিক। তিনি আবেগের উপর সমস্ত জোর দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলো আবেগেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর ভাষা পাঠককে নাড়া দেবে, যেখানে কল্পনার ঐশ্বর্য প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। উপন্যাসের এ সব চরিত্র আমাদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

১. বাঁধন-হারা

নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস 'বাঁধন-হারা'। কলকাতার মাসিক 'মোসলেম-ভারত' পত্রিকায় ১৯২০ খ্রি./১৩২৭ বঙ্গাব্দের প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আটটি সংখ্যায় নজরুল ইসলাম বিরচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখন নজরুল ইসলামের বয়স ছিল মাত্র একুশ বৎসর। এই উপন্যাস অংশতঃ লেখকের সৈনিক জীবনের রচনা। নজরুল ইসলাম যে তিনটি উপন্যাস লিখেছেন তন্মধ্যে এটিই দুর্বলতম। এটি পত্রাকারে রচিত পত্রোপন্যাস। বাঁধনহারা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকলে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫ খ্রি.) এর 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩২৭ সংখ্যায় 'নিকষমণি' স্তম্ভে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত হল, "বাঁধন-হারা" বড় উপভোগ্য তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস- অবিবাহিত দ্বিপদ; বিবাহিত চতুষ্পদ। বাঁধন-হারার বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে উজ্জ্বল ও মোহনীয়। মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তাহার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জলতরঙ্গ আছে- উপমাগুলি মন মাতান।" [১০৫]

নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস প্রসঙ্গেই নারায়ণ পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সংখ্যার প্রশংসাপত্রে লেখা হয়, "হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম 'বাঁধন-হারা'।

---

১০৩. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭৯; কাজী নজরুল ইসলাম, 'অগ্নি-গিরি, 'শিউলিমালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪-৬১৭।

১০৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শিউলি-মালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮-৬২৮; ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, পৃ. ২৭৮।

১০৫. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অরূপ রসের কবি তাহা আমি জানিতাম, এবারকার (ভাদ্র) বাঁধন-হারার গোড়ায় তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর... কোয়ার্টার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রং কোথাও বেশী পড়ে নাই। তারপর আবার সেইরূপ অপরূপে ভাবের রস। এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথায়ও নয়।"[১০৬]

নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালীন 'বাঁধন-হারা' শ্রাবণ, ১৩৩৪; সফর, ১৩৪৬; আগষ্ট, ১৯২৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল, "সুর সুন্দর শ্রী নলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু।"[১০৭]

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়ক 'নুরুল হুদা'। সে বাঁধন-হারা, অনাথ এবং প্রথম জীবনে আশ্রয়হীন তরুণ। কিন্তু সে এক অনাত্মীয় পরিবারে আশ্রয় লাভ করে। সেখানে সে কেবল মায়ের স্নেহ আর ভাইয়ের আদরই পায়নি, 'মাহবুবা' আর 'সোফিয়া' নাম্নী দুই তরুণীর অপূর্ব হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসাও তার উদ্দেশ্যে উৎসারিত হয়েছে। পরে অবশ্য 'হেনা' গল্পের নায়িকার মত 'মাহবুবা' তাকে নিজ হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দেয়। স্বেচ্ছায় তাকে 'পাওয়ার লোভ দুহাতে ঠেলে' তার মহৎজীবন পাছে বিবাহের জন্য নষ্ট হয়ে যায়', এই ভয়ে নুরুল হুদার জীবনে মহত্ত্ব কোথায় ছিল এবং সোফিয়াও তাকে প্রত্যাখ্যান করে কিনা লেখক অবশ্য তা বলেননি। কিন্তু সে একই সঙ্গে স্নেহ-প্রেমের জন্য ক্ষুধিত এবং অভিমানী তাই হিসেবের ভুলে যুদ্ধে চলে গেল। ফলে মাহবুবা বা সোফিয়ার সাথে তার ভবিষ্যৎ মিলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ সে যে অতীত জীবন একেবারে উপেক্ষা করতে পেরেছিলো, তাও নয়। এর প্রমাণ তার প্রথম দিকের পত্রাবলীতে যেমন আছে, তেমনি শেষের দিকের পত্রেও রয়েছে।[১০৮]

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা সন্ত্রাসবাদী নয়। নজরুল ইসলামের মত সে একজন মৌলিক চিন্তাবিদ। প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। নুরুল হুদার চরিত্রে দু'টি দিক আছে। তার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্য সে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছে। উপন্যাসের এই বাঁধন-হারা সৈনিক নায়কের সাথে নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি পুরুষের জীবনে মেয়েদের পুরো ভূমিকা পালন করতে দিয়েছেন। সত্যিকার জীবনের মত করে শিল্পীর তুলিতে তাদের এঁকেছেন। এভাবে নজরুল ইসলাম তাঁর ব্যথাদীর্ণ ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ভবিষ্যৎ বিদ্রোহী কবির জন্ম এহেন ব্যর্থতা থেকেই হয়েছিল কি না কালপ্রবাহ তা নিরূপণ করবে। তবে প্রথম উপন্যাসে অনিশ্চিত অনভিজ্ঞ অবস্থা থেকে তিনি নিশ্চিত করে পরবর্তী উপন্যাস রচনায় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন। আর প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর কবিসত্তা বিকশিত হয়নি ঠিকই কিন্তু ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম অবশ্যই বিকশিত হয়েছিলেন।[১০৯]

এ পত্রোপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচনের সংখ্যাই সর্বাধিক। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রায় ৭০ এর অধিক প্রবাদ প্রবচনের যথার্থ ব্যবহার 'বাঁধন-হারা' কে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এছাড়া সংখ্যায় অল্প হলেও লোক ঐতিহ্যের অন্যান্য শাখার উল্লেখ এতে পাওয়া যায়। যেমন-ছড়া, পুরাণের ব্যবহার, লৌকিক বিশ্বাস, সাধারণ লোক-সংস্কার, পৃথকভাবে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোক-সংস্কার প্রভৃতি।[১১০] যাহোক, নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস প্রসঙ্গে 'সওগাত' পত্রিকার

---

১০৬. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা, পৃ. ৩৩।

১০৭. কাজী নজরুল ইসলাম, উৎসর্গপত্র, 'বাঁধন-হারা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪।

১০৮. আতোয়ার রহমান, নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

১০৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনূদিত, পৃ. ৮৪-৮৫; কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাঁধন-হারা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৬১২।

১১০. সেলিম জাহাঙ্গীর, লোকায়ত নজরুল, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আষাঢ়, ১৪০৪/ জুন, ১৯৯৭), পৃ.৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮খ্রি./১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমালোচনায় লেখা হয়, "ইহাই নজরুল ইসলাম লিখিত প্রথম উপন্যাস। লেখক কবি, তাই এই গ্রন্থে উপন্যাসত্ব অপেক্ষা কাব্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান চরিত্র-সৃষ্টি যে ইহাতে একেবারেই নেই, এমন কথা বলিতে না পারা গেলেও, এ গ্রন্থে লেখকের সে ক্ষমতা খুব পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।... লেখার সংযম উপন্যাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ গ্রন্থের কবি লেখক কাব্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া অনেক স্থলেই সে সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে যতটুকু দরকার তার চেয়েও অনেক বেশী কথা তিনি অনাবশ্যকরূপে বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়ের প্রগাঢ়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থোল্লিখিত মূল গল্পটি পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। তদুপরি ভাষা আশ্চর্যরকম জোরালো ও নতুন। কবিতার ন্যায় গদ্যরচনায় উপরেও যে কবির অসামান্য ও অনাহত অধিকার আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশিত।"[১১১]

২. মৃত্যুক্ষুধা

নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রথমে মাসিক সওগাত পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪/ ১৯২৭ সালের শেষদিকে ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়ে ফাল্গুন, ১৩৩৬/ ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে শেষ হয়। নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে অবস্থানকালে সেখানকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেন। উপন্যাসখানি রচনাকালে নজরুল ইসলামের বয়স ছিল সাতাশ-আঠাশ। পরে ফাল্গুন, ১৩৩৬/ জানুয়ারী ১৯৩০ সালে 'মৃত্যুক্ষুধা' গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে।[১১২]

'মৃত্যুক্ষুধা'র কুশীলব বস্তিবাসী কতকগুলো শ্রমজীবি নির্বিত্ত মুসলমান আর খ্রিষ্টান এবং বিষয় তাদেরই সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামী জীবন। কাহিনীর প্রধান চরিত্র প্যাঁকালে, তার মা, তিন ভাবী এবং তাদের ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার পটভূমি থেকে এমন কিছু বস্তিসুলভ ঘটনা উপচিত হয়েছে, তা যে কোন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। হিড়িম্বা, মিস জোন্স, দারোগা-গিন্নী, গিয়াসুদ্দীন প্রভৃতি চরিত্র ক্ষণাবির্ভূত ও খন্ডিত; আর উপন্যাসের নায়ক বিত্তশালী মুসলিম পরিবারের যুবক আনসার অতিরঞ্জন সত্ত্বেও বিশিষ্ট যুবকের চেহারা ও পোষাকের বর্ণনার মধ্যেই তার অন্তঃপ্রকৃতি ও কর্ম পদ্ধতির পরিচয় অনেকটা সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ জীবন সংগ্রামে দুর্মর প্যাঁকালে আর তার মেজ ভাবী এবং দোষেগুণে মেশানো মায়ের মত প্রাণবন্ত চরিত্র নজরুল ইসলামের অন্য কোন রচনায় নেই।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের একজন স্মরণীয় মহিলা হচ্ছে মেজ ভায়ের স্ত্রী। এই মহিলা আকর্ষণীয়া, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বাস্তববাদী। সে মুসলিম পরিবারে জন্ম হলেও মিশনারী থেকে একটা জীবিকা হবে ভেবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে তাদের জীবনে যে শুভ পরিবর্তনের কথা, তা কিন্তু কার্যতঃ অপূর্ণই রয়ে গেছে। উপন্যাসের ছেলেমেয়েদের চরিত্রগুলোও জীবন্ত। এই উপন্যাসে শিশুরা খাবার ছাড়াই দিন কাটিয়েছে কিন্তু দারিদ্র প্রদর্শন করেনি। শিশুর মুখে সংগ্রামের সংকল্প, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-বিবাদ এবং প্রয়োজনের খাতিরে অবিলম্বিত আপোষ, দারোগা-গিন্নীর বেড়ালে এটো করা আধপোয়া দুধকে পানি আর মুরগীছানা ভোগ্য দুধ সহযোগে ক্ষীর রন্ধন এবং তা দিয়ে পুরো পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টার পর শিশুদের মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলা, পাঁচির আঁতুড় তোলা, কাঁচা কৎবেলের আস্বাদনে ক্ষুধার্ত শিশুর সান্ত্বনা লাভ প্রভৃতি সমাজচিত্রের উপকরণ হিসেবে এগুলো অবিস্মরণীয়।[১১৩]

---

১১১. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭০।

১১২. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৯।

১১৩. আনোয়ার হোসেন, নজরুলের গল্প ও উপন্যাস, মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম, পৃ. ৩১১-৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

'মৃত্যুক্ষুধা'তে আসলে দুটো গল্প আছে। একটি 'মেজ ভায়ের বৌ' এবং অন্যটি রুবির। উপন্যাসটির প্রথম পনর পরিচ্ছেদই শ্রেষ্ঠ অংশ। এ অধ্যায়গুলোতে মেজ ভায়ের বৌ চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান এবং নিচু শ্রেণীর মুসলমানরা সমাজে কিভাবে বসবাস, ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি করে সেইসব দৃশ্যের চিত্রায়ণ লক্ষণীয়। উপন্যাসের নায়ক যখন ষোড়শ দৃশ্যে প্রবেশ করেন তখন এই আবহাওয়া পাল্টে যায়। নায়ক আনসারের চমকপ্রদ আকস্মিক আবির্ভাবে 'মৃত্যুক্ষুধা'র কাহিনী ভিন্ন মোড় নেয়। এই আনসার একটি পরিবারের সদস্য হলেও ভুলে গেছে সেসব সম্পর্কের কথা। নায়ক কৃষ্ণনগরে এসেছেন এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করার জন্য। নজরুল ইসলামও এই মফস্বল শহরে এক সময় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। একজন কর্মযোগী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক কর্মপদ্ধতিতেই মুক্তি আসতে পারে। এর পর থেকে কাহিনী ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত। কারণ এখানে ঔপন্যাসিক তাঁর লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেন। নজরুল ইসলাম এই নায়কের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে নিজে জড়িত হয়ে পড়েন। নায়ককে বীর আখ্যা দেওয়াকে সন্দেহ করা যায় কেননা যে-ই তার সংস্পর্শে আসে, বিশেষতঃ মেয়েরা, প্রত্যেকের মাঝেই ঐ নায়কের জন্য প্রেম জাগে, সকলেই তাকে পছন্দ করে।

মূল প্রসঙ্গধারা ছেড়ে দিয়ে নজরুল ইসলাম উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধের একটি বড় অংশ ব্যয় করেছেন তাঁর জীবনকথা ও রুবির প্রেমের অনাবশ্যক পল্লবায়নে। আনসারের প্রতি মেজ বৌয়ের আকর্ষণে কাহিনীর মূলধারা অবশ্য প্রায় শেষ অবধি প্রবাহিত কিন্তু নিরতিশয় ক্ষীণভাবে। নায়ক আনসার অধঃপতিত লোকদের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মেজ ভায়ের বৌ তার প্রেমে পড়ে। এদিকে আনসার কৃষ্ণনগরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার হামিদের বিধবা মেয়ে রুবিকে ভালবাসে। তবু এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা কারণ মেজ ভায়ের বৌ জানত কিভাবে অনুভূতিকে গোপন করতে হয়। ঘটনাক্রমে আনসার নিগৃহীত হয় এবং জেলে যায়। সেখানে তার যক্ষা হয়, তখন তার দুই প্রেমিকাই তাকে দেখতে আসে। শেষ দৃশ্যে আনসার মারা গেলে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১১৪]

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক এলাকার শ্রমজীবী খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের জীবনযাত্রার পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে লৌকিক জীবনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এতে গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা, লৌকিক জীবনের চালচিত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসের বর্ণনার সাথে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা। প্রবাদ ছড়ার ব্যবহার ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১১৫]

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটির ভাষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কোন স্থানে আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করে লেখক তাঁর অংকিত চরিত্রগুলো ও তাদের পরিবেশকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষতঃ কয়েকটি স্থানের বর্ণনা যেমন নিখুঁত বাস্তবানুগ, তেমনি কবিত্বময়। অবশ্য গ্রন্থটিতে সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটি একটি নিছক রোমান্টিক প্রেমকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।[১১৬]

৩. কুহেলিকা

নজরুল ইসলামের তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা' প্রথমে মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকায় কয়েক পরিচ্ছেদ এবং পরে সাপ্তাহিক 'সওগাতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর কলকাতার

---

১১৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, পৃ. ৮১-৮৩; দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'মৃত্যুক্ষুধা', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১-৫৬২।

১১৫. সেলিম জাহাঙ্গীর, লোকায়ত নজরুল, পৃ.৩৭-৩৮।

১১৬. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক ৫ শ্রাবণ, ১৩৩৮/ ৫ রবিউল আউয়াল, ১৩৫০/ ২১ জুলাই, ১৯৩৯ সালে 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।[১১৭]

'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক কুমিল্লার কোন জমিদারের সন্তান জাহাঙ্গীর বিপ্লবী তরুণ, সন্ত্রাসবাদী; একটি আদর্শায়িত আত্মভোলা চরিত্র। দেশের মুক্তি সংগ্রামে একজন অগ্রগামী সৈনিক। এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে নজরুল ইসলাম যেন সমগ্র মুসলিম তরুণকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক নিজে যেমন তেমনি এই নায়কও যে কোন দুঃখ-দুর্দশা এবং কঠিন অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে দেশের স্বার্থে। একই সাথে সে প্রেমিকও। ফলাফলে ভালবাসা আর দায়িত্ববোধে বাঁধল দ্বন্দ্ব। 'কুহেলিকা'র নায়িকা 'ভূনী' ওরফে তাহমিনা অস্বাভাবিক স্বল্প পরিচিত জাহাঙ্গীরের কাছে সে আবেগের বশে তর্কে অবতীর্ণ, যদিও উপন্যাসে পাঠকের সাথে তার প্রথম পরিচয় গ্রামের স্বল্প শিক্ষিতা নারীরূপে। বিপ্লববাদে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর সন্ত্রাসবাদী তথা অসাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের কথায় উৎসর্গ করেছে জীবনকে, যাবজ্জীবন নির্বাসন দন্ড ভোগ করতে হবে তাকে কিন্তু ভালবাসা মরেনি তার মধ্য থেকে। আলীপুর জেলে সে তার বন্ধু হারুনকে চরম উক্তি করে বলে, 'তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী কুহেলিকা।' জাহাঙ্গীর নারীকে বোঝে না, কিন্তু লেখক বোঝেন। আর তাই নজরুল ইসলাম তাঁর উপন্যাসের মহিলাদের একটি বিশেষ গুণে চিত্রিত করেছেন, হৃদয়হীন সমাজের অত্যাচারে তাদের ভেতরে জন্ম নিয়েছে এই বৈশিষ্ট্য। তাঁর চরিত্রের সকলেই যন্ত্রণা ভোগ করে কিন্তু ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা তা ভোগ করে বেশী। অবশ্য তাঁর সৃষ্ট মহিলারা মানবিক এবং তাঁর সৃষ্ট নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের চেয়ে আরো মৌলিক। 'কুহেলিকা'য় নজরুল ইসলাম কথাশিল্পী হিসেবে প্রেমজীবি আর উচ্ছাসপ্রিয় রোমান্টিকতার প্রভাবে থেকে অপসৃত। 'কুহেলিকা' প্রায় সর্বতোভাবেই তৃতীয় দশকের রাজনৈতিক পরিবেশের ফসল। নজরুল ইসলামের কথা সাহিত্য সাধনায় 'কুহেলিকা' এক অগ্রগতির সূচক। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের জাহাঙ্গীর মূলতঃ নজরুল ইসলামের বন্ধনমুক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১১৮]

নাটক

নাট্যকার হিসেবে নজরুল ইসলাম ততটা পরিচিত নন, কেননা তাঁর নাটক দীর্ঘকাল যাবত অভিনীত হয়নি এবং সাহিত্য হিসেবেও প্রায় অপ্রচলিত। তাঁর নাটকের সংখ্যাও অবশ্য বেশী নয়, তিনি কিশোর জীবনে পালাগান ও পরিণত বয়সে দু'তিনটি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু এগুলো সঠিক অর্থে নাটক নয় এবং গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর নাটিকা সংকলন সংখ্যা চারটি; যথা:- 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'পুতুলের বিয়ে' ও 'মধুমালা'।

১. ঝিলিমিলি

নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি' শীর্ষক নাট্যগ্রন্থটি কলকাতা থেকে ২৯ কার্তিক, ১৩৩৭/ ১৫ নভেম্বর ১৯৩০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ঝিলিমিলি'তে সংকলিত একাঙ্কিকার মধ্যে 'ঝিলিমিলি' ও 'শিল্পী' প্রতীকনাট্য এবং 'সেতুবন্ধ' ও 'ভূতের ভয়' রূপক-নাট্য। এদের মধ্যে একমাত্র 'ঝিলিমিলি' নাটকটিই সবচেয়ে বেশী নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। এই নাটকটি ১৩৩৪ সালের ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কৃষ্ণনগরে রচিত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে নওরোজে আত্মপ্রকাশ করে।[১১৯]

'ঝিলিমিলি' নাটিকার প্রথম দু'তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই রুগ্না ফিরোজা আর তার মা হালিমা বিবির চরিত্র সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করে এবং অবলীলাক্রমে একটা পেলব নাটকীয় পরিস্থিতি জমে উঠে,

---

১১৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪১।

১১৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, আফজালুল বাসার অনুদিত, পৃ. ৮১; দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'কুহেলিকা', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩৯-৬৩৮।

১১৯. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮০-২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় যেন কোন নিপুণ নাট্যকারের রচনা। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বপ্নরাজ্যের উদ্ভাসন কুশলী নাট্যকারেরই পরিচায়ক, কিন্তু এরপর নাটক আর জমে উঠেনি। বস্তুতঃ প্রথম দৃশ্যের প্রথম দু'তিন পৃষ্ঠার পরেই নাটক যেখানে বাস্তবতা উতরিয়ে প্রতীকের পথে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই শিল্পোত্তরণ ক্রমেই সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে। কেননা 'ঝিলিমিলি'র প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলায় যেমন প্রয়াস আছে ক্ষুদ্রাতয়ন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে তেমনটি নেই। নাট্যকার নজরুল ইসলাম এখানে অতি সংক্ষেপে তাড়াহুড়ো করে নাটিকাটি শেষ করতে চেয়েছেন। 'ঝিলিমিলি' একটা পূর্ণাবয়ব শিল্পকর্ম হয়ে উঠলো কিনা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি। ফলে 'ঝিলিমিলি'তে কোন চরিত্রই সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়নি। সর্বোপরি এই নাটিকার প্রত্যক্ষ চরিত্র, দৃশ্য ও ঘটনার অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের প্রতিভাস বলে সহজ ও উজ্জ্বলভাবে প্রতীত না হওয়ায় এটি সার্থক রূপক সাঙ্কেতিক নাট্য হতে পারেনি। আবার নাটিকার কাহিনীর মধ্যে কতকটা বাস্তবিকতা থাকার জন্য এটি কোন কোন স্থলে বাস্তব সাঙ্কেতিক হয়ে উঠেছে।[১২০]

সেতুবন্ধ

'সেতুবন্ধ' রূপক-সাঙ্কেতিক নাটিকা। এই নাটিকাটির প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য 'সারা ব্রীজ' শিরোনামে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনটি দৃশ্য সংবলিত এই একাঙ্ক নাটিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' (১৯২২) এর বিষয়বস্তুর সমধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকৃতির শক্তির সাথে মানুষের তৈরী যন্ত্রশক্তির সংঘাতে যন্ত্রশক্তির পরাভব দেখানোই 'সেতুবন্ধ' নাটিকার মূল উদ্দেশ্য। যন্ত্র শক্তির বলে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে মানুষ অমৃতানন্দ উপভোগ করতে যে চেষ্টা করে তা বারে বারে কেবল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ যন্ত্রশক্তি হচ্ছে জড়শক্তি, দানবশক্তি বা পশুশক্তি। আর মানুষ হচ্ছে যন্ত্রপাতি বা যন্ত্ররাজ। এই নাটকে প্রকৃতির শক্তি বলতে দেবশক্তিকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতির শক্তির প্রতীক পদ্মার উপর তার প্রচন্ড বাধাদান সত্ত্বেও মানুষ তার যন্ত্রশক্তির সাহায্যে আধিপত্যের প্রতীক সেতুবন্ধ নির্মাণ করতেই উভয়ের যুদ্ধ বা সংঘাতের সৃষ্টি না হয়ে পারেনি। পরিশেষে দেবশক্তির হাতে যন্ত্রশক্তির পরাজয় ঘটেছে এবং সেতুবন্ধ ভেঙে পদ্মাগর্ভে পতিত হয়েছে। নাটিকার শেষ দৃশ্যে পদ্মার দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যে সেতুবন্ধের মূল সুর ধ্বণিত হয়েছে। পদ্মা যন্ত্ররাজ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, 'জানি যন্ত্ররাজ! তুমি বারে বারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যুদন্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে।'[১২১]

শিল্পী

'শিল্পী' তিনটি দৃশ্য সংবলিত একাঙ্ক নাটিকা, রূপক-সাংকেতিক নাটিকা হলেও কাহিনীর মধ্যে কোন কোন জায়গায় বাস্তবিকতা থাকায় স্থল বিশেষে এটি বাস্তব সাংকেতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের নায়ক শিরাজ একজন শিল্পী। সে চির সুন্দরের উপাসক বলে মানুষের সাধারণ অনুভূতির বন্ধন স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু তার স্ত্রী লায়লী তাকে সাধারণ অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ হিসাবে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। প্রথম দৃশ্যে শিরাজের কথায় উভয়ের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। এইজন্যে শিরাজ তার শিল্পী মানসী চিত্রার সান্নিধ্যে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে সন্ধ্যায় শৈল-নিবাসে চিত্রাও যখন শিরাজকে মানুষরূপে পাবার আকাঙ্খা জানিয়েছে তখন সে বলেছে, 'আমি শিল্পী, হৃদয়হীন নির্বেদ উদাসীন শিল্পী।'

শেষ পর্যন্ত যখন চিত্রা চলে যেতে চাইলো তখন আকস্মিক বেদনায় শিরাজের দু' চোখে জীবনের প্রথম অশ্রু বর্ষিত হল। তাকে তুলি উপহার দিয়ে সে জানালো যে সে চলে যাবে। চিত্রা যখন

---

১২০. আবদুল হক, 'নজরুল নাট্য প্রসঙ্গ', নজরুল ইসলাম, মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, পৃ. ৩২৪-৩২৬; কাজী নজরুল ইসলাম, 'ঝিলিমিলি', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫-৫৭৬।

১২১. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮২-২৮৩; কাজী নজরুল ইসলাম, 'সেতুবন্ধ', 'ঝিলিমিলি', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৫৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তার গন্তব্যস্থানের কথা জানাতে চাইলো তখন সে ঘোষণা করলো যে সে যাবে; 'যে-পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধরে চলেছে, সেই দুঃখের, সেই চির-বেদনার পথে।' লেখকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, দুঃখ-বেদনা নিরপেক্ষ শুদ্ধ সৌন্দর্যাশ্রয়ী কোন প্রকৃত শিল্প হতে পারে না। পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-বেদনাকে অনুভব করলেই যথার্থ শিল্প সৃষ্টি সম্ভবপর। এই নাটিকায় নজরুল ইসলামের জীবনতত্ত্ব আভাসিত হওয়ায় এর কতকটা মূল্য অবশ্যি রয়েছে।[১২২]

ভূতের ভয়

'ভূতের ভয়' নাটিকায় কবি নজরুল ইসলাম স্বদেশের মুক্তির জন্য বিপ্লবের উদ্বোধন চেয়েছেন। তাঁর মতে, বিপ্লব যখন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জন্ম নেয় তখনই তা সার্থকতায় মন্ডিত হয়ে উঠে। এই নাটিকাটিতে নজরুল ইসলামের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১২৩]

২. আলেয়া

নজরুল ইসলামের গীতিনাট্য 'আলেয়া' কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে পৌষ, ১৩৩৮/ শাবান, ১৩৫০/ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটিকাটির উৎসর্গপত্রে কবি লিখেন,

> নট-রাজের চির নৃত্য-সাথী
> সকল নট-নটীর নামে
> "আলেয়া" উৎসর্গ করিলাম।[১২৪]

তিন অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা-আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী-চিরকালের নর-নারীর প্রতীক-এই আগুনে দগ্ধ হ'ল, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।"[১২৫]

'আলেয়া' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য নয়, এটি গীতি প্রধান নাটক। এটি বিদেশী অপেরার সঙ্গে তুলনীয়। ১৯২৯ খ্রি./১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের 'কল্লোল' পত্রিকার সাহিত্য সংবাদে 'আলেয়া' নাটকের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় যে, "নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'মরু-তৃষা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবত মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ৩০ খানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ অপেরাখানি জন-সাধারণের মন হরণ করবে।"[১২৬]

হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে এর গল্পাংশ নেয়া হয়েছে। 'আলেয়া' প্রতীকমূলক রচনা-নাটকের সূচনায় নজরুল ইসলাম প্রত্যেকটি প্রতীকের কুঞ্জিকাও দিয়েছেন। যেসব চরিত্রের উপর নির্দিষ্ট প্রতীক রূপায়নের ভার অর্পিত তারা প্রতীক হিসেবে প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ এবং ঘোষিত, সংলাপ ও আচরণে ব্যক্তি চরিত্রের মতো নয়, মানব-মানবীরূপী ভাব-প্রতীকের মতো, তারা নিজেদের প্রচার করে কিছুতেই নিজেদের ভুলে মানব-মানবী হয়ে ওঠে না।[১২৭]

---

১২২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শিল্পী', 'ঝিলিমিলি', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৬০১।

১২৩. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮৩-২৮৪; কাজী নজরুল ইসলাম, 'ভূতের ভয়', 'ঝিলিমিলি', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২-৬১৩।

১২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আলেয়া', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩০।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩১।

১২৬. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮৪

১২৭. আবদুল হক, নজরুল নাট্য প্রসঙ্গ, 'নজরুল ইসলাম', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আলেয়া' নাটকটির মধ্যে রূপক-সাংকেতিক নাট্যরীতি প্রয়োগের কতকটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তবে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের মতো প্রতি কথায় ও গানে যে দ্যুতি ও দীপ্তি ঝলসে ওঠা উচিত, অসীমের যে গভীর স্পন্দন ও আভাস কাম্য, তা এই নাটকে অনেকাংশে অনুপস্থিত দেখা যায়। 'আলেয়া' কিসের ইঙ্গিত বা সংকেতের বাহক তার পরিচয় নাট্যকার নজরুল ইসলাম গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন তা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। রূপক-সাংকেতিক সুলভ মনোধর্মী গতিবেগ 'আলেয়া' নাটকে খানিকটা থাকলেও বস্তুধর্মী গতিবেগের স্বল্পতা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক।[১২৮]

৩. পুতুলের বিয়ে

নজরুল ইসলামের 'পুতুলের বিয়ে' একাঙ্ক নাটিকা ও গানের সংকলন। নজরুল ইসলাম কলকাতা থাকাকালীন ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক চৈত্র, ১৩৩৯/ জিলহজ্জ ১৩৫১/ এপ্রিল, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। কবির দুই পুত্র 'সানি' ও 'নিনি'কে উৎসর্গীত 'পুতুলের বিয়ে' গীতিনাট্যটি কিঞ্চিৎ সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক হাস্যরস মিশ্রিত, যার মুখ্য লক্ষ্য আনন্দ বিতরণ, আর এদিক দিয়ে বলা যায় এটি সন্তোষজনক ও সফল নাটিকা। এটি গীত প্রধান হলেও এর চরিত্রদের আচরণে ও সংলাপে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় সুস্পষ্ট এবং এর রূপকর্ম অনায়াস সাধিত। এর হাস্যরস বিশেষ করে পঞ্চির ঢাকাইয়া সংলাপ এবং খেঁদির সাওঁতালী সংলাপ সবিশেষ উপভোগ্য। অধিকাংশ গান বিভিন্ন উদ্দিষ্ট চরিত্রের উপযোগী এবং ছন্দে ও হাস্যরসের বৈচিত্র্যে আনন্দমুখর।

'পুতুলের বিয়ে' পুস্তিকাটিতে 'কালো জামাইরে ভাই' 'জুজু বুড়ীর ভয়', 'কে কি হবি বল'; 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি', 'নবার নামতা পাঠ', 'সাত ভাই চম্পা', 'শিশু-যাদুকর' নামে নাট্যধর্মী রচনা আছে। 'পুতুলের বিয়ে' ছোট মেয়েদের উপযোগী নাটক আর বাদবাকীগুলো ছোটদের উপযোগী হাস্যরসাত্মক ও উপদেশমূলক গীতিনাট্য।[১২৯]

৪. মধুমালা

নজরুল ইসলাম বিরচিত 'মধুমালা' শীর্ষক লোককাহিনীমূলক পূর্ণাঙ্গ নাটকটি অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪/ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে রচিত, যা কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে 'মধুমালার গোড়ার কথা' শিরোনামে শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১ খ্রি.) এর লেখা মুখবন্ধ সহকারে মাঘ, ১৩৬৫/ জানুয়ারী ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৩০]

'মধুমালা' তিন অঙ্ক বিশিষ্ট গীতিনাট্য। গীতিনাট্য বলে উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি গীতিবহুল নাটক। সন্দ্বীপের রাজকুমারী মধুমালা ও কাঞ্চন নগরের যুবরাজ মদনকুমারের মিলন ও বিরহকে ভিত্তি করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ঘুমপরী ও স্বপ্নপরীর কারসাজিতেই মদনকুমারের সঙ্গে মধুমালার সাক্ষাৎ, বিবাহ ও বিচ্ছেদ এবং পরে আবার মিলন ঘটেছে ; কিন্তু শেষে যখন মিলন হল, তার পূর্বেই ত্রিপুরার রাজকুমারী কাঞ্চনমালার সঙ্গে মদনকুমারকে বাধ্য হয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে হয়েছে। মধুমালা ও মদনকুমারের মিলনলগ্নে কাঞ্চনমালা চাইলো তার স্বামীকে একটি বার মাত্র প্রণাম করে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে। কিন্তু মধুমালা তা হতে দিলো না। সে নিজের জীবনকে সাগর জলে বিসর্জন দিয়ে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালার মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটিয়ে গেল।[১৩১]

'মধুমালা'র মধ্যে নাট্যকার নজরুল ইসলামের প্রেমতত্ত্বটি ভালোভাবে পরিস্ফুট হয়নি। চরিত্রগুলোতে ঘাত-প্রতিঘাত স্বল্প। বস্তুতঃ কোন চরিত্রই সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত নয়। পরিশেষে মধুমালার আত্মবিসর্জনের ঘটনাটি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়ায় নাটকের মূল নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে

---

১২৮. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮৫।

১২৯. আবদুল হক, নজরুল নাট্য প্রসঙ্গ, 'নজরুল ইসলাম', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৬।

১৩০. নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ.৭৩০।

১৩১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মধুমালা', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪১-৬৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে। 'মধুমালা' নাটকে রূপক-নাট্যের একটি আভাস পাওয়া যায়। মধুমালার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর চিরন্তন প্রেম সমস্যা সমাধানের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। মধুমালার ভেতরেই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপে অভীপ্সিত বাস্তবতা না থাকাতে নাটকটি বাঞ্ছিত মাত্রায় সফল হতে পারেনি।[১৩২]

লোক সংস্কৃতি থেকে আহরিত 'মধুমালা'র কাহিনী কাব্যধর্মী ও সংঘাতময়, আর এর সংলাপ স্বাভাবিকতাধর্মী। নজরুল ইসলাম কিরূপে অবলীলাক্রমে মুহূর্তে নাটকীয় পরিস্থিতি নির্মাণ করতে পারতেন এবং চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন তার অনেক পরিচয় এ নাটকে রয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ও সময়াভাবের পরিচয়ের অনেক লক্ষণ এতে বিদ্যমান। দ্বিতীয় অঙ্কে একবার এবং তৃতীয় অঙ্কে কয়েকবার দৃশ্যপট পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু সুস্পষ্ট দৃশ্য বিভাগ নেই। কাঞ্চনমালার পিতা ত্রিপুরাধিপতি, গৌড়েশ্বর না বঙ্গেশ্বর? সেকেন্দর শার জারিগানটি আসলে প্রস্তাবনা, আর সে হিসেবে তৃতীয় অঙ্কের পরিবর্তে নাটকের প্রারম্ভই এর উপযুক্ত স্থান। যথাস্থানে জারিগানটি সংস্থাপিত না হওয়ায় রূপকথা ও বাস্তব সংস্কৃতি-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটেছে; উপরন্তু এ নাটকে পরিবেশিত হাস্যরসও বিশেষ সূক্ষ্ম নয় তা বলাই বাহুল্য।[১৩৩]

প্রবন্ধ

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত নজরুল ইসলাম বিরচিত জ্বালাময়ী প্রবন্ধাবলীর সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৫ টি। যথাঃ- 'যুগবাণী', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'ধূমকেতু'। নিম্নে নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

১. যুগবাণী

নজরুল ইসলামের একটি প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী'। ১৯২০ সালে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা নজরুল ইসলামের কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের এটি গ্রন্থবদ্ধ সংকলন। 'যুগবাণী' প্রথম সংস্করণ আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে কার্তিক, ১৩২৯, সফর, ১৩৪১/ ২৬ অক্টোবর, ১৯২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৩৪] 'যুগবাণী' তে নজরুল ইসলামের যেসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তার শিরোনাম হচ্ছেঃ- 'নবযুগ', 'গেছে দেশ দুঃখ নাই', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'ধর্মঘট', 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?', 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান', 'ছুৎমার্গ', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', 'মুখবন্ধ', 'রোজ-কেয়ামত' বা 'প্রলয়দিন', 'বাঙালীর ব্যবসাদারী', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?', 'কালা আদমীকে গুলি মারা', 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'লাটপ্রেমিক আলী ইমাম', 'ভাব ও কাজ', 'সত্যশিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'জাগরণী'।[১৩৫]

নবযুগে নজরুল ইসলাম যে সকল জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলো 'যুগবাণী'তে সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে রাজরোষে ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে যুগবাণীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি তাই প্রবন্ধ সংকলনটির প্রথম সংস্করণ ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে ছাপা হলেও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায় ২৭ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩৬]

---

১৩২. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৮৬।

১৩৩. আবদুল হক, নজরুল নাট্য প্রসঙ্গ, 'নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

১৩৪. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৭।

১৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'যুগবাণী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৭-৬৭০।

১৩৬. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৯-২৫০; শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ. ৯-১১।

Dhaka University Institutional Repository

২. রাজবন্দীর জবানবন্দী

কাজী নজরুল ইসলামের একটি ছোটপুস্তিকা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। কবি রাজরোষে কারাবন্দী হওয়ার পর বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সুইনহোর আদালতে দাখিলের জন্য ভাষণটি কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে বসে ৭ ই জানুয়ারী, ১৯২৭ সালে রচনা করেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার ২৭ শে জানুয়ারী, ১৯২৩ সালে কাজী নজরুল সংখ্যায় 'রাজবন্দী' শিরোনোমে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ডি. এম. লাইব্রেরী কলকাতা থেকে মাঘ, ১৩২৯/ জমাদিউল আউয়াল ১৩৪১/জানুয়ারী, ১৯২৩ সালে ছোট পুস্তিকা আকারে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়।[১৩৭]

৩. দুর্দিনের যাত্রী

নজরুল ইসলামের 'দুর্দিনের যাত্রী' শীর্ষক গ্রন্থখানি কতকগুলো প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলো অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছিল। কবি কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালীন ভট্টাচার্য্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা থেকে ভাদ্র, ১৩৩৩/ সফর ১৩৪৫/ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সালে এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থে যে সব প্রবন্ধের শিরোনাম রয়েছে; 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক', 'মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা', 'স্বাগত', 'মেয় ভূখাঁ হু', 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?', 'আমি সৈনিক'।[১৩৮]

মৃতপ্রায় জাতিকে ঘা মেরে জাগাবার আহ্বান, এ বইয়ের প্রতি পাতায়, প্রতি ছত্রে। নজরুল ইসলাম 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন: 'বল, কারুর অধীনতা মানিনা, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। যে অপমান করে, তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সেই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, তবে বিশ্বে এত বড় দানব-শক্তি নেই , যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে।"[১৩৯]

৪. রুদ্র মঙ্গল

'রুদ্রমঙ্গল' শীর্ষক গ্রন্থখানি নজরুল ইসলামের কয়েকটি প্রবন্ধ সমষ্টি। এই প্রবন্ধগুলো 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছিল। পরে কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে চৈত্র, ১৩৩২/ রমজান, ১৩৪৪/ এপ্রিল, ১৯২৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামে মোট আটটি প্রবন্ধ আছে: 'রুদ্রমঙ্গল', 'আমার পথ', 'মোহররম', 'বিষ-বাণী', 'ক্ষুদিরামের মা', 'ধূমকেতুর পথ', 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান'।[১৪০]

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত বইটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। রুদ্রমঙ্গলের ভূমিকায় নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মা'কে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাবকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে, তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায়ের ক্রন্দন 'বোঁধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙ্গেছে'- শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ-শক্তি নাই, সাহস নাই।"[১৪১]

---

১৩৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য পৃ. ৯৩-৯৪; কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪০-৭৪৪।

১৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'দুর্দিনের যাত্রী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৫-৬৮৮।

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯।

১৪০. কাজী নজরুল ইসলাম, ' রুদ্রমঙ্গল' , নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৩-৭১৪।

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামের ছোট্ট নিবন্ধের বই 'রুদ্রমঙ্গল'ও রাজরোষে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ হয়েছিল, কিন্তু বাজেয়াপ্ত হয়নি; যদিও বইটি প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েই তৎকালীন সরকার ক্ষান্ত হন।[১৪২]

৫. ধূমকেতু

নজরুল ইসলামের একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ সংকলন 'ধূমকেতু'। কবির অসুস্থতার পর কলকাতায় অবস্থানকালীন প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭/ জানুয়ারী, ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।এই গ্রন্থে সংকলিত একুশটি লেখার মধ্যে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা ও অন্যত্র প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও পত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথা: 'ধূমকেতুর আদি উদয় স্মৃতি', 'ধূমকেতুর-পথ', 'আমার ধর্ম', 'মোহররম', 'মুশ্‌কিল', 'লাঞ্ছিতা', 'বিষ-বাণী', 'নিশান-বরদার', 'তোমার পণ কি', 'ভিক্ষা দাও', 'আমি সৈনিক', 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য', 'মেয় ভূখা হুঁ', 'কামাল', 'ব্যর্থতার ব্যথা', 'আমার সুন্দর', 'ভাববার কথা', 'আজ চাই কি', 'নজরুল ইসলামের পত্র', 'একখানি চিঠি' (ইব্রাহিম খাঁ) ও 'চিঠির উত্তরে'। এই গ্রন্থের 'মোহররম' ও 'বিষবাণী' প্রবন্ধদ্বয় 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থ থেকে এবং 'মেয় ভুখা হুঁ', ও 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধদ্বয় 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য 'ধূমকেতু'র পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণে (প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫/ ১৯৬৮) এ সব লেখা গৃহীত হয়নি।[১৪৩]

শিশু-কিশোরতোষ

শিশুসাহিত্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনন্য সাধারণ, অবিস্মরণীয় এবং এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি শিশু-কিশোরতোষ ছড়া, কবিতা, নাটকসহ ছোটদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাবলী গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে।

১. মক্তব সাহিত্য

নজরুল ইসলাম কলকাতা অবস্থানকালীন কোন প্রকাশক বন্ধুর অনুরোধে 'মক্তব সাহিত্য' শীর্ষক একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, যা ১৫ শ্রাবণ, ১৩৪২/ ২৯ রবিউস সানি, ১৩৫৪/ ৩১ জুলাই, ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলকাতা গেজেট: ২৪-৯-১৯৩৬ ইং জানুয়ারী 'মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর' কর্তৃক বঙ্গদেশের মক্তব ও মাদ্রাসাসমূহের প্রথম শ্রেণীর জন্য পুস্তকটি অনুমোদিত হয়। বইটিকে সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের স্তরে নিয়ে যেতে হয়। এজন্য গ্রন্থখানার মোট একুশটি রচনার মধ্যে পাঁচটি অন্য লেখকের রচনা সংগ্রহ করে গ্রথিত করা হয়েছে। যদিও শুধু দারিদ্র বিমোচনের জন্যই নজরুল ইসলাম এই শিশু পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করেন।[১৪৪]

অর্থ সংকটের দরুণ কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত 'মক্তব সাহিত্য' শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় চালু করার জন্য পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সংগত কারণেই তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বাঙলার মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভী সাহেবানের খেদমতে আরজ:

আস্‌সালামু আলাইকুম। কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়ত আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। ...আজ আপনাদের দরওয়াজায় এই খেদমতগার এক সামান্য আর্জি লইয়া হাজির হইয়াছে। আমার ভরসা আছে, আপনাদের দরাজ দিল্ ও দস্ত আমাকে রিক্ত হস্তে ফিরাইবে না। আমি এতদিন পরিণত-

---

১৪২. শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল , পৃ. ৫৭-৫৮।

১৪৩. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২৯০; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮।

১৪৪. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স্ক ও পরিণত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা, গজল ইত্যাদি লিখিয়াছি। শিশুদের জন্য, বালক-বালিকাদের জন্য কিছু লিখি নাই। আমার মনে হয়, ইহার জন্য আমিও আশানুরূপ ফল পাই নাই। জ্ঞানের উন্মেষকালে যদি তাহারা ইসলাম ধর্মের, মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রথম সবক পায়, তাহা হইলেই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের ইমারতের ভিত্তি পাকা হয়। সেইজন্য আমি 'মক্তব সাহিত্য' নাম দিয়া একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি। খোদার ফজলে ও আপনাদের দোয়াতে উক্ত 'মক্তব সাহিত্য' টেকস্ট বুক কমিটি কর্তৃক আপনাদের পরিচালিত মাদ্রাসা ও মক্তবের জন্য মনোনীত হইয়াছে। আপনারা যদি আমায় মদদ দেন এবং আমার এই ক্ষুদ্র কেতাবখানি আপনাদের মক্তব-মাদ্রাসার জন্য মনোনীত করিয়া এই খাদেমকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে মক্তব-মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাঙলা পুস্তক রচনায় মন দিব ও এইরূপে কওমের সেবা করিতে থাকিব। আশা করি, আমার এই আর্জি আপনারা মঞ্জুর করিয়া আপনাদের কওমের একনিষ্ঠ খেদমতগারকে সরফরাজ করিবেন।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৩।

আরজ ইতি
খাদেম,
নজরুল ইসলাম

উল্লেখ্য যে, একজন অসামান্য প্রতিভাধর কবি কতটা দরিদ্র, নিপীড়িত ও অভাবগ্রস্থ হলে 'মক্তব সাহিত্য' এর মত পাঠ্য পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন এবং তা বিক্রির জন্য পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের একটি বিজ্ঞাপনের ভাষাও নির্মাণ করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়।[১৪৫]

২. ঝিঙেফুল

কবি নজরুল ইসলামের 'ঝিঙেফুল' ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। শিশুদের মনকে আকর্ষণ করার জন্য গ্রন্থটি অগ্রহায়ণ, ১৩৩১/ জমাদিউল আউয়াল ১৩৪৩/ ডিসেম্বর, ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বীর বাদলকে' উৎসর্গীত ছোটদের এ কাব্য সংকলনে যে সব চিত্তাকর্ষক শিরোনামে কবিতা রয়েছে তা হলোঃ 'ঝিঙেফুল', 'খুকী ও কাঠবিড়ালী', 'খোকার খুশী', 'খাদু-দাদু', 'দিদির বে'তে খোকা', 'মা', 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা', 'চিঠি', 'প্রভাতী', 'লিচু-চোর', 'হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন', 'ঠ্যাংফুলী', 'পিলে-পট্‌কা'।[১৪৬]

৩. পুতুলের বিয়ে

কিশোর ও ছোটদের উপযোগী হাস্য রসাত্মক নাটিকা ও উপদেশমূলক কবিতা সমন্বয়ে 'পুতুলের বিয়ে' শিশুতোষ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কলকাতার ভট্টাচার্য প্রেস থেকে চৈত্র, ১৩৪০/ এপ্রিল, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'সানি ও নিনি কল্যাণীয়েষু' কে উৎসর্গীত গ্রন্থটিতে সে সব শিরোনামে কিশোর উপযোগী কবিতা ও নাটিকা রয়েছে তা হচ্ছে, 'পুতুলের বিয়ে', 'কালো জামাইরে ভাই', 'জুজুবুড়ীর ভয়', 'কে কি হবি বল', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি', 'নবার নামতা পাঠ', 'সাত ভাই চম্পা', 'শিশু যাদুকর'।[১৪৭]

৪. পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে

ছোটদের জন্য নজরুল ইসলাম বিরচিত কবিতা ও নাটিকা 'পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কবি কলকাতা অবস্থানকালীন ১৬ ফাল্গুন, ১৩৬৯/ ৪ শাওয়াল,

---

১৪৫. তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (কুমিল্লাঃ তিতাস প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ , ১৩৯৭/ ১৯৯০), পৃ. ১১০; সৈকত আসগর, নজরুলের গদ্যরচনা ভাবলোক ও শিল্পরূপ,(ঢাকা:অস্ট্রিক পাবলিশার্স, আগষ্ট, ১৯৯০), পৃ. ২৬১-২৬২।

১৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ঝিঙে ফুল', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ২৮১-৩০৮।

১৪৭. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৪; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮২/১ মার্চ, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। পূর্বে প্রকাশিত 'পুতুলের বিয়ে' ও 'সঞ্চয়ন' গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু কবিতা এবং কয়েকটি নতুন কবিতা নিয়ে 'পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থ থেকে 'পুতুলের বিয়ে' নাটিকা 'কে কি হবে বল', 'নবার কবিতা পড়া' (পুতুলের বিয়ে গ্রন্থে নাম ছিল 'নবার নামতা পাঠ') এবং 'সঞ্চয়ন' গ্রন্থ থেকে 'মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়', 'খোকার গল্প বলা' (সঞ্চয়ন গ্রন্থে নাম আছে 'খোকার গপ্প বলা') সংকলিত হয়েছে।[১৪৮]

৫. ঘুম জাগানো পাখী

শিশুদের উপযোগী নজরুল ইসলামের কবিতা সমষ্টি 'ঘুম জাগানো পাখী' গ্রন্থটি কবি কলকাতায় অবস্থানকালীন অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ / ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। ছোটদের হাতে উৎসর্গীত গ্রন্থটিতে রয়েছে 'ঘুম জাগানো পাখী', 'রাখাল-রাজা', 'মাটির রাজা,' 'সওদাগর', 'সানির ইচ্ছা', 'চলবো আমি হালকা চালে','কোথায় ছিলাম আমি', 'কিশোর স্বপ্ন', 'সংকল্প', 'ছোট্ট হিটলার', 'মাঙ্গলিক', 'মায়া মুকুর', 'নব-ভারতের হলদী ঘাট', 'মা,' 'বর প্রার্থনা', 'সারস পাখী', 'পল্লী-জননী', 'চিঠি', 'প্রার্থনা'।[১৪৯]

৬. ঘুম পাড়ানো মাসী-পিসি

নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোরতোষ 'ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসি' শীর্ষক কবিতা সংকলন গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কলকাতার মোহন লাইব্রেরী থেকে শ্রাবণ, ১৩৭৫/ ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।[১৫০]

৭. সাত ভাই চম্পা

অনেকে 'সাত ভাই চম্পা' শীর্ষক নজরুল ইসলামের একটি নাট্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, যা ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থ পরিচয়ে লিখেছেন; 'সাত ভাই চম্পা' নামে কবির পৃথক কোন বই আছে কিনা, তা আমার জানা নাই। 'পুতুলের বিয়ে' বইখানায় 'সাত ভাই চম্পা' নামে এক দীর্ঘ কবিতা আছে। কিন্তু উঁহাতে মাত্র চার ভাই এর কথা আছে। বাদবাকী তিন ভাই ও চম্পার কথা দিয়ে অন্য কোনো বই হয়তো বার হয়েছিল। কিন্তু তা আমার চোখে পড়ে নাই।"[১৫১]

৮. নজরুল কিশোর সমগ্র

নজরুল ইসলামের সমগ্র শিশুসাহিত্য একত্রিত হয়ে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। যতগুলি প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত রচনা একত্রিত করে অখণ্ড 'নজরুল কিশোর সমগ্র' গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা থেকে ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯/ ২ রা শাবান, ১৪০২ / ২৬ শে মে, ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবির শিশু-কিশোরতোষ গ্রন্থের অপ্রতুলতা যদি তাঁর সাহিত্য প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে তবে আশা করা যায় এ গ্রন্থ থেকে তা দূর হবে। এতে কবির হাতের লেখা একাধিক আলোকচিত্র এবং গ্রন্থ শেষে সংক্ষিপ্ত কবি-জীবনী, পুস্তক তালিকা ও কবিতা পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।[১৫২]

---

১৪৮. আজহার উদ্দীন খান , বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪৪।

১৪৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

১৫০. শেখ দরবার আলম, অজানা নজরুল, পৃ, ৬৭১।

১৫১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫২: ভিতাশ চৌধুরী, এবং নিষি নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৪০।

১৫২. আজহার উদ্দীন খান , বাংলা সাহিত্যে নজরুল , পৃ. ৪৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত গ্রন্থাবলী

গানের বুলবুলি খ্যাত কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১৪টি। নিম্নে নজরুল ইসলামের সঙ্গীত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

১. বুলবুল ১ম-২য় খণ্ড

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গজল গানের প্রথম সংকলন 'বুলবুল'। গ্রন্থটির ১ম খণ্ড কবি কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালীন ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে আশ্বিন, ১৩৩৫/ রবিউস সানি, ১৩৪৭/ নভেম্বর, ১৯২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'সুরশিল্পী বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'র প্রতি উৎসর্গ করে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন;

> আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু আমার শুধু এ গান,
> তুমি তারে দিলে রূপ রঙিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।[১৫৩]

কবি-বন্ধু দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০ খ্রি.) এর নিজের কথায়, "কাজী আমার মুখে তার গানের সুর বিহারে উৎফুল্ল হয়েছিলো। সে তার 'বুলবুল' কাব্য-গ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকে উৎসর্গ করে।"[১৫৪]

যেসব গজল-গান বাংলায় আমদানী করে নজরুল ইসলাম এদেশে নতুন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেন, তার অধিকাংশ গান 'বুলবুল'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ৪২টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই শ্রেণীর আরো ১০৩ টি গান গ্রথিত করে মিসেস প্রমীলা নজরুল ইসলাম (১৯০৮-১৯৬২ খ্রি.) কর্তৃক 'বুলবুল' এর ২য় খণ্ড ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯/ মে, ১৯৫২ ইং সালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫৫]

২. চোখের চাতক

নজরুল ইসলামের আরেকটি গজল গানের সংকলন 'চোখের চাতক' প্রথম সংস্করণ ডি. এম. লাইব্রেরী কলকাতা থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ / রজব, ১৩৪৮/ ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। যা উৎসর্গ করা হয় "কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু" কে। 'চোখের চাতক' সংকলনে গজল-গান, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর ৫৩ টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অনেকগুলো গান সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত।[১৫৬]

৩. নজরুল গীতিকা

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'নজরুল গীতিকা' প্রথম সংস্করণ কলকাতা থেকে ভাদ্র, ১৩৩৭/২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। যা উৎসর্গ হয়েছিল তার গানের বুলবুলি ও বনের কুহু কেকাদেরকে। 'নজরুল গীতিকা' শীর্ষক গানের সংকলনে জাতীয় সংগীত ১৪টি, ঠুংরী ২২ টি, হাসির গান ৬ টি, গজল ৩৫ টি, ধ্রুপদ ৬ টি , কীর্তন ২টি, বাউল-ভাটিয়ালী ৭ টি, টপ্পা ৬টি এবং খেয়াল ২৯টি সহ কবির বিভিন্ন ঢং-এর মোট ১২৭ টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ গানই খুব জনপ্রিয়।[১৫৭]

---

১৫৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বুলবুল', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

১৫৪. দিলীপ কুমার রায়, 'নজরুল স্মৃতি', কাজী নজরুল ইসলাম, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পৃ. ১২-১৩।

১৫৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বুলবুলঃ দ্বিতীয় খণ্ড', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২১-১৮০।

১৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চোখের চাতক', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭-২৭৪।

১৫৭. তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৪০-৪১; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৫; কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল গীতিকা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. চন্দ্রবিন্দু

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'চন্দ্রবিন্দু' প্রথম সংস্করণ কলকাতা থেকে আশ্বিন, ১৩৩৮/ রবিউস সানি, ১৩৫০/ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়- যা উৎসর্গ হয়েছিল 'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মন্দা ঠাকুর-শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রী চরণ কমলে।"[১৫৮]

'চন্দ্রবিন্দু' সংকলনে আছে মোট ৬১ টি গান। তন্মধ্যে ১৮ টি কমিক-গান। নজরুল ইসলামের 'চন্দ্রবিন্দু' সম্পর্কে শ্রী শিশির কর লিখেছেন: "এটি মূলতঃ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা। এই গ্রন্থের লেখাগুলি দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গে ভরপুর।"[১৫৯] অবশ্য সব গানগুলোতেই তরুণ মনে আগুন ধরিয়ে দেয়ার গুণ আছে। কমিক-গানগুলো যাদের উদ্দেশ্যে লেখা, তাঁরা এর রস আস্বাদন করতে না পেরে গ্রন্থখানা বাজেয়াপ্ত করে কবির লেখার আসুরিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। 'চন্দ্রবিন্দু' বইটি সরকার কর্তৃক ১৯৩১ সালের ১৪ ই অক্টোবর বাজেয়াপ্ত করা হয়, প্রায় ১৫ বছর পর ১৯৪৫ সালের ৩০ শে নভেম্বর 'চন্দ্রবিন্দু'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। রাজরোষ মুক্ত হবার পর ১৩৫২ সালের ফাল্গুন মাসে 'চন্দ্রবিন্দু'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৬০]

৫. সুর-সাকী

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'সুর-সাকী' প্রথম সংস্করণ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা থেকে ২২ আষাঢ়, ১৩৩৯/১৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৫৮/ ৭ জুলাই, ১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সুর-সাকী'তে নজরুল ইসলামের ৯৭ টি গান সন্নিবেশিত হয়েছিল। এরপর প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক 'সুর-সাকী' দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৬১ সালে কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে বের হয়। এই সংস্করণে নজরুল ইসলামের আরো ২ টি গান যুক্ত হওয়ায় 'সুর-সাকী' এর গানের সংখ্যা ৯৯ এ দাড়ায়।[১৬১]

৬. জুলফিকার

নজরুল ইসলামের মূলতঃ ইসলামী গানের সমষ্টি 'জুলফিকার' প্রথম সংস্করণ কবি কলকাতায় অবস্থানকালীন এম্পায়ার বুক হাউস থেকে ভাদ্র ১৩৩৯/ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জুলফিকার' প্রথম সংস্করণে মোট ২৪ টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'জুলফিকার' গ্রন্থে মৃতপ্রায় মুসলিম জাতির দুর্দশায় ব্যথিত কবি যেন তাদের হাত ধরে টেনে তুলতে চেয়েছেন। বিভিন্ন দেশের মুসলিম জাগরণ লক্ষ্য করে নজরুল ইসলাম এদেশের মুসলমানকে ডেকে বলেছেন: "ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণের প্রদীপ জ্বাল।"[১৬২]

'জুলফিকার' গীতি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মিসেস প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক পৌষ, ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে বহু নতুন গান স্থান লাভ করায় 'জুলফিকার' এ ৫৪ টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খণ্ডে এই গান গুলি 'জুলফিকার: দ্বিতীয় খণ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[১৬৩]

---

১৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চন্দ্রবিন্দু', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

১৫৯. শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল , পৃ. ১০৩।

১৬০. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪২; আজহার উদ্দীন খান , বাংলা সাহিত্যে নজরুল , পৃ. ৪৩২-৪৩৩; ভিভাশ চৌধুরী এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৪১।

১৬১. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল', পৃ. ৪৩৩-৪৩৪; কাজী নজরুল ইসলাম, 'সুর-সাকী', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-২০২।

১৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫-২১৮; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৩।

১৬৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার: দ্বিতীয় খণ্ড ', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭. বনগীতি

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'বনগীতি' প্রথম সংস্করণ কলকাতার এম্পায়ার বুক হাউস থেকে আশ্বিন, ১৩৩৯/ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৫১/ অক্টোবর ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল,

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলা-বিদ
আমার গানের ওস্তাদ
জমীরুদ্দীন খান সাহেবের
দস্ত মোবারকে- [১৬৪]

'বনগীতি' প্রথম সংস্করণে গানের সংখ্যা ৭৭টি। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৯)৭৭টি গান আছে। 'বনগীতি'র অধিকাংশ গানে কবির হৃদয়াবেগ পরিস্ফুট। নজরুল ইসলামের প্রেমানুভূতি, রূপ আর রস প্রতিটি গানে জ্বলজ্বল করছে। অবশ্য কয়েকটি অন্যভাবের গানও এতে সন্নিবিষ্ট আছে।[১৬৫]

৮. গুল-বাগিচা

নজরুল ইসলামের 'গুলবাগিচা' শীর্ষক গানের সংকলনটির প্রথম সংস্করণ কলকাতার দি গ্রেট ইস্টার্ণ লাইব্রেরী থেকে ১৩ আষাঢ়, ১৩৪০/ ৩ রবিউল আউয়াল, ১৩৫২ / ২৭ জুন, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। যার উৎসর্গপত্রে গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন; "স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্ন হৃদয়েষু।"[১৬৬]

নজরুল ইসলামের 'গুল-বাগিচা'য় রয়েছে কবির ঠুংরী, গজল, দাদরা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী কীর্তন, ভাটিয়ালি, ইসলামী ধর্মসঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং এ লেখা ৮৮ টি গানের সমষ্টি। গুলবাগিচার দুই-চারটি ছাড়া প্রায় গানই স্বদেশী মেগাফোন কোম্পানীতে রেকর্ড হয়েছে।[১৬৭]

৯. গীতি শতদল

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'গীতি শতদল' প্রথম সংস্করণ কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে বৈশাখ, ১৩৪১ / জিলহজ্জ, ১৩৫২ / এপ্রিল, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে রয়েছে কবির ১০১ টি গান। গীতি শতদলের সমস্ত গানই স্বদেশী মেগাফোন ও গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড হয়েছে।[১৬৮]

১০. গানের মালা

নজরুল ইসলামের কতকগুলো গানের সমষ্টি 'গানের মালা' প্রথম সংস্করণ কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক ৬ কার্তিক, ১৩৪১/ ১৩ রজব, ১৩৫৩ / ২৩ অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়- যার উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল, "পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু।"[১৬৯] 'গানের মালা ' সংকলনে কাজী নজরুল ইসলামের গানের সংখ্যা ৯৫ টি।

---

১৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বনগীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

১৬৫. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৪৭; আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল , পৃ. ৪৩৪-৪৩৫।

১৬৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

১৬৭. আজহার উদ্দীন খান , বাংলা সাহিত্যে নজরুল পৃ. ৪৩৬; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন , যুগ স্রষ্টা নজরুল , পৃ. ২৪১।

১৬৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গীতি শতদল', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-৪৭০।

১৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গানের মালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

১১. রাঙা জবা

নজরুল ইসলাম বিরচিত শ্যামা সঙ্গীত সংকলন 'রাঙা জবা' কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে বৈশাখ, ১৩৭৩/ এপ্রিল, ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে রয়েছে নজরুল ইসলামের ১০০ টি শ্যামা সংগীত। একজন মুসলিম কবির হাতে অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রাণের আবেগ কি পরিমাণ সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'রাঙা জবা'র গানগুলো তারই প্রতীক।[১৭০]

১২. দেবীস্তুতি

কবি নজরুল ইসলামের তিনখানি অপ্রকাশিত রচনা ও ১৬ খানি অপ্রকাশিত 'মাতৃস্তুতি' দিয়ে 'দেবীস্তুতি' প্রথম সংস্করণ কলকাতা থেকে মহালয়া, ১৩৭৫/অক্টোবর, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। নজরুল সঙ্গীতের স্বনামখ্যাত স্বরলিপিকার শ্রী নিতাই ঘটক 'দেবীস্তুতি' এর গানগুলি সংকলন করেন এবং ড. গোবিন্দ্র গোপাল মুখোপাধ্যায় 'দেবীস্তুতি' এর ভূমিকা লিখেন।[১৭১]

১৩. সন্ধ্যামালতী

নজরুল ইসলামের গানের সমষ্টি 'সন্ধ্যামালতী' প্রথম সংস্করণ কলকাতা থেকে শ্রাবণ ১৩৭৭/জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের এই রচনাগুলি ইতোপূর্বে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করছিল, কবি-পুত্রদের সহযোগিতায় ও আনুকূল্যে রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে।[১৭২]

স্বরলিপি

অদ্যাবধি নজরুল গীতির যে সকল স্বরলিপির বই বের হয়েছে তন্মধ্যে একটি স্বরলিপির গ্রন্থ স্বয়ং নজরুল ইসলাম প্রকাশ করেছিলেন। কবির সুস্থাবস্থায় তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪ খ্রি.) ও জগৎ ঘটকের দু'টো স্বরলিপির গ্রন্থ বের হয়। তারপর নজরুলের গানের স্বরলিপির যে সব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাতে নজরুল গীতির প্রভূত জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে। এখানে নজরুল ইসলামের স্বরলিপিকৃত উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম, প্রকাশের তারিখ, গানের স্বরলিপি সংখ্যা ও স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখ করা হল।[১৭৩]

১. নজরুল স্বরলিপিঃ 'নজরুল স্বরলিপি' শীর্ষক গ্রন্থে নজরুল ইসলামের স্বদেশী, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর ৩০ টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ৮ ভাদ্র, ১৩৩৮ / ১০ রবিউস সানি, ১৩৫০/ ২৫ আগষ্ট, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এর উৎসর্গপত্রে লেখা হয়, "গীত-শিল্পী' বন্ধু শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য এম. এ. করকমলেষু"।

২. সুর-লিপিঃ নজরুল ইসলামের কতকগুলো গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুর-লিপি' প্রথম সংস্করণ কবি কলকাতা থাকাকালীন ৩১ শ্রাবণ, ১৩৪১/ ৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৫৩/ ১৬ আগষ্ট, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার জগৎঘটক। এতে ৩১ টি গানের স্বরলিপি রয়েছে। গ্রন্থটির মুখবন্ধে নজরুল ইসলাম লিখেন, "সুরলিপিতে প্রকাশিত প্রায় সব গানগুলিই গ্রামোফোন রেকর্ড হয়ে গেছে, গীত-শিল্পীদের মুখে মুখে গীত হয়েও গানগুলি লোকপ্রিয় হয়ে আছে। কাজেই 'সুরলিপি ' অন্ততঃ তাঁদের আনন্দ দান করবে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গানের নির্ভুল সুর শিখতে চান।"

---

১৭০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাঙা জবা', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৩৬৭-৪৩০।

১৭১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'দেবীস্তুতি', নজরুল রচনাবলী,৪র্থ খণ্ড,পৃ.৪৩১-৪৪৪ ও গ্রন্থ পরিচয়,পৃ.৭২২-৭২৩

১৭২. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৪২; ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ৩৭৩।

১৭৩. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫২-৪৫৭; খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ স্রষ্টা নজরুল, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সুর মুকুর: নজরুল ইসলামের কতকগুলো গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুর মুকুর' প্রথম সংস্করণ কবি কলকাতায় থাকাকালীন ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে ১৭ আশ্বিন, ১৩৪১/ ২৩ জমাদিউস সানী, ১৩৫৩/৪, অক্টোবর, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার নলিনীকান্ত সরকার। এতে ২৭ টি গানের স্বরলিপি আছে।

৪. নজরুল সুর সঞ্চয়ন: নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি 'নজরুল সুর সঞ্চয়ন' গ্রন্থটি ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ৩য় খণ্ডটির প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৭৭, প্ররম শ্রদ্ধেয় গিরিবালা দেবীর (দিদিমা) পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ। এতে ২১ টি গানের স্বরলিপি রয়েছে।

৫. সুর ছন্দিতা: নজরুল ইসলামের ৩০ টি গানের স্বরলিপি 'সুর ছন্দিতা' ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

৬. আনন্দ-সুন্দর: নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি 'আনন্দ-সুন্দর' ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি শ্রীমতি প্রতিমা সেনের করকমলে উৎসর্গীত হয়েছে। স্বরলিপিকার মনোরঞ্জন ঘোষ।

৭. নবরাগ: নজরুল ইসলামের ৩০ টি গানের স্বরলিপি 'নবরাগ'। স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক ও কাজী অনিরুদ্ধ।

৮. বেণুকা: নজরুল ইসলামের ৩০ টি গানের স্বরলিপি 'বেণুকা' ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক ।

৯. পটদীপ: নজরুল ইসলামের ৩০টি গানের স্বরলিপি 'পটদীপ' ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার নিতাই ঘটক।

১০. সুর মল্লার: নজরুল ইসলামের ২৬টি গানের স্বরলিপি 'সুর মল্লার' ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ ও বেচু দত্ত।

১১. গীতি-আলেখ্য: নজরুল ইসলামের ৩০টি গানের স্বরলিপি 'গীতি আলেখ্য' ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

১২. নজরুল রাগ বিচিত্রা: নজরুল ইসলামের ৩০টি গানের স্বরলিপি 'নজরুল রাগ বিচিত্রা' ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

১৩. নার্গিস: নজরুল ইসলামের ৩০টি গানের স্বরলিপি 'নার্গিস' ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি 'সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা দেবী ও আঙ্গুরবালা দেবী'কে উৎসর্গীত। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

১৪. সুরবাহার: নজরুল ইসলাম বিরচিত ৪০টি শ্যামা সঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুরবাহার'। স্বরলিপিকার কমল দাশ গুপ্ত ও ফিরোজা বেগম।

১৫. সঙ্গীতাঞ্জলি: নজরুল ইসলামের ১২১টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সঙ্গীতাঞ্জলি' মোট চারটি খণ্ডে ১৩৭৫-১৩৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার নিতাই ঘটক।

১৬. কারার ঐ লৌহ কপাট: নজরুল ইসলামের ১৯টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ১লা আশ্বিন, ১৩৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

১৭. সুর ও বাণী: নজরুলের ২৬টি গানের স্বরলিপি 'সুর ও বাণী' গ্রন্থটি ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়, 'আমার অগ্রজ বুলবলের অমরাত্মার স্মরণে'। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ঘর ভুলানো সুরেঃ নজরুল ইসলামের ২৪ টি গানের স্বরলিপি 'ঘর ভুলানো সুরে' গ্রন্থটি ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করা হয় কল্যাণী কাজীকে। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

১৯. নজরুল গীতিমালাঃ নজরুল ইসলামের ৬০ টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'নজরুল গীতিমালা' মোট তিনটি খণ্ডে ১৯৬৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডে ২০টি গানের স্বরলিপি। স্বরলিপিকার ফিরোজা বেগম।

২০. হিন্দোলঃ নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'হিন্দোল' দুইটি খণ্ডে ১৩৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার মফিজুল ইসলাম।

২১. নজরুল সুর সুধা : নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'নজরুল সুর সুধা' মোট তিনটি খণ্ডে ১৯৬৮ সালে কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ইসলামী গানের স্বরলিপি, ২য় খণ্ডে ১৯টি গানের স্বরলিপি ও ৩য় খণ্ডে স্বরলিপি সংকলন। স্বরলিপিকার সুরাইয়া খলিল।

২২. নজরুল সুর সংকলনঃ নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'নজরুল সুর সংকলন' গ্রন্থটি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার এ. এইচ. সাঈদুর রহমান

২৩. নজরুল সুরলিপিঃ নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি 'নজরুল সুরলিপি' গ্রন্থটি মোট দশটি খণ্ডে ১৯৮২-১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডে ২৫ টি গানের স্বরলিপি। স্বরলিপিকার সুধীন দাশ ও এস. এম. আহসান মুর্শেদ।

২৪. শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপিঃ নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি' দুইটি খণ্ডে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডে ৯৯টি গানের স্বরলিপি আর ২য় খণ্ডে ১২২ টি গানের স্বরলিপি।

২৫. সুনির্বাচিত নজরুল-গীতির স্বরলিপিঃ নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুনির্বাচিত নজরুল-গীতির স্বরলিপি' গ্রন্থটি মোট ৫টি খণ্ডে ১৩৮৩-১৩৮৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডে ১০১ টি গানের স্বরলিপি। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

২৬. সুনির্বাচিত নজরুল-গজল স্বরলিপিঃ নজরুল ইসলামের ১০১ টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুনির্বাচিত নজরুল গজল স্বরলিপি' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

২৭. নির্বাচিত নজরুল-ভক্তিগীতির স্বরলিপিঃ নজরুল ইসলামের ১০১ টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'নির্বাচিত নজরুল-ভক্তিগীতির স্বরলিপি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ।

২৮. নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপিঃ 'নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি' গ্রন্থটি মোট ১৭ টি খন্ডে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৮৬-১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার সুধীন দাশ, আসাদুল হক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, রশিদুন নবী।

কাজী নজরুল ইসলামের অনেক গান, রেকর্ড নাট্য বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, যা অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্রামোফোন ও বেতারের ফাইল ঘাটলে তাঁর বহু গান পাওয়া যেতে পারে, যেগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে উদ্ধার করে সাধারণের অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন।

রচনাবলী

কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র সাহিত্যকর্ম 'নজরুল রচনাসম্ভার' ও 'নজরুল রচনাবলী' শিরোনামে কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে ও নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। এ যাবত প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর নাম দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

১. নজরুল রচনাসম্ভার ১ম-৫ম খণ্ড

ঢাকা থেকে প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি.) কর্তৃক সম্পাদিত কাজী নজরুল ইসলামের অপ্রকাশিত রচনার সংকলন 'নজরুল রচনাসম্ভার' নামে কলকাতা থেকে ২৫ শে মে, ১৯৬৫/১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ সালে প্রথম সংস্করণ বের হয়। পরে এই খণ্ডটির পুনঃ নতুন সংস্করণ থেকে আবদুল কাদিরের নাম বাদ পড়ে এবং গ্রন্থটি 'নজরুল রচনাসম্ভার' শিরোনামেই খণ্ডে খণ্ডে আবদুল আজিজ আল-আমান (১৯৩২-১৯৯৪ খ্রি.) এর সম্পাদনায় হরফ প্রকাশনী থেকে বের হতে থাকে।

'নজরুল রচনাসম্ভার' ২য় খণ্ড ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫/ ২৫শে, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'নজরুল রচনা সম্ভার' ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। নজরুল রচনা সম্ভার ৫ম খণ্ড, ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ সালে ছাপা হয়। এসব সংকলনে নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুদ্রিত বই গুলো যখন নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন বিষয় বিন্যস্ত পদ্ধতি পরিবর্তন করে নজরুল রচনাসম্ভার পাঁচ খণ্ডকে তিন খণ্ডে রূপান্তরিত করে আবদুল আজিজ আল-আমানের সম্পাদনায় কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে ১৩২৫-১৩৮৮/ ১৯৭৮-১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।[১৭৪]

২. নজরুল রচনাবলী ১ম-৫ম খণ্ড

কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র 'নজরুল রচনাবলী' শিরোনামে পাঁচটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীর ১ম খণ্ড কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮/ ২৫ মে ১৯৬৬ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের প্রথম যুগের যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা; এ সকল রচনা গ্রথিত হয়েছে। ১ম খণ্ডে নজরুল ইসলামের কিশোর বয়সের রচনায় নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও নজরুল ইসলামের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নজরুল রচনাবলীর ২য় খণ্ড ঢাকা কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৯ ই পোষ, ১৩৭৪/ ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই খন্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, উপন্যাস নাটিকা ও প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

নজরুল রচনাবলীর ৩য় খণ্ড ঢাকা কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৯ ই ফাল্গুন, ১৩৭৬/ ২১ জানুয়ারী, ১৯৭০ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই খন্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, কাব্যানুবাদ, গল্প, নাটিক ও প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

নজরুল রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডটি ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে কবির মৃত্যুর পর ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪/ ২৫ শে মে, ১৯৭৭ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খন্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

নজরুল রচনাবলীর ৫ম খণ্ড প্রথমার্ধ ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১/ ২৫ শে মে, ১৯৮৪ সালে এবং দ্বিতীয়ার্ধ ১লা পৌষ, ১৩৯১/ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল

---

১৭৪. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫৭-৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

কাদিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডটির উত্তরার্ধে নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, হাসির গান, নাট্যগীত, নাটক-নাটিকা, অভিভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১৭৫]

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর বাংলা একাডেমী রচনাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত নতুন তথ্যাদিও কিছু কিছু আসতে থাকে। কবি-সম্পাদক আবদুল কাদির লোকান্তরিত (১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪) হওয়ার পর হুবহু পূর্ব সংস্করণ মুদ্রিত না করে তারই কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে পরিমার্জন, পূর্ণাঙ্গীকরণ ও সংহত দানের জন্য গঠিত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পাঁচ খণ্ডের স্থলে চার খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ নজরুল রচনাবলী নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

নজরুল রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ কথায় বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ লিখেছেন, "বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত নজরুল-রচনাবলীরই সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এ সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল বিশেষজ্ঞগণ।"[১৭৬]

'নজরুল রচনাবলী' নতুন সংস্করণের ১ম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং ২য় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকী সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩য় খণ্ডে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতিগ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ৪র্থ খণ্ডে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দু' খণ্ডের রচনা বিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।[১৭৭]

পত্রাবলী

কাজী নজরুল ইসলাম পত্র সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। কবি নজরুল ইসলাম জানতেন তাঁর চিঠি যারা পাবেন তাদের কাছে এগুলো মূল্যায়িত হবে। তাছাড়া কোনদিন এগুলো হয়তো ছাপানোও হবে। তথাপি তিনি কোন রকম আত্মসচেতনতা ছাড়াই একের পর এক চিঠি লিখতেন। তিনি হৃদয়ের তাপে উষ্ণ, ঐকান্তিক আর অন্তরঙ্গ সব চিঠি লিখতেন। অবশ্য এগুলো প্রকাশ হোক তাও তিনি চাননি। এগুলো পড়লে কারো কখনো মনে হতে পারে যে, একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কিন্তু একবার পড়ে ফেললে আর কেউ দুঃখ করবেন না। কারণ তিনি পাবেন অনেক পুরস্কার, গোপনীয়তা আবিষ্কার করে নয় বরং একটি অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং অনুভূতিশীল অন্তরের সাথে পরিচিত হয়ে। নজরুল ইসলামের চিঠিগুলো ডি. এইচ. লরেন্সের মত। যেই পড়ুন পড়তে সুন্দর লাগবে, মজাও পাওয়া যাবে।[১৭৮]

কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন সময় অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছেন। নজরুল ইসলামের যেসব চিঠিপত্র গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে তা 'নজরুল পত্রাবলী' নামে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭/১৯৭০ সালে কলকাতা সাহিত্যম থেকে কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ ও বিশ্বনাথ দে-এর সম্পাদনায় কল্লোল সম্পাদক কবি বন্ধু দীনেশরঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১ খ্রি.)এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যাতে নজরুল ইসলামের ৫৭ টি চিঠিপত্র ছাড়াও 'আমরা লক্ষী ছাড়ার দল',

---

১৭৫. দ্রঃ আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড- ৫ম খণ্ড ।

১৭৬. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৬২।

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

১৭৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

'তুবড়ী', 'বাশীর ডাক', 'মোরা সবাই স্বাধীন', 'মোরা সবাই রাজা', 'স্বাগত', 'মেয় ভুখা হুঁ', 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?', 'আমি সৈনিক', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নিবন্ধগুলি রয়েছে।[১৭৯]

সাম্প্রতিককালে 'নজরুলের পত্রাবলী' বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ (জন্ম-১৩৪২/১৯৩৬)এর সম্পাদনায় কবির ৭৭ টি চিঠি ও পত্র প্রাপকদের পরিচিতি সহকারে ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২/ মে, ১৯৯৫ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১৮০]

কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভা। এই অতুলনীয় প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখা। যেমন- কবিতা, গান, গজল, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ, শিশুতোষ রচনা প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও ব্যাপক বিস্তৃতির মূলেও প্রভূত কাজ করেছে কাজী নজরুল ইসলামের অমর অবদান। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এই যুগস্রষ্টা কবি এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নব জাগরণের এবং বৃটিশ শাসনের ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার বাণীবাহক ও বিদ্রোহী চেতনার অনন্য সাধারণ রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামময় বর্ণাঢ্য জীবন, তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন এবং নজরুল প্রতিভার স্বরূপ অনুসন্ধানের কাজ গত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে চলে আসছে। চলতি শতকের বিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই নজরুল ইসলামের মৌলিক কবি-প্রতিভা এবং তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি সমকালীন পাঠক ও সমালোচক মহলের বিস্ময়কর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'বিদ্রোহী' (১৯২২) কবিতার আত্মপ্রকাশের পূর্বেই ১৯২০ সালেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি ও প্রাজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.) নজরুল প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যধর্মী স্বরূপ এবং তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় তুলে ধরে এই নবীন কবিকে বাংলার স্বারস্বত সমাজের পক্ষ থেকে সাহিত্য অঙ্গনে স্বাগত জানান।

বলাবাহুল্য যে, মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যমূলক কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' পাঠ করে মোহিতলাল মজুমদার পত্রিকার সম্পাদক শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.) কে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রে নবীন কবি নজরুল ইসলামকে অভিনন্দন জানান এবং উক্ত কবিতার ভাব ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতির এবং উপমা চিত্রকল্পের আলোচনা করতঃ কবিতাটির শিল্পরূপ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নজরুল ইসলামের অতুলনীয় কবি-প্রতিভা ও মৌলিকতা তুলে ধরেন।

এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'একখানি পত্র' শীর্ষক চিঠিতে লিখেছেন, "মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালী এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃশয় প্রমাণ তাহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাহাকে বাংলার স্বারস্বত মন্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি

---

১৭৯. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৫২।

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২: শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, নজরুলের পত্রাবলী, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট,৫জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২/ মে, ১৯৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।"[১৮১]

মন্তব্যটি বাংলা ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের কাব্য প্রতিভার ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এই মন্তব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.) নজরুল ইসলামের প্রতিভা ও তাঁর কাব্যের প্রথম এবং পথিকৃৎ সমালোচক ও মূল্যায়নকারী। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক মোজাম্মেল হককে লিখিত 'একখানি পত্র' শীর্ষক চিঠিতে মোহিতলাল মজুমদার নজরুল ইসলামের 'বাদল প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতার প্রশংসা করে লিখেন, "বাদল প্রাতের শরাব" শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতেও কবির 'মত্ত' হইবার ও 'মত্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী মাত্রই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।"[১৮২]

কবিতার শিল্পরূপের এবং তার উৎকর্ষের বিচার মূলত ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োগেরই বিচার। কবির শক্তি ও সাফল্য এসবের সার্থক প্রয়োগের নিরিখেই নির্ণীত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের বিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবির্ভাবের পরে এবং তাঁর সাড়া জাগানো বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার আগে যে সব কবিতায় নজরুল ইসলামের অনন্য সাধারণ মৌলিক কবি-প্রতিভা এবং সৃষ্টি ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে, সে গুলো হচ্ছে, 'খেয়াপারের তরণী', 'মোহররম', 'কোরবানী', 'শাত-ইল-আরব', 'কামাল পাশা', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' প্রভৃতি মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কবিতা। মোহিতলাল মজুমদার নজরুল ইসলামের 'কোরবানী' কবিতা পাঠ করে তার ছন্দ দক্ষতায় বিমুগ্ধ হয়ে লিখেছেন; "শুধু ঘন ঘন যুক্তাক্ষর বিন্যাসই নয়-পর্বান্ত হসন্ত বর্ণ, যতদূর সম্ভব বর্জন করিতে পারিলে স্বর প্রসারণের কোন অবকাশ আর থাকে না বলিয়া, এই বাংলা ছন্দেও প্রবল আঘাতমূলক ছন্দ স্পন্দের সৃষ্টি করা যায়, যথা -

'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন'

ইহা পড়িতে হইবে এইরূপ-

'ওরে হত্যা-নয়াজ ০ সত্যাগ্রহ ০ শক্তি রুদ্বো ০ ধন'

ইহার কোন খানে স্বর প্রসারণের অবকাশ মাত্র নাই।"[১৮৩]

কাজী নজরুল ইসলামের সমকালীন সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য সমালোচক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮ খ্রি.) সমগ্র বাংলা কাব্যের পটভূমিকায় নজরুলের কবি-প্রতিভার স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি এবং অসাধারণ মৌলিকতা তুলে ধরে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ প্রবর্তক কবি হিসেবে অভিহিত করেন এবং নজরুল ইসলাম যে ভবিষ্যতে তাঁর প্রাপ্য সাহিত্য সিংহাসনে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিষিক্ত হবেন এই প্রত্যয় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। 'সওগাত' পৌষ, ১৩৩৩ সংখ্যায় 'কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান' শীর্ষক এব দীর্ঘ প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের কবি-প্রতিভা ও তাঁর কবিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন লিখেন, "এই যুগ-প্রবর্তক কবি প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম। অন্যান্য যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার উদয় যেমন হইয়াছে, নজরুল ইসলামের সময়ও তাহাই হইতেছে। অর্থাৎ চতুর্দিক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে একদল তাঁহাকে কাফের ফতোয়া দিয়া তাহার

---

১৮১. মোহিতলাল মজুমদার, 'একখানি পত্র', (কলকাতা: মোসলেম ভারত, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৭), পৃ. ৩৪২-৩৪৪; উদ্ধৃত, রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, পৃ. ১০২-১০৫।

১৮২. প্রাগুক্ত।

১৮৩. মোহিতলাল মজুমদার, বাংলা কবিতার ছন্দ, পৃ. ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরকালের ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।....আবার হিন্দুদের মধ্যেও নজরুল ইসলামকে লইয়া নানা কথা উঠিয়াছে, নজরুলের লেখায় রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক অনুকরণ থাকে না এবং রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বসাহিত্যর উঁচু ভাব নাই বলিয়া অনেকে হতাশ হইতেছেন। ...ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। দুনিয়ার যত যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার উদয় হইয়াছে, সকলের ভাগ্যেই অল্প-বিস্তর নিন্দা-গ্লানি লাভ হইয়াছে।"[১৮৪]

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধে একশ্রেণীর হিন্দু-মুসলিম সংকীর্ণ চিত্ত এবং গোড়া সমালোচকদের নজরুল সমালোচনা, কবির নিন্দার সমালোচনা করে এবং নজরুল ইসলামের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা তুলে ধরে বলেন, "যুগ-প্রবর্তক প্রতিভাকে বুঝতে একটু দেরীই লাগিবে। কিন্তু আমাদের আশা আছে সেদিন বেশী দূরে নয়, যে দিন এই নতুন যুগ প্রবর্তক কবি-প্রতিভা বাংলার সাহিত্যিক মন্ডলীতে সাদরে অভ্যর্থিত হইবেন এবং নিজের প্রাপ্য সাহিত্য সিংহাসনে শ্রদ্ধার সাথে অভিষিক্ত হইবেন।"[১৮৫]

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভবিষ্যৎবাণী অচিরেই প্রতিফলিত হয়েছিল। সত্যই বাঙ্গালী জাতির পক্ষ থেকে কবিকে বিরাট নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ নজরুল প্রতিভার স্বরূপ সন্ধান ও তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মোহিতলাল মজুমদার ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভূমিকা শুধু অগ্রণীর নয়, এ প্রচেষ্টা মাইল ষ্টোন হিসেবেও চিহ্নিত হবার মতো।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সর্বপ্রথম কাজী নজরুল ইসলামকে যুগ প্রবর্তক কবি, বাংলার জাতীয় কবি এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক ও বস্তুতান্ত্রিক কবি হিসেবে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। নজরুল ইসলাম ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নিয়ে এবং মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় ইসলামী আদর্শ ও জোশপূর্ণ কবিতা রচনায় নজরুল ইসলামের অসাধারণ শক্তিমত্তা ও দক্ষতার উল্লেখ করে এবং তাঁর 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'সুবহ্-উম্মেদ', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম', প্রভৃতি কবিতার উদাহরণ দিয়ে বলেন, "এমন ইসলামী প্রকাশ ভঙ্গীযুক্ত চমৎকার রচনা বাংলা সাহিত্যে আর নাই।...এমন ইসলামী প্রকাশভঙ্গীযুক্ত কবিতা আর কার কলম হইতে বাহির হইয়াছে ...এমন ইসলামী জোশ, এমন মুসলমানী শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ বাঙলার আর কোন কাব্যে আছে? ভীরু বাঙালীর কলমে যে এত তেজ ছিল, তাহা নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আর কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?" [১৮৬]

মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার ১৩৩৩ বাং /১৯২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্য ও যুগ ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের একাংশে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.) এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন, "মোসলমান অধিক দিন বাংলা সাহিত্যে নামে নাই। কিন্তু এই অল্পদিনেই নজরুল ইসলাম দেখা দিয়াছেন। বাংলার গীতিকাব্য যখন সুরা, সুন্দরী ও স্বর্গ লইয়া মাতোয়ারা হইতে হইতে অবসাদে মৃতকল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন ওদিকে অগ্রসর হইবার আর কোন ও পথই ছিল না, যখন কবি প্রিয়ার ধ্যানে নিতান্ত অ-কবিরাও অবসন্ন নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময় নজরুল ইসলাম তাঁর কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে বাঙালীর হৃদয় দুয়ারে উপস্থিত

---

১৮৪. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, (সওগাত , পৌষ, ১৩৩৩): উদ্ধৃত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৭৭।

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৮৬. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৭৯-৮০

Dhaka University Institutional Repository

হইয়া তাকে এমন সবল ঝাঁকুনী দিয়াছেন যে, তার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। বাংলা গীতিকাব্যে নতুন তোরণ দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।"[১৮৭]

কবি-সাহিত্যিকগণ হলেন সত্য ও সুন্দরের মূর্তপ্রতীক। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আমাদের জাতীয় চেতনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ছিলেন সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ। অবহেলিত ও লাঞ্ছিত জাতিকে আলোর পথে উত্তরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। নজরুল ইসলামের তুলনা তিনি নিজেই। নজরুল ইসলাম গানের কবি, ইসলামী আদর্শের কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি, সর্বোপরি বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতার কবি। নজরুল ইসলাম সকল ধর্মের স্বীকৃত কবি হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একনিষ্ঠ বান্দা ও নবী করীম (সা.) এর উম্মত হিসেবে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। একজন পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলামী সংগীতের পাশাপাশি হিন্দুদের জন্য শ্যামা সংগীতও রচনা করেছেন।

নজরুল ইসলাম উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সেনানায়ক। নজরুল ইসলামের সাহিত্য চেতনা-দর্শন অনুসরণের মাধ্যমে যুবসমাজ হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। নজরুল ইসলাম মূলতঃ বাঙালী মুসলমানের জাতীয় কবি। তাঁকে আমরা মানুষের কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি যাই বলি বাঙালী মুসলমানরা তাঁর কাছে যত ঋণি এমনটি আর কোন লেখক, কবি বা সাহিত্যিকের কাছে নন। নজরুল ইসলাম আমাদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, জেল খেটেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের কথা বলেছেন। নজরুল ইসলাম ধনী, দরিদ্র, কুলি, মজুর, অধঃপতিত, নির্যাতিত সকল মানুষের কথা বলেছেন। তাই নজরুল ইসলাম আমাদের সকলের জাতীয় কবি।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মণিমুক্তা। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস। আমাদের জাতীয় দিক নির্দেশনার অগ্র সেনানী। বহুমুখী কালজয়ী প্রতিভা ও সংগ্রামী জীবনের অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা কবি, বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, নাট্যকার, গীতিকার ও সুরকার নজরুল ইসলামের সৃষ্টিধর্মী মৌলিক প্রতিভার অবদানে সাহিত্যের সব শাখা এবং আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়েছে। নবজাগরণের তূর্যবাদক নজরুল ইসলাম ঔপনিবেশবাদ, পরাধীনতা শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন, কুসংস্কার ও গোড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই আমাদের জাতীয় জাগরণে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল সাহিত্য অকুতোভয় প্রেরণা জাগায়।

---

১৮৭. আবুল মনসুর আহমদ, সাহিত্য ও যুগ ধর্ম,(কলকাতাঃ সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৩/ ১৯২৬); উদ্ধৃত মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
আহমাদ শাওকীর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা

পৃথিবীর অনেক জাতির নিকট বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যের প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ধর্ম। আসমানী কিতাব তথা ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে সর্বদাই কবি-সাহিত্যিকগণ উৎসরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এ থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তাঁরা সেগুলোকে বিভিন্ন চিত্র, কল্পনা ও চিন্তা-চেতনায় ধর্মীয় ভাবধারা নিজেদের কাব্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিঃসন্দেহে সাহিত্যের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হচ্ছে অধিক সুদৃঢ়। কারণ ইসলাম পূর্বেকার ধর্মের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ আসমানী ধর্ম এবং ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহকে রহিত করে দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য যাবতীয় ধর্মের পরিসমাপ্তিকারী হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেন এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মাধ্যমে রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটান। এদিক দিয়ে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভান্ডারসমৃদ্ধ চিরস্থায়ী মু'জিযা আল-কুরআনের উপর নির্ভরশীল। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমষ্টিগত রিসালাতের অলংকারপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় বংশের উপর সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। সুতরাং মহান আল্লাহর পবিত্র কালাম 'আল-কুরআন' اَلْقُـــرْآن ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ নিঃসৃত বাণী 'আল-হাদীস' اَلْحَـــدِيْث হচ্ছে সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস। আর এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রভাগে রয়েছে সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ও সাহিত্যের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। কালক্রমে এই সম্পর্কের দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা ইসলাম ও সাহিত্যের মধ্যস্থিত আন্তঃসম্পর্কের একটি চিত্র বিশেষতঃ এক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাবের মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি। এ পর্যায়ে আমরা আরব কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর ইসলামী চিন্তাধারার কবিতাবলী বিশদ বিশ্লেষণসহ বঙ্গানুবাদ করেছি। আহমাদ শাওকী আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক ধর্মীয় বিষয়বস্তুসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ইসলামী কবিতার মধ্যে অধ্যয়নযোগ্য বিভিন্ন বিশেষ দিক রয়েছে।

যদিও আহমাদ শাওকী ধর্মের অবশ্যকরণীয় বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করতেন না, গোপনে ও প্রকাশ্যে তিনি ছিলেন মদ্যপানে অভ্যস্ত। বিনা কারণে হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে তিনি অলসতা করতেন, তথাপি তিনি ছিলেন স্বীয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দৃঢ় 'আকীদা সম্পন্ন একজন মুমিন মুসলমান। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ।[১] ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কন্ঠ ও সোচ্চার। তাঁর কাব্য গ্রন্থ দীওয়ান 'আল-শাওকিয়্যাত' اَلشَّـــوْقِيَات পাঠ করলেই এহেন ধ্রুব সত্য প্রতীয়মান হয়। তাঁর সাহিত্যের অর্ধাংশ জুড়ে ইসলামী চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। ধর্ম ছিল তাঁর মনের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যা ছাড়া তাঁর মনে শান্তি ছিল না। তাই তাঁর রচনায় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসাহ-প্রেরণাশূন্য কাসীদার সংখ্যা অতিনগণ্য। কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশী ইসলামের জয়গান করেছেন,

---

১. মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন, আ'লাম আল-নাসর ওয়া আল-শি'র ফী আল-আসর আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ২৪৯; ইন্'আম আল-জুন্দী, আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৪৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি মহান আল্লাহ, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, খলীফা ও পবিত্র স্থানসমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন।[২]

কবি 'আমীর আল-শু'আরা' أَمِيْرُ الشُّعَرَاءِ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার খুশীর চেয়ে নিজেকে শা'ইর আল-ইসলাম' شَاعِرُ الإِسْلَامِ উপাধিতে ভূষিত করাকে প্রাধান্য দিতেন ও অধিক আনন্দিত হতেন।[৩] যাহোক, "পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণেই আহমাদ শাওকী ধর্মীয় কবিতা রচনা শুরু করেন।"[৪] এতদসম্পর্কে ভারতের হায়দ্রাবাদের ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ইসমাত মাহ্দীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:[৫]

"Shawqi was also proud to his Islamic heritage and composed many poems on Islam." (শাওকী তাঁর ইসলামী ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের জন্যও গৌরববোধ করতেন, আর তিনি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেন।)

প্রকৃতপক্ষে আহমাদ শাওকী তাঁর অগ্রজদের অনুকরণ ও তাঁদের থেকে গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কবি মুহাম্মদ বিন সা'ঈদ আল-বু'সিরী (৬০৮-৬৯৬ হি./১২১২-১২৯৬ খ্রি.) এর ন্যায় পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা উপস্থাপিত ইসলামী চিন্তাধারা তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ ও 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়া' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদাদ্বয়ে অনুসরণ করেন। আহমাদ শাওকী তাঁর ধর্মীয় কাসীদাসমূহে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশস্তিতে ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের স্তুতিগাঁথায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যদিও কবি ধর্মপরায়ণ ছিলেন না, বরং ধর্মপরায়ণের দৃশ্যে নিজের প্রকাশকে ভালবাসতেন। যেমন- খেদীব দ্বিতীয় আব্বাসের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনের সময় কাফেলা থেকে পলায়নে এমনটি ঘটেছে। অতঃপর তিনি অনুশোচনা ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় পরিপূর্ণ 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ নামক কাসীদাটি রচনার দ্বারা এহেন পলায়নের কাফ্ফারা আদায় করেন। আর খেদীবীর কাছে গমন করে অপারগতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এসব কিছুর কারণ হচ্ছে ধর্মীয় ধারা হতে আহমাদ শাওকীর দূরে থেকে মদ্যপানের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি। আহমাদ শাওকীর ভেতর ও বাহিরের এহেন সুস্পষ্ট বিরোধিতার কারণ হচ্ছে সম্পদ, প্রাচুর্য এবং বিত্তশালী ভোগবিলাসী তাঁর চতুর্পার্শ্বস্থ পরিমন্ডল। এ কারণে আহমাদ শাওকী নিজের জন্য দু'টি ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করেছেন। একটি হচ্ছে মিসরের মৌলিক সমাজের অনুগত ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব, যেখানে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে নির্বাসিত দেশে গমনের পূর্বে লালিত-পালিত হন। আরেকটি চরিত্র হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে ছাত্রের ব্যক্তিত্ব, যেখানে তিনি ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় ফরজ কাজসমূহ থেকে শিথিল হয়ে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হন।[৬]

সমালোচকগণ আহমাদ শাওকীর এই দ্বৈত চরিত্রের রহস্য উন্মোচন করেছেন। এ সম্পর্কে প্রথমতঃ প্রখ্যাত আরবী সাহিত্য সমালোচক ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৩০৫-১৩৭৬ হি./১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.) আল-শাওকিয়্যাতের ১ম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন যে, "শাওকী দ্বৈত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তিনি মুসলমানদের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ততা, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্তৃক তাদের প্রতি নিরেট ক্রুসেডীয়

---

২. হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৮৮-৯৮৯।

৩. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১২।

৪. আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৭৯।

৫. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature 1900-1967, P. 56.

৬. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৪৫-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে তাকানোর মোকাবেলায় মুসলমানদের ঐক্য ও অস্তিত্বের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও শাওকী জীবনকে ভালবাসতেন এবং জীবন সংশ্লিষ্ট ভোগ-বিলাসে লালায়িত ছিলেন।"[৭]

প্রসঙ্গক্রমে মাহির হাসান ফাহমী বলেছেন, "এই যে লোকটি, যিনি আধুনিক সভ্যতাকে ভালবাসেন, কিন্তু তিনি একজন মুসলিম এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে ভালবাসেন, তিনি আর কি-ই বা করতে পারেন।"[৮]

আলী নাজ্‌দী নাসিফ এ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন যে, "শাওকী অন্যান্যের ন্যায় আনন্দ-উপভোগের উপকরণাদির সম্মুখীন হন, যেমন তিনি অনুশোচনা করা ও আধ্যাত্মিকতার কারণসমূহের অনুগামী হন; তাই তিনি এটার দ্বারা এবং ওটার দ্বারা প্রভাবিত হন। অনেক কবি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিই এই দু'টির প্রতি সাড়া প্রদান করেছেন।"[৯]

অবশ্যই আহমাদ শাওকী নিজের মনের অভ্যন্তরে এমন কতগুলো প্রেরণা লাভ করেন, যা তাঁকে স্বীয় কবিতায় ইসলামের গৌরব ও মহিমা বর্ণনা এবং এর মূল্যবোধসমূহের পবিত্র বর্ণনায় অনুপ্রাণিত করেছে। আহমাদ শাওকীর উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় কবিতার মধ্যে কবি কর্তৃক ১৩৬২ হি./ ১৮৯৪ সালে রচিত 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ শীর্ষক কাসীদাটি ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনার একটি বাস্তব কথাচিত্র। অনুরূপভাবে ১৩১৭ হি./১৯১০ সালে রচিত 'ইলা আরাফাত' إِلَى عَرَفَاتٍ ও 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ ১৩২৮ হি./১৯১১ সালে রচিত 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ ১৩৩১ হি./১৯১৪ সালে রচিত 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَةِ, ১৩৩৪ হি./ ১৯১৭ সালে রচিত নবী প্রশস্তিমূলক 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ এবং স্পেনে নির্বাসিত জীবন-যাপন কালীন রচিত আরব রাষ্ট্র, মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের প্রশংসাসূচক 'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' دُوَلُ الْعَرَبِ وَعُظَمَاءُ الإِسْلَامِ প্রভৃতি কাসীদাসমূহ তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১০] বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আহমাদ শাওকীর ইসলামী চিন্তাধারাসম্পন্ন কবিতাবলী সম্পর্কিত এ অধ্যায়টিকে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

---

৭. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

৮. মাহির হাসান ফাহ্‌মী, শাওকী শি'রুহু আল-ইসলামী, (কায়রো, ১৯৫৯), পৃ. ৯২।

৯. আলী নাজ্‌দী নাসিফ, আল-দ্বীন ওয়া আল-আখলাক ফী শি'র শাওকী, (কায়রো, ১৯৬৪), পৃ. ১৪।

১০. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ৩৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯), পৃ.৭৫: ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৮-৯: হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৮৭-৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও 'আকীদা

আহমাদ শাওকী মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব ও প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে বিষয়টি সম্পর্কে সংশয়বাদী সেই একত্ববাদ তথা তাওহীদ تَوْحِيْــدٌ সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাতের একমাত্র হকদার বলে মুখে স্বীকার এবং মনে-প্রাণে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর নিদর্শনাবলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন। মানুষকে যারা ইবাদাত থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে মিনতি করেছেন এবং অবনতমস্তকে তাঁর সকল ফয়সালা মেনে নিয়েছেন। এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যে, তাঁর দরবার থেকে পালানোর আর কোন পথ নেই। স্বীয় পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছেন।[১১]

আর তাঁকে বিপথগামিতা ও পদস্খলন থেকে নিষ্কলুস ঈমান সহকারে মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রশান্তিদাতা আল-কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এর প্রতি সংযুক্ত থাকা এবং সত্যের উপর মানুষকে সমাবেশকারী মসজিদ ও জড় বস্তুর লোভ-লালসা সংবরণের দ্বারা রাতের আধার ও দিবালোকে দেশ-জাতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত করেছেন। যেমন- কবি বলেন:[১২]

وَالْمُومِنُ الْمَعْصُوْمُ فِي أَخْلاَقِهِ * مِن كُلِّ شَـائِنَةٍ، وَ فِـيْ آدَابِهِ
أَبَدًا يَرَاهُ اللّهُ فِيْ غَلَـسِ الدُّجَى * مِنْ صَحْنِ مَسْجِدِهِ، وَحَوْلَ كِتَابِهِ

"স্বীয় চরিত্রে ও আচরণাদিতে সকল কলঙ্ক থেকে নিষ্পাপ মুমিন এমন যে, আল্লাহ সর্বদাই তাঁকে রাত্রির অন্ধকারে মসজিদের আঙিনা ও তাঁর কিতাবের পার্শ্ব থেকে পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।"

আহমাদ শাওকী স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বে সর্বদাই আশ্চর্যবোধ করেন, যিনি প্রতিটি অনাথের প্রতি এগিয়ে যাওয়া এবং বিধবা, দুর্বল ও অভাবীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, সৎকর্ম অন্বেষণকারীদের প্রতি অধিকার পরিপূর্ণ করা, যুবকদের প্রতিশ্রুতি এবং যোগ্য ও ধনী ব্যক্তিদের প্রতি কল্যাণ কাজ প্রসারিত করার জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমানকে একমাত্র পন্থা হিসেবে পরিগণিত করেছেন। মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব সচেতনতার প্রতি ইশারা করে কবি বলেন:[১৩]

وَيَرَى الْيَتَامَـى لاَئِـذِيْنَ بِظِلِّـهِ * وَيَرَى الأَرَامِلَ يَعْتَصِمْنَ بِبَابِه
وَ يَرَاهُ قَـدْ أَدَّى الْحُقُوْقَ جَمِيْعَهَا * لَمْ يَنْسَ مِنْهَا غَيْـرَ حَقِّ شَبَابِهِ

---

১১. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৩৪।

১২. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

১৩. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি ইয়াতীমদেরকে তাঁর (মুমিনের) ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী হিসেবে দেখেন এবং বিধবাদেরকে তাঁর দ্বারে আঁকড়িয়ে ধরতে দেখেন। আর তিনি তাঁকে (মুমিনকে) দেখেন যে, সে তাঁর সকল অধিকার পালন করে, স্বীয় যৌবনের অধিকার ব্যতীত সেগুলোর কোনটিই সে বিস্মৃত হয় না।"

আহমাদ শাওকীর ইসলামী কবিতাবলী বিচ্ছিন্ন মানবতাকে একত্রিতকারী এবং অন্তরসমূহকে সংযোগকারী ধর্মীয় প্রেরণা ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাঁর মতে, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মম্ভরিতা হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে ঈমান। সুতরাং একজন মুমিন ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচুর মধ্যে কোন পার্থক্য মনে করে না। বরং সে সকল মানুষকে সমান মনে করে। কবির ভাষায়:[১৪]

أَلَمْ تَرَ لِلْهَوَاءِ جَرَى فَأَفْضَــــى * إِلَى الأَكْوَاخِ، وَاخْتَــرَقَ الْقِبَابَا

وَأَنَّ الشَّمْسَ فِي الآفَاقِ تَغْشَى * حِمَى كِسْرَى كَمَا تَغْشَى الْيَبَابَا ؟

وَأَنَّ الْمَاءَ تَرْوِي الأُسْــــدُ مِنْهُ * وَيَشْفِــي مِنْ تَلَعُّلِعِهَا الْكِلَابَا ؟

"তুমি কি প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করছ না যে, উহা দাপটে চলছে অনন্তর উহা কুড়েঘরসমূহে পৌছেছে এবং সৌধের চূড়াসমূহকে ফাটিয়ে দিয়েছে। আর সূর্য দিগন্তসমূহে কিস্‌রা (পারস্যসম্রাট) এর চারণভূমিকে আবৃত করেছে যেমন দরিদ্রের গৃহকে আচ্ছন্ন করে? আর (তুমি কি লক্ষ্য করেছ!) পানির দ্বারা সিংহ পরিতৃপ্ত হচ্ছে এবং কুকুরও উহা পান করে তৃষ্ণা মিটাচ্ছে?"

আল্লাহ চির বিরাজমান

কবি আহমাদ শাওকী এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তিনি সদা বিরাজমান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। যখন কিছুই ছিল না তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। আবার যখন কিছুই থাকবে না তখন একমাত্র তিনিই বিরাজমান থাকবেন। এ বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব ও কোন মুফ্‌তির ফতোয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আরো বলেন যে, নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রয়েছে সে আল্লাহ পাকের বিশাল সৃষ্টিজগত নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন খুঁজে পাব। যেমন-কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী ইউরোপ থেকে ইস্তাম্বুল আগমনকালে প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে বলেন:[১৫]

تِلْكَ الطَّبِيْعَةُ ؛ قِفْ بِنَا يَا سَارِي * حَتَّى أُرِيَكَ بَدِيْعَ صُنْعِ الْبَارِي

اَلأَرْضُ حَوْلَكَ وَالسَّمَاءُ اهْتَزَّتَا * لِرَوَائِـــــعِ الآيَاتِ وَالآثَارِ

مِنْ كُلِّ نَاطِقَةِ الْجَلَالِ كَـأَنَّهَا * أُمُّ الْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ الْقَارِي

دَلَّتْ عَلَــى مَلِكِ الْمُلُوْكِ فَلَمْ * تَدَعْ لأَدِلَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالأَحْبَارِ

مَنْ شَكَّ فِـيْهِ فَنَظْرَةٌ فِيْ صُنْعِهِ * تَمْحُـوْ أَثِيْمَ الشَّكِّ وَالإِنْكَارِ

"ঐ মনোরম প্রকৃতি, (কতই সুন্দর!) হে মাস্তুলের সারেং! তুমি আমাদেরকে নিয়ে একটু থাম, যাতে আমি তোমাকে স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টিশৈলী দেখাতে পারি। তোমার চতুস্পার্শ্বে মনোরম দৃশ্যাবলী ও নিদর্শনাদির কারণে পৃথিবী এবং আকাশ আন্দোলিত ও প্রকম্পিত হচ্ছে। এর প্রত্যেকটি আল্লাহপাকের মহিমা এমনভাবে ব্যক্ত করছে যেন তা আবৃত্তিকারীর কণ্ঠে আল-কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি। এগুলো

১৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

১৫. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ্দের বাদশাহ্ মহান আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দেশ করছে, ফলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পণ্ডিত ও আইনবিদদের প্রমাণের কোন প্রয়োজন থাকছেনা। কেউ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে তার সংশয় ও অস্বীকৃতি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যের প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

কবি নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত। এর রূপ বৈচিত্র্যে তিনি চির বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণপঞ্জি অনুভব করেছেন। স্রষ্টার অস্তিত্ব সংক্রান্ত এ সকল অকাট্য দলীল প্রমাণাদি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণপঞ্জিকেও হার মানায়। মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যে এক পলককেই আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে আহমাদ শাওকী মনে করেন। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে সংশয় বা অস্বীকৃতিকে তিনি প্রকৃতি বিরুদ্ধ অপরাধ বলে চিহ্নিত করেন। তিনি মনে-প্রাণে এই বিশ্বাস স্থাপন করেন যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন সত্তা, তাঁর কোন মৃত্যু নেই। এ বিষয়ে 'রিসালাতু আল-নাশিআত' رِسَالَةُ النَّاشِـــــــــئَةِ শীর্ষক কবিতায় নিম্নোক্ত চরণে সর্বশক্তিমান আল্লাহর চিরন্তনতা ঘোষণা করে কবি বলেন:[১৬]

كُلُّ حَيٍّ مَا خَلاَ اللهِ يَمُوْتُ * فَاتْرُكِ الْكِبْرَ لَهُ وَالْجَبَرُوْتَ

"এক আল্লাহ ব্যতীত সকল জীবিত প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে, সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য অহংকার ও শক্তিকে ছেড়ে দাও।"

আল্লাহর একত্ববাদ

আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরিত হওয়ার পূর্বে লোকেরা স্রষ্টার স্বরূপ অনুসন্ধানে গলদঘর্ম হতো। কখনো তারা শক্তিধরকেই প্রভু হিসেবে গণ্য করতো এই ভেবে যে, এর শক্তি স্রষ্টার শক্তির প্রতিচ্ছবি। কখনো তারা সৌন্দর্যকে পূজা করতো এই ভেবে যে, এর সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যেরই প্রতিবিম্ব। কখনো তারা তারকারাজিকে প্রভু জ্ঞান করতো এই ভেবে যে, এর আলোকরশ্মি ও উর্ধ্বলোকে অবস্থান আল্লাহ তা'আলার নূর এবং উর্ধ্বলৌকিকতার নিদর্শন। আর কখনো তারা দেব-দেবী, কাল্পনিক মূর্তি, প্রতিমা ও প্রতিচ্ছবিকে পূজা করতো। এ ছাড়াও তারা কল্যাণ, সৌন্দর্য ও জীবনীশক্তির প্রতীক বৃক্ষরাজি এবং বিশালতা ও বৃহত্তরের প্রতীক পর্বতমালাকে স্রষ্টার দান হিসেবে পূজা করত। অনুরূপভাবে তারা রাজা-বাদশাহ, সমুদ্র, বায়ু, হিংস্র প্রাণী, মাতা-পিতা প্রভৃতিকে এই বিশ্বাসে উপাসনা করত যে, তারা তাকে প্রকৃত প্রভুর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করবে।

এমনিভাবে যুগে যুগে মানুষ তাওহীদের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিপথগামী হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের অসংখ্য সৃষ্টির দাসে পরিণত করেছে। সমাজের এই ভ্রান্ত মতবাদ ও অসংখ্য প্রভুর গোলামী থেকে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। কবি

---

১৬. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী তাঁর 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِيْ وَادِي النِّيْلِ শীর্ষক কবিতায় এ বিষয়টি আলোকপাত করে বলেন:[১৭]

رَبِّ، شُقِّتَ الْعِبَادَ أَزْمَانَ لاَ كُتْـ * ـبَ بِهَا يُهْتَدَى، وَلاَ أَنْبِيَاءُ ؟

ذَهَبُوا فِي الْهَوَى مَذَاهِبَ شَتَّى * جَمَعَتْهَا الْحَقِيقَةُ الزَّهْرَاءُ

فَإِذَا لَقَّبُوْا قَوِيًّا إِلَهًا * فَلَهُ بِالْقُوَى إِلَيْكَ انْتِهَاءُ

وَإِذَا آثَرُوْا جَمِيْلاً بِتَنْزِيْـ * ـهٍ ؛ فَإِنَّ الْجَمَالَ مِنْكَ حِبَاءُ

"হে প্রতিপালক! আপনার বান্দাগণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এ সময়ে তারা ধর্মগ্রন্থ ও নবীগণের দ্বারা সৎপথ লাভ করেনি? তারা কল্পনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ধর্মমতে চলেছে, সেগুলোকে উজ্জ্বল বাস্তবতা তথা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তাদের মনে একত্রিত করেছিল। অনন্তর (হে প্রতিপালক!) যখন তারা কোন শক্তিকে উপাস্য হিসেবে ঘোষিত করত, তখন তার শক্তির সীমা আপনার নিকট পর্যন্ত সমাপ্ত হত। আর যখন তারা মর্যাদার কারণে কোন সৌন্দর্যকে পছন্দ করত, তখন সেটিও আপনার প্রদত্ত ছিল।"

আল্লাহর কুদরত

১৩১৮ হি./১৯০১ সালে আহমাদ শাওকী প্যারিসে অবস্থানকালে সেখানে একটি অভিনব প্রদর্শনীতে ফুল ও ফলের বিভাগ পরিদর্শন করেন। তথায় তিনি পুষ্পরাজির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, রোপণকারীদের নিপুণতা এবং সেগুলোর চমৎকার বিন্যাসে মুগ্ধ হন। প্রদর্শকগণ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা পরস্পর এ মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলো। কিন্তু কবি এ মনোরম দৃশ্যকে ভিন্ন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলেন। তিনি ফুল ও ফলের সমারোহের মাঝে মহান আল্লাহর অপার মহিমার নিদর্শন অবলোকন করলেন; যেমন খোদাভীরু বান্দাগণ এ দৃশ্যে স্রষ্টার মহিমার নিদর্শন খুঁজে পায়। অথচ তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রত্যাখ্যানকারী নাস্তিক লোকেরা সৃষ্টিজীবকে এ সব কিছুর নিয়ন্তা মনে করে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:[১৮]

رَزَقَ اللهُ أَهْلَ بَارِيْسَ خَيْرًا * وَأَرَى الْعَقْلَ خَيْرَ مَا رُزِقُوْهُ

عِنْدَهُمْ لِلثِّمَارِ وَالزَّهْرِ مِمَّا * تُنْجِبُ الأَرْضُ مَعْرَضٌ نَسَقُوْهُ

جَنَّةٌ تَخْلِبُ الْعُقُوْلَ ، وَرَوْضٌ * تَجْمَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ مَا فَرَّقُوْهُ

يَجِدُ الْمُتَّقِيُّ يَدَ اللهِ فِيْهِ * وَيَقُوْلُ الْجَحُوْدُ : قَدْ خَلَقُوْهُ

"আল্লাহ তা'আলা প্যারিসবাসীদের কল্যাণের জীবিকা দান করেছেন, আর আমি মনে করি বুদ্ধিমত্তাই হচ্ছে তাদের প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা। তাদের নিকট রয়েছে ভূমি উৎপাদিত ফল ও ফুলের মনোরম প্রদর্শনী, যাকে তারা সুবিন্যস্ত করেছে। তাদের রয়েছে ফলের বাগান, যা মানুষের মনকে হরণ করে নেয় এবং সারি সারি পুষ্প উদ্যান; যা দেখে মানুষের চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। এ পুষ্প প্রদর্শনীতে একজন খোদাভীরু ব্যক্তি মহান আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পায়, পক্ষান্তরে একজন নাস্তিক এতে বলে: তারা নিজেরা এটি সৃষ্টি করেছে।"

---

১৭. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬।

১৮. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এই সুন্দর পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, বৃক্ষলতা, যা কিছু আছে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, প্রভু ও পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। দিবা-রাত্রির আবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, কোন কিছুতেই কোন প্রকার অনিয়ম নেই। সবকিছুই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ বিশাল সৃষ্টিজগতের একজন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী আছেন। আর এ নিখিল বিশ্বের সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন। তিনিই মহান আল্লাহ। যিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড পরিচালনা করেন। তাঁর নির্দেশেই সবকিছু জন্মলাভ করে ও মৃত্যুবরণ করে। তাঁর অসীম ক্ষমতা ও কুদরতে কারো বিন্দুমাত্র দখল নেই।

প্রকৃতির স্রষ্টার বন্দনায় 'রিসালাতু আল-নাশিআত' رِسَالَةُ النَّاشِـئَةِ কবিতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের অপরিসীম নিদর্শনাবলী উল্লেখ করে কবি বলেন:১৯

أَحْمَدُ اللهَ وَأُطْــــرِي الأَنْبِيَاءَ * مَصْدَرَ الْحِكْمَةِ طُــرّاً وَالضِّيَاءِ

وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى نُعْمَى الْوُجُوْدِ * وَعَلَى مَا نِلْتُ مِنْ فَضْلٍ وَجُوْدِ

اُعْبُدِ اللهَ بِعَـــقْـــلٍ يَا بُـنَيَّ * وَبِقَلْبٍ مِـــنْ رَجَـاءِ اللهِ حَيّ

اُنْظُرِ الْمُلْكَ، وَأَكْبِــرْ مَا خَلَقَ * وَتَـمَتَّـــعْ فِيْهِ مِنْ خَيْرِ رِزْقٍ

أَنْتَ فِيْ الْكَوْنِ مَحَلُّ التَّكْرِمَةِ * كُلُّ شَيْئٍ لَكَ عَــبْدٌ أَوْ أَمَــةٌ

سُخِّرَ الْعَالَـــمُ مِـــنْ أَرْضٍ وَمَاءٍ * لَكَ وَالرِّيْحُ، وَمَا تَحْتَ السَّمَاءِ

"আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি এবং নবীগণের পর্যাপ্ত প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি, যারা সামগ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আলোর উৎস। আর অস্তিত্বকুলের অনুগ্রহরাজির জন্য এবং আমার অস্তিত্ব প্রাপ্তির করুণার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। হে প্রিয় বৎস! তুমি বুদ্ধিমত্তা সহকারে এবং চিরঞ্জীব আল্লাহর করুণা লাভের আশাভরা মন নিয়ে তাঁর ইবাদত কর। বিশ্বসাম্রাজ্যের দিকে তাকাও! আর আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তার মহিমা বর্ণনা কর এবং এতে জীবিকা হিসেবে প্রদত্ত উত্তম বস্তু উপভোগ কর। তুমি সৃষ্টিকুলে সম্মানিত মর্যাদায় সমাসীন, আর এর প্রতিটি বস্তু তোমার সেবার জন্য দাস অথবা দাসী হিসেবে রয়েছে। তোমার জন্য বিশ্বের মাটি, পানি, বায়ু এবং আকাশের নীচে যা রয়েছে সবই অনুগত করা হয়েছে।"

আল্লাহর ইবাদাত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার সাধনের জন্য। মানুষকে এমন কিছু গুণাবলী দেওয়া হয়েছে যদ্বারা সে অন্য সব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের উপকারে ব্যবহার করতে সক্ষম। সুতরাং সৃষ্টি স্রষ্টার উপাসনা করবে এটাই স্বাভাবিক। কবি আহমাদ শাওকী ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদাত-বন্দেগীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কারে ইবাদাতের যে বিরাট প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে ছিলেন সংশয়হীন। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা মানুষের ইবাদাত পাওয়ার কোনক্রমেই যোগ্য নয়। তাই তিনি স্বীয় কবিতায় নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুনাজাত, দু'আ, ইস্তেগফার প্রভৃতি বিষয়ে দর্শনপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। কবি তাঁর বিভিন্ন রচনায় নামায পড়ে ও রোযা রাখে অথচ যাকাত আদায় করে না এমন

---

১৯. আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বক-ধার্মিকদেরকে বিদ্রূপ করেছেন এবং এই বলে ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে, আল্লাহ পাক ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার গচ্ছিত রেখেছেন। তিনি আরো অভিমত পেশ করেছেন যে, ধন-সম্পদ মালিকের হাতে ঋণস্বরূপ; সুতরাং তাদের এবং দরিদ্র-পীড়িতদের মাঝে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। কেননা মহান আল্লাহ রিযকদাতা। তিনি এমন বণ্টনকারী নন যে, ধনীদের জন্য সম্পদের পাহাড় দিয়েছেন, আর দরিদ্রদের সম্পর্কে অসচেতন। কবি এসব বিষয়ে সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। তিনি তাঁর দর্শনপূর্ণ বক্তব্যে বলেছেন যে, খোদাপ্রদত্ত বায়ুপ্রবাহ বস্তি-প্রাসাদ নির্বিশেষে সর্বত্রই সমান। সূর্য উর্বর-অনুর্বর, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি তার আলোকরশ্মি অকৃপণভাবে বিকিরণ করে। পানি ব্যাঘ্র-কুকুর নির্বিশেষে সকল জীব-জানোয়ার, বৃক্ষরাজি, লতা-পাতা সকলকে পরিতৃপ্ত করে। আর মৃত্যু সৃষ্টিকুলের জন্য অবধারিত। মৃত্যু থেকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কারোরই পালাবার কোন পথ নেই। লোকেরা মৃত্যুর পরে সকলেই একই সমান্তরাল মাটিতে শয্যাশায়ী হবে। ধনবান কৃপণগণ ভাবে যে, মৃত্যু আসলে তারা স্ব স্ব সম্পদ অন্যদের জন্য রেখে যাবে; অথচ উত্তম পন্থাতো এটাই যে, তারা স্বীয় সম্পদ সৎকর্মে ব্যয় করবে যা মহান আল্লাহর দরবারে তাদের উপকারে আসবে। এ সম্পর্কে 'যিক্রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَّةُ কবিতায় কবি বলেন:[২০]

عَجِبْتُ لِمَعْشَرٍ صَلُّوْا وَصَامُوْا * عَوَاهِرَ، خَشْيَةً وَتُقَى كِـــذَابًا
وَتُلْقِيْهِمْ حِيَالَ الْمَالِ صُـــمًّا * إِذَا دَاعِي الزَّكَاةِ بِهِـــمْ أَهَابَا
لَقَدْ كَتَمُوْا نَصِيْبَ اللهِ مِنْـــهُ * كَأَنَّ اللهَ لَمْ يُحْصِ النِّصَـــابَا
وَمَنْ يَعْدِلْ بِحُبِّ اللهِ شَيْـــئًا * كَحُبِّ الْمَالِ، ضَلَّ هَوًى وَخَابَا
أَرَادَ اللهُ بِالْـــفُقَـــــرَاءِ بِرًّا * وَبِالأَيْتَـــامِ حُـــبًّا وَارْتِـــبَابَا

"আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করছি এমন একটি সম্প্রদায়ের জন্য যারা ব্যভিচারী হিসেবে এবং মিথ্যা ভয়-ভীতিবশতঃ নামায পড়ে ও রোযা রাখে। আর যখন তাদের নিকট যাকাত প্রদানের জন্য আহ্বানকারী আহ্বান জানায়, তখন তুমি তাদেরকে সম্পদের সম্মুখে বধির হিসেবে দেখতে পাবে। তারা আহ্বানকারী থেকে আল্লাহ তা'আলার অংশকে লুকিয়ে রাখে যেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। আর যে ব্যক্তি সম্পদের ভালবাসার ন্যায় মহান আল্লাহর ভালবাসা থেকে কোন কিছুকে পরিবর্তন করবে, সে আকাঙ্খার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট ও নিরাশ হবে কেননা আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রদের উপকার, অনাথের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন ও লালন-পালনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'বা'দাল মান্‌ফা' بَعْـــدَ الْمَنْفَـــى শীর্ষক কাসীদায় যাকাত প্রদানে কার্পণ্যকারী কতিপয় কপট মুসলমানের এহেন মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন যে, তারা যাকাতকে ধর্মের স্তম্ভই মনে করে না। তিনি যাকাতের মত সৎকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন যে, নবী-রাসূলগণ তো সৎকর্ম সম্পাদনের দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন নইলে তাঁদের নবুওয়্যাত ও রিসালাতের কি-ই বা প্রয়োজন ছিল। কবির ভাষায়:[২১]

أَكُلُّ فِيْ كِـــتَـــــابِ اللهِ إِلاَّ * زَكَاةَ الْمَالِ لَيْـــسَــتْ فِيْـــهِ بَابَا ؟

---

২০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

২১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

إِذَا مَا الطَّامِعُوْنَ شَكَوْا وَضَجُّوْا * فَدَعْهُمْ، وَاسْمَعِ الْغَرْثَى السَّغَابَا
وَلَوْ لاَ لِلْبِرِّ لَمْ يُبْعَثْ رَسُوْلٌ * وَلَمْ يَحْمِلْ إِلَى قَوْمٍ كِتَابَا

"মহান আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনে সম্পদের যাকাত সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য ব্যতীত আর কোন অধ্যায় কি নেই? যখন অর্থলিপ্সু কৃপণগণ অভিযোগ ও কলরব করে, তখন তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তদের কথা শ্রবণ কর আর যদি পরোপকারিতার প্রয়োজন না থাকত, তাহলে কোন রাসূল প্রেরিত হতেন না এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসতেন না।"

যাকাত আল্লাহ পাকের ফরজ ইবাদাত। আল্লাহ তা'আলা যাকাতকে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি এবং বুনিয়াদরূপে নির্ধারণ করেছেন। তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নামাযের সাথে যাকাতকে উল্লেখ করেছেন। যাকাত প্রদান করলে যাকাত দানকারীর অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। আর কৃপণতা অন্তর থেকে দূর করতে না পারলে মহান আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দীন-হীন, দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্য করে অন্তরে লালিত কৃপণতা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে কবি আহমাদ শাওকী ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, অকৃপণ, যাকাত দানকারী ও প্রশস্ত হাতের অধিকারী। যেমন-'ইলা আরাফাত' إِلَى عَرَفَات কবিতায় তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করে বলেছেন:[২২]

وَإِنِّي – لاَ أَمُنُّ عَلَيْكَ بِطَاعَةٍ – * أُجِلُّ، وَأُغْلِي فِي الْفُرُوْضِ زَكَاتِي
أُبَلِّغُ فِيْهَا وَهِيَ عَدْلٌ وَرَحْمَةٌ * وَيَتْرُكُهَا النُّسَّاكُ فِي الْخَلَوَاتِ
وَأَنْتَ وَلِيُّ الْعَفْوِ، فَامْحُ بِنَاصِعٍ * مِنَ الصَّفْحِ مَا سَوَّدْتُ مِنْ صَفَحَاتِي

"নিশ্চয়ই আমি আমার যাকাত প্রদানকে পাঁচটি ফরজ কাজের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ বলে মনে করি, এতে আমি আপনার নিকট পূণ্যের আত্মপ্রশস্তি করছি না। এক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিই, কারণ এটি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও অনুকম্পার বিষয়; আর নির্জনে উপাসনারত কপট ব্যক্তি যাকাত বর্জন করে। (হে আল্লাহ!) আপনি ক্ষমার অধিকারী, তাই আপনি আমার কৃত যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি পরম দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দিন।"

ধর্মের সাথে গভীর অনুরাগের কারণে আহমাদ শাওকীর ভোগ-বিলাসের প্রতি অনীহা বিষয়ক বলিষ্ঠ কাসীদা দুনিয়ার যাবতীয় কলংক থেকে পরিত্রাণ এবং ধ্বংসাত্মক রিপুর তাড়নাসমূহ বর্জন সম্পর্কিত কবিতাবলী আমাদেরকে অভিভূত করে দেয়। তাই আমরা যেন নিজেদেরকে একজন সাধকের সামনে উপস্থিত দেখতে পাই যিনি মানবাত্মাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতের প্রতি আকর্ষিত ও গৌরবান্বিত করেন এবং প্রতিটি বৈষয়িক প্রতাড়নাকারী বস্তুর প্রতি তিরস্কার করছেন। কবির ভাষায়:[২৩]

فَمَنْ يَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا فَإِنِّي * لَبِسْتُ بِهَا فَأَبْلَيْتُ الثِّيَابَا
وَلَمْ أَرَ مِثْلَ جَمْعِ الْمَالِ دَاءً * وَلاَ مِثْلَ الْبَخِيْلِ بِهِ مُصَابَا
فَلاَ تَقْتُلْكَ شَهْوَتُهُ وَزِنْهَا * كَمَا تَزِنُ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَا

---

২২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

২৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

"সুতরাং যে দুনিয়ার দ্বারা প্রতারিত হয়, অনন্তর নিশ্চয়ই আমি উহার পোশাক পরিধান করেছি, অতঃপর যৌবনকে ক্ষয় করেছি। আর আমি অর্থ জমায়েত করার ন্যায় কোন ব্যধি দেখছি না, আর না দেখছি কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে। সুতরাং উহার (কামনার) মোহের জন্য নিজকে হত্যা করো না এবং লোভকে এমনভাবে অলংকৃত কর যেমন খাবার এবং পানীয়কে সুসজ্জিত করে থাক।"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক ধনী ও সুস্থ মুসলমানের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। হজ্জ পালন করা ধনী ব্যক্তিদের উপর আল্লাহ্ পাকের আদেশ। তাই কবি হজ্জকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম রোকন বলে মনে করতেন। তৎকালীন মক্কার শাসক'আউন আল-রফীক শরীফ হুসাইন (১২৩৭-১৩৫০ হি./ ১৮৫৬-১৯৩১ খ্রি.) এর অত্যাচারের বিরূদ্ধে ১৩২১ হি./১৯০৪ সালে রচিত তাঁর অভিযোগ সংক্রান্ত 'দাজীজ আল-হাজীজ' ضَجِيْجُ الْحَجِيْجِ শীর্ষক কাসীদার নিম্নোক্ত চরণত্রয়ে কবির এহেন ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাস সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে,[২৪]

خَلِيْفَةَ اللهِ ، شَكْوَى الْمُسْلِمِيْنَ رَقَتْ * لِسُدَّةِ اللهِ هَلْ تَرْقَى لَكَ الْكَلِمُ ؟

اَلْحَجُّ رُكْنٌ مِنَ الإِسْــــــلاَمِ نُكْبِرُهُ * وَ الْيَوْمَ يُوْشَكُ هَذَا الرُّكْنُ يَنْهَدِمُ

مِنَ الشَّرِيْفِ وَمِنْ أَعْــــوَانِهِ فُعِلَتْ * نُعْمَى الزِّيَادَةَ مَا لاَ تَفْعَلُ النِّقَـــمُ

"(হে মক্কার শাসক!) তুমি মহান আল্লাহর খলীফা, তোমার দ্বারা মহান আল্লাহর পথ রুদ্ধ করার কারণে মুসলমানদের অভিযোগ উত্থিত হয়েছে; তোমার নিকট তাদের কথাগুলো কি পৌঁছেছে? হজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ, যাকে আমরা মর্যাদা দিয়ে থাকি, অথচ আজ মনে হয় এ স্তম্ভটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শরীফ (আউন আল-রফীক) ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে বাড়াবাড়িমূলক আচরণ সংঘটিত হয়েছে, ইসলামের শত্রুরা এহেন কাজ করেনি।"

পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক নির্দিষ্ট সময়ে কা'বাঘরের চারিপাশে এবং মক্কার অপর কয়েকটি স্থানে সম্মিলিত কতগুলি অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে হজ্জ আদায় করে। এ বিষয়টি আহমাদ শাওকী ১৩২৭ হি./ ১৯১০ সালে তাঁর রচিত 'ইলা আরাফাত' إِلَى عَرَفَاتِ কবিতায় চিত্রণ করে বলেন:[২৫]

لَكَ الدِّيْنُ يَا رَبَّ الْحَجِيْجِ، جَمَعْتَهُمْ * لِبَيْتٍ طَهُوْرِ السَّاحِ وَالْعَرَصَاتِ

أَرَى النَّــــاسَ أَصْنَافًا وَمِنْ كُلِّ بُقْعَــةٍ * إِلَيْكَ انْتَهَوْا مِنْ غُـــرْبَةٍ وَشَتَاتِ

تَسَاوَوْا، فَلاَ الأَنْسَابُ فِيْهَا تَفَــاوُتٌ * لَدَيْكَ، وَلاَ الأَقْدَارُ مُخْــتَلِــفَاتِ

"হে হাজীদের প্রতিপালক! আপনার সন্তুষ্টির জন্যই রয়েছে দ্বীন, আপনি তাদেরকে পবিত্র আঙিনা ও প্রশস্ত মাঠ বিশিষ্ট কা'বাগৃহের উদ্দেশ্যে একত্রিক করেছেন। আমি লোকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীর দেখতে পাচ্ছি, তারা আপনার সান্নিধ্যে দূর-দূরান্তের প্রত্যেক ভূখণ্ড থেকে এসে পৌঁছেছে। তারা সকলেই পরস্পর সমান, ফলে আপনার নিকট এখানে বংশ-কৌলিন্যের ভেদাভেদ এবং মর্যাদার বৈষম্যের কোন স্থান নেই।"

---

২৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মী পাশা (১২৯১-১৩৬৩ হি./১৮৭৪-১৯৪৪ খ্রি.) আহমাদ শাওকীকে স্বীয় সান্নিধ্যে নেয়ার ফলে রাজ দরবারে কর্মব্যস্ততার দরুণ তিনি যথাসময় হজ্জ আদায় করতে পারেননি। এজন্য কবি আল্লাহ পাকের দরবারে পুনঃ পুনঃ স্বীয় অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন এবং মহান আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে কায়মনোবাক্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে 'ইলা আরাফাত' إلى عَرفات কবিতায় বলেছেন:[২৬]

وَيَا رَبِّ، لَوْ سَخَّرْتَ نَاقَةَ (صَالِحٍ) * لِعَبْدِكَ، مَا كَانَتْ مِنَ السَّلِسَاتِ

وَيَا رَبِّ، هَلْ سَيَّارَةٌ أَوْ مَطَارَةٌ * فَيَدْنُوا بَعِيْدَ الْبِيْدِ وَالْفَلَوَاتِ ؟

وَيَا رَبِّ ، هَلْ تُغْنِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةٌ * وَفِي الْعُمْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الْهَفَوَاتِ ؟

"হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনার এই বান্দার জন্য হযরত সালেহ (আ.) এর উষ্ট্রীকে অনুগত করে দিতেন, যা শৃংখলযুক্ত উষ্ট্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দার জন্য একটি স্থলযান বা আকাশযানের ব্যবস্থা করে দেবেন কি? তাহলে সুদূর মরুভূমি এবং শূন্য মাঠ নিকটবর্তী হয়ে যেত। আর হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আপনার বান্দার জন্য হজ্জ পালন সহজসাধ্য এবং তার জীবনের সকল পদস্খলন ক্ষমা করে দিবেন?"

নবী করীম (সা.) এর রওযা মুবারক যিয়ারত এবং মসজিদে নববীর মাটি চুম্বন ও এর সুগন্ধি গ্রহণে আহমাদ শাওকী চরম আকাঙ্খী ছিলেন। ১৩২৯ হি./১৯১২ সালে 'মাজাল্লা আল-যুহূর' مَجَلَّةُ الزُّهُورِ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ কবিতার নিম্নোক্ত চরণে এ মনোভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে,[২৭]

تُرَاكَ مَتَى أَطُوْفُ بِهِ * وَ أَلْثَمُهُ وَ أَنْشَقُهُ

"(হে রাসূল!) আমি কখন আপনার কবর যিয়ারত করব এবং আপনার মসজিদের মাটি চুম্বন করব ও এর সুগন্ধি নিঃশ্বাস ভরে নেব।"

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ও প্রার্থনা

স্রষ্টার অনুগত বান্দা প্রতিনিয়ত সুখ-শান্তি, কল্যাণ-সমৃদ্ধি ও সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ও কাকুতি-মিনতি করবে, প্রার্থনা জানাবে এটাই স্বাভাবিক। আহমাদ শাওকীও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ১৩১২ হি./১৮৯৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত তাঁর দীর্ঘ ২৬৪ শ্লোক বিশিষ্ট 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ শীর্ষক কাসীদায় নৌযান, সাগর, তরঙ্গ, মনোরম প্রাকৃতিক বিষয়ের বর্ণনায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিশ্বাসের একাগ্রতা সহকারে এই মর্মে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন নৌযান আরোহীদের নিরাপদে রাখেন, কেননা মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বত্রই তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। বান্দার জীবন-মৃত্যু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। আসমান ও যমীন তাঁর আলোকধারায় উদ্ভাসিত। সাগরের বিশাল জলরাশি ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের ন্যায় তাঁর পবিত্রতা

---

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনায় সদা মশগুল। কবি সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালাকে কল্পনা করে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশ ও আকুল প্রার্থনা করে বলেন:[২৮]

رَبِّ، إِنْ شِئْتَ فَالْفَضَاءُ مَضِيقٌ * وَإِذَا شِئْتَ فَالْمَضِيقُ فَضَاءُ
فَاجْعَلِ الْبَحْرَ عِصْمَةً ، وَابْعَثِ الرَّحْـ * ـمَةَ فِيهَا الرِّيَاحُ وَالأَنْوَاءُ
أَنْتَ أُنْسٌ لَنَا إِذَا بَعُدَ الأُنْـ * ـسُ وَأَنْتَ الْحَيَاةُ وَالإِحْيَاءُ

"হে প্রতিপালক! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে শূন্যস্থান সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন সংকীর্ণ স্থান বিশাল শূন্যে পরিণত হয়। অনন্তর আপনি এই ভয়াল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে আমাদের জন্য নিরাপদ করে দিন এবং এর মধ্যে করুণাধারা বর্ষণ করুন; যেখানে বায়ু থাকবে, বৃষ্টিও থাকবে। আর (হে আল্লাহ!) আপনি আমাদের বন্ধু! যখন বন্ধুরা দূরে সরে যায়, আর আপনি জীবনের কর্তা এবং জীবন দানকারী।"

কবি আহমাদ শাওকী একবার শিক্ষকদের এক সংবর্ধনা সভায় আল্লাহ তা'আলার গুণগান করতে গিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলেছেন যে, তিনি ইল্ম ও মা'আরিফাতের উৎস, জ্ঞানীদের স্রষ্টা ও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিদাতা, পথপ্রদর্শনকারী ও শিক্ষক হিসেবে নবী-রাসূলগণের প্রেরক। এতদসম্পর্কে 'আল-ইলম ওয়া আল-তা'লীম ওয়া ওয়াজিব আল-মু'আল্লিম' اَلْعِلْمُ وَالتَّعْلِيْمُ وَ وَاجِبُ الْمُعَلِّمِ শীর্ষক কাসীদায় কবি বলেন:[২৯]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَيْرَ مُعَلِّمٍ * عَلَّمْتَ بِالْقَلَمِ الْقُرُوْنَ الأُولَى
أَخْرَجْتَ هَذَا الْعَقْلَ مِنْ ظُلُمَاتِ * وَهَدَيْتَهُ النُّوْرَ الْمُبِيْنَ سَبِيْلاَ
أَرْسَلْتَ بِالتَّوْرَاةِ مُوْسَى مُرْشِداً * وَابْنَ الْبَتُوْلِ فَعَلَّمَ الإِنْجِيْلاَ
وَفَجَّرْتَ يَنْبُوْعَ الْبَيَانِ مُحَمَّداً * فَسَقَى الْحَدِيْثَ وَنَاوَلَ التَّنْزِيْلاَ

"হে আল্লাহ! আপনি পূতঃ পবিত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আপনি প্রাথমিক শতাব্দীর লোকদের কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি এ মানব বুদ্ধিকে অন্ধকার রাশি থেকে মুক্ত করেছেন এবং একে সুস্পষ্ট আলোর পথে পরিচালিত করেছেন। আপনি হযরত মূসা (আ.) কে তাওরাত গ্রন্থসহ পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং বিবি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.) কে পাঠিয়েছেন, অতঃপর তিনি ইঞ্জীলগ্রন্থ শিক্ষা দেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রাঞ্জল বর্ণনার ঝর্ণা হিসেবে প্রবাহিত করেছেন, ফলে তিনি ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন ও অমিয় বাণী হিসেবে আল-হাদীসের ধারায় লোকদেরকে পরিতৃপ্ত করেন।"

আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা

বান্দা ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। বান্দা ভুল করে অনুতপ্ত হলে সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপার করুণা দ্বারা দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করবেন, এটা শাশ্বত নিয়ম। তবে সেই ভুল হওয়া চাই স্বেচ্ছায় নয় বরং অনিচ্ছাকৃত। আল্লাহ পাক অতিশয় ক্ষমাশীল। যখন মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, পুনরায় ঐ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে

---

২৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

২৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন। কবি আহমাদ শাওকীও জীবনে কিছু ভুল-ত্রুটি করেছেন এবং সেটা স্বেচ্ছায় নয় অনিচ্ছায় ও সৃষ্টির স্বাভাবিক দুর্বলতায়। পরক্ষণে আবার লজ্জিত হয়ে যথারীতি আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরূপ আত্মস্বীকৃত অপরাধ মার্জনার জন্য আহমাদ শাওকীর 'আল-সিতার' اَلسَّتَار নামক কবিতায় চরণদ্বয়ে তওবা ও ইস্তেগফারের নমুনা পাওয়া যায়,[৩০]

قَدَّمْتُ بَيْنَ يَـــــــدَيَّ نَفْسًا أَذْنَبَتْ * وَأَتَيْتُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالإِقْرَارِ

وَجَعَلْتُ أَسْـــتُـــرُ عَنْ سِوَاكَ ذُنُوبَهَا * حَتَّى عَيِيتُ، فَمَنْ لِي بِسَتَّارِ !

"একটি অপরাধী আত্মাকে (নিজকে) আমি আমার সম্মুখে পেশ করেছি এবং স্বীকৃতি ও ভীতির মাঝে আমি অবস্থান করছি। আর তার পাশাপাশি তুমি ছাড়া অন্যদের থেকে লুকোচ্ছি, শেষ পর্যন্ত আমি পরিশ্রান্ত; অনন্তর আবরণ আমাকে অনুগ্রাহান্বিত করেছে।"

অনুরূপ আরেকটি মুনাজাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهجُ الْبُرْدَة শীর্ষক কাসীদার নিম্নের পংক্তিগুলোতে; যাতে কবি স্বীয় পাপরাশির ব্যাপকতা থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ পেশ করে বলেছেন:[৩১]

يَا نَفْسُ، دُنْيَاكِ تُخْفِـــيْ كُلَّ مبكيةٍ * وَإِنْ بَدَا لَكِ مِنْهَا حَسَـــنٌ مُبْتَسِمِ

فُضِّيْ بِتَقْوَاكِ فَاهاً كُلَّمَا ضَحِكَتْ * كَمَا يُفَضُّ أَذَى الــرَّقْشَاءِ بِالثَّرَمِ

يَا وَيْلَتَاهُ لِـــنَـــفْـــسِيْ ! رَاعَهَا وُدُّهَا * مُسَوَّدَةَ الصُّحُفِ فِي مُبْيَضَّةِ اللِّمَمِ

رَكَضْتَهَا فِي مُـــرِيْعِ الْمَعْصِيَاتِ وَمَا * أَخَذْتُ مِنْ حِمْيَةِ الطَّاعَاتِ لِلتُّخَمِ

"হে প্রাণ! তোমার দুনিয়া সকল ক্রন্দনকারী আত্মাকে লুকিয়ে রাখে, যদিও তোমার নিকট তাঁর সুন্দর দাঁতগুলো প্রকাশ পায়। যখন সে হাসে, তখন তোমার মুখকে তোমার খোদাভীতির দ্বারা এমনভাবে সরিয়ে রাখ যেমন বিষধর সাপের বিষাক্ত ছোবলের ক্ষতি থেকে সরে থাক। হে আমার প্রাণের জন্য আক্ষেপ! যাকে বার্ধক্য বয়সে পাপকর্ম পরিচালিত করেছে ও পশম দ্বারা কর্ণ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে এবং পাপের উর্বর ভূমিতে একে ছড়িয়ে দিয়েছে।"

তাক্দীর

ইসলামে তাক্দীর تقدير বা ভাগ্য প্রসঙ্গটি অতি প্রাচীন ও জটিল সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম বিশারদ ও দার্শনিকগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে নতুন নতুন তত্ত্ব-তথ্যাদি উপস্থাপন করলেও অদ্যাবধি কোন সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছুতে পারেননি। একজন মুমিন বান্দা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাবে, অতঃপর আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপিতে আস্থা স্থাপন করে উত্তমভাবে ধৈর্য অবলম্বন করবে, এটাই ঈমানের দাবী। কবি আহমাদ শাওকী মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বিপদ-আপদে অথবা তিনি হা-হুতাশ করে ধৈর্যহারা হতেন না। তাই বলে তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। কেননা ইসলাম কর্মবাদী ধর্ম। তবে যথাযথ প্রচেষ্টা চালানোর পরেও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় বিশ্বাস স্থাপন করে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। কেননা

---

৩০. আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯২।

৩১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

হা-হুতাশ করে হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া যায় না। হতে পারে এই না পাওয়ার মাঝেও দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর কোন হিক্‌মাত লুকায়িত রয়েছে। এতদসম্পর্কে কবি বলেন:[৩২]

سُبْحَانَ مَـــــنْ لاَ عِزَّ إِلاَّ عِزُّهُ * يَبْقَى وَلَمْ يَكُ مُلْكُهُ لِيَزُوْلاَ
لاَ تَسْتَطِـيْعُ النَّفْسُ فِي مَلَكُوْتِهِ * إِلاَّ رِضًا بِقَضَـــائِهِ وَقَبُوْلاَ
اَلْـــخَــيْرُ فِيْمَا اخْتَارَهُ لِعِبَادِهِ * لاَ يَظْلِمِ اللهُ الْعِـــبَادَ فَتِيْلاَ
وَإِذَا أَرَادَ اللُّـــهُ أَمْــرًا لَمْ تَجِدْ * لِقَضَائِهِ رَدًّا وَلاَ تَــبْـــدِيْلاً

"তিনিই পবিত্র সত্ত্বা, যার মর্যাদা ব্যতীত আর কোন মর্যাদা নেই; তিনি চিরন্তন আর তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার নয়। তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি ব্যতীত তাঁর সাম্রাজ্যে কারোরই কিছু করার ক্ষমতা নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা নির্বাচন করেন তাতেই কল্যাণ নিহিত; আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণ অত্যাচারও করেন না। আর মহান আল্লাহ যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তুমি তাঁর ফয়সালা প্রতিহত বা পরিবর্তন করতে পারবে না।"

মানুষের তাক্‌দীর বা ভাগ্য আল্লাহর হাতে। মানুষের তাক্‌দীর বা ভাগ্যলিপিতে ভাল-মন্দ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সবই বিদ্যমান। ভাগ্যের ভাল ও মন্দ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানুষের কর্মের উপর তিনি ভাল-মন্দ নির্ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে আহমাদ শাওকী তার 'রিসালাতু আল- নাশিআত' رِسَالَةُ النَّاشِئَةِ শীর্ষক কবিতায় বলেন:[৩৩]

كُلُّ حَالٍ صَائِـــرٌ يَوْمًا لِضِدٍّ * فَدَعِ الأَقْدَارَ تَجْرِيْ وَاسْتَعِدّ
فَلَكٌ بِالسَّعْدِ وَالنَّحْسِ يَـــدُوْرُ * لاَ تُعَارِضْ أَبَدًا مَجْرَى الأُمُوْرِ
قُلْ إِذَا شِئْتَ: صُرُوْفٌ وَغِيَرٌ ! * وَإِذَا شِئْتَ : قَضَـــاءٌ وَقَدَرٌ !

"প্রতিটি অবস্থা কোন এক সময়ে বিপরীতে পরিণত হবে, সুতরাং ভাগ্যকে (তার পথে) চলতে দাও এবং প্রস্তুত হও। ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আপতিত হয়, তুমি কখনোই স্বাভাবিক গতিধারার বিরোধিতা করবে না। চাইলে তুমি এ গুলোকে কালচক্র ও দুর্বিপাক বলতে পার! ইচ্ছা করলে খোদায়ী ফয়সালা এবং অদৃষ্টও বলতে পার!"

কবি সর্বদাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফয়সালায় বিশ্বাসী ছিলেন। বান্দার অক্ষমতার কথাও ভুলে যাননি কখনও। করুণাময় আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বান্দার ভাল কাজের ভালফল এবং মন্দ কাজের মন্দফল দিয়ে থাকেন। তবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে অলসভাবে বসে থাকা মোটেই সমীচীন হবে না। এতদসম্পর্কে 'আল-বানুন ওয়া আল-হায়াত আল-দুনিয়া' اَلْبَنُوْنَ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا শীর্ষক কবিতায় আহমাদ শাওকী সৌভাগ্যের জন্য কাজ করার উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন:[৩৪]

مَا تَـــقُوْلُ فِي قَدَرٍ * بَعْـــضُ سِـــرِّهِ الأَبَدُ ؟
وَهْـــوَ فِي الْحَيَاةِ عَلَى * كُلِّ خُـــطْـــوَةٍ رَصَدٌ

---

৩২. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ.৫৪-৫৫।

৩৩. আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, ৪০-৪১।

৩৪. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

يَسْتَشْعِرُ الأَنَامُ بِهِ * إِنْ سَعَوْا وَإِنْ قَعَدُوْا
يَنْزِلُ الرِّجَالُ عَلَى * حُكْمِهِ وَإِنْ جَحَدُوْا
اَلْقَضَاءُ مُعْضِلَةٌ * لَمْ يَحُلَّهَا أَحَدٌ

"তাক্‌দীর বা ভাগ্য সম্পর্কে তুমি কি বল? এর কোন কোন বর্ষ কি স্থায়ী? আর ভাগ্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ প্রহরী। অদৃষ্টের কারণে মানুষ হোঁচট খায়, যদিও তারা প্রচেষ্টা চালায় এবং যদিও তারা বসে থাকে। অস্বীকার করলেও লোকেরা নিয়তির শাসনাধীনে অবতরণ করে থাকে। ভাগ্য এতই শক্তিশালী যে, এতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।"

আল্লাহ পাকের ফয়সালা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপিতে আহমাদ শাওকীর বিশ্বাস ছিল গভীর ও অটুট। তাঁর অনুসৃত মতে এর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। একবার জনৈক যুবকের আত্মহননের প্রচেষ্টায় তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন আর এ উদ্বিগ্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর "ইন্‌তিহার আল-তালাবা' اِنْتِحَارُ الطَّلَبَةِ শীর্ষক দীর্ঘ কাসীদায়। যাতে তিনি যুব সমাজকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন, আশার বাণী শুনিয়েছেন, আত্মহত্যার পাপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আত্মহত্যাজনিত কারণে পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্ট ও জনগণের অভিশাপ এবং দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সম্পর্কে আলোকপাত করে কবি সতর্কতামূলকভাবে বলেছেন:[৩৫]

قَاتِلَ النَّفْسِ- وَلَوْ كَانَتْ لَهُ - * أَسْخَطَ اللهَ ، وَلَمْ يُرْضِ الْبَشَرْ
سَاحَةُ الْعَيْشِ إِلَى اللهِ الَّذِيْ * جَعَلَ الْوِرْدَ بِأَذْنٍ وَالصَّدَرْ
لاَ تَمُوْتُ النَّفْسُ إِلاَّ بِاسْمِهِ * قَامَ بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا وَقَهَرْ

"প্রবৃত্তি আত্মহননকারী! যদিও প্রবৃত্তির ধর্ম এই যে, এটি মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করে। যে মহান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, ভাগ্য তাঁরই প্রতি জীবনের আঙিনা। তাঁর নাম না নিয়ে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে না, যিনি মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং ক্রোধান্বিত হন।"

আহমাদ শাওকী ১৩১৯ হি./ ১৯০২ সালে দমল বা ফুসফুড়িতে আক্রান্ত বৃটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড (১৮৪১-১৯১০ খ্রি.) এর অভিষেক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মুলতবি হয়ে যাওয়া উপলক্ষে রচিত তাঁর 'আল্লাহ ওয়া আল-ইল্‌ম' اَللهُ وَالْعِلْمُ শীর্ষক কাসীদায় বলেন:[৩৬]

لَكَ الْمُلْكُ يا مَن خَصَّ بَالعِزِّ ذَاتَهُ * وَمَنْ فَوْقَ آرَابِ الْمُلُوْكِ مَآرِبُهُ
فَلاَ عَرْشَ إِلاَّ أَنْتَ وَارِثُ عِزِّهِ * وَلاَ تَاجَ إِلاَّ أَنْتَ بِالْحَقِّ كَاسِبُهُ
وَآمَنْتُ بِالْعِلْمِ الَّذِيْ أَنْتَ نُوْرُهُ * وَمِنْكَ آيَادِيْهِ، وَمِنْكَ مَنَاقِبُهُ
تُؤَامِنُ مِنْ خَوْفٍ بِهِ كُلُّ غَالِبٍ * عَلَى أَمْرِهِ فِي الأَرْضِ، وَالدَّاءُ غَالِبُهُ
فَآمَنْتُ بِاللهِ الَّذِيْ عَزَّ شَأْنُهُ * وَ آمَنْتُ بِالْعِلْمِ الَّذِيْ عَزَّ طَالِبُهُ

---

৩৫. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-১২৯।

৩৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মহান সত্তা ! আপনার অধিকারে রয়েছে বিশ্বসাম্রাজ্য, যার সত্তা পরম মর্যাদায় বিশেষিত, যার উদ্দেশ্য রাজণ্যবর্গের উদ্দেশ্যাবলীর উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। অনন্তর এমন কোন আরশ নেই যার মর্যাদার অধিকারী আপনি নন; আর এমন কোন মুকুট নেই যার সত্যিকার অধিকারী আপনি নন। আর আমি এমন জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী স্বয়ং আপনি যার আলো, আপনার থেকেই এর শক্তি আগত এবং আপনার থেকেই এর গুণাবলী প্রতিফলিত। আপনি প্রতিটি বিজয়কে এর ভয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর কাজে নিরাপত্তা বিধান করেন, অথচ ব্যাধি তার উপর বিজয়ী হয়। সুতরাং আমি মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী, যার মর্যাদা অতীব মহিমান্বিত; আর আমি বিদ্যায় বিশ্বাসী যার অন্বেষণকারী সম্মানিত হয়।

মৃত্যু

আহমাদ শাওকী জীবনবাদী কবি। তিনি ছিলেন দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশী। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে এর স্বাক্ষর মিলে। তিনি মৃত্যুকে ভয় করতেন না। মৃত্যুর কারণগুলো সম্পর্কে যথাসম্ভব চিন্তা-ভাবনা করতেন। কিন্তু মৃত্যু এমন বাস্তবতা যার থেকে পলায়নের কোন পথ নেই। জীবন এমন সত্য যার বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। তাহলে আহমাদ শাওকীর করার আছে কি? তিনি কি মৃত্যুকে ভুলে শুধু ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করবেন? নাকি যৌবন বিমুখ হয়ে শুধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবেন? এমনটি মনে করার কোন অবকাশ নেই। আহমাদ শাওকী মৃত্যুভয়ে কাতর না হয়ে নিজের জন্য জীবনের দাবী পুরোপুরি আদায় করে ছেড়েছেন এবং মৃত্যুর বাস্তবতার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি জীবন বিমুখ ছিলেন না। তিনি জীবন মৃত্যুর একচ্ছত্র প্রশংসাকারীও ছিলেন না। আবার এতদুভয়ের নিন্দায় নিজেকে ব্যাপৃতও রাখেননি। কবির ভাষায়:[৩৭]

يَا خَلِيْلَيَّ لاَ تَــذُمَّا لِي الْمَـــــوْ * تَ فَإِنِّيْ مِمَّنْ يَرَى الْعَيْشَ حَمْدَا

لاَ أَقُوْلُ : اُسْكُنَا إِلَى هَذِهِ الــدَّا * رِ غُرُوْرًا وَلاَ أَقُــوْلُ اسْتَـــعِدَّا

أَنَا مَنْ لاَ يَـــرَى الْفِرَارَ مِنَ الْمَوْ * تِ وَمَنْ لاَ يَرَى مِنَ الْمَوْتِ بُدَّ

أَنَا مَنْ بَلَّ دَمْعُهُ الْمَهْدَ بِالأَمْـــــ * ــسِ وَلَوْ لاَ التَّعْلِيْلُ لَمْ يَأْوِ مَهْدَا

"হে আমার বন্ধুদ্বয়! তোমরা আমাকে মৃত্যুর জন্য ভর্ৎসনা করো না, কারণ আমি ঐ দলভুক্ত যারা জীবনকে প্রশংসার বিনয় বলে মনে করে। আমি বলি না যে, তোমরা ইহকালে অহংকার সহকারে বসবাস কর, আর আমি এটাও বলি না যে, তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমি এমন ব্যক্তি যে মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্ভব বলে মনে করে না এবং এমন ব্যক্তিও নই, যে মৃত্যু থেকে পলায়নের কোন উপায় আছে বলে মনে করি। আমি এমন ব্যক্তি যে, যার অশ্রু গতদিন দোলনাকে সিক্ত করেছে, আর যদি আমার অসহায়ত্ব না থাকত, তাহলে আমায় দোলনায় আশ্রয় দেয়া হতো না।"

প্রত্যেক বস্তুর শেষ আছে। জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। আর এই কবি আহমাদ শাওকী জীবনের দুঃখ-কষ্টের সান্ত্বনার ঠিকানা খুঁজে পেতেন মৃত্যুর মাঝে এবং ব্যর্থতা ও সম্পদহানির বিপরীতে উপদেশের ভান্ডার হিসেবে কল্পনা করতেন মৃত্যুকে। আহমাদ শাওকীর কবিতার নিম্নের চরণত্রয়ে যার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে,[৩৮]

أَرَى الْمَوْتَ عَلَى الْغَبْرَا * ءِ هُوَ الْجَائِحَـــةُ الْكُبْـــرَى

هُـــوَ الْمَجْرَى وَنَحْنُ الْمَا * ءُ مِن حَاجَاتِـــهِ الْمَجْـــرَى

---

৩৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৫৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

هُوَ السَّلْـــوَةُ وَالــــرَّا * حَـــةُ وَالعِبْرَةُ وَالذِّكْــــرَى

"পৃথিবীতে মৃত্যুকে আমি এভাবে দেখি যে, উহা সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশকারী । উঁহা স্রোতস্বিনী আর আমরা পানিস্বরূপ, যার প্রয়োজনসমূহের একটি হচ্ছে স্রোতস্বিনী। উঁহা হচ্ছে সান্ত্বনা, আরাম,শিক্ষা এবং স্মৃতি স্বরূপ।"

মৃত্যু এমন অতিথি, যাতে রয়েছে জীবনের সকল কষ্ট-ক্লেশ থেকে প্রশান্তি। আত্মা. শরীর নামক খাঁচায় তার বন্দিত্বের ও বেদনার নিরাময়তা খুঁজে পায় মৃত্যুর মাঝে। আর মৃত্যুজগতটি এমন যে সেখানে নেই কোন শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও ভালবাসা। যেমন- কবি আহমাদ শাওকী 'যিক্‌রা কানার ফুন' ذِكْرَى كَانَارْفُوْنَ শীর্ষক কবিতায় বলেন:[৩৯]

فِي الْمَوْتِ مَا أَعْيَا وَفِي أَسْبَــابِهِ * كُلُّ امْرِئٍ رَهْـــنٌ بَطِيٍّ كِتَابِهِ
أَسَدٌ لَعَمْرُكَ، مَنْ يَمُوْتُ بِظَفَرِهِ * عِنْدَ اللِّقَاءِ ؛ كَمَنْ يَمُوْتُ بِنَابِهِ
إِنْ نَامَ عَنْكَ ؛ فَكُلُّ طِبٌّ نَافِــعٍ * أَوْ لَمْ يَنَمْ ؛ فَالطِّبُّ مِن أَذْنَابِهِ

"মৃত্যুর রহস্য অনুধাবনে কোন ব্যক্তিই ক্লান্ত ও অক্ষম হয়নি, আর প্রত্যেকেই তাঁর লিপিবদ্ধ আয়ুষ্কালে বন্দী। তোমার জীবনের শপথ! সেই ব্যক্তি সিংহ পুরুষ যে যুদ্ধের মুহূর্তে বিজয় সহকারে মৃত্যু বরণ করে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ছেদন দন্তসহ মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যু যদি তোমা হতে ঘুমিয়ে (দূরে সরে) থাকে, তাহলে প্রতিটি চিকিৎসাই উপকারী হত, আর যদি উহা না ঘুমায় তবে চিকিৎসা উপকারী নয়।"

আহমাদ শাওকীর 'শোকগাঁথা' اَلرِّثَاءُ কবিতা গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সকল কবিতায় তিনি মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছেন। যা একজন জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর প্রয়াত নানী ও পিতার স্মরণে রচিত শোকগাঁথায় জীবনকে তাঁর এবং সময়ের মাঝে সংঘাত হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এমনভাবে দেখিয়েছেন যে, তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না । অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। যদিও সে গহীন জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ায়। দিকের সংখ্যা যদি ছয় না হয়ে সাত হতো তাহলে অবশ্যই মৃত্যুই হতো সপ্তম দিক। যেমন-'ইয়ারছী জান্দাতাহু' يَرْثِيْ جَدَّتَهُ শীর্ষক শোকগাঁথায় কবি বলেন:[৪০]

كَأَنِّيْ وَالزَّمَانُ عَلَى قِــتَالٍ * مُسَاجَلَةً بِــمَيْــدَانِ الْحَيَاةِ
أَخَــافُ إِذَا تَثَاقَلَتِ اللَّيَالِي * وَ أُشْفِقُ مِنْ خُفُوْفِ النَّائِبَاتِ
وَلَوْ أَنَّ الْجِهَاتِ خُلِقْنَ سَبْعًا * لَكَانَ الْمَوْتُ سَابِعَةَ الْجِهَاتِ

"জীবনের প্রান্তরে স্বয়ং আমি এবং সময় যেন যুদ্ধে লিপ্ত যে, একদিন আমার বিজয়ের পালা অপরদিন তার। রাত্রি নিঝুম হলে আমি ভয় পাই এবং দুর্বিপাকের স্বল্পতার কারণে আমি কৃপা প্রদর্শন করি। আর যদি দিকসমূহকে সাতটিতে সৃষ্টি করা হত, তাহলে মৃত্যু সপ্তম দিকে পরিণত হত।"

---

৩৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৮৪।

৪০. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী তাঁর মরহুম পিতা আলীর প্রতি শোক প্রকাশ করে ১৩১৫ হি./ ১৮৯৭ সালে রচিত 'ইয়ারছী আবাহ' يَرْثِيْ أَبَاهُ শীর্ষক শোকগাঁথা কবিতায় স্বীয় পিতাকে লক্ষ্য করে মৃত্যুকালীন ক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। মৃত্যুর তিক্ত পেয়ালা তিনি কি এক ঢোকে পান করেছেন, না দুই ঢোকে তাও জানতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁর নিকট থেকে অবগত হওয়া যে, মৃত্যু তাঁর নিকট কিভাবে এলো? আত্মা কিভাবে উড়ে গেলো এবং শেষ নিঃশ্বাসটি যখন তিনি নিচ্ছিলেন তখন তার অনুভূতিই বা কেমন ছিল? কবির ভাষায়:[৪১]

يَا أَبِيْ وَالْمَـــوْتُ كَأْسٌ مُرَّةٌ * لاَ تَذُوْقُ النَّفْـــسُ مِنْهَا مَرَّتَـــيْنِ

كَيْفَ كَانَتْ سَاعَةٌ قَضَيْتَهَا * كُلُّ شَيْئٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدُ هَـــيِّنٌ ؟

أَشَرِبْتَ الْمَوْتَ فِيْهَا جُرْعَةً * أَمْ شَرِبْتَ الْمَوْتَ فِيْهَا جُرْعَتَيْنِ ؟

"হে আমার পিতা! আর মৃত্যু এমন একটি তিক্ত পেয়ালা, যার থেকে কোন ব্যক্তি দু'বার পান করে না। মৃত্যুর যে ক্ষণটি অতিবাহিত করে এসেছো সেটি কেমন ছিল? প্রতিটি ব্যাপার সংঘটিত হবার পূর্বে ও পরে সহজ মনে হয়। তুমি কি মৃত্যুর পেয়ালা এক ঢোকে পান করেছ অথবা তুমি কি মৃত্যুকে দুই ঢোকে পান করেছ?"

কবি আহমাদ শাওকী মৃত্যু সম্পর্কে মুস্তফা রিয়াদ পাশা (১২৫০-১৩২৯ হি./ ১৮৩৪-১৯১১ খ্রি.) কে শুধিয়েছেন যেন তিনি তাঁকে এই মর্মে উপদেশ প্রদান করেন যে, মৃত্যুই বাস্তব। এতদভিন্ন অন্য সব কল্পনা ও বাতুলতা মাত্র। তিনি আরো জানতে চেয়েছেন তার সামনে যেন উদ্ভাসিত করে দেয়া হয় মৃত্যুর প্রকৃতি ও স্বাদ সম্পর্কে, রোগ-শোকে ভুগে দেরীতে মৃত্যু সম্পর্কে, আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে এবং এসবের মাঝে কোনটি কষ্টদায়ক? যেমন- 'রিয়াদ পাশা' رِيَاض بَاشَا নামক কবিতায় কবি অনুসন্ধিৎসুরূপে বলছেন:[৪২]

رَهِيْنُ الرَّمْـــسِ، حَدِّثْنِيْ مَلِيًّا * حَدِيْثَ الْمَوْتِ تَبْدُ لِي الْعِظَاتُ

هُوَ الْخَبَرُ الْيَقِيْنُ ، وَمَا سِوَاهُ * أَحَادِيْثُ الْمُــنَى وَالتُّـــرَّهَاتُ

سَأَلْتُكَ: مَا الْمَنِيَّةُ؟ أَيُّ كَأْسٍ؟ * وَكَيْفَ مَذَاقُهَا ؟ وَمَنِ السُّقَاةُ ؟

"হে কবরবাসী! আমায় একটু মৃত্যুর কথা বল, যাতে করে আমার জন্য উপদেশ হয়। তা সুনিশ্চিত সংবাদ, এছাড়া অন্যসব কিছু আশা ও মিথ্যাবাণী বৈ আর কিছু নয়। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মৃত্যু কি? এর পাত্রই বা কোনটি? এর স্বাদ কেমন? এর সাকী কারা?"

মিসরে নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা কাসেম বেক আমিন (১২৭৯-১৩২৭ হি./ ১৮৬৩-১৯০৯ খ্রি.) এর শোকগাঁথায় আহমাদ শাওকী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি যেন পুনর্জন্ম লাভ করে তাঁকে মৃত্যুর সংবাদাদি অবহিত করেন। কবির ভাষায়:[৪৩]

يَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالْقَـــضَاءِ وَعِلْمِـــهِ * إِلاَّ قَضَـــاءَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

هَلاَّ بُعِثْتَ فَكُنْتَ أَفْصَـــحَ مُخْبِراً * عَمَّا وَرَاءِ الْمَوْتِ مَنْ (لاَزَار) ؟

---

৪১. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৫৫।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৪৩. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

اُنْفُضْ غُبَارَ الْمَوْتِ عَنْكَ وَنَاجِنِيْ * فَعَسَاىَ أَعْلَمَ مَا يَكُوْنُ غُبَارِىْ

"ওহে প্রতাপশালী! এক আল্লাহ্ পাকের বিচার ভিন্ন অন্য বিচার ও বিদ্যায় অনন্য; কেন আপনি পুনর্জীবিত হচ্ছেন না? তাহলে মৃত্যুর পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনি 'আযর' হযরত ঈসা (আ.) এর সুস্পষ্ট সংবাদদাতা হতেন। আপনার থেকে মৃত্যুর ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলুন এবং আমাকে গোপনে পরামর্শ দিন, অনন্তর শীঘ্রই যাতে আমি আমার ধূলিবর্ণ হওয়া সম্পর্কে অবগত হতে পারি।"

পুনরুত্থান

মৃত্যুর পরে কি? শুধু কি চিরস্থায়ী ধ্বংস, চূড়ান্ত নিঃশেষ যেমন মৌলবাদীরা ধারণা করে। নাকি সাময়িক ধ্বংস, পরবর্তীতে পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবন, ধর্ম বিশ্বাসীরা যেমনটি মনে করে। বস্তুতঃ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না বা তার অস্তিত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যায় না, বরং মৃত ব্যক্তি আমাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং পুনরুত্থানের পর তার নতুন জীবন শুরু হয়। এটাই আসল জীবন এবং চিরস্থায়ী জীবন। ইহকালীন জীবন শেষে মৃত্যুর পর মানুষের যে চিরস্থায়ী পারলৌকিক অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয় ইসলামের পরিভাষায় একে আখিরাত বা পরকাল বলা হয়।[৪৪] এই আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্মে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন:[৪৫] وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ "আর তারা (মুত্তাকীগণ) আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে।"

কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর কবিতায় পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কেননা তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মুমিন মুসলমান, তাঁর বিশ্বাস ছিল মৃত্যু ধ্রুব সত্য এবং পুনরুত্থানও তেমনি প্রকৃত সত্য। তিনি তাঁর মরহুম পিতার শোকগাঁথায় তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ চিনে রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন যে, তারা কি মিলিত হবে, নাকি মিলিত হবে না? পরকালীন জগতে স্বীয় পিতার সাথে মিলিত হয়ে নতুন জীবন শুরু করার তাঁর বড়ই শখ ছিল। একই কবরে পাশাপাশি শায়িত হওয়ারও তাঁর ইচ্ছা ছিল, যা কবির 'ইয়ারছী আবাহ্' يَرْثِيْ أَبَاهُ শীর্ষক শোকগাঁথায় পরিস্ফুটিত হয়েছে,[৪৬]

لَيْتَ شِعْرِيْ : هَلْ لَنَا أَنْ نَلْتَقِيْ * مَرَّةً، أَمْ ذَا افْتِرَاقُ الْمَلَوَيْنِ ؟

وَإِذَا مِتُّ وَأُوْدِعْتُ الثَّرَى * أَنَلْقَى حُفْرَةً أَمْ حُفْرَتَيْنِ ؟

"আমাদের জন্য কি আবার মিলিত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে? নাকি তা দিবা-রাত্রির বিচ্ছিন্নতা? আর যখন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং কবরে আমাকে দাফন করা হবে তখন কি আমরা একই গর্তে অথবা দুইটি গর্তে মিলিত হবো? (হায়!) যদি আমার উপলব্ধি হতো!"

আহমাদ শাওকী তাঁর অনেক কাসীদায় পুনরুত্থান ও আখিরাতের নি'আমতরাজী সম্পর্কে স্বীয় বিশ্বাসের একাগ্রতা প্রকাশ করেছেন। কেননা পুনরুত্থান ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তিনি রিয়াদ পাশার শোকগাঁথায় তাঁকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর আত্মার যাত্রাপথ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কবির ভাষায়:[৪৭]

---

৪৪. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক স্টাডিজ, (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৪: ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮), পৃ. ২৬৪।

৪৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ২, আয়াত: ৪।

৪৬. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

৪৭. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

هَلْ تَقَعُ النُفُوْسُ عَلَى أَمَـانٍ * كَمَا وَقَعَتْ عَلَى (الْحَرَمِ) الْقَطَاةُ ؟
وَتَخْلُدُ أَمْ كَزَعْمِ الْقَوْلِ تَبْلَى * كَمَا تَبْلَى الْعِظَامِ أَوِ الرُّفَاتُ ؟
تَعَـالَى اللّـهُ قَابِـضَهَا إِلَيْهِ * وَنَاعِشُهَا كَـمَا انْتَعَشَ النَّبَاتُ

"আর লোকেরা কি নিরাপদে অবস্থান করবে ? যেভাবে মক্কার পবিত্র মসজিদে পাখীরা অবস্থান করে? আর তারা চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে? না কি সম্প্রদায়ের ধারণা অনুসারে বিগলিত হয়ে যাবে? যেমন দেহ ও অস্থিসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে। লতা-পাতার প্রবৃদ্ধির ন্যায় লোকদের লালন-পালনকারী ও মৃত্যু দানকারী আল্লাহ পাক সুমহান।"

প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাই স্বভাবতই মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাও তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল তথা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। এতদসম্পর্কে অন্য এক কাসীদায় কবি বলেন:[৪৮]

سُنَّةُ اللهِ فِي الْعِبَادِ وَأَمْـرُ * نَاطِـقٌ عَنْ بَقَائِهِ لَنْ يُرَدَّا
وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ النَّفْسُ يَوْمًا * صَدَقَ اللهُ وَالنَّبِيُّوْنَ وَعْدَا

"বান্দার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নীতি ও তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যদানকারী নিদর্শন এমন যে, তা কখনো অস্বীকার করা যায় না। আর একদিন মহান আল্লাহর দিকেই মানুষের আত্মা প্রত্যাবর্তন করবে, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক এবং নবীগণ যথার্থই সাক্ষ্য দিয়েছেন।"

মৃত্যুর পর বিচারের জন্য জীবের পুনরুত্থান হবে। তাই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে আহমাদ শাওকী তাঁর 'তুত আন্‌খা আমুনা ওয়া হাদারাতু 'আস্‌রিহী' تُوْتْ عَنْخَ أَمُونَ وَحَضَارَةُ عَصْرِه নামক কাসীদার নিম্নোক্ত চরণটিতে বলেন:[৪৯]

قَسَمًا بِمَنْ يُحْيِ الْعِظَا * مَ ، وَلَا أَزِيْدُكَ مِن يَمِيْنِ

"শপথ, ঐ সত্তার যিনি অস্থিসমূহকে জীবন দান করেন! এ ব্যাপারে আমি আপনার নিকট আর অধিক শপথ গ্রহণ করতে চাই না।"

মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যার ছিল প্রথম কৃতিত্বপূর্ণ অসামান্য অবদান, সেই স্বনামধন্য রাজকুমারী ফাতেমা বিনতে ইসমাঈল (মৃ. ১৯২০ খ্রি.) কে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত 'আল-আমিরাত' الأَمِـيْرَةُ শীর্ষক শোকগাঁথায় কবি বলেন যে, প্রতিটি সৃষ্টিই ধ্বংস ও মরণশীল। আজ হোক কাল হোক প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কবির ভাষায়:[৫০]

(فَاطِمُ) ، مَن يُوْلَدْ يَمُتْ * اَلْمَهْدُ جِسْرُ الْمَقْبَرَه
وَكُلُّ نَـفْسٍ فِـيْ غَـدٍ * مَـيِّتَةٌ فَـمُـنْتَشِرَه

৪৮. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ ৬৪।

৪৯. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৫০. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"হে ফাতেমা! যে জন্মগ্রহণ করে সে মৃত্যুবরণ করে, আর মৃত্যু হচ্ছে কবরস্থানের সেতু। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তিই আগামীকাল মৃত এবং বিক্ষিপ্ত হবে।"

অনুরূপভাবে খ্যাতনামা রুশ লেখক, কাহিনীকার, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক 'লিউ টলষ্টয়' (Leo Tolstoy)[৫১] কে নিবেদিত শোকগাঁথায় আহমাদ শাওকী মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে দর্শনপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেছেন:[৫২]

طَوَانَا الَّذِيْ يَطْوِي السَّمَاوَاتِ فِيْ غَدٍ * وَيَنْشُرُ بَعْدَ الطَّيِّ وَهُوَ قَدِيْرُ

"তিনি আমাদের ভাঁজ করবেন যিনি আগামীকাল মহাকাশকে ভাঁজ করবেন এবং ভাঁজের পরে আবার ছড়িয়ে দিবেন, আর এ ব্যাপারে তিনিই সর্বশক্তিমান।"

স্পেনিশ প্রখ্যাত আরব কবি আবুল ওয়ালীদ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখযূমী আল-আন্দালুসী যিনি ইব্‌ন যায়দুন (৩৯৪-৪৬৩ হি./১০০৪-১০৭১ খ্রি.) নামে পরিচিত, তাঁর নিকট আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কে আহমাদ শাওকী এই মর্মে অবগত হতে চেয়েছেন যে, তিনি যেন তাঁর নিকট সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা ও নি'আমত সম্পর্কে বর্ণনা করেন[৫৩]

جُلْتَ فِي الْخُلْدِ جَوْلَـــــةً * هَلْ عَنِ الْخُلْدِ مِنْ نَبَا ؟

صِـــفْ لَـــنَـــــا مَا وَرَاءَهُ * مِنْ عُيُوْنٍ، وَمِنْ رُبَى

وَنَـــعِـــيْــــــمٍ وَنَـــضْـــرَةٍ * وَظِــلاَلٍ مِـــنَ الصِّبَا

وَصِـــــفِ الْحُـــوْرَ مُوْجِزًا * وَإِذَا شِئْتَ مُـــطْـــنِبَا

"(হে ইব্‌ন যায়দুন!) তুমি স্থায়িত্বে কিছু সময় পরিভ্রমণ করেছ, স্থায়িত্বের ব্যাপারে কোন সংবাদ আছে কি? এর পশ্চাতে ঝর্ণা, সবুজ ভূমি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শোভা এবং শৈশবের ছায়া বিষয়ক যা রয়েছে তা আমাদের নিকট বর্ণনা কর। আর হূর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং তোমার মন চাইলে দীর্ঘ বর্ণনা দাও।"

অনুরূপভাবে সমসাময়িক প্রখ্যাত পন্ডিত সাহিত্যিক ও প্রয়াত কবি শায়খ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব (১২৮৭-১৩৫০ হি./১৮৭০-১৯৩১ খ্রি.) এর শোকগাঁথায় আহমাদ শাওকী বলেন:[৫৪]

---

৫১. লিউ টলষ্টয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত রুশ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন এবং যা বলতেন তদানুযায়ী কাজ করতেন । ফলে তিনি দরিদ্রদের সাথে নিজেকে সমান করার জন্য তার প্রচুর সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তিনি সহিংসতা ব্যতিরেকে ন্যায়নীতি ও প্রীতির মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। তিনি রাশিয়ান অভ্যাসসমূহ চিত্রিত করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করেন। তার প্রসিদ্ধ উপন্যাসসমূহের মধ্যে "War and Peace" 'আল-হারব ওয়া আল-সিল্‌ম' اَلْحَرْبُ وَالسِّلْمُ 'আনা কারীনীনা' أنَا كَارِنِيْنَا উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ তার উপন্যাস সমূহ ও রচনাবলী রাশিয়ায় সর্বশেষ বিপ্লবের জন্য প্রাথমিক বাইবেলের ন্যায় সমাদৃত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ১৯১০ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্রঃ ফায়দীনাল তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ১৯৬; মুনীর আল-বা'আলাবাক্কী, আল-মাওরিদ, মু'জাম আ'লাম, ৮৩।

৫২. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড,৮১।

৫৩. অধ্যাপক কামিল কায়লানীর সানুগ্রহে মিসরে প্রথমবারের মত 'দীওয়ান ইব্‌ন যায়দুন' دِيْوَانُ ابْنِ زَيْدُوْن প্রকাশ হলে আহমাদ শাওকী এ সংকলনটিকে স্বাগত জানিয়ে 'ইব্‌ন যায়দুন' শীর্ষক কাসীদাটি রচনা করেন। দ্রঃ আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০।

৫৪. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

قُمْ صِفِ الْخُلْدَ لَنَا فِي مُلْكِهِ * مِنْ جَلاَلِ الخَلْقِ، وَالصُّنْعِ الْعَجَبْ
وَثِمَارٍفِي يَوَاقِيْتِ الرُّبَى * وَسُلاَفٍ فِيْ أَبَارِيْقِ الذَّهَبْ

"তুমি উঠ এবং মহান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও আশ্চর্য সৃষ্টি শৈলীর ইয়াকূত সদৃশ কালো গোলাপের ফুটন্ত কলি, স্বর্ণপাত্রের খাট, আর পুরাতন শরাবের বিশদ বর্ণনা দাও।"

বস্তুতঃ পুনরুত্থান যেহেতু সত্য, অনন্তর এরপর প্রতিদানও সত্য। এজন্য কবি আহমাদ শাওকী নেক আমল তথা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন, তাঁর রাসূলের অনুসরণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও জনকল্যাণের জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মৃতব্যক্তি পরকালে সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। এতদসম্পর্কে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-আছার' اَلأَثَرُ শীর্ষক কাসীদায় বলেন:[৫৫]

وَجَدْتُ الْحَيَاةَ طَرِيْقَ الزُّمَرْ * إِلَى بَعْثَةٍ وَشُئُوْنٍ أُخَرْ
وَمَا بَاطِلاً يَنْزِلُ النَّازِلُوْنَ * وَلاَ عَبَثًا يُزْمِعُوْنَ السَّفَرْ
فَلاَ تَحْتَقِرْ عَالِمًا أَنْتَ فِيْهِ * وَلاَ تَجْحَدِ الآخِرَ الْمُنْتَظَرْ
وَخُذْ لَكَ زَادَيْنِ : مِنْ سِيْرَةٍ * وَمِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ يُدَّخَرْ
وَكُنْ فِي الطَّرِيْقِ عَفِيْفَ الْخُطَا * شَرِيْفَ السَّمَاعِ، كَرِيْمَ النَّظَرْ
...وَكُنْ رَجُلاً إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ * يَقُوْلُوْنَ : مَرَّ وَهَذَا الأَثَرْ

"আমি জীবনকে পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যুমারের রাস্তা মনে করি অবতরণকারীদের অবতরণ মিথ্যা নয়, আর সফরের ইচ্ছা পোষণ করা বৃথা নয়। সুতরাং তুমি যে জগতে বসবাস করছ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। অপেক্ষমান পরকালকে অস্বীকার করো না আর সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের পাথেয়দ্বয় নিজের জন্য গ্রহণ কর যা পুঞ্জীভূত করে রাখা হবে। আর রাস্তায় তুমি কোমল পদক্ষেপ, মহৎ কর্ণ হও এবং সম্ভ্রান্তবান দ্রষ্টা হও। ... আর তুমি এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হও যেন তোমার পরবর্তীগণ বলবে যে, তিনি চলে গেলেও এই কীর্তি রেখে গেছেন।"

---

৫৫. আল-শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নবী-রাসূলগণের প্রশস্তিগাঁথা

কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, জীবন, মৃত্যু, আখিরাত, পুনরুত্থান প্রভৃতি ঈমান-'আকীদার মৌলিক বিষয়াবলীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের পাশাপাশি রিসালাত ও নবুওয়্যাতের উপর ছিলেন সমান আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলগণের যথাযথ মর্যাদার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অকুণ্ঠ। কেননা নবীগণই হচ্ছেন সত্যের প্রতিচ্ছবি। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ বা প্রচারক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের নিকট তাঁদেরকে শান্তির বার্তাবাহক ও পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন। তাই মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী হচ্ছেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মানুষের কাছে তাঁর কালাম বা বাণী পাঠিয়েছেন। রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুসারে মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। তাওহীদের উপর ঈমান আনা যেমন ফরজ, রিসালাতের উপর ঈমান আনা ও তেমনি ফরজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে, তা না হলে ঈমান পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হবে না। সুতরাং তাঁদের প্রতি প্রত্যয়ন ও ভালবাসায় একনিষ্ঠ হওয়া প্রতিটি বান্দারই একান্ত কর্তব্য। যারা নবুওয়্যাত ও রিসালাতে অবিশ্বাসী তারা পথভ্রষ্ট, হতভাগ্য এবং আল্লাহ পাকের রোষানলে পতিত ও শাস্তির উপযোগী। এ প্রসঙ্গে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ কবিতায় বলেন:[৫৬]

إِنَّمَا الأَرْضُ وَالْفَضَاءُ لِرَبِّي * وَمُلُوْكُ الْحَقِيْقَةِ الأَنْبِيَاءُ
لَهُمُ الْحُبُّ خَالِصًا مِنْ رِعَايَا * هُمْ ، وَكُلُّ الْهَوَى لَهُمْ وَالْوَلاَءُ
إِنَّمَا يُنْكِرُ الدِّيَانَاتِ قَوْمٌ * هُمْ بِمَا يُنْكِرُوْنَهُ أَشْقِيَاءُ

"নিশ্চয়ই ভূ-মন্ডল ও বায়ু মন্ডল আমার প্রতিপালকের মালিকানাধীন, আর নবীগণ হচ্ছেন বাস্তবতার রাজণ্যবর্গ। তাঁদের অনুগামীদের জন্য রয়েছে তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসা, সার্বিক প্রীতি ও অভিভাবকত্ব। নিশ্চয়ই এক শ্রেণীর লোক ধর্মসমূহকে অস্বীকার করে, আর তারা ধর্মকে অস্বীকার করার কারণে হতভাগ্য হয়েছে।"

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন মহামানবকে নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের দুনিয়ায় আগমনের এ প্রক্রিয়াকে ইসলামের পরিভাষায় 'রিসালাত' বলা হয়। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ.) থেকে আর এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে। এ পর্যায়ে হযরত মূসা (আ.), হযরত ইউসূফ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ অনেক নবী-রাসূলের আগমন এবং পরবর্তীতে ইসলামের অন্যতম জনপদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে অর্জিত মিসরের মর্যাদার কল্পনা করেছেন আহমাদ শাওকী তাঁর 'আয়্যুহা আল-নীল' أَيُّهَا النِّيلُ নামক কবিতায়:[৫৭]

تَابُوْتُ مُوْسَى ؛ لاَ تَزَالُ جَلاَلَةُ * تَبْدُو عَلَيْكَ لَهُ ، وَرَيَّا تُنْشَقُ

---

৫৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

৫৭. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

وَجَمَالُ يُوْسُفَ، لاَ يَــزَالُ لِــوَاؤُهُ * حَــوَالَيْكَ فِي أُفُقِ الْجَلاَلِ يُرَنِّقُ
وَخُطَى الْمَسِيْحِ عَلَيْكَ رُوْحًا طَاهِرًا * بَرَكَاتُ رَبِّكَ وَالنَّعَمُ الْغَيْدَقُ

"(হে মিসর!) হযরত মূসা (আ.) এর সিন্দুকের মহত্ত্ব সর্বদা তোমার উপর পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং ছড়াচ্ছে। আর হযরত ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্যের পতাকা তোমার আশে-পাশে গৌরবের দিগন্তে আন্দোলিত হচ্ছে। আর হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) এর পদচারণা তোমার জন্য পবিত্র অনুপ্রেরণা স্বরূপ, যা তোমার প্রভুর আশীর্বাদ ও প্রচুর সম্পদ স্বরূপ।"

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী-রাসূল মানুষকে সরল ও সঠিক পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ ন্যায়, ইন্‌সাফ, সততা ইত্যাদি মানবিক সৎ গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন। শির্‌ক, কুফ্‌র, নিফাক প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার এবং এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত-বন্দেগী করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। পয়গম্বরদের মধ্যে হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সহ নবী-রাসূলগণের বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আহমাদ শাওকী ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথক পৃথক কাসীদা রচনা করেছেন।

হযরত মূসা (আ.)

আহমাদ শাওকী তাঁর 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ শীর্ষক কবিতায় 'ইযীস' إِيزِيس ও তার সাথে প্রাচীনকালে মিসরীয়দের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন, সাথে সাথে স্রষ্টার মা'আরিফাত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতে হযরত মূসা (আ.) এর মু'জিযার দ্বারা মিসরের তৎকালীন বাদশাহ্ ওলীদ নামক ফির'আউনের যাদুকরদের পরাজিত হওয়ার ঘটনা কবি চমৎকার কল্পচিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন,[৫৮]

رَبِّ هَــذِي عُقُوْلُــنَا فِيْ صِبَاهَا * نَالَهَا الْخَوْفُ، وَاسْتَبَاهَا الرَّجَاءُ
فَعَشِقْنَاكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الــرُّسْـــــ * ـــلُ، وَقَامَتْ بِحُبِّكَ الأَعْضَـــاءُ
وَ وَصَلْنَا السُّرَى، فَلَوْ لاَ ظَلاَمُ الْــ * ـــجَـــهْلِ لَمْ يَخْطُنَا إِلَيْكَ اهْتِدَاءُ
وَاتَّخَذْنَا الأَسْمَاءَ شَــتَّى ، فَلَمَّـــا * جَاءَ مُوْسَى انْتَهَتْ لَكَ الأَسْمَاءُ
حَجَّنَا فِي الزَّمَانِ سِحْـــرًا بِسِحْرٍ * وَاطْمَأَنَّتْ إِلَى الْعَصَا السُّعَدَاءُ

"হে প্রতিপালক! আমাদের এ বুদ্ধিগুলো তার শৈশবে রয়েছে, এ গুলোকে ভয়-ভীতি পেয়ে বসেছে, আশা এদেরকে দাসে পরিণত করেছে। রাসূলগণের আগমনের পূর্বে আমরা আপনাকে ভালবেসেছি, আর আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনার ভালবাসায় নিয়োজিত। আর আমরা ক্ষীণ আলোবিশিষ্ট দূরে অবস্থিত 'সুরা' নামক তারকায় পৌঁছেছি, অনন্তর যদি অজ্ঞতার অন্ধকার না থাকত তবে আপনার দিকে সরল পথ প্রাপ্তি আমাদের অতিক্রম করে যেত না। আর আমরা বিভিন্ন নবীর নাম গ্রহণ করেছি, অনন্তর হযরত মূসা (আ.) আগমন করেন, তখন সকল নাম আপনাতে সমাপ্ত হয়। যুগপৃষ্ঠে যাদুকে যাদুর দ্বারা প্রমাণ হিসেবে পরাজিত করা হয়, আর সৌভাগ্যবানরা হযরত মূসা (আ.) এর লাঠির প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হন।"

---

৫৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ের পাদদেশে 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ধর্মশিক্ষা ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি হযরত মূসা (আ.) এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। এ কারণে তিনি 'কালীমুল্লাহ' كَلِيمُ الله উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাই কবি আহমাদ শাওকী একই কাসীদায় হযরত মূসা (আ.) ও ফির'আউনের কতিপয় ঘটনা বর্ণনার পর হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক মিসর এবং মিসর কর্তৃক হরযত মূসা (আ.) এর মর্যাদা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন:[৫৯]

مِصْرُ مُوْسَى عِنْدَ انْتِمَاءٍ وَمُوْسَى * مِصْرَ إِنْ كَانَ نِسْبَةٌ وَانْتِمَاءُ
فِيْـــهِ فَخْرُهَا الْمُؤَيَّدُ مَـــهْـــمَا * هُزَّ بِـــالسَّـــيِّدِ الْكَلِيْمِ اللِّوَاءُ

"সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিসর হযরত মূসা (আ.) এর, আর যদি সম্পর্ক ও যোগসূত্রতা হয়ে থাকে তাহলে হযরত মূসা (আ.) ই হচ্ছেন মিসর। যখনই হযরত মূসা কালীমুল্লাহর দ্বারা পতাকা প্রকম্পিত হয়, তখনই মিসরের প্রতি সমর্থিত গৌরব হযরত মূসা (আ.) এর মধ্যে নিহিত থাকে।"

হযরত ঈসা (আ.)

বিখ্যাত পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আ.) ফিলিস্তিনের 'বাইত লাহম' بَيْتُ لَحْمٍ (বেথেলহাম) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে মানুষের জন্মের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ধারায় পিতা ছাড়া ইমরানের কন্যা বিবি মরিয়মের গর্ভে আবির্ভূত হন। তাঁর উপর আসমানী কিতাব 'ইঞ্জীল' اَلإِنْجِيْلُ নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে শিশুনবী হযরত ঈসা (আ.) দোলনায় থাকাকালে বাকশক্তি লাভ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মু'জিযা স্বরূপ মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুস্মান করা, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার অলৌকিক শক্তি প্রদান করেছিলেন। বিবি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.) এর মর্যাদা বর্ণনায় আহমাদ শাওকী তাঁর 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيْلِ শীর্ষক কবিতায় বলেন, তিনি ছিলেন দয়া, পরোপকারিতা, মানবতা ও শালীনতার দিশারী। তাঁর জন্ম কল্যাণ ও খোদাভীরুতার নির্দেশক, রক্তপাত বন্ধের সংবাদবাহক এবং শান্তি ও ক্ষমার নবযুগের সূচনাকারী। কবির ভাষায়:[৬০]

وُلِدَ الرِّفْـــقُ يَـــوْمَ مَوْلِدِ عِيْسَـــى * وَالْمُرُوْءَاتُ، وَالْهُـــدَى، وَالْحَـــيَاءُ
وَازْدَهَى الْكَوْنُ بِالْوَلِيْـــدِ، وَضَاءَتْ * بِسَـــنَـــاهُ مِنَ الثَّرَى الأَرْجَـــاءُ
وَسَرَتْ آيَةُ الْمَسِيْـــحِ ، كَمَا يَسْـــ * ـــرِيْ مِنَ الْفَجْرِ فِي الْوُجُوْدِ الضِّيَاءُ
تَمْلأُ الأَرْضَ وَالْـــعَوَالِمَ نُـــــوْرًا * فَالثَّـــرَى مَـــاىِٔـــجٌ بِـــهَا، وَضَّاءُ
لاَ وَعِيْدَ ، لاَ صَـــوْلَـــةَ، لاَ انْتِقَـــامَ * لاَ حُسَـــامَ، لاَ غَزْوَةَ، لاَ دِمَـــاءُ

"হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মদিনে প্রীতি, মানবতা, সরলতা ও শালীনতা জন্মলাভ করে । আর নবজাতকের মাধ্যমে সৃষ্টিকুল আলোকিত হয় এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তাঁর দীপ্তির ঝলকে উদ্ভাসিত

---

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। মাসীহ ঈসা (আ.) এর নিদর্শন ছড়িয়ে পড়ে, যেমন উষালগ্নের আলোকরশ্মি অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ে। এটা পৃথিবী এবং মহাবিশ্বকে আলোকে পরিপূর্ণ করে দেয়, অনন্তর মৃত্তিকা এর দ্বারা তরঙ্গায়িত ও উজ্জ্বল হয়। সেখানে ভীতি, দন্ড, প্রতিশোধ, তরবারী , যুদ্ধ এবং রক্তপাত কিছুই ছিলনা।"

অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) কে কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানকারী অধিপতি হিসেবে চিত্রিত করে কবি আহমাদ বলেন যে, তাঁর জীবন ক্লান্ত ও লোকদের নিকট তাঁর ধর্মীয় মিশন সমাপ্ত হলে তিনি আল্লাহ পাকের হুকুমে আকাশে উঠে যান। তাঁর আকাশে উত্থিত হওয়ার অর্থ ও মূল রহস্যের প্রতি কবি কোনরূপ বিতর্কের অবতারণা করেননি। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের বিষয়টি কবি দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন:[৬১]

مَلِكٌ جَاوَرَ التُّرَابَ، فَلَـمَّا * مَلَّ نَابَتْ عَنِ التُّرَابِ السَّمَاءُ

وَأَطَاعَتْهُ فِي الإِلَهِ شُيُـوخٌ * خُشَّـعٌ ، خُـضَّعٌ لَهُ ، ضُعَفَاءُ

"হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন এমন একজন রাজা, যিনি মাটিকে প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করেন, অনন্তর যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি মাটি থেকে আকাশে উঠে যান। আর মহান আল্লাহর ব্যাপারে ভীত কয়েকজন বৃদ্ধ, খোদাভীরু, অনুগত ও দুর্বল লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করেন।"

ইয়াহুদীগণ কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) কে শূলে চড়ানোর সংকল্পের কথা এবং অসত্যকে দূরীভূত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁকে এহেন ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি দানের বিষয়টি আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদায় সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন:[৬২]

لَوْ لاَ حُمَـاةٌ لَهَا هَـبُّـوْا لِنُصْرَتِهَا * بِالسَّيْفِ مَا انْتَفَعَتْ بِالرِّفْقِ وَالرُّحَمِ

لَـوْلاَ مَكَانٌ لِعِيْسَى عِـنْـدَ مُرْسِلِهِ * وَحُرْمَةٌ وَجَبَتْ لِلرُّوْحِ فِي الْقِدَمِ

لَسُمِّرَ الْبَدَنُ الطُّهْرُ الشَّرِيْفُ عَـلَـى * لَوْحَيْنِ ، لَمْ يَخْشَ مُؤْذِيْهِ، وَلَمْ يَجِمِ

جَلَّ الْمَسِيْحُ، وَذَاقَ الصَّلْبَ شَانِـئُهُ * إِنَّ الْعِقَـابَ بِـقَدْرِ الذَّنْبِ وَالْجُرُمِ

أَخُـو النَّبِيِّ، وَرُوْحُ اللهِ فِـي نُزُلٍ * فَوْقَ السَّمَاءِ وَدُوْنَ الْعَـرْشِ مُحْتَرَمِ

"যদি খ্রিষ্টধর্মের রক্ষণাবেক্ষণকারী না থাকত, যারা এর সাহায্যে তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাহলে ক্ষমা ও অনুকম্পা কোন কাজে আসতো না, যদি হযরত ঈসা (আ.) এর জন্য তাঁর প্রেরণকারীর নিকট কোন সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা না থাকত তাহলে অতীতকালে রূহুল্লাহর জন্য নির্ধারিত হত যে,তাঁর সম্মানিত দেহ মুবারককে দু'টি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে শূলিবিদ্ধ করা হত, আর তিনি তাঁর কষ্টদাতাকে ভয় করতেন না এবং হা-হুতাশ করতেন না। হযরত ঈসা (আ.) মহিমান্বিত হন, আর তাঁর প্রতিপক্ষ শূলির স্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই শাস্তি পাপ ও অপরাধের পরিমাণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ.) নবীর ভ্রাতা এবং রূহুল্লাহ, যিনি আকাশের উপর অবতরণ ও আরশের মধ্যে পরম সম্মানিত।

---

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রশস্তিতে আহমাদ শাওকী ৫ টি কাসীদা রচনা করেছেন এবং অনেক কাসীদায় বিচ্ছিন্নভাবে নবীজির প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শানে নিবেদিত আহমাদ শাওকীর নবী প্রশস্তিমূলক কাসীদাগুলোর মধ্যে 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَة 'যিক্রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ 'যিক্রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَّةُ 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةِ 'আল-সীরাত আল-নাবাবিয়্যা আল-শারীফা' اَلسِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيْفَةُ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৩]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শানে নিবেদিত আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবি সম্রাটের রাসূল প্রশস্তিগাঁথামূলক কাসীদাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রচনাকাল, প্রেক্ষাপট, পটভূমি, আলোচ্য বিষয় ও তার প্রারম্ভিক চরণসহ গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. নাহ্জ আল-বুরদা

আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَة শীর্ষক কাসীদাটিকে মিসরের খেদীব দ্বিতীয় আব্বাসের হজ্জ অনুষ্ঠানের স্মরণে ১৩২৭ হি./ ১৯১০ সালে রচনা করেছিলেন। কায়রোর প্রখ্যাত 'আল-মুওয়ায়্যিদ' اَلْمُؤَيَّد পত্রিকার ২৬ জানুয়ারী, ১৯১০ খ্রি./১৪ ই মহররম ১৩২৮ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটির প্রথম পংক্তি হলো; [৬৪]

رِيْمٌ عَلَى الْقَاعِ بَيْنَ الْبَانِ وَالْعَلَمِ * أَحَلَّ سَفْكَ دَمِيْ فِي الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

"বান জাতীয় বৃক্ষ ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর একটি গাঢ় শুভ্র বর্ণের হরিণী নিষিদ্ধ মাসসমূহে আমার রক্তপ্রবাহকে বৈধ করেছে।"

১৯০ পংক্তি বিশিষ্ট এ কাসীদাটি প্রণয়গীতি দিয়ে শুরু, অতঃপর খোদাভীতি ও পার্থিব স্বার্থচিন্তা থেকে বেঁচে থাকার আত্মউপদেশ উল্লেখ করতঃ সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসা করা হয়েছে। বিশেষতঃ নবীজির অনেক মু'জিযার বর্ণনা, ওহীর অবতরণ, আল-কুরআন, আল-হাদীস প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম ও জন্মকালীন সময়ের সংশ্লিষ্ট অলৌকিক ঘটনবলী, প্রাক-ইসলামী যুগের সামাজিক সন্ত্রাস, প্রতিমা পূজা, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তিশালী শাসক কর্তৃক দুর্বলদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, মি'রাজ, হিযরত, সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন, গুহার দ্বারে মাকড়শার জাল বুনন ও কবুতরের খড়কুটো স্থাপন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর দ্বীনি দাওয়াতের প্রভাব, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ দাবীর অসারতা প্রমাণ, রাসূলের বীরত্ব ও জিহাদ, সাহাবায়ে কিরামের জিহাদ ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য, মুসলমানদের গৌরবগাঁথা, মহান মুসলিম খলীফা, রাজা-বাদশাহ ও জ্ঞানীদের ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি এবং কাসীদার পরিসমাপ্তিতে রাসূলে করীম (সা.) এর শাফা'আত ও অসীলা কামনা করা হয়েছে।

---

৬৩. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, আরবী কাব্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশস্তিগাঁথা, 'সাহিত্য পত্রিকা', ড. ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারী ,১৯৯৯), পৃ. ১২৮-১২৯।

৬৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, এ কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী খেদীব আব্বাস হিল্‌মী পাশা ও তাঁর হজ্জ সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেননি। কাসীদাটির উৎসর্গপত্রে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে কবি বলেন যে, "আল্লাহ পাক এ বিনীত বান্দাকে তাঁর মহান ঘরের কবিকে সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রশংসায় রচিত প্রখ্যাত 'কাসীদা আল-বুরদা' قَصِيْدَةُ الْبُرْدَة এর রচয়িতা মরহুম আল-বুসিরীর জ্ঞানের আলোতে চলার তাওফীক দান করুন। অনন্তর আমি এ কবিতার পংক্তিগুলো রচনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তা গ্রহণের আশা পোষণ করছি।"

আহমাদ শাওকীর কাসীদার নামকরণ 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَة দ্বারা আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনামা কবি শরফুদ্দীন আল-বুসিরী (৬০৮/৬৯৬ হি./ ১২১২-১২৯৬ খ্রি.) বিরচিত 'আল-বুরদা' اَلْبُرْدَة।এর সমকক্ষতা বোঝানো হয়নি, বরং এ নামকরণে অনুখাপেক্ষিতার সুরই অনুরণিত হয়েছে। কেননা 'নাহ্‌জ' نَهْج এর অর্থ হল স্পষ্টরাস্তা, যেমন বলা হয়ে থাকে, 'নাহ্‌জা ফুলান' نَهَجَ فُلَانٌ অর্থাৎ সে তার পথে চলেছে।

এই কাসীদার সুস্পষ্ট ত্রুটিসমূহের মধ্যে রয়েছে যে, এর চিন্তাধারাগুলো অবিন্যস্ত, প্রণয়গীতি দ্বারা যার সূচনা। প্রাচীন এই ছকবাঁধা নিয়ম থেকে আহমাদ শাওকীর কবিতা মুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনিও প্রাচীনদের অনুকরণে মূল বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন প্রণয়গীতি দিয়ে কাসীদার সূচনা করেছেন। অথচ রাসূল প্রশস্তির ভূমিকায় প্রণয়গীতি উল্লেখের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য প্রখ্যাত সাহাবী কবি কা'ব বিন যুহায়র (মৃ. ২৪ হি./৬৪৫ খ্রি.) এর রাসূল প্রশস্তিমূলক 'বানাত সু'আদ' بَانَتْ سُعَادُ কবিতায় অনুরূপ করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন প্রাক-ইসলামী যুগের কবি। পক্ষান্তরে, আহমাদ শাওকী আধুনিক যুগের কবি এবং ইতোপূর্বে এ যুগেই 'কাসীদা আল-বুরদা' قَصِيْدَةُ الْبُرْدَة রচিত হয়েছে। তাই রাসূল প্রশস্তিতে তাঁর স্বকীয় স্টাইল বিনির্মাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে কাম্য ছিল।[৬৫]

২. যিক্‌রা আল-মাওলিদ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রশংসাসূচক আহমাদ শাওকীর দ্বিতীয় কাসীদার নাম 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ ذِكْرَى الْمَوْلِد ১৩২৮ হি./১৯১১ সালে রচিত কবিতাটি 'মাজাল্লা আল-যুহুর' مَجَلَّةُ الزُّهُوْر পত্রিকার জুন, ১৯১২ ইং সংখ্যায়, অতঃপর 'উকায' عُكَاظ পত্রিকার মার্চ, ১৯১৭ ৪র্থ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যার প্রথম চরণ হচ্ছে;[৬৬]

بِـهِ سِحْرٌ يَتَيَّمُـهُ * كِلَا جَفْنَيْكَ يَعْلَمُهُ

"এর মধ্যে রয়েছে এমন যাদুমন্ত্র যা ব্যাকুল করে দেয়, আর তোমার চোখের পাতাদ্বয় তাঁর সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

৯৯ পংক্তি বিশিষ্ট এ কাসীদাটিও গযল বা প্রণয়গীতি দিয়ে সূচনা, পরবর্তীতে রাসূলে করীম (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত, চরিত্র-মাধুর্য, জিহাদ, মর্যাদা তাঁর কতিপয় মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা এবং

---

৬৫. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৮৩-৮৫।

৬৬. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে তাঁর অসীলা ও পবিত্র রওযা মুবারক যিয়ারতের কামনা দিয়ে চমৎকারভাবে শেষ করা হয়েছে।

৩. যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা

১৩৩৯ হি./ ১৯১৪ সালে আহমাদ শাওকী বিরচিত 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَّة কবিতাটি 'উকায' عُكَاظُ পত্রিকায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ৭১ পংক্তি বিশিষ্ট কবিতাটির প্রথম চরণ নিম্নরূপ:[৬৭]

سَـــلُوا قَلْبِيْ غَدَاةَ سَلاَ وَثَابَا * لَعَلَّ عَلَى الْجَمَالِ لَهُ عِتَابَا

"তোমরা আমার অন্তরকে এভাবে জিজ্ঞাসা কর যা সমবেদনা ও অনুশোচনা জ্ঞাপন করেছে, সম্ভবতঃ তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে এর সন্দেহ রয়েছে।"

রাসূল প্রশস্তিমূলক 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَّةُ কবিতাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রণয়গীতি, পার্থিব জগতের বর্ণনা, হিক্‌মাত এবং রাসূলে করীম (সা.) এর প্রশংসা, নবীজির জন্ম, জন্মস্থানের উজ্জ্বলতা ও তাঁর অসীলা কামনা প্রভৃতি।[৬৮]

৪. আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা

আহমাদ শাওকী কর্তৃক ১৩৩৪ হি./ ১৯১৭ সালে রচিত 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদাটি 'উকায' عُكَاظُ পত্রিকার মার্চ, ১৯১৭ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৩৪১ হি./১৯২২ সালে হাসান আল-সান্‌দুবী সম্পাদিত 'আল-শু'আরা আল-ছালাছা' اَلشُّعَرَاءُ الثَّلاَثَةُ কাব্যগ্রন্থে এ কবিতাটি 'শামাইলু সায়্যিদ আল-আলামীন' شَمَائِلُ سَـــيِّدِ الْعَالَمِيْنَ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যার প্রথম পংক্তি;[৬৯]

وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ * وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَثَنَاءُ

"সৎপথ প্রদর্শক (হযরত মুহাম্মদ (সা.)) জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর সৃষ্টিজগত আলোকিত হয়, আর যুগের মুখ খুশীতে মুচকি হাসে ও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে।"

১৩১ শ্লোক বিশিষ্ট সুদীর্ঘ এ কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত, রিসালাতের প্রতি মানব জাতির প্রয়োজনীয়তা, তাঁর জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী, মি'রাজ, আম্বিয়াদের উপর মহানবী (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও প্রভাব, সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য ও জিহাদ, কতিপয় ইসলামী ব্যক্তিত্বের গৌরবগাঁথা এবং পরিশেষে নবী করীম (সা.) এর শাফা'আত কামনা প্রভৃতি বিষয় অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭০] এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রশস্তিগাঁথায় আহমাদ শাওকীর সর্বোত্তম কাব্যকীর্তি।

---

৬৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

৬৮. প্রাগুক্ত।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; হাসান আল-সান্দূবী, আল-শু'আরা আল-ছালাছা, পৃ. ১১।

৭০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আল-সীরাত আল -নাবাবিয়্যা আল-শারীফা

কবি আহমাদ শাওকী কর্তৃক স্পেনে নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে রচিত ১৩৫২ হি./ ১৯৩৩ সালে মিসরে প্রকাশিত ১৭২৬ শ্লোক বিশিষ্ট 'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল ইসলাম' دُوَلُ الْعَرَبِ وَعُظَمَاءُ الإِسْلَامِ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'আল-সীরাত আল-নাবাবিয়্যা আল-শারীফা' اَلسِّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيْفَةُ নামক কাসীদায় ১৫৩ পংক্তি ব্যাপী নবী করীম (সা.) এর জীবন চরিত তথা সীরাতের বর্ণনা রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের নেতৃস্থানীয় বনী হাশিম শাখার অভিজাত কুরাইশ বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের উদারতা, বদান্যতা ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলতো। আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা। কুরাইশ বংশের বনী যুহ্‌রা নামক গোত্রের নেতা আবদুল ওয়াহ্‌হাবের সর্বগুণসম্পন্না কন্যা বিবি আমিনা ছিলেন নবী করীম (সা.) এর স্নেহময়ী মাতা। নবীকুল শিরোমণির আদর্শ জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কিত আলোচ্য কবিতার প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[৭১]

مُحَمَّدٌ سُلَالَةُ النُّبُوَّةْ * اِبْنُ الذَّبِيْحِ الطَّاهِرُ الأُبُوَّةْ
اَلْعَرَبِيُّ طَيِّبَةٌ نَبِيْلَةْ * اَلْقُرَشِيُّ الْبَاذِخُ الْقَبِيْلَةْ
أَبُوْهُ ذُوْ النُّوْرِ الْجَمِيْلُ الْجَعْدُ * وَمُرْضِعُوْهُ الْفُصَحَاءُ سَعْدُ
وَبَيْتُهُ النَّجْمُ الرَّفِيْعُ شُهْرَه * وَنَبْعَتَاهُ هَاشِمُ وَ زُهْرَهْ

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন নবুওয়্যাতের বংশধর, হযরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহর পুত্র এবং পবিত্র পিতৃকুল বিশিষ্ট। তিনি আরবী, পুতঃপবিত্র, সম্ভ্রান্ত, কুলীন কুরাইশ বংশীয়। তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) দানশীল, উজ্জ্বল আলোর অধিকারী; আর তাঁর (শৈশবকালীন) দুগ্ধদানকারীগণ (বিবি হালিমা) হচ্ছেন সা'দ গোত্রের অলংকারময় প্রাঞ্জলভাষী। আর তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি তারকাসদৃশ; তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উৎসমূল হচ্ছে নেতৃস্থানীয় আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম এবং আবৃদে মানাফের পিতা যুহ্‌রা।"

৬. বিচ্ছিন্ন কবিতা

এতদ্ব্যতীত আহমাদ শাওকী কর্তৃক প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত ও ১৩১২ হি./১৮৯৪ সালে রচিত 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيْلِ ১৩২৮ হি./১৯১১ সালে রচিত 'মারহাবান বিল হিলাল مَرْحَبًا بِالْهِلَالِ এবং ১৩২৭ হি./১৯১০ সালে রচিত 'ইলা আরাফাত' إِلَى عَرَفَاتِ প্রভৃতি কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশস্তিমূলক বিক্ষিপ্ত পংক্তি রয়েছে।[৭২]

---

৭১. আহমাদ শাওকী বেক, দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম, (বৈরুত: দার আল-আওদা, ১৯৮১, ১ম প্রকাশ, মাত্বা'আতু মিসর, ১৯৩৩), পৃ. ২২।

৭২. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ.৮৯; মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, আরবি কাব্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশস্তিগাঁথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গুণাবলী ও কৃতিত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো যা আহমাদ শাওকীর তাঁর নবী প্রশস্তিমূলক বিভিন্ন কবিতায় উপস্থাপন করেছেন আমরা যুগের ধারাবাহিকতা, ঘটনা পরম্পরা ও জিহাদের স্তর বিন্যাসের ক্রমানুসারে তা সাজানোর প্রয়াস পেয়েছি।

মানবতার প্রয়োজনে মহানবী (সা.) এর রিসালাত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)এর আগমনের পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যব্যাপী চলছিল সন্ত্রাসের তান্ডবলীলা, শাসকরা ছিল পথভ্রষ্ট, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ ছিল পলায়নপর, বিদ্রোহী, সংখ্যালঘু ধনাঢ্য লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের উপর প্রভুত্ব খাটাতো, সাধারণ জনগণ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অন্যায়-অত্যাচার ও অপশাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল টলটলায়মান, যাদু ও প্রতিমার প্রভাবে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল বিলুপ্ত প্রায় এমনি এক বিভীষিকাময় যুগ সন্ধিক্ষণে ত্রাণকর্তার অন্বেষণে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতা এমন একজন উদ্ধারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল যিনি স্রষ্টাপ্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা দ্বারা তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করতে পারেন। আহমাদ শাওকী 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيلِ শীর্ষক কাসীদায় এ বিষয়টির একটি মনোরম চিত্র অংকন করেছেন, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা ও স্রষ্টা বিমুখতার অন্ধকারে নিমজ্জমান দেখিয়েছেন। এহেন চরম দুরাবস্থা থেকে বিশ্ব মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য এমন একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাকে কেউ অভিহিত করতো 'মানুষ' হিসেবে, কেউ বা মনে করতো 'তারকা', আর কারো ভাষায় তিনি ছিলেন 'দেবতা'। কবির ভাষায়:[৭৩]

أَظْلَمَ الشَّرْقُ بَعْدَ قَيْصَرَ وَالْغَرْ * بُ، وَعَمَّ الْبَرِيَّةَ الإِدْجَاءُ
فَالْوَرَى فِي ضَلاَلَةٍ مُتَمَادٍ * يَقْتُلُ الْجَهْلُ فِيهِ الْجُهَلاَءُ
عَرَفَ اللهُ ضِلَّةً، فَهُوَ شَخْصٌ * أَوْ شِهَابٌ، أَوْصَخْرَةٌ صَمَّاءُ

"রোম সম্রাট কায়সারের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরে যায়, আর সৃষ্টিকুল অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ফলে সৃষ্টিকুল দীর্ঘ বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়, অজ্ঞ ও মূর্খগণ এতে হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতাকে জানেন, চাই সে ব্যক্তি হোক, চাই উল্কা হোক অথবা কঠিন পাথর হোক।"

বিশ্বমানবতার প্রয়োজনে এমন এক অজ্ঞানতার যুগে নবী করীম (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন, যখন পৃথিবী ছিল সংঘাত-বিক্ষুব্ধ, শতধা বিচ্ছিন্ন, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না; বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। যেমন-মদীনার 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের মধ্যে 'বাসূস' যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর স্থায়ী ছিল। কারণে ও অকারণে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত এবং এই গোত্রীয় কলহ বংশ পরম্পরায় চলতে থাকত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব বিশ্বের শতধা বিভক্ত বিবদমান গোত্রগুলোকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে

---

৭৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনলেন এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করলেন।[৭৪] এতদসম্পর্কে আহমাদ শাওকী একই কাসীদায় বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে আরো বলেন :[৭৫]

جَاءَ لِلنَّاسِ وَالسَّرَائِرُ فَوْضَى * لَمْ يُؤَلِّفْ شَتَاتَهُنَّ لِوَاءُ
وَحِمَى اللهِ مُسْتَبَاحٌ ، وَشَرْعُ اللّهِ وَالْحَقُّ، وَالصَّوَابُ وَرَاءُ

"তিনি (হযরত মুহাম্মদ (সা.)) মানবতার কল্যাণে (এমন এক সময়) এসেছিলেন, যখন সিংহাসনসমূহ ছিল গোলযোগপূর্ণ, কোন পতাকাই এদের বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দিতে সক্ষম ছিল না। আর আল্লাহ পাক কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী বৈধ হিসাবে বিবেচিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার বিধান, ন্যায় ও সঠিকতা ছিল পশ্চাতে পতিত।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান ও নবী-রাসূলগণের আদর্শ ভুলে গিয়ে সর্বপ্রকার জঘন্যতম অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তাদের আচার আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতা বিরোধী। এ কারণে সেই যুগ 'আইয়্যামে জাহেলিয়্যা' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' হিসেবে পরিচিত। এ সময় মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর কোন নিরাপত্তা ছিল না। শান্তি-শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা বলতে কিছুই ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করা মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার প্রভৃতি অন্যায় ছিল তখনকার লোকদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। শত শত দেব-দেবী, মূর্তি নির্মাণ ও তার পূজা করা ও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ছিল তাদের ধর্ম। কা'বাঘরে তারা ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। এক কথায় পাপ-পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল তারা। মানবতার এ চরম দুর্দিনে পথহারা আত্মভোলা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়বন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বিশ্বমানবতার শান্তির দূত হিসেবে পাঠালেন। এ প্রসঙ্গে 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী বলেন:[৭৬]

أَتَيْتَ وَالنَّاسُ فَوْضَى لاَ تَمُرُّ بِهِمْ * إِلاَّ عَلَى صَنَمٍ ، قَدْ هَامَ فِي صَنَمٍ
وَالأَرْضُ مَمْلُوْءَةٌ جَوْرًا، مُسَخَّرَةٌ * لِكُلِّ طَاغِيَةٍ فِي الخَلْقِ مُحْتَكِمِ
مُسَيْطِرُ الفُرْسِ يَبْغَى فِي رَعِيَّتِهِ * وَقَيْصَرُ الرُّوْمِ مِنْ كِبْرٍ أَصَمُّ عَمِ
يُعَذِّبَانِ عِبَادَ اللهِ فِيْ شُبَهٍ * وَيَذْبَحَانِ كَمَا ضَحَّيْتَ بِالْغَنَمِ

"(হে নবী!) আপনি এলেন এমতাবস্থায় যে, লোকেরা ছিল এমন কলহে লিপ্ত যা তাদেরকে শুধু প্রতিমার নিকট নিয়ে যেত, আর তারা প্রতিমাতেই বিভোর ছিল। পৃথিবী ছিল অন্যায়-অত্যাচারে পরিপূর্ণ এবং মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী স্বেচ্ছাচারীদের অনুগত। পারস্যের অধিপতি স্বীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাতো, রোমের শাসক (কায়সার) অহংকারবশতঃ অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারা উভয়ে আল্লাহর বান্দাদের সন্দেহ করে শাস্তি দিত এবং তারা বকরী যবেহ করার ন্যায় লোকদেরকে হত্যা করত।"

---

৭৪. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক স্টাডিজ, পৃ. ২০৭।

৭৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

৭৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সা.) এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ-উচ্ছলতা

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّـــةُ কাসীদায় যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও সৌন্দর্য সহকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন কল্যাণ, ন্যায়, সত্য ও পথভ্রষ্ট মানবতার সুসংবাদদাতা। বিশ্বব্রহ্মান্ড তাঁর জন্মের আনন্দে আলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সহ ফেরেশ্তাকুল নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করছিল। মহান আল্লাহর আরশ, লওহে মাহফূয ও মহাকাশে ছিল খুশীর বন্যা, আর তিনি ছিলেন তাঁর সৌন্দর্য ও মানবতার কল্যাণে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল বাগানের গোলাপের ন্যায়। কবির ভাষায়:[৭৭]

وُلِــدَ الْهُــدَى ، فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ * وَفَمُ الزَّمَانِ تَــبَسُّـــمٌ وَثَنَاءُ
اَلــــرُّوْحُ وَالْمَلأُ الْمَلاَئِكُ حَوْلَهُ * لِلدِّيْنِ وَالدُّنْيَا بِهِ بُـــشَــرَاءُ
وَالْعَرْشُ يَزْهُوْ ، وَالْحَظِيْرَةُ تَزْدَهِيْ * وَالْمُنْتَهَى وَالسِّدْرَةُالْعُصَمَاءُ
وَحَدِيْــقَةُ الْفُرْقَانِ ضَاحِكَـــةُ الرُّبَا * بِالتَّرْجُمَانِ، شَذِيَّـــةٌ، غَنَّاءُ

"সৎপথ প্রদর্শক জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর সৃষ্টিকুল আলোকিত হয়, আর কালের মুখ প্রশংসা ও মৃদুহাসিতে মত্ত হয়। তাঁর আশে-পাশে হযরত জিব্রাঈল (আ.) ও তাঁর পার্শ্বস্থ নেতৃস্থানীয় ফেরেশ্তাগণ নবীজির মাধ্যমে ধর্ম ও দুনিয়াবাসীর প্রতি শুভসংবাদ প্রদান করছে। আর পবিত্র আরশ ঝলমল্ করছে এবং বেহেশতের আঙিনার প্রান্তর ও পবিত্র কূলবৃক্ষ আত্মগর্ববোধ করছে। আর সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী 'আল-কুরআন' এর উদ্যানের অবস্থা এই যে, অকাট্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপারগুলো ভাষ্যকারের (হযরত মুহাম্মদ (সা.)) মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করছে, সুগন্ধ ছড়াচ্ছে ও গান গাচ্ছে।"

আহমাদ শাওকী রাসূলগণের নাম আল্লাহ তা'আলার আরশে অবস্থিত 'লওহে মাহফূয' বা 'রক্ষিত ফলকে' সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, তন্মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর নাম 'তুগ্রা'[৭৮] طُغْــرَاءُ এর ন্যায়। সুতরাং মহান আল্লাহকে যদি আমরা আরবী বর্ণমালার 'আলিফ' (أ) বলে গণ্য করি সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অবস্থান হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'বা' (ب) এর ন্যায়। এভাবে চিত্রিত করার পেছনে কবি আহমাদ শাওকীর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী কারীম (সা.) কে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন । কবির ভাষায়:[৭৯]

نُظِمَتْ أَسَامِــي الرُّسْلِ فَــهِيَ صَحِيْفَــةٌ * فِي اللَّــوْحِ ، وَاسْمُ مُحَمَّدٍ طُغْرَاءُ
اِسْــــمُ الْجَــلاَلَــةِ فِي بَــدِيْعِ حُرُوْفِــهِ * أَلِفٌ هُــنَالِكَ وَاسْمُ (طَــهَ) اَلْبَاءُ

"লওহে মাহফূয তথা রক্ষিতফলকে রাসূলগণের নামসমূহ বিন্যাস করা হয়, ফলে এগুলো একটি পুস্তিকায় পরিণত হয়, আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম সেখানে (মনোগ্রামস্বরূপ)

---

৭৭ আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪।

৭৮. তাতারী ভাষায় একটি শব্দ 'তুগরা' طُغْــرَاءُ এটি এমন একটি চিহ্ন, যদ্বারা তারা নির্দেশমূলক গ্রন্থাবলীর ধারে বড় অক্ষরে লিখতো। দ্রঃ ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৭৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষস্থানীয়। সেখানে সুমহান আল্লাহর নামের বর্ণসমূহের আদিতে রয়েছে 'আলিফ' বর্ণ, আর 'ত্বাহা' নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম হচ্ছে 'বা' বর্ণের স্থানে।"

একই কাসীদায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মকালীন আনন্দ, উচ্ছলতাকে চিত্রিত করে কবি বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নভোমন্ডল তাঁর জন্মের সুসংবাদ পেয়ে অপরূপ সাজে সেজেছে। অনুরূপভাবে ভূ-মন্ডলও তাঁর আবির্ভাবের খবর পেয়ে সুগন্ধময় হয়েছে। আর তিনি মানবতার পথ প্রদর্শন ও সত্য সেবার সুসংবাদদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। কবি আহমাদ শাওকী আরো বলেন, জন্মলগ্নে তাঁর মহিমান্বিত চেহারা মুবারকে ছিল নবুওয়্যাতের নূর এবং তাঁর প্রপিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্মৃতিচিহ্ন। মাসীহ হযরত ঈসা (আ.) তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং বিবি মরিয়ম (আ.) তাঁর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর জন্মক্ষণটি কালের গৌরব ও সত্যের সহায়ক। কবির ভাষায়:[৮০]

بِكَ بَشَّــرَ اللهُ السَّمَاءَ فَــزُيِّـنَتْ * وَتَضَوَّعَتْ مِسْكًابِكَ الْغَبْرَاءُ

وَبَدَا مُحَيَّاكَ الَّــذِيْ قَـــسَــمَاتُـــهُ * حَقٌّ ، وَغُرَّتُهُ هُـــدًى وَحَيَاءُ

وَعَلَيْهِ مِنْ نُــوْرِ الــنُّبُوَّةِ رَوْنَـــقٌ * وَمِنَ الْخَلِيْلِ وَهَـــدْيِهِ سِيْمَاءُ

وَ أَثْـــنَى(الْمَسِيْحُ)عَلَيْهِ خَلْفَ سَمَائِهِ * وَتَهَلَّلَتْ وَاهْـــتَزَّتِ الْعَذْرَاءُ

"(হে রাসূল!) আপনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক মহাকাশকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন, অনন্তর তা সুশোভিত হয়, আর পৃথিবী আপনার মাধ্যমে কস্তুরীর সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়। আর আপনার জীবন শুরু হয় যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্য, উজ্জ্বলতা, সৎপথ প্রদর্শন ও শালীনতা। আর তাঁর উপর রয়েছে নবুওয়্যাতের নূরের আলোকদীপ্তি, আর হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) ও তাঁর সৎপথের নিদর্শন। হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) স্বীয় আকাশের পশ্চাৎ থেকে তাঁর প্রশংসা করেন, আর কুমারী বিবি মরিয়ম (আ.) প্রফুল্লতা প্রকাশ করেন এবং আনন্দের আতিশয্যে আন্দোলিত হন।"

সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ.)এর মাধ্যমে নবী-রাসূল আগমনের সূচনা হয়েছে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে তা পরিসমাপ্ত হয়েছে। এ দু'জনের মাঝে কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল এসেছেন। অন্যান্য নবীগণ কোন বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ এবং বিশেষ সময়কালের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। আর 'রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন' رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন বিশ্বনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,[৮১]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

"আর (হে মুহাম্মদ!) আমরা আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্য শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"

'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيْــــلِ শীর্ষক কবিতায় কবি আহমাদ শাওকী এ সম্পর্কে আরো বলেন:[৮২]

---

৮০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৫।

৮১. আল-কুরআন, সূরা আল-সাবা: ৩৪, আয়াত: ২৮।

৮২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

أَشْـــــــرَقَ النُّورُ فِي الْعَوَالِمِ لَمَّا * بَشَّـــرَتْهَا بِأَحْمَدَ الأَنْبِـــيَاءُ
بِالْيَتِيمِ الأُمِّيِّ ، وَالْبَشَرُ الْمُـــــوحَى إِلَـــيْهِ الْعُلُومُ وَالأَسْمَاءُ
قُوَّةُ اللهِ إِنْ تَـــــوَلَّتْ ضَعِـــــيفاً * تَعِبَتْ فِي مِرَاسِهِ الأَقْــــوِيَاءُ
أَشْرَفُ الْمُرْسَلِينَ، آيَاتُهُ النُّــطْـــ * قُ مُبِيْنًا، وَقَوْمُـــهُ الْفُصَحَاءُ

"নবীগণ বিশ্ববাসীকে আহমাদ মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে শুভসংবাদ প্রদান করায় সমগ্র বিশ্ব আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর নিরক্ষর অনাথ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নামসমূহ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তির মাধ্যমে উচ্ছ্বাসিত হয়। মহান আল্লাহর শক্তি কোন দুর্বলকে ক্ষমতাসীন করলে শক্তিশালীরা তাঁর শক্তিতে ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ে। তিনি রিসালাতের মাধ্যমে সম্ভ্রান্ততম; তাঁর নিদর্শন হচ্ছে সুস্পষ্ট বক্তব্য, আর তাঁর সম্প্রদায় প্রাঞ্জলভাষী।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মক্ষণের অলৌকিক ঘটনাবলী

কোন কোন সীরাত বা জীবন চরিত গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর প্রসবকালীন সময়ের কতিপয় অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। রাসূল প্রশস্তিকারী অনেক কবি এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আহমাদ শাওকীও এর ব্যতিক্রম নন। এ পদ্ধতির অনুসরণ করেই তিনি তাঁর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْـــبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদায় রাসূলে করীম(সা.)এর জন্মকালীন যে সব অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে মাদায়েনে অবস্থিত বিরাট অট্টালিকার ফাটল, মনে হয় যেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মই সন্ত্রাস, প্রতিমাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শক। আহমাদ শাওকী এ বিষয়গুলোকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, নবী করীম (সা.) এর জন্মকালীন সুসংবাদ দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এ কারণে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেছে যে, অন্ধকারের বুক চিরে উদ্ভাসিত আলো দ্বারা শির্‌ক, অন্যায় ও পথভ্রষ্টতা বিদূরিত হয়ে ন্যায়, সত্য ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদায়েনের বিশাল প্রাসাদ ধ্বংস হওয়াকে তিনি এভাবে কল্পনা করেছেন যে, এর ধ্বসনামা নির্মাণশৈলীর ত্রুটির কারণে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনজনিত সত্যের আঘাতে এর পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রাসাদে ফাটল ধরার কারণে এর অধিবাসীগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আরব-অনারব নির্বিশেষে সকল ধর্মদ্রোহীও অনুরূপ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কবির ভাষায়:[৮৩]

سَـــرَتْ بَـــشَائِرُ بِالْهَادِى وَمَوْلِدِهِ * فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مَسْرَى النُّورِ فِي الظُّلَمِ
تَخَطَّفَتْ مُهَجَ الطَّاغِيْنَ مِنْ عَرَبٍ * وَطَـــيَّرَتْ أَنْفُـــسُ الْبَاغِيْنَ مِنْ عَجَمِ
رِيْعَتْ لَهَا شَرَفُ الإِيْوَانِ فَانْصَدَعَتْ * مِنْ صَدْمَةِ الْحَقِّ، لاَ مِنْ صَدْمَةِ الْقُدُمِ

"শুভসংবাদসমূহ দিশারী, আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের মাধ্যমে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেমন আলো আঁধারে ছড়িয়ে পড়ে। আরবের অবাধ্যদের হৃৎপিন্ডের রক্ত অপহৃত হয়, আর অনারব বিদ্রোহীদের প্রাণ উড়ে যায়। শুভসংবাদের কারণে পারস্যের রাজপ্রাসাদের মর্যাদা ভীত হয়, অতঃপর তা সত্যের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যায়, আগমনের বেদনায় নয়।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّـــةُ النَّبَوِيَّـــةُ শীর্ষক কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, অগ্নি উপাসকদের প্রজ্বলিত

৮৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল, 'রায়' ও 'হামাদান' শহরের মধ্যবর্তী নগর 'সাউত' এর পার্শ্ববর্তী 'বুহায়রা' হ্রদের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। কবির ভাষায়:[৮৪]

ذُعِرَتْ عُرُوْشُ الظَّالِمِيْنَ، فَزُلْزِلَتْ * وَعَلَتْ عَلَى تِيْجَانِهِمْ أَصْدَاءُ

وَالنَّارُ خَاوِيَةُ الْجَوَانِبِ حَوْلَهُمْ * خَمَدَتْ ذَوَائِبُهَا ، وَغَاضَ الْمَاءُ

وَالآيُ تَتْرَى ، وَالْخَوَارِقُ جُمَّةٌ * (جِبْرِيْلُ) رَوَاحٌ بِهَا غَدَاءُ

"অত্যাচারী শাসকদের সিংহাসনসমূহ ভীতিপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর এরা প্রকম্পিত হয় এবং তাদের মুকুটসমূহের উপর ঝংকার পড়ে যায়। আর অগ্নিপূজকদের পার্শ্বস্থ সকল দিকে প্রজ্বলমান অগ্নিকুন্ডের শিখাসমূহ নির্বাপিত হয়ে যায় এবং পানিসমূহ শুকিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয় আর অলৌকিক ঘটনাবলী প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়, ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (আ.) এগুলো নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ কবিতায় বলেন যে, মাতৃগর্ভ থেকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠকালীন সময়ে নবী করীম (সা.) এর চেহারা উর্ধ্বমুখী ছিল, আর তাঁর দু' কাধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নবুওয়্যাতের মোহর। কবির ভাষায়:[৮৫]

بَدَا تَسْتَقْبِلُ الدُّنْيَا * بِهِ خَيْراً تُوَسِّمُهُ

يُحَمِّلُهَا نُهَى اللهِ * وَيُحَلِّيهَا تَبَسُّمُهُ

إِلَى الرَّحْمَنِ جَبْهَتُهُ * وَنَحْوَ جَلَالِهِ فَمُهُ

وَفِي كَتِفَيْهِ نُوْرُ الْحَقِّ * وَضَّاحٌ وَرَوْسَمُهُ

"পৃথিবী কল্যাণ হিসেবে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতে থাকলো, যার পূর্বাভাস তিনি দান করেছেন। তাঁর আনন্দ পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে থাকে এবং তাঁর মৃদুহাসি একে অলংকৃত করে। পরম করুণাময় ও তাঁর মহিমাপানে মহানবী (সা.) এর মুখ ও মুখমন্ডল নিবিষ্ট রয়েছে। আর তাঁর দু'কাধে সত্যের আলো ও এর নিদর্শন উদ্ভাসিত রয়েছে।"

হেরা পর্বতের গুহায় মহানবী (সা.) এর ধ্যানমগ্নতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় একান্ত নির্জনে দীর্ঘসময় নিবিষ্ট মনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন এই আশায় যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে সত্য দ্বীনের দিশা দিবেন। আর এহেন ধ্যানমগ্নতার দরুণ তিনি তাঁর স্বগোত্রীয়দের অসত্য দ্বীনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার প্রয়াস পেতেন। আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদায় এ বিষয়টি চিত্রায়িত করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ধ্যানমগ্নতার জন্য বাঞ্ছাইকৃত স্থানটি হেরা পর্বতের নির্জন গুহা। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আল-কুরআনের বার্তাবাহক ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (আ.) ও গুহা এদের কেউই এই গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। রিসালাতের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য নবী করীম (সা.) পবিত্র মক্কায় গুহা ও তাঁর আবাসে সবার অলক্ষ্যে যাতায়াত করতেন। বিবি খাদিজা (রা.) এর সাথে বিবাহ হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ পর্বতের গুহায়

---

৮৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৮৫. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এমন প্রশান্ত মনে তিনি গুহায় রাত্রি যাপন করতেন যে, মনে হত যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর সাথে তিনি গোপন আলোচনায় মত্ত; কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হিদায়াত ও মুহাব্বাতের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। কবির ভাষায়:[৮৬]

سَائِلُ حِرَاءَ ، وَرُوْحَ الْقُدُسِ : هَلْ عِلْمَا * : مَصُوْنَ سِرٌ عَنِ الإِدْرَاكِ مُنْكَتِمُ ؟
كَمْ جِيْئَةٍ وَذِهَابٍ شُرِّفَتْ بِهِمَا * بَطْحَاءُ مَكَّةَ فِي الإِصْبَاحِ وَالْغَسَمُ
وَوَحْشَةٍ لاِبْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْنَهُمَا * أَشْهَى مِنَ الأُنْسِ بِالأَحْبَابِ وَالْحَشَمُ
يُسَامِرُ الْوَحْيُ فِيهَا قَبْلَ مَهْبِطِهِ * وَمَنْ يُبَشَّرْ بِسِيْمَى الْخَيْرِ يَتَّسِمُ

"আমি হেরা গুহা ও পবিত্র আত্মা হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে এই মর্মে প্রশ্নকারী যে, তারা উভয়ে কি রক্ষিত রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে যে তা অনুধাবন থেকে লুপ্ত? এমন অনেক গমনাগমন হয়েছে যে, উভয়ের দ্বারা সকাল-সন্ধ্যায় মক্কার কংকরময় স্থান মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এতদুভয়ের মাঝে আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কতইনা নির্জনতা রয়েছে, যা ছিল তাঁর নিকট একান্ত সেবক ও প্রিয়জনদের ভালবাসার চেয়ে অধিক প্রিয়। উক্ত গুহায় প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণের পূর্বে তাঁর সাথে নৈশকালীন কথোপকথন হয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ওহীর অবতরণ

ওহী বা প্রত্যাদেশের আগমন শুরু হল, রিসালাতেরও সূচনা হল। বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য দিনের পর দিন হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে একদা স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহান আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর নিকট অবতীর্ণ হলেন। এভাবে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসের ২৭ তারিখ শবে কদরের রাত্রিতে পবিত্র কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত ইরশাদ হলো:[৮৭]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.
عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে জমাটবাধা রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন! আর আপনার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।"

উল্লেখ্য যে, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পবিত্র শবে কদরের রাত্রিকাল থেকে শুরু করে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে ওহী নাযিল হয়েছিল। এ সকল ওহীর সমষ্টি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপলব্ধি করলেন যে, তাওহীদের ঘোষণা দানের লক্ষ্যে তিনি রিসালাতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশের প্রকাশ্য প্রচার শুরুতে তিনি স্বজাতিকে মহান স্রষ্টার ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানালেন। তাঁর এই পবিত্র আহ্বান কুরাইশদের কর্ণকুহরে এবং মক্কার আনাচে-কানাচে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। যে দ্বীন ইসলামের দরুণ কুরাইশদের প্রতিমাগুলো অনর্থক হয়ে পড়ল, বাতিল হল তাদের

---

৮৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৮৭. আল-কুরআন, সূরা আল-'আলাক: ৯৬, আয়াত: ১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক কু-অভ্যাস, দুর্বলদের উপর প্রভুত্ব ও নিজেদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ভুলুণ্ঠিত হল, এমন ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিলনা। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকল বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রশ্নবানে জর্জরিত করছিল, কেননা তারা মহাশক্তিধর আল্লাহর ইবাদাত ভুলে গিয়ে স্বহস্তে বানানো প্রতিমা পূজায় লিপ্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কেউ কেউ মিথ্যবাদী, কেউ-বা কবি, পাগল, যাদুকর বলে সন্দেহ করতে লাগলো। তবে নবী করীম (সা.) কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত ছিল। কেননা লোকেরা তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেই জানতো, ছোটবেলা থেকেই তারা তাঁকে 'আল-আমীন' اَلأَمِيْنُ বা বিশ্বাসী বলে ডাকতো, অথচ চল্লিশ বছর বয়সে তারা তাঁর প্রতি কেনই বা সন্দেহ পোষণ করবে? এ সকল বিষয়গুলো কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় চিত্রিত করেছেন,[৮৮]

وَنُوْدِيَ: اقْــرَأْ تَعَالَى اللهُ قَائِــلُهَا * لَمْ تَتَّصِلْ قَبْلَ مَنْ قِيْلَتْ لَهُ بِفَــمِ

هُنَاكَ أُذِّنَ لِلرَّحْمَنِ، فَــامْتَــلأَتْ * أَسْمَاعُ مَكَّــــةَ مِنْ قُدْسِيَّةِ النَّغَمِ

فَلاَ تَسَلْ عَنْ قُرَيْشٍ كَيْفَ حَيْرَتُهَا ؟ * وَكَيْفَ نُفْرَتُهَا فِي السَّهْلِ وَالْعَلَمِ ؟

"আর তাঁকে আহ্বান করা হয়: 'আপনি পড়ুন!' এর বক্তা আল্লাহ সুবহান। এটি ইতোপূর্বে যাকে মুখে পড়তে বলা হয়েছে তাঁর সাথে মিলিত হয়নি। সেখানে পরম করুণাময়ের জন্য ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, অনন্তর পবিত্র সুরে মক্কানগরীর কর্ণসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আপনি কুরাইশদেরকে তাদের আশ্চর্য কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না? সমতল ও পাহাড়ী ভূমিতে তাদের ভয় কেমন ছিল তাও জিজ্ঞাসা করবেন না? "

নবী করীম (সা.) এর মি'রাজ গমন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সংঘটিত বড় বড় 'মু'জিযা'[৮৯] গুলোর মধ্যে 'মিরাজ'[৯০] অন্যতম। মি'রাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়্যাতী জীবনের এক বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বিস্ময়কর ও সত্য

---

৮৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৬।

৮৯. 'মু'জিযা' مُعْجِــزَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অলৌকিকতা, অসাধারণতা বা অভিভূত। সাধারণতঃ যে কাজ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক একেই মু'জিযা বলা হয়। আর ইসলামের পরিভাষায় নবী-রাসূলগণের এমন অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনাকে মু'জিযা বলে, যা তাঁদের বিরোধী দলকে অনুরূপ বিষয় উপস্থাপন করা হতে অক্ষম ও অপারগ করে দেওয়ার জন্য প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার শক্তি কেবলমাত্র তাঁর নবী-রাসূলগণকেই প্রদান করে থাকেন। যার মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ রীতি-নীতি বহির্ভূত অলৌকিক পন্থায় কোন ঘটনা সংঘটিত করেন। দ্রঃ আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯; ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ১৫৭।

৯০. মি'রাজ مِعْــرَاجٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সোপান, সিড়ি, উর্ধ্বগমন, বাহন, আরোহণ প্রভৃতি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নবুওয়্যাতের দশম বর্ষের রজব মাসের ২৭ তারিখ (৬২০ খ্রি.) দিবাগত রাত্রিকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'বোরাক' নামক বিদ্যুৎ গতির চেয়ে দ্রুতগামী স্বর্গীয় বাহনে চড়ে কা'বাগৃহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনীত হয়ে সেখান থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সাথে দীদার বা প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ লাভ ও বাক্যালাপ করার নিমিত্তে ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর সাহায্যে যে নভোভ্রমণ করেছিলেন একে 'মি'রাজ' বলা হয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এটিকে 'আল-ইস্‌রা' الإِسْــرَاءُ বা 'রাত্রিকালীন ভ্রমণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দ্রঃ আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা। মি'রাজের মাধ্যমে নবী করীম (সা.) কে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তাই কবি আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় মি'রাজের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত চমৎকার চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

মি'রাজ কি আত্মিকভাবে হয়েছিল না শারীরিকভাবে এ বিতর্কে না গিয়েও তিনি ঘোষণা করেছেন আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পবিত্রতম সত্ত্বা বলে কবি অভিহিত করেছেন এবং তাঁর দেহ ও আত্মা উভয়কে নূর ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গঠিত বলে উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, যারা নবী করীম (সা.) এর মি'রাজকে আত্মিক বলে স্বীকার করে, তারা শারীরিকভাবে মি'রাজকে স্বীকার করতে বাধ্য। আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নভোমন্ডলের দিকে নৈশ ভ্রমণকালীন চিত্র এভাবে অংকন করেছেন যে, তিনি ছিলেন উর্ধ্বলোকের সুন্দর অলংকার। অতঃপর মহাশূন্যের সকল স্তর পাড়ি দিয়ে উর্ধ্বজগতের উর্ধ্বে স্থান-কালেরও উর্ধ্বে মহান আরশে উপনীত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা প্রত্যক্ষ করেছেন কবি সে বিষয়গুলোর বর্ণনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একান্ত সান্নিধ্য নৈকট্য অর্জনের বিষয়টি এভাবে চিত্রিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বার পার্শ্বেই 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' বা সীমান্ত কুল বৃক্ষের নিকট মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্য একটি উঁচু আসন নির্ধারণ করেছিলেন, সেখানে কারো পৌঁছার সাধ্য নেই। ফলে আল্লাহ পাকের আরশ তাঁর সামনে, উপরে, পার্শ্বে ও নিকটে ছিল। আর তিনি ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর স্কন্ধে ঠেশ দিয়ে ছিলেন।

অতঃপর 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' থেকে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'রফ্‌রফ্‌' নামক এক কুদরতী যানে চড়ে ৭০ হাজার নূরের পর্দা পাড়ি দিয়ে স্থান-কালের উর্ধ্বে লা-মাকান ও লা-যামানে আল্লাহ তা'আলার মহান আরশে উপনীত হলেন। তিনি নিকট থেকে নিকটতর হলেন। নূর আর নূরের আতিশয্যে তিনি একাকার হয়ে গেলেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দীদার লাভ করলেন । মহানবী (সা.) বিস্ময় ও আনন্দে, সন্তুষ্টি ও নৈকট্যে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ মাকামে উপনীত হলেন। এতদসম্পর্কে আলোকপাত করে 'আল-হাম্‌যিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কবিতায় কবি বলেন:[৯১]

يَا أَيُّهَا الْمُسْـــــــــرَى بِهِ شَرَفاً إِلَى * مَا لاَ تَنَالُ الشَّمْسُ وَالْجَوْزَاءُ

يَــتَسَاءَلُوْنَ وَأَنْتَ أَطْهَرُ هَيْكَلٍ - * بِالرُّوْحِ أَمْ بِالْهَيْكَلِ الإِسْرَاءُ ؟

بِهِمَا سَــمَوْتَ مُطَهَّرَيْنِ كِلاَ هُمَا * نُــــوْرٌ ، وَرَيْحَانِيَّةٌ ، وَبَهَاءُ

فَضْلٌ عَلَيْكَ لِذِي الْجَلاَلِ وَمِنَّـــــةٌ * وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يَرَى وَيَشَاءُ

"হে মহান ব্যক্তি! যাকে উচ্চ মর্যাদার কারণে (মি'রাজে) এমন স্তর পর্যন্ত (রাত্রিকালীন) ভ্রমণ করানো হয়েছে, যথায় সূর্য ও রাশিচক্র পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। লোকেরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে থাকে যে, নৈশভ্রমণ আত্মিক ছিল না সশরীরে? অথচ আপনি পবিত্রতম দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনি দেহ এবং আত্মা উভয় সহকারে উর্ধ্বারোহণ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, উভয়টি ছিল পবিত্র আলোকময়, সুগন্ধযুক্ত ও উজ্জ্বল। এটি ছিল আপনার প্রতি পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া; আর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা ও মনস্থ করেন তাই করে থাকেন।"

অতঃপর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মসজিদুল হারাম থেকে অতিক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন স্বর্গীয় বাহন 'বোরাকে' আরোহণ করে একনিমিশে

---

৯১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদ আল-আক্সা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পানে পরিভ্রমণ এবং সেখানে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনায় অন্যান্য নবী-রাসূলগণের অপেক্ষমান থাকার বিষয়টি এমন উপমার সাথে চিত্রিত করেছেন যে, নক্ষত্ররাজি কর্তৃক ভরা পূর্ণিমার শশী যেমন পরিবেষ্টিত থাকে এবং যুদ্ধের ময়দানে জাতীয় পতাকাকে সৈন্য বাহিনী আগলে ধরে থাকে, অনুরূপভাবে নবী করীম (সা.) তাঁদের মাঝে অবতরণ করায় অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আনন্দ-উচ্ছল হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন। যেহেতু তিনি সকলের মাঝে শ্রেষ্ঠ তিনি হলেন ইমামুল মুরসালীন অর্থাৎ সকল নবী-রাসূলের ইমাম, তাই তিনি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে আদায়কৃত এক বিশাল জামা'আতে দু'রাকাত নামাযের ইমামতি করেছিলেন। কবির ভাষায়:[৯২]

أَسْرَى بِكَ اللهُ لَيْلاً، إِذْ مَلاَئِكَةٌ * وَالرُّسُلُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى عَلَى قَدَمِ
لِمَا خَطَرْتَ بِهِ الْتَفُّوا بِسَيِّدِهِمْ * كَالشُّهُبِ بِالْبَدْرِ، أَوْ كَالْجُنْدِ بِالْعَلَمِ
صَلَّى وَرَاءَكَ مِنْهُمْ كُلُّ ذِي خَطَرٍ * وَمَنْ يَفُزْ بِحَبِيبِ اللهِ يَأْتَمِمِ

"(হে মুহাম্মদ (সা.)!) আল্লাহ পাক আপনাকে কোন এক রাত্রিতে নৈশভ্রমণ করিয়েছেন, যখন তাঁর ফেরেশ্তা ও প্রেরিত মহাপুরুষগণ বায়তুল মুকাদ্দাস তথা আল-আক্সা মসজিদে প্রস্তুত হয়ে দন্ডায়মান ছিলেন। আপনি সেখানে উপস্থিত হলে তাঁরা তাঁদের নেতাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যেমন পূর্ণিমার চাঁদকে এর বেষ্টনী এবং পতাকাকে সৈনিকরা ঘিরে রাখে। তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তি আপনার পশ্চাতে সালাত আদায় করে, আর যে আল্লাহ তা'আলার বন্ধুর মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে অবশ্যই সে তাঁর অনুগামী হয়।"

অতঃপর মি'রাজ ও বোরাক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মুখে উন্মোচিত গোপন রহস্যাবালী, তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত অনুগ্রহরাজি এবং তাঁর ভ্রমণ ও মি'রাজ বিষয়ে উদ্ভূত সন্দেহ নিরসনকল্পে বিভিন্ন প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন। তিনি যে নবীকুল শিরোমণি, মহান আল্লাহর আরশ স্পর্শ যে শুধু তাঁরই ভাগ্যে জুটেছে নিম্নের চরণত্রয়ে আহমাদ শাওকী সুনিপুণভাবে তা উল্লেখ করেছেন,[৯৩]

جُبْتَ السَّمَوَاتِ وَمَا فَوْقَهُنَّ بِهِمْ * عَلَى مُنَوَّرَةٍ دُرِّيَّةِ اللُّجُمِ
رُكُوبَةً لَكَ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ شَرَفٍ * لاَ فِي الْجِيَادِ، وَلاَ فِي الأَيْنُقِ الرُّسُمِ
مَشِيئَةُ الْخَالِقِ الْبَارِي وَصَنْعَتُهُ * وَقُدْرَةُ اللَّهِ فَوْقَ الشَّكِّ وَالتُّهَمِ

"আপনি ঐশীবাহন বোরাকের উপর আরোহণ করে মহাকাশ বা তাদের সাথে যা কিছু রয়েছে তা অতিক্রম করেছেন। এটি ছিল আপনার জন্য গৌরবের একটি বাহন, দ্রুতগামী অশ্ব ও দ্রুতগামী উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে নয়। এটি ছিল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের একটি ইচ্ছা ও কাজ, আর আল্লাহ তা'আলার কুদরত বা ক্ষমতা সকল সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে।"

অতঃপর কবি মি'রাজের আলোচনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক লওহে মাহ্ফূয অধ্যয়ন, মহান আল্লাহর বিধি-বিধান লিখনরত কলম স্পর্শ এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অনেক গোপন রহস্য অবহিত করণের বিষয়টি চিত্রিত করেছেন। নিঃসন্দেহে নবী প্রশস্তিতে তাঁর কাব্যশৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন নিম্নোক্ত পংক্তির মাধ্যমে, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র উক্তি ও নির্দেশ

---

৯২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

৯৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

এবং উত্তরদাতার শ্রুতি, পিয়ারা হাবীব তথা বন্ধুকে বন্ধুর আহ্বান, সুন্দর নৈকট্য একান্ত সান্নিধ্য ইত্যাদির চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। কবির ভাষায়:[৯৪]

وَقِيْلَ : كُلُّ نَـبِـيٍّ عِنْدَ رُتْـبَـتِـهِ * وَيَـا مُحَمَّدُ، هَذَا الْعَرْشُ فَاسْتَلِمِ

"আর বলা হলোঃ প্রত্যেক নবী তার নিজ মর্যাদায় অভিষিক্ত, আর হে মুহাম্মদ (সা.)! এটি মহান আল্লাহর আরশ, সুতরাং একে চুম্বন করুন।"

মহানবী (সা.) এর অন্যান্য মু'জিযা

আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আরো অনেক মু'জিযা সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাত করেছেন। যেমন-তাঁর তৃষ্ণার্ত সাহাবীদের তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে স্বীয় অঙ্গুলী মুবারক স্বল্প পানিতে ডুবানোর ফলে পানির ফোয়ারা সৃষ্টির ঘটনা, মেঘমালা কর্তৃক তাঁকে ছায়াপ্রদান, সাওর পর্বতের গুহার মুখে মাকড়শার জাল ও কবুতরের বাসা বুনন প্রভৃতি। ফলে কুরাইশগণ তাঁর পশ্চাদধাবন করেও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হওয়া, মক্কা থেকে মদীনায় হিযরতের সময় আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁকে ও তাঁর সাথী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে শত্রুদের কবল থেকে নিষ্কৃতিদান ইত্যাদি বিষয়ও আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

মদীনায় হিযরতকালীন অলৌকিকতা

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হিযরতের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় জন্মভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করে দ্বীন-ইসলামকে রক্ষার জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিত্যসঙ্গী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সাথে নিয়ে দ্রুত গতিতে মক্কার অদূরে 'সাওর' নামক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন। শহর থেকে এই স্থানের দূরত্ব মাত্র দেড় ঘন্টার পথ। পরদিন মক্কার লোকেরা জানতে পারল যে, হযরত দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন এবং তারা তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লো। এদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করার জন্য নিয়োজিত শত্রুরা দ্রুত পদক্ষেপে তাঁর সন্ধান করতে লাগলো।

ঘটনাচক্রে একটি দল সাওর পর্বতের গুহার নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের পদধ্বনি শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় পাহাড়ীয়া গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো গুহার প্রবেশ দ্বারে ঝুঁকে পড়ে এবং একদল কবুতর গুহার সামনে বাসা তৈরী করে বাস করতে থাকে। ক্ষণকাল পরে কয়েকটি মাকড়শা এসে গুহার মুখে জাল বিস্তার করে। কুরাইশদের অনুসন্ধানী দল এই মাকড়শার জাল বুনন দেখে মনে করল সেখানে কোন লোক নেই। তাই তিন দিন তল্লাশী করার পর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কবি আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কল্পনার মাধ্যমে সন্দেহজনক সকল স্থানে মহানবী (সা.) কে ঘিরে মুশরিকদের অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য হামলার চিত্র অংকন করেছেন। পদচিহ্ন থেকে অন্ধত্ব, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শোনার ক্ষেত্রে বধিরতা, মাকড়শার জালকে পুরাতন মনে করা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি কল্পনায় সূক্ষ্মতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অতঃপর কবি মুশরিকদের আপমানজনক পশ্চাদপসারণ, ন্যায় ও সত্য এমনকি চলার পথের উপর তাদের ক্ষোভ প্রভৃতি বিষয়ের চিত্রায়নেও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । কবির ভাষায়: [৯৫]

---

৯৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

৯৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

سَلْ عُصْبَةَ الشِّرْكِ حَوْلَ الْغَارِ سَائِمَةً * لَوْلاَ مُطَارَدَةُ الْمُخْتَارِ لَمْ تُسَمِ
هَلْ أَبْصَرُوْا الأَثَرَ الْوَضَّاءَ ، أَمْ سَمِعُوْا * هَمْسَ التَّسَابِيْحِ وَالْقُرْآنَ مِنْ أُمَمِ ؟
وَهَلْ تَمَثَّلَ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ لَهُمْ * كَالْغَابِ، وَالْحَائِمَاتُ الزُّغْبُ كَالرُّخَمِ ؟
فَأَدْبَرُوْا ، وَوُجُوْهُ الأَرْضِ تَلْعَنُهُمْ * كَبَاطِلٍ مِن جَلاَلِ الْحَقِّ مُنْهَزِمِ

"সাওর পর্বতের গুহার আশে-পাশে মুশরিক রাখাল দলকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি মনোনীত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি আক্রমণ না হতো, তবে সে দলটি ব্যর্থতার কলংকে চিহ্নিত হতো না। তারা কি উজ্জ্বল পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিল অথবা তারা কি নিকট থেকে তাস্‌বীহ্‌ এবং আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুণগুণ শব্দ শুনতে পেয়েছিল ? আর মাকড়শার জাল কি তাদের নিকট ঘন বৃক্ষ সম্বলিত বনের আকার ধারণ করেছিল এবং কোমল পালক বিশিষ্ট কবুতরগুলো কি শুভ্র কালো বিন্দু বিশিষ্ট শকুনের সদৃশ মনে হচ্ছিল? অনন্তর তারা পশ্চাদপসারণ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠ মহান আল্লাহর মহিমায় তাদেরকে পরাজিত বাতিলপন্থী হিসেবে অভিসম্পাত করছিল।"

অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অঙ্গুলী সমূহের মধ্য হতে পানির ফোয়ারা বয়ে যাওয়া এবং মেঘমালা কর্তৃক তাঁকে ছায়াদানের বিষয়টি কবি আহমাদ শাওকী ছন্দোবদ্ধ বাক্যদ্বয়ে আলোকপাত করেছেন, [৯৬]

لَمَّا دَعَا الصَّحْبُ يَسْتَسْقُوْنَ مِنْ ظَمَأٍ * فَاضَتْ يَدَاهُ مِنَ التَّسْنِيْمِ بِالسَّنَمِ
وَظَلَّلَتْهُ ، فَصَارَتْ تَسْتَظِلُّ بِهِ * غَمَامَةٌ جَذَبَتْهَا خِيْرَةُ الدِّيَمِ

"যখন সাহাবীগণ মহানবী (সা.) এর নিকট তৃষ্ণার কারণে পানি পান করার জন্য প্রার্থনা জানালেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় স্বর্গীয় পানিভর্তি পাত্রদ্বারা প্লাবিত হয়। আর অবিরাম বর্ষণমুখর বারির দ্বারা চালিত মেঘমালা তাঁকে ছায়া প্রদান করেছিল, অনন্তর সাহাবীগণ তাঁর সাথে ছায়া লাভ করেন।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ শীর্ষক কবিতায় কতিপয় মু'জিযা তথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বক্‌রীর কথা বলা, তৃষ্ণার্ত সৈন্য বাহিনীকে পরিতৃপ্ত করা ও তাঁর বৃষ্টি প্রার্থনার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন:[৯৭]

وَيُظْهِرُ كُلَّ مُعْجِزَةٍ * لِشَانِئِهِ فَيُفْحِمُهُ
فَغَادِيَةٌ تُظَلِّلُهُ * وَثَاغِيَةٌ تُكَلِّمُهُ
تُرْوِيْ الْجَيْشَ رَاحَتُهُ * إِذَا اسْتَسْقَى عَرَمْرَمُهُ

"আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রতিপক্ষের জন্য প্রতিটি মু'জিযা প্রকাশ করতে থাকেন, অনন্তর প্রতিটি মু'জিযা তাঁকে প্রশান্ত করে। অতঃপর একটি মেঘমালা তাঁকে ছায়া দান করে এবং একটি বক্‌রী তাঁর সাথে কথা বলে। যখন তাঁর সেনাবাহিনী তাঁর নিকট পানি প্রার্থনা করে, তখন তাঁর হাতের তালু সৈন্যদেরকে পরিতৃপ্ত করে।"

---

৯৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

৯৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আখলাক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আখলাক তথা চারিত্রিক মাধুর্যতা যথাযথভাবে বর্ণনা করা তাঁর প্রশংসাকারীদের একান্ত কর্তব্য। কেননা নবীজি তাঁর জীবনের সর্বাবস্থায় যুদ্ধে, সন্ধিতে, আনন্দে-নিরানন্দে, সন্তুষ্টি-ক্রোধে, সারল্যে-কাঠিন্যে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল পর্যায়েই বিশ্বমানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। এমনকি তাঁর পানাহার, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, মেলামেশা, পোশাক-পরিচ্ছেদ সবকিছুতেই নিখুঁত আদর্শ পরিলক্ষিত হত। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ মহান স্বভাব-চরিত্রের গুণাবলী সম্পর্কে ইরশাদ করেন:[৯৮] وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

" (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

নবী করীম (সা.) যদিও সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, আনন্দবোধ করতেন, চিন্তিত হতেন, এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব, অন্যান্য মানুষের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। আহমাদ শাওকী কতিপয় কাসীদার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এহেন সুমহান চারিত্রিক মাধুর্যতা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

কবি তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় মহানবী (সা.) এর চারিত্রিক গুণাবলীর কতিপয় দিক তথা তাঁর উদারতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, বিস্ময়কর বীরত্ব, অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে সরল পথ প্রদর্শন ও শিক্ষাদান ইত্যাদি আলোচনা করেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মধ্যে এক চমৎকার তুলনা করে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত লোকদের জীবিত করতেন, আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজালে আবদ্ধ প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদেরকে নতুন জীবন দান করেছেন। কেননা মূর্খতা মৃত্যুর সমতুল্য। মূর্খকে শিক্ষিত করা মৃতকে জীবিত করার মতই বিস্ময়কর এক অলৌকিক ঘটনা । কবির ভাষায়: [৯৯]

اَلْبَدْرُ دُوْنَكَ فِي حُسْنٍ وَفِي شَرَفٍ * وَالْبَحْرُ دُوْنَكَ فِي خَيْرٍ وَفِي كَرَمِ
شُمُّ الْجِبَالِ إِذَا طَاوَلْتَهَا انْخَفَضَتْ * الأَنْجُمُ الزُّهْرُ مَا وَاسَمْتَهَا تَسِمِ
وَاللَّيْثُ دُوْنَكَ بَأْسًا عِنْدَ وَثْبَتِهِ * إِذَا مَشَيْتَ إِلَى شَاكِي السِّلاَحِ كَمِي
تَهْفُوْ إِلَيْكَ- وَإِنْ أَدْمَيْتَ حَبَّتَهَا * فِي الْحَرْبِ أَفْئِدَةُ الأَبْطَالِ وَالْبُهَمِ

"পূর্ণিমার চাঁদ সৌন্দর্য ও মর্যাদায় আপনার নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সমুদ্র কল্যাণ ও বদান্যতায় আপনার নিকট তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়। পর্বতমালার চূড়া যখন উচ্চতার প্রতিযোগিতা করে তখন আপনার নিকট ওরা নীচু প্রতিপন্ন হয় এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি সৌন্দর্য ও শোভার প্রতিযোগিতায় আপনার নিকট পরাজিত হয়। আর যখন আপনি অস্ত্র সজ্জিত বীরযোদ্ধা হিসেবে এগিয়ে চলেন, তখন সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় শক্তির ক্ষেত্রে আপনার নিকট দুর্বল প্রমাণিত হয়। বীর ও সাহসী যোদ্ধাদের অন্তর আপনার ভয়ে কাঁপতে থাকে, যদিও আপনি রণাঙ্গনে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলকে রক্তে রঞ্জিত করে দেন।"

কবি তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় উল্লেখ করেছেন যে, অনাথ বালক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নেতৃত্বের গুণাবলী তাঁর যৌবনকালেই প্রকাশিত হয়েছে।

---

৯৮. আল-কুরআন, সূরা আল-কালাম: ৬৮, আয়াত: ৪।

৯৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রতি ঘৃণা, মানুষের প্রতি কু-ধারণা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, চারিত্রিক দুর্বলতা, পলায়নপরতা ও হীনমন্যতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী অনাথদের মাঝে পরিদৃষ্ট হলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শৈশবকালেই আমানতদারী ও সত্যবাদিতায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁর সম্প্রদায় তার আমানত ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে তাঁর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই সম্যক অবগত ছিল, অথচ তারা তাঁর দ্বীনি দাওয়াতের চরম বিরোধিতা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) রিসালাত নিয়ে না আসলে ও তাঁর এ সকল মহান স্বভাব-চরিত্র এবং আখলাকই পথ প্রদর্শক হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। মহানবী (সা.) এর অতুলনীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য তাঁর সৌন্দর্যের সামান্য রশ্মি মাত্র। আর নবীজির চরম সৌন্দর্য ছিল তাঁর আদর্শ নেতৃত্বগুণ, যদ্বারা তিনি তাঁর অনুসারীদের পরিচালিত করতেন। আহমাদ শাওকী মহানবী (সা.) এর মহান উদারতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও তাঁর অতুলনীয় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির উল্লেখ করেছেন, যা কেবল সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার পক্ষেই সম্ভব। মহানবী (সা.) এর এহেন পরম ক্ষমা ও অনুকম্পা সত্ত্বেও তিনি সত্য বিরোধিতাকারীদের প্রতি সত্য, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাগান্বিত হতেন। অনুরূপভাবে সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়-নীতিবানদের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বোত্তম প্রাঞ্জল ভাষী ও বাগ্মী ছিলেন, যদ্বারা তিনি শ্রোতাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক ও নিরপেক্ষ বিচারক, তাঁর আদল বা ন্যায় বিচারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কেউ সংশয় প্রকাশ করত না। আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক, জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষায়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাইতো যখনই কোন দাস বা যুদ্ধ বন্দী তাঁর অধিকারে আসত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্ত করে দিতেন। তিনি জীবের প্রতি অনুগ্রহশীল ছাড়াও সহধর্মিণীদের কাছে সর্বোত্তম সাথী বিবেচিত হতেন। ওয়াদা পূরণ ও অঙ্গীকার রক্ষায় তিনি ছিলেন মহৎ প্রাণ। ক্ষমা ও করুণার আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় তিনি ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। কবির ভাষায়:[১০০]

نِعْمَ الْيَتِيْمُ بَدَتْ مَخَايِلُ فَضْلِهِ * وَالْيُتْمُ رِزْقٌ بَعْضُهُ وَذَكَاءُ

فِي الْمَهْدِ يُسْتَسْقَى الْحَيَا بِرَجَائِهِ * وَبِقَصْدِهِ تُسْتَدْفَعُ الْبَأْسَاءُ

بِسِوَى الأَمَانَةِ فِي الصِّبَا وَالصِّدْقِ لَمْ * يَعْرِفْهُ أَهْلُ الصِّدْقِ وَالأُمَنَاءُ

يَا مَنْ لَهُ الأَخْلاَقُ مَا تَهْوَى الْعُلاَ * مِنْهَا وَمَا يَتَعَشَّقُ الْكُبَرَاءُ

"তিনি কতইনা সুমহান অনাথ, যার মহত্ত্বের নিদর্শনাবলী শৈশবেই প্রকাশিত হয়েছিল। আর অনাথ হওয়া কখনো কখনো জীবিকা উপার্জন ও প্রতিভা অর্জনে সহায়ক হয়। তাঁর শৈশবকালে তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে বৃষ্টিবর্ষণ কামনা করা হতো এবং তাঁর আকাংখার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি নিরসন কামনা করা হতো। শৈশবে বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা ব্যতীত অন্যকিছুর দ্বারা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা তাঁকে চিনতো না। হে মহান ব্যক্তি ! আপনার অধিকারে রয়েছে এমন চরিত্র, যার দ্বারা উচ্চ মর্যাদা আশা করা যায় এবং যাকে মহান ব্যক্তিরা ভালবাসে।"

---

১০০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সমগ্র মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:[১০১] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

নবী করীম (সা.) মানব জীবনের প্রতিটি আদর্শকে তাঁর জীবনে বাস্তবায়িত করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্বভাব-চরিত্রে চরিত্রবান এবং তাঁর বীরত্ব ও করুণার গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে জোড়ালো আহ্বান জানিয়ে কবি আহমাদ শাওকী বলেন:[১০২]

اَلْخَيْلُ تَأْبِي غَيْرَ (أَحْمَدَ) حَامِيًا * وَبِهَا إِذَا ذُكِرَ اسْمُهُ خُيَلاَءُ
شَيْخُ الْفَوَارِسِ يَعْلَمُوْنَ مَكَانَهُ * إِنْ هَيَّجَتْ آسَادَهَا الْهَيْجَاءُ
وَإِذَا تَصَدَّى لِلظُّبَي فَمُهَنَّدُ * أَوْ لِلرِّمَاحِ فَصَعْدَةٌ سَمْرَاءُ
وَإِذَا رَمَى عَنْ قَوْسِهِ فَيَمِيْنُهُ * قَدَرٌ، وَمَا تَرْمِي الْيَمِيْنُ قَضَاءُ

"দ্রুতগামী অশ্ব আহমাদ (সা.) ব্যতীত অন্য কাউকে রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যখন তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন এরা আত্মগর্ববোধ করে। তিনি অশ্বারোহী সৈনিকদের নেতা, যখন ভীষণ যুদ্ধ এর ব্যাঘ্রের ন্যায় সাহসী সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করে তখন অশ্বারোহী সৈনিকরা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। আর যখন তিনি অশীযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষে নির্মিত ধারালো তরবারীসদৃশ; অথবা যখন বর্শার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি বাদামী বর্ণের অটুট বল্লমসদৃশ। আর যখন তিনি তাঁর ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেন, তখন তাঁর দক্ষিণ হস্ত ভাগ্যে পরিণত হয় এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত যা কিছু নিক্ষেপ করে তাই চূড়ান্ত বিধানে পরিণত হয়।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন ইয়াতীম, অসহায়, আর্ত-পীড়িত ও দুঃখী মানুষের দরদী এবং পরোপকারী অকৃত্রিম বন্ধু। 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-নাবাবিয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ النَّبَوِيَّةِ কবিতায় আহমাদ শাওকী এগুলো পুনর্বার উল্লেখ করে নবী করীম (সা.) কে 'পরোপকারী নবী' نَبِيُّ الْبِرِّ বলে অভিহিত করেছেন। কবির ভাষায়:[১০৩]

نَبِيُّ الْبِرِّ عَلَّمَهُ * وَجَاءَ بِهِ يُعَلِّمُهُ
لِكُلٍّ عِنْدَهُ فِي الْبِرِّ * حَقٌّ لَيْسَ يَهْضِمُهُ
سَحَابُ الْجُوْدِ رَاحَتُهُ * وَفِي بُرْدَيْهِ عَيْلَمُهُ

"তিনি পরোপকারিতার নবী, যাকে মহান আল্লাহ শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন। তাঁর নিকট প্রত্যেকের জন্য পরোপকারিতার ক্ষেত্রে এমন অধিকার রয়েছে, যা কখনো লজ্জিত হয়না। তাঁর হাতের তালু হচ্ছে বদান্যতার মেঘমালা, আর তাঁর চাদরে রয়েছে বদান্যতার সমুদ্র।"

---

১০১. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব: ৩৩, আয়াত: ২১।

১০২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৯।

১০৩ ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বা ইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِـــدِ الْبَائِيَّـــةُ কবিতায় আহমাদ শাওকী দরিদ্রদের প্রতি মাহনবী (সা.)এর দায়িত্ব সচেতনতা ও দুঃস্থ-অভাবীদের প্রতি তাঁর কল্যাণকামিতার উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বিশ্বমানবতার জন্য তাঁর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য সংবিধান রচনা করে সেদিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছেন, এছাড়াও নবী করীম (সা.) কে চিকিৎসক হিসেবে অভিহিত করে কবি বলেছেন যে, তিনি মানুষকে তাদের মনের ব্যাধিসমূহ থেকে আরোগ্য দান করেছেন। কবির ভাষায়:[১০৪]

نَـبِـــــيُّ الْـبِرِّ، بَيَّنَهُ سَـبِيْلاً * وَسَنَّ خِلاَ لَهُ، وَهُدَى الشِّعَابَا

تَفَـــــرَّقَ بَعْدَ عِيْسَى النَّاسُ فِيْهِ * فَلَمَّا جَـــاءَ كَانَ لَهُـــمْ مَتَابَا

وَشَافِي النَّفْسِ مِنْ نَزْعَاتِ شَـــرٍّ * كَشَـــافٍ مِنْ طَبَائِعِهَا الذِّئَابَا

"তিনি পরোপকারিতার নবী, তাঁকে আল্লাহ্ পাক সৎপথ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পথকে রীতি-নীতি হিসেবে পরিগণিত করেছেন এবং সঠিক রাস্তাসমূহ প্রদর্শন করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) এর পরে লোকেরা পরোপকারিতার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পোষণ করে, অনন্তর যখন হযরত মূসা (আ.) আগমন করেন তখন তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হন। আর তিনি অমঙ্গলের ছোবল থেকে মানবাত্মাকে আরোগ্যদানকারী ব্যাঘ্রদেরকে তাদের মন্দ স্বভাব থেকে আরোগ্যদানকারীর ন্যায়।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন নবীদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী। বংশগত মর্যাদার দিক দিয়েও তিনি আদি মানব হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.) থেকে শুরু করে দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কতিপয় সূফী সাধকের মতে, তিনি মহান আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়বান্দা এবং তাঁর পরম কাম্যব্যক্তি। নবী প্রশস্তিকারী কবিদের অন্যতম আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবি শরফুদ্দীন আল-বূসিরী (৬০৮-৬৯৫ হি./ ১২১৩-১২৯৫ খ্রি.) এর ন্যায় আহমাদ শাওকীও এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং এই ভাবধারাটি তাঁর কবিতায় পুনঃ পুনঃ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মহানবী (সা.)কে 'বিচার দিবসে মহান সুপারিশ অধিকর্তা' বলে অভিহিত করে 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَـهْـــجُ الْبُرْدَةِ শীর্ষক কবিতায় বলেন:[১০৫]

مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ الْبَـــارِيْ، وَرَحْمَـــتُهُ * وَبُغْيَةُ اللهِ مِنْ خَلْقٍ وَ مِنْ نَـــسَمِ

وَصَاحِبُ الْحَوْضِ يَوْمَ الرُّسْلُ سَائِلَةٌ * مَتَى الْوُرُوْدُ ؟ وَجِبْرِيْلُ الأَمِيْنُ ظَمِي

فَاقَ الْـــبُدُوْرَ، وَفَاقَ الأَنْبِيَاءَ ، فَكَمْ * بِالْخَلْقِ وَالْخُلْقِ مِنْ حَسَنٍ وَمِنْ عِظَمِ

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্রষ্টার মনোনীত পবিত্র ব্যক্তি, তাঁর করুণা এবং তিনি সৃষ্টিকুলের ও মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ব্যক্তি। তিনি হাউজে কাউসারের অধিপতি, যেদিন রাসূলগণ জিজ্ঞাসা করবেন যে, কখন তথায় অবতরণ করা হবে? আর বিশ্বস্ত ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (আ.) লোকদের জন্য পিপাসা উপলব্ধি করবেন। আর তিনি পূর্ণিমার চাঁদসমূহের ও নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, সুতরাং সৃষ্টিকূলে ও উত্তম চরিত্রাবলীতে তাঁর কতইনা সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব রয়েছে।"

---

১০৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১।

১০৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫-১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ দেশ ও জাতিভিত্তিক অবির্ভূত হতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّـــةُ শীর্ষক কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী আরো বলেন:[১০৬]

يَا خَيْرَ مَنْ جَاءَ الْوُجُوْدَ ، تَحِيَّةً * مِنْ مُرْسَلِيْنَ إِلَى الْهُدَى بِكَ جَاءُوْا

بَيْتُ النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْ لاَ يَلْـــتَـــقِيْ * إِلاَّ الْحَنَائِفُ فِيْهِ وَالْحُنَـــفَـــاءُ

خَيْرَ الأُبُوَّةِ حَازَهُمْ لَكَ (آدَمُ) * دُوْنَ الأَنَامِ، وَأَحْـــرَزَتْ حَـــوَّاءُ

"হে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি! যিনি রাসূলগণের পক্ষ থেকে সৃষ্টিকূলের প্রতি আশীর্বাদ হিসেবে আগমন করেছেন, যারা আপনার কারণে বিশ্বে হেদায়েত নিয়ে আগমন করেন। আপনি নবীগণের পরিবারভুক্ত, যেখানে সত্য ধর্মপরায়ণ পুরুষেরা সত্য ধর্মপরায়ণা মহিলাদের ব্যতীত অন্য কারো সাথে মিলিত হয় না। আপনার রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট পিতৃকুল, যাদেরকে হযরত আদম (আ.) সকল মানুষের মধ্যে আপনার জন্য একত্রিত করেছেন এবং বিবি হাওয়া (আ.) যাদেরকে সংরক্ষণ করেছেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)এর এহেন শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তাঁর বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিন্য সমন্বিত হয়েছে। কারণ আরবদের মাঝে কুরাইশদের বংশ মর্যাদা শীর্ষস্থানীয় হওয়ায় মহানবী (সা.) এর বংশগত মর্যাদা সর্বোচ্চ শিখরে; অনুরূপভাবে কুরাইশ বংশও মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আবির্ভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় গৌরবান্বিত হয়েছে। এতদসম্পর্কে আহমাদ শাওকী তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ শীর্ষক কবিতায় বলেন:[১০৭]

(خَلِيْلُ) اللهِ مَعْدِنُـــهُ * فَكَيْفَ يَزِيْفُ دِرْهَمُهُ ؟

أُبُوَّةُ سُؤْدُدٍ أَخَذَتْ * بِـــقَرْنِ الشَّمْسِ تُزْحَمُهُ

"মহান আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন তাঁর খনি, সুতরাং তাঁর রৌপ্যমুদ্রা কিভাবে ভেজাল হতে পারে? তাঁর পিতৃকুল নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, সূর্যের শিং থেকে তা কিভাবে ভাংতে পারে?"

রাসূলে করীম (সা.) হলেন নবুওয়্যাতের বংশধর, সর্বোৎকৃষ্ট পিতৃকুল বিশিষ্ট, পুতঃ পবিত্র, সম্ভ্রান্ত, কুলীন আরব কুরাইশ বংশীয়। এতদসম্পর্কে 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কবিতায় কবি আহমাদ শাওকী আরো বলেন:[১০৮]

قَـــدْ أَخْطَأَ النَّجْمُ مَا نَالَتْ أُبُوَّتُهُ * مِنْ سُؤْدُدٍ بَاذِخٍ فِي مَظْـــهَرٍ سَنَمِ

نُمُوْا إِلَيْهِ، فَزَادُوْا فِي الْوَرَى شَرَفًا * وَرُبَّ أَصْلٍ لِفَرْعٍ فِي الفَخَارِ نُمِى

"তাঁর পিতৃকুল মহত্ত্বের উৎসস্থলের ক্ষেত্রে উচ্চ নেতৃত্ব লাভ করেছে, তা নক্ষত্ররাজিকেও অতিক্রম করে গেছে। তারা তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত হয়েছে, অনন্তর তারা বিশ্বের গৌরব বর্ধন করেন এবং অনেক সময় গৌরবের ক্ষেত্রে মূল শাখার প্রতি সম্পর্কিত হয়।"

---

১০৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

১০৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১৩৩।

১০৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাক্যালংকার

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বংশের গৌরবের বিষয় ছিল বাক্যালংকার ও যাদুময় প্রাঞ্জল বর্ণনা। আর তাঁদের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন মানুষের চিত্তাকর্ষণে সর্বাধিক সক্ষম, বক্তব্য ও ভাষণে সর্বাধিক নিপুণ। 'নাজহ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কবিতায় আহমাদ শাওকী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাক্যালংকারের বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন যে, তিনি আরবী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বিশুদ্ধতম ব্যক্তি। অলংকার শাস্ত্রবিদদের কাছে তাঁর কথা ছিল মধুর ন্যায় সুমিষ্ট। আরবী বর্ণনারীতি তাঁর বাক্যালংকার দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। তিনি তাঁর গদ্যবাক্যে কাব্য সৌন্দর্যের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতা ও কথামালা বুদ্ধিমত্তা এবং অন্তরের খোরাকস্বরূপ; যা বিষন্নতা থেকে মনকে সজীব করে এবং অলসতা থেকে বিবেককে জাগ্রত করে। কবির ভাষায়:[১০৯]

يَا أَفْصَحَ النَّاطِقِيْنَ الضَّادَ قَاطِبَــةً * حَدِيْثُكَ الشُّهْدُ عِنْدَ الذَّائِقِ الْفَهِمِ

حَلَّيْتَ مِنْ عَطَلٍ جِيْدَ الْبَـيَانِ بِهِ * فِي كُلِّ مُنْـتَثِرٍ فِي حُسْنِ مُنْتَظِمِ

بِكُلِّ قَوْلٍ كَرِيْـــمٍ أَنْتَ قَائِــلُهُ * تُحْيِ الْقُلُوْبَ، وَتُحْيِي مَيِّتَ الْهِمَمِ

"হে দোয়াদ তথা আরবী ভাষা-ভাষী সকলের মধ্যে প্রাঞ্জলতম ব্যক্তি! আপনার অমিয় বাণী (হাদীস) বিজ্ঞ স্বাদ আস্বাদনকারীর নিকট মধু সদৃশ। এর দ্বারা আপনি অলংকার বিহীন মহিলার গ্রীবাদেশকে অলংকারপূর্ণ বর্ণনা দ্বারা প্রতিটি গদ্য রচনার সুর ছন্দে অলংকৃত করেছেন, প্রতিটি মহৎ বক্তব্যের দ্বারা যার বক্তা স্বয়ং আপনি, অন্তকরণসমূহকে সঞ্জীবিত করেন এবং চিন্তার মৃতকে জীবন দান করেন।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় নবী করীম (সা.)এর মুখ নিঃসৃত বাণী, কর্ম ও অনুমোদনসূচক বিষয় তথা 'আল-হাদীস' اَلْحَدِيْثُ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হাদীস হচ্ছে আইনবিদ, পন্ডিত ব্যক্তিদের জন্য পানির ঘাট, যা থেকে তারা পানিসদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধি-বিধানসমূহ আহরণ করতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, হাদীস হচ্ছে আল-কুরআনের সুগন্ধ ও বাস্তব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং পবিত্র কুরআনের কাব্যালংকারের স্রোতস্বিনী। আরবদের বিরচিত যাবতীয় গদ্যকর্মের মাঝে হাদীস শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। কেননা হাদীস অলংকার শাস্ত্রের ভান্ডার ও ঝর্ণাধারা, যা থেকে অলংকার শাস্ত্রবিদগণ যুগ যুগ ধরে অলংকার শাস্ত্র জ্ঞান আহরণ করছে ও করতে থাকবে। অনুরূপভাবে হাদীস শাস্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ন্যায়-নীতির উৎস, যা থেকে লোকেরা সর্বদা উপকৃত হতে থাকবে। হাদীসকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করে কবি বলেন যে, এহেন জ্ঞান সমুদ্রে সন্তরণকারীদের জন্য রয়েছে জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান। কবির ভাষায়:[১১০]

أَمَّا حَدِيْـثُكَ فِي الْعُقُــوْلِ فَمَشْرَعٌ * وَالْعِلْـمُ وَالْحِـكَمُ الْغَـوَالِي الْمَاءُ

هُوَ صِبْــغَةُ الْفُرْقَانِ، نَفْحَــةُ قُدْسِيَّــةٌ * وَالسِّيْنُ مِنْ سُــوْرَاتِهِ وَالرَّاءُ

جَــرَتِ الْفَصَاحَةُ مِنْ يَنَابِيْعِ النُّهَى * مِنْ دَوْحِــهِ، وَتَفَجَّــرَ الإِنْشَاءُ

---

১০৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

১১০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

فِي بَحْــرِهِ لِلسَّابِــحِــيْنَ بِهِ عَلَى * أَدَبِ الْحَيَاءِ وَعِلْمِهَا إِرْسَــــاءُ
أَنْتِ الدُّهُــوْرُ عَلَى سُــلاَفَتِهِ، وَلَمْ * تَفْنَ السُّلاَفُ وَلاَ سَلاَ النُّدَمَــاءُ

"বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে আপনার অমিয় বাণী 'আল-হাদীস' হচ্ছে পানির ঘাঁট স্বরূপ, আর মূল্যবান জ্ঞান ও বিজ্ঞান হচ্ছে এর পানি। আল-হাদীস হচ্ছে, আল-কুরআনের বর্ণ (ব্যাখ্যা), আর এর পবিত্রতার সৌরভ, 'সীন' এবং 'রা' বর্ণদ্বয় এর অধ্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর বিশাল বৃক্ষের পার্শ্বস্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাসমূহ থেকে অলংকারপূর্ণ বর্ণনা প্রবাহিত হয় এবং রচনা ফেটে বের হতে থাকে। হাদীসের সমুদ্রে জীবনাদর্শ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তথায় সন্তরণকারীদের (অন্বেষণকারী) জন্য নোঙ্গর রয়েছে। এর ঘাঁটি মদের উপর দিয়ে বহুযুগ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অথচ এর মদের ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়নি এবং মদ্যপায়ীরাও ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েনি।"

উপরোক্ত কবিতাংশে আহমাদ শাওকী কর্তৃক হাদীসকে মদের সাথে এবং হাদীসের পাঠকদেরকে মদ্যপায়ীদের সাথে তুলনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কেননা হাদীসের অলংকার থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যা কিছু গ্রহণ করুক না কেন এবং এর সাথে মানব অন্তর যতই সম্পৃক্ত হোক না কেন একে মদের সাথে চিত্রিত করা যায় না। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) এর প্রতি যেখানে মদ হারাম করে 'আল-কুরআন' এর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী তথা 'আল-হাদীস'কে মদের সাথে কিছুতেই তুলনা করা যায় না।

নবী করীম (সা.) এর প্রজন্ম ও ইসলামের মহান ব্যক্তিত্ব

নবী করীম (সা.)তাঁর জীবদ্দশায় এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন যারা তাঁর অবর্তমানে দ্বীন ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন যদ্বারা ইসলাম প্রায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় ঐ সকল নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বের বীরত্ব, জান-মালের বিনিময়ে স্বীয় বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের যে বিরাট অবদান তার প্রশংসা করেছেন।

'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّــةُ কসীদায় কবি তাঁদের এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তাঁরা ছিলেন অসামান্য বীরত্বের অধিকারী। ইসলাম ও মহানবী (সা.)এর প্রতি আপতিত বিবিধ অনিষ্ট ও দুঃখ-কষ্টকে তাঁরা তাঁদের উন্নত চরিত্র, বীরত্ব এবং জীবনের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দানের মাধ্যমে প্রতিহত করেছিলেন। ফলে তাঁরা শিরক ও প্রতিমা পূজা মূলোৎপাটনে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি বলেন যে, তাঁরা স্বীয় ঈমানের বলিষ্ঠতা, আত্মার পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ক্ষেত্রে খোদাদ্রোহীদের নিকট ভীতির কারণে পরিণত হন, যদ্দরুণ পৃথিবী তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতো এবং তাঁদের ভয়ে প্রকম্পিত হতো। তাঁরা পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে এর চেয়ে অধিক মূল্যবান ও অধিক স্থায়ী পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তাই যখন দেশের পর দেশ তাদের হাতে বিজিত হলো, জনগণ তাঁদের অধীনে আসলো তাঁরা কারো প্রতি অত্যাচার করেননি এবং জীবনের প্রাচুর্য ও ক্ষণস্থায়ী সাজ-সজ্জার প্রতি লালায়িত হননি। এমনিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গড়া প্রজন্ম ছিল শৌর্য-বীর্য, ধৈর্য, সংগ্রাম, উৎসর্গের দ্বারা ভূষিত এবং জীবনের চাকচিক্য ও অসার ভোগ-বিলাসের সামগ্রীর প্রতি মোহ মুক্ত। কবির ভাষায়:[১১১]

هَلْ كَانَ حَوْلَ مُحَمَّدٍ مِنْ قَــــوْمِهِ * إِلاَّ صَبِيٌّ وَاحِدٌ وَ نِسَــــــاءُ؟

১১১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০।

Dhaka University Institutional Repository

فَدَعَا، فَلَـــبَّى فِي الْقَبَائِلِ عُصْـــبَـــةٌ * مُسْتَضْعَـــفُوْنَ ، قَلَائِلُ أَنْضَاءُ
رَدُّوْا بَـــأْسِ الْعَـــزْمِ عَنْهُ مِنَ الأَذَى * مَا لَا تَرُدُّ الصَّخْرَةُ الصَّـــمَّاءُ

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চতুর্দিকে তাঁর বংশ থেকে একজন শিশু (আলী) ও কয়েকজন মহিলা ব্যতীত কেউ ছিল কি? অনন্তর তিনি দ্বীন ইসলামের আহ্বান জানালেন, বিভিন্ন গোত্র থেকে একটি দল তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়, যারা ছিল শক্তিতে দুর্বল, সংখ্যায় স্বল্প এবং দৈহিক গঠনে কৃশ। তাঁর স্বীয় দৃঢ়তা শক্তিবলে নবীজি থেকে দুঃখ-দুর্দশা প্রতিহত করেন, যা কঠিন প্রস্তর প্রতিহত করতে পারতোনা।"

কবি আহমাদ শাওকী শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিকদের শত্রুতার মোকাবেলায় একটি ক্ষুদ্র ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন মুসলিম বাহিনী কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি সহায়তা দানের বিষয়টি 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيْـــلِ কাসীদায় চমৎকারভাবে চিত্রায়ণ করে বলেন:[১১২]

وَحَـــمَاهَا غُرٌّ، كِرَامٌ أَشِـــدَّا * ءُ عَلَى الْخَـــصْمِ، بَيْـــنَهُمْ رُحَمَاءُ
أُمَّـــةٌ يَـــنْتَهِي الْبَيَانُ إِلَيْـــهَا * وَ تَـــؤُوْلُ الْعُلُوْمُ وَالْعُلَـــمَاءُ
جَازَتِ النَّجْمَ، وَاطْمَأَنَّتْ بِأُفُقٍ * مُطْمَـــئِـــنٌّ بِـــهِ السَّـــنَا وَالسَّنَاءُ
كُلَّـــمَا حَلَّـــتِ الرِّكَابُ لِأَرْضٍ * جَاوَرَ الرُّشْدُ أَهْـــلَهَا وَالـــذَّكَاءُ

"তাঁর রক্ষকগণ হচ্ছেন উজ্জ্বল, শত্রুতার বিরুদ্ধে কঠোরমনা, নিজেদের মাঝে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। তাঁরা এমন একটি জাতি, যাদের প্রতি অলংকারপূর্ণ প্রাঞ্জল বর্ণনা পরিসমাপ্ত হয়; আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পন্ডিতগণ তাঁদের প্রতি ফিরে আসে। তাঁরা নক্ষত্ররাজিকে অতিক্রম করেন এবং তাঁরা এমন দিগন্তে শান্তি প্রাপ্ত হন যেখানে আলো ও উচ্চ মর্যাদা স্থির থাকে। যখনই কাফেলাসমূহ কোন ভূ-খন্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সৎপথ, প্রতিভা ও প্রজ্ঞা এর অধিবাসীদের প্রতিবেশিত্ব হয়ে যায়।"

'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْـــبُرْدَةِ কাসীদায় আহমাদ শাওকী ইসলামের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)(৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.), হযরত উমর ফারুক (রা.) (৫৮৩-৬৪৪ খ্রি.), হযরত ওসমান (রা.) (৫৭৫-৬৫৬ খ্রি.), হযরত আলী (রা.) (৬০০-৬৬১ খ্রি.)এবং ন্যায়-নীতিবান হিসেবে ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলে অভিহিত উমর বিন আবদুল আযীয (৬৮২-৭০২ খ্রি.) এর উদাহরণ পেশ করেছেন,[১১৩]

خَلَائِـــقُ اللهِ جَلُّوْا عَنْ مُوَازَنَـــةٍ * فَلَا تَقِيْسَـــنَّ أَمْلَاكَ الْـــوَرَى بِهِمِ
مَنْ فِي الْبَرِيَّةِ كَالْفَارُوْقِ مَعْدَلَـــةً ؟ * وَكَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْخَاشِعِ الْحَشِمِ؟
وَكَالإِمَامِ إِذَا مَا فَـــضَّ مُزْدَحِـــمًا * بِـــمَـــدْمَعٍ فِي مَآقِي الْقَوْمِ مُزْدَحِمِ

"মহান আল্লাহর খলীফাগণ পারস্পরিক তুলনা থেকে মহিমান্বিত, সুতরাং বিশ্বের রাজণ্যবর্গকে তাঁদের সাথে কখনো তুলনা করবে না। বিশ্বে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে কে আছে? আর কোথায় আছে খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয (র.) এর মত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত বিনয়ী?

১১২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১১৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আর কে আছে ইমাম হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) এর মত, যখন তিনি বিপদগ্রস্ত সম্প্রদায়ের রোদনস্থলে অশ্রু সজল নেত্রে জনতার ভীড় ছিন্ন করেন।"

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ছিলেন চরম সম্মানীয়। কেননা পার্থিবজীবনের প্রতি তাঁদের কোন মোহ ছিল না এবং মৃত্যুকে তাঁরা ভয় করতেন না। এক কথায় জীবন-মৃত্যু তাঁদের বিবেচনায় সমান ছিল। অসম্মান, অমর্যাদা তাঁদের মনে কোনভাবেই প্রবেশ করেনি। ইসলামের বিরুদ্ধবাদী ও এর শত্রুদের মিথ্যা অপবাদ প্রতিহত করে কবি আহমাদ শাওকী সমসাময়িক মুসলমানদের তাঁদের পূর্ববর্তী মুসলমানদের আদর্শ অনুসরণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِي وَادِي النِّيْلِ শীর্ষক কাসীদায় বলেন:[১১৪]

هَكَذَا الْمُسْلِمُوْنَ ، وَالْعَرَبُ الْخَا * لُوْنَ، لاَ مَا يَقُوْلُهُ الأَعْدَاءُ
فَبِهِمْ فِي الزَّمَانِ نِلْنَا اللَّيَالِيَ * وَبِهِمْ فِي الْوَرَى لَنَا أَنْبَاءُ
لَيْسَ لِلذُّلِّ حِيْلَةٌ فِيْ نُفُوْسٍ * يَسْتَوِيْ الْمَوْتُ عِنْدَهَا وَالْبَقَاءُ

"এমন হচ্ছে মুসলমান ও বন্ধুত্বকারী আরবগণ, তাঁরা এমন নন যা শত্রুরা বলে থাকে। অনন্তর তাঁদের মাধ্যমে যুগপৃষ্ঠে (সুখের) রাত্রিসমূহ পেয়েছি এবং তাঁদের মাধ্যমে বিশ্বের মাঝে আমাদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সংবাদাদি। ঐ সকল লোকদের মধ্যে অপমানের কোন কারণ থাকতে পারে না, যাদের নিকট মৃত্যু ও বেঁচে থাকা সমান।"

মহানবী (সা.) এর শাফা'আত কামনা

আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাফা'আত তথা সুপারিশের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসের বিপদাদির অবসান কামনা করে বলেন যে, তিনি যখন অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় মহানবী (সা.) এর শাফা'আত দ্বারা সম্মান লাভ কামনা করেন, তাঁর কাছে কবির এ প্রার্থনা অতিসামান্য ব্যাপারই বটে। খোদাভীরু বান্দাগণ যখন তাদের সৎকর্ম নিয়ে অগ্রসর হবে তখন তিনি তাঁর জীবনে কৃত ভুল-ভ্রান্তির জন্য লজ্জায় অশ্রুসজল হয়ে অগ্রসর হবেন। এরপর কবি বলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ, নবীকুলের শিরোমণি এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। তিনি তাঁকে ভালবেসে এবং যে কিয়ামত দিবসে যখন কৌলিন্য ও বংশমর্যাদা কোন কাজে আসবে না সেদিনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর স্তুতি কবিতা রচনা করেছেন। কবির ভাষায়:[১১৫]

إِنْ جَلَّ ذَنْبِيْ عَنِ الْغُفْرَانِ لِيْ أَمَلٌ * فِي اللهِ يَجْعَلُنِيْ فِي خَيْرِ مُعْتَصَمِ
أُلْقِى رَجَائِيْ إِذَا عَزَّ الْمُجِيْرُ عَلَى * مُفَرِّجِ الْكَرْبِ فِي الدَّارَيْنِ وَالْغُمَمِ
إِذَا خَفَضْتُ جَنَاحَ الذُّلِّ أَسْأَلُهُ * عِزَّ الشَّفَاعَةِ، لَمْ أَسْأَلْ سِوَى أَمَمِ

"ক্ষমার চেয়ে আমার পাপ যদিও বেশী, তথাপি আল্লাহ পাকের নিকট আমার আশা রয়েছে যে, তিনি আমাকে সর্বোত্তম নিস্পাপ করে দেবেন। আমি আমার আশা রাখবো যখন আশ্রয়দাতা মহান আল্লাহ উভয় জাহানে এবং দুশ্চিন্তালগ্নে বিপদ দূরীভূতকারী মহানবী (সা.) কে সম্মান প্রদর্শন করবেন।

---

১১৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

১১৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

যখন আমি বিনয়ের বাহু নত করয়ো, আমি তাঁর নিকট সুপারিশের মর্যাদা প্রার্থনা করব, আর আমি সামান্য ছাড়া বোশী চাইব না।"

উদ্ধৃত চরণত্রয়ের মধ্যে আহমাদ শাওকীর বিখ্যাত প্রথমোক্ত চরণটি সম্পর্কে প্রখ্যাত মিসরীয় সাহিত্যিক ইয়াহ্ইয়া হাক্কীর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, "সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী উম্মে কুলসুমের আরবীয় সঙ্গীতে যতবারই আমি উপরোক্ত চরণটি শুনেছি, ততবারই আমার মনে হয়েছে যে, আমি কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীর মুখমন্ডলকে অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও বিনয় সহকারে মুচকি হাস্যরত দেখেছি।"[১১৬]

'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْـــبُرْدَةِ কাসীদায় নবী করীম (সা.)কে 'আমীর আল-আম্বিয়া' أَمِيْرُ الأَنْبِيَاءِ। তথা 'নবীগণের সর্দার' হিসেবে অভিহিত করে আহমাদ শাওকী বলেছেন:[১১৭]

لَزِمْتُ بَابَ أَمِيْرِ الأَنْبِـــيَاءِ، وَمَنْ * يُمْسِكْ بِمِفْتَاحِ بَابِ اللهِ يَغْتَـــنِمُ

"আমি নবীগণের নেতার দ্বার দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের দ্বারের চাবি আকড়িয়ে ধরে সে লাভবান হয়।"

হাশরের দিবসে উম্মতের শাফা'আতকারী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে আহমাদ শাওকী বিরচিত 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْـــبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদার পংক্তিতে কবির জীবনবোধ সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নের চরণে কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী তাঁর নামের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আহমাদ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর নামের সামঞ্জস্যতা থাকার কারণে রাসূলে করীম (সা.)এর মহান শাফা'আত লাভের অসীলা কামনা করে বলেন:[১১৮]

يَا أَحْمَدُ الْخَيْرُ لِي جَاهٌ بِتَسْمِيَتِي * وَكَيْفَ لاَ يَتَسَامَى بِالرَّسُوْلِ سَمِيْ ؟

"হে সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসিত ব্যক্তি! আমার নামকরণে রয়েছে আমার মর্যাদা, আর কিভাবে আমার নাম রাসূল (সা.) এর দ্বারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে না?"

রাসূল কারীম (সা.) এর প্রশংসায় রচিত 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী মহানবী (সা.) এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর কুমারী সদৃশ্য পংক্তিগুলোকে মাধ্যম করে সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্য উপস্থাপন করে বলেন যে, এগুলোকে অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করলে এদের কোন মোহর বা বিনিময় দিতে হবে না, বরং এদের মোহর হবে কাল হাশরের দিনে তাঁর জন্য মহানবী (সা.) এর সদয় শাফা'আত। কবির ভাষায়: [১১৯]

يَا مَنْ لَهُ عِزُّ الشَّفَاعَـــةِ وَحْـــدَهُ * وَهُـــوَ الْمُــنَـــزَّهُ، مَا لَهُ شُـــفَعَاءُ

১১৬. ইয়াহইয়া হাক্কী, হাযা আল-শি'র, 'শাওকী আমীর আল-শু'আরা', পৃ. ৬০।

১১৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৯৪।

১১৮. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১৪৮; আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

১১৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

عَــرْشُ الْقِيَامَةِ أَنْتَ تَحْتَ لِوَائِــهِ * وَالْحَــوْضُ أَنْتَ حِــيَالَــهُ السَّقَّاءُ

"ওহে মহান ব্যক্তি! যার জন্য রয়েছে এককভাবে সুপারিশের মর্যাদা অথচ তিনি হচ্ছেন পুতঃপবিত্র, যার কোন সুপারিশকারী নেই। কিয়ামত দিবসে আপনি আরশের পতাকাতলে অবস্থান করবেন, আর হাউজে কাউসারের অবস্থা এমন থাকবে যে, এর সামনে পর্যাপ্ত পানি পান করাবেন।"

অনুরূপভাবে 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-উলা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الأُوْلَى কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি উৎসর্গীত তাঁর স্তুতি কবিতার দ্বারা নবীজির অনুগ্রহ ও কিয়ামত দিবসে তাঁর শাফা'আত কামনা করে কবি আহমাদ শাওকী বলেন:[১২০]

رَسُوْلُ اللهِ لَـــنْ يَـــشْقَـــى * بِـــبَابِـــكَ مَنْ يَـــؤُمُّـــهُ

وَأَيْـــــــنَ النَّارُ مِنْ بَشَـــرٍ * بِـــرُؤْيَتِهِ تُحَـــرَّ مُـــــهُ؟

أَنَا الْمَـــرْحُـــوْمُ يَوْمَـــئِـــذٍ * بِشِـــعْرٍ فِيْكَ أَنْظُـــمُـــهُ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দ্বার থেকে তাঁর ইচ্ছা পোষণকারী নিরাশ হয় না। আর এমন একজন মানুষ থেকে নরক কোথায়? যার দর্শনের মাধ্যমে তাঁর জন্য নরক হারাম হয়ে যায়। সেদিন আমি আপনার শানে রচিত আমার কবিতাবলী দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হব।"

রাসূল প্রশস্তিকারীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আহমাদ শাওকীই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের জন্য নবী করীম (সা.) এর শাফা'আত কামনার পাশাপাশি সকল মুসলমানের জন্য অনুরূপ শাফা'আত প্রার্থনা করেছেন। যেমন-কবি 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অসীলায় এই মর্মে আল্লাহ তা'আলার নিকট শাফা'আত প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন মুসলমানদেরকে তাঁর করুণা দ্বারা আবৃত করেন। যাতে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ ও অক্ষমতার শৃংখল থেকে মুক্ত হয়। শত্রুদের মোকাবেলা এবং তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি সামর্থও তিনি কামনা করেছেন, যেন তারা অলস নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতে পারে। যেমনিভাবে অনেক জাতি জাগ্রত হয়েছে, মুসলমানদের ন্যায় যাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস নেই এবং মুসলমানদের সঠিক ধর্মের ন্যায় তাঁদের এমন সৎপথ প্রদর্শনকারী ধর্মও নেই। কবির ভাষায়:[১২১]

يَا رَبِّ ، هَــبَّتْ شُعُوْبٌ مِنْ مَنِيَّتِهَا * وَاسْتَيْقَظَتْ أُمَمٌ مِنْ رَقْــدَةِ الْعَدَمِ

سَعْدٌ، وَنَحْسٌ وَمُلْكٌ أَنْتَ مَالِكُهُ * تُـــدِيْلُ مِنْ نِعَمٍ فِيْهِ ، وَمِنْ نِقَـــمِ

رَأَى قَضَاؤُكَ فِيْـــنَا رَأْيَ حِكْمَتِهِ * أَكْرِمْ بِوَجْهِـــكَ مِنْ قَاضٍ وَمُنْتَقِمِ

"হে প্রতিপালক! বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের মৃত্যু থেকে জেগে উঠেছে, আর জাতিসমূহ অস্তিত্ব -হীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছে। আপনি সৌভাগ্যবান, দুর্ভাগ্যবান এবং রাজত্বের অধিপতি! আপনি এতে সুখ এবং শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আমাদের মধ্যে আপনার বিচারের সিদ্ধান্ত, তাঁর কৌশলের সিদ্ধান্ত, বিচারক ও শাস্তিদাতা হিসেবে আপনার সত্তা কতই না সুমহান! "

---

১২০. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ১৫০।

১২১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّــةُ النَّبَوِيَّــةُ কাসীদায় কবি মুসলমানদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অসীলা কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন মুসলমানদের সত্য, সৎপথ, ঐক্য ও শক্তির দ্বারা মহিমান্বিত করেন, কেননা তারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এদের কেউ কেউ আবার জীবনের মোহ-মায়া ও সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মুসলমানদের এক গোষ্ঠী ইসলামের শত্রুদের তাদের নির্ভরতার সংশয় সংক্রান্ত ধারণাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছে। তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে থেকে অত্যাচারী হয়ে পড়েছে। কেননা ইসলাম ধর্ম এমন পরিপূর্ণ জীবন বিধান- যা বিশ্বে প্রভাবশালী একটি মহান সভ্যতা সংস্কৃতি। কবির ভাষায়:[১২২]

مَا جِــئْتُ بَابَكَ مَادِحًا ، بَلْ دَاعِيًا * وَمِنَ الْمَدِيْحِ تَضَــرُّعٌ وَدُعَاءُ

أَدْعُوْكَ عَنْ قَوْمِيْ الضِّعَــافِ لِأَزْمَةٍ * فِي مِــثْلِهَا يُلْقَى عَلَيْكَ رَجَاءُ

أَدْرَى رَسُوْلُ اللهِ أَنَّ نُفُــــــــوْسَهُمْ * رَكِبَتْ هَوَاهَا،وَالْقُلُوْبُ هَوَاءُ ؟

مُتَــفَــكِّكُوْنَ، فَمَا تَضُمُّ نُفُوْسَهُم * ثِقَةٌ، وَلَاجَمَعَ الْقُلُوْبَ صَفَاءُ

"আমি আপনার দ্বারে প্রশংসাকারী হিসেবে নয় বরং প্রার্থনাকারী হিসেবে আগমন করেছি, আর স্তুতি কবিতার মধ্যে বিনয় প্রকাশ ও প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমি আপনাকে আমার দুর্বল সম্প্রদায়ের একটি সংকটের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, অনুরূপ সমস্যার মধ্যে আপনার নিকটই আশা করা যায়। আল্লাহর রাসূল কি অবগত আছেন যে, তাদের অন্তরসমূহ তাদের প্রবৃত্তির বাহনে আরোহণ করেছে এবং তাদের হৃদয়সমূহ শূণ্য হয়ে পড়েছে? তারা বিচ্ছিন্ন, ফলে কোন অবস্থা তাদের অন্তঃকরণসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না, আর কোন পবিত্র ব্যক্তি তাদের হৃদয়সমূহকে একত্রিত করতে পারছে না।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে তাঁর উম্মাতের জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবেন। তাই 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ কাসীদার শেষাংশে পুনর্বার মুসলমানদের জন্য শাফা'আত কামনা করে আহমাদ শাওকী বলেন: [১২৩]

سَــأَلْتُ اللهَ فِي أَبْنَاءِ دِيْنِــي * فَإِنْ تَــكُنِ الْــوَسِيْــلَــةَ لِيَ أَجَابَا

وَمَا لِلْمُسْلِمِيْنَ سِــوَاكَ حِصْنٌ * إِذَا مَا الضُّــــــرُّ مَسَّـــهُمْ وَنَابَا

"আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার ধর্মীয় লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, অনন্তর আমার জন্য যদি কোন মাধ্যম থেকে থাকে তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। আর যখন কোন বিপদ মুসলমানদেরকে স্পর্শ ও আক্রান্ত করে, তখন আপনি ব্যতীত মুসলমানদের জন্য আর কোন দুর্গ নেই।"

খেদীব দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী পাশা (১২৯১-১৩৬৩ হি./১৮৭৪-১৯৪৪ খ্রি.) এর হজ্জ গমন উপলক্ষে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পঠিত 'ইলা আরাফাত' إِلَى عَرَفَاتٍ নামক কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট তাঁর অভিযোগ, মুসলমানদের পশ্চাদপদতার ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ এবং তাদের অসহায়ত্ব ও নিদ্রাচ্ছন্নতার বিষয়টি পেশ করার জন্য আহমাদ শাওকী বিশেষ অনুরোধ জানান। কবি তাঁর অভিযোগকে

---

১২২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

১২৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রার্থনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন, যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম জাতিকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত জীবন-যাপনের জন্য উজ্জীবিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। কবির তাষায় :[১২৪]

إذَا زُرْتَ يَا مَوْلاَيَ قَبْرَ مُحَمَّدٍ * وَقَبَّلْتَ مَثْوَى الأَعْظَمِ الْعَطِرَاتِ
وَفَاضَتْ مِنَ الدَّمْعِ الْعُيُوْنُ مَهَابَةً * لأَحْمَدَ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْحُجُرَاتِ
فَقُلْ لِرَسُوْلِ اللهِ : يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ * أَبُثُّكَ مَا تَدْرِيْ مِنَ الْحَسَرَاتِ
شُعُوْبُكَ فِي شَرْقِ الْبِلاَدِ وَغَرْبِهَا * كَأَصْحَابِ كَهْفٍ فِي عَمِيْقِ سُبَاتِ
بِأَيْمَانِهِمْ نُوْرَانِ : ذِكْرٌ وَسُنَّةٌ * فَمَا بَالُهُمْ فِي حَالِكِ الظُّلُمَاتِ؟
فَقُلْ : رَبِّ وَفِّقْ لِلْعَظَائِمِ أُمَّتِيْ * وَزَيِّنْ لَهَا الأَفْعَالَ وَالْعَزَمَاتِ

"হে আমার অধিকর্তা! যখন আপনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কবর যিয়ারত করবেন এবং সর্বাধিক সুগন্ধময় আশ্রয়স্থলের মাটি চুম্বন করবেন আর আচ্ছাদন ও প্রস্তরাদির মধ্যে আহমাদ (সা.) এর জন্য ভালবাসাবশতঃ আপনার চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে সিক্ত হবে, তখন আপনি আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে বলবেনঃ হে সর্বোৎকৃষ্ট প্রেরিত মহাপুরুষ! আমি আপনাকে অবহিত করব এমন সব আক্ষেপের বিষয় যা আপনি অবগত আছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে আপনার উম্মতগণ গুহাবাসীদের ন্যায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন রয়েছে। তাদের ডান হাতে রয়েছে দু'টি আলোঃ 'আল-কুরআন' ও 'আল-সুন্নাহ' ; তাহলে তাদের অবস্থা এমন কেন যে, তারা অন্ধকারে তমসাচ্ছন্ন হচ্ছে? অতঃপর (রাসূলকে সম্বোধন করে কবি বলেন) আপনি বলুনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের মহান কার্যাবলী সম্পাদন করার তাওফীক দিন এবং তাদেরকে কর্মকান্ড ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের দ্বারা অলংকৃত করুন।"

---

১২৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

আহমাদ শাওকীর কবিতায় ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, যাতে ইসলামের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ও অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের সামগ্রিক বর্ণনা যেহেতু কবির বিষয়বস্তুর আওতাধীন নয়, বিধায় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইসলাম বিশ্বাস, ইবাদাত ও বিধি-বিধানের দিক দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মধ্যম নীতিসম্পন্ন ধর্ম, যা উন্নত মানবতার জন্য উপযুক্ত এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মহানসত্যটি ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। কবির ভাষায়:[১২৫]

بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَامَتْ سَمْحَةٌ * بِالْحَقِّ مِنْ مِلَلِ الْهُدَى غَرَّاءُ

"হে আবদুল্লাহর পুত্র (হযরত মুহাম্মদ (সা.)!) আপনার মাধ্যমে উজ্জ্বল সৎপথ প্রদর্শনকারী ধর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি সত্যভিত্তিক মধ্যমনীতিপূর্ণ সংবেদনশীল ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

ইসলামের চিরস্থায়ী মু'জিযা আল-কুরআন

আহমাদ শাওকী তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْـــزِيَّةُ النَّبَوِيَّـــةُ কাসীদায় পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেন যে, এটি ইসলামের একটি চিরস্থায়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। এর পর অন্য কোন মু'জিযা অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। নবী করীম (সা.) তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদের সম্মুখে আল-কুরআনকে স্থায়ী চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, আল-কুরআন আরবী অলংকার শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় বর্ণনায় অতুলনীয়। পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনার পর আরবের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই নতুন ধর্মের দ্বারা তাদের মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীষণ সন্ত্রস্ত ও অস্থির হয়ে পড়ল। কেননা তারা উপলব্ধি করেছিল যে আল-কুরআনের মোকাবেলা করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। তথাপি উকায মেলায় তারা আল-কুরআনের সাথে প্রতিযোগিতার প্রয়াস চালায় এবং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়, এতে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরপরও তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে 'কবি' ও 'যাদুকর' বলে অপবাদ দিয়েছিল। নবীজির প্রতি তাদের এহেন মিথ্যা আরোপ ছিল তাদের হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনের বহিঃপ্রকাশ। নবী করীম (সা.) না ছিলেন কবি, না যাদুকর; বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত, সাহায্য ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত রাসূল। কবির ভাষায়:[১২৬]

يَا أَيُّهَا الأُمِّيُّ حَسْبُكَ رُتْبَـــةً * فِي الْعِلْمِ أَنْ دَانَتْ بِكَ الْعُلَمَاءُ
صَدْرُ الْبَيَانِ لَهُ إِذَا الْتَقَتِ اللُّغَى * وَتَقَدَّمَ الْبُلَغَـــاءُ وَالْفُصَحَاءُ
أَزْرَى بِمَنْطِقِ أَهْلِــهِ وَ بَيَانِهِمْ * وَحْيٌ يُقَصِّـــرُ دُونَـــهُ الْبُلَغَاءُ
حَسَدُوا، فَقَالُوا : شَاعِرٌ أَوْسَاحِرٌ * وَمِنَ الْحَسُوْدِيَكُوْنُ الاسْتِهْزَاءُ

---

১২৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১২৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

"হে নিরক্ষর নবী! জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা হিসেবে এটুকু আপনার জন্য যে (বিশ্বের) জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিরা আপনার প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। আল-কুরআনে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, যখন বিভিন্ন ভাষাসমূহ একত্রিত হয় এবং বাগ্মীগণ ও অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিতগণ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আসে। প্রত্যাদেশগ্রন্থ এর ভাবাভাষীদের কথা ও বর্ণনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং এর সামনে বাগ্মী, কবি-সাহিত্যিকগণ অক্ষম প্রমাণিত হয়। তারা বিদ্বেষ পোষণ করে অতঃপর তারা বলে যে, তিনি 'কবি' অথবা 'যাদুকর', আর হিংসুকদের থেকেই বিদ্রূপ প্রকাশ পায়।"

অতঃপর কবি আহমাদ শাওকী বলেন যে, ইসলাম হচ্ছে আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা সুদৃঢ় একটি বিশাল সৌধ। এর ভিত্তি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা মহান আল্লাহই এর ভিত্তি স্থাপনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা। কবির ভাষায়:[১২৭]

دِيْنٌ يُشَـيِّدُ آيَـــةً فِي آيَــةٍ * لَبِنَاتُــهُ السُّوْرَاتُ وَالأَضْوَاءُ

اَلْحَقُّ فِيْهِ هُوَ الأَسَاسُ، وَكَيْفَ لاَ * وَاللهُ جَــلَّ جَلاَلُهُ الْبَــنَّاءُ ؟

"ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যে,যার একটি নিদর্শন অপর একটি নিদর্শনকে সুদৃঢ় করে, আর এর ইটগুলো হচ্ছে আল-কুরআনের সূরা ও উজ্জ্বল ভাবসমূহ। এই সৌধরূপ ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সত্য, আর কিভাবে তা হবে না? যখন মহান আল্লাহ হচ্ছেন তার স্থপতি।"

'নাহ্জ আল-বুরদা' نَــــهْجُ الْــبُرْدَةِ কাসীদায় আহমাদ শাওকী আল-কুরআনকে চিরস্থায়ী মু'জিযা হিসেবে বর্ণনা করেন। আর নবীগণের মু'জিযাসমূহকে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় সেগুলোকে সাময়িক বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে, আল-কুরআন নতুন নতুন অলংকারের সমাহার, যার সৌন্দর্য যুগের অতিক্রমের সাথে সাথে আরো উদ্ভাসিত হবে যা সত্য, খোদাভীতি, ন্যায়-পরায়ণতা, পরোপকারিতার প্রতি আহ্বানে পরিপূর্ণ। কবির ভাষায়:[১২৮]

جَاءَ النَّبِيُّوْنَ بِالآيَاتِ فَانْصَرَمَتْ * وَجِئْتَنَا بِحَكِـيْمٍ غَيْــرِ مُنْصَــرِمِ

آيَاتُهُ كُلَّمَا طَالَ الْمَدَى جُــدُدٌ * يَــزِيْنُهُنَّ جَلاَلُ الْعِتْــقِ وَالْقِــدَمِ

يَكَادُ فِي لَفْــظَةٍ مِنْهُ مُشَرَّفَــةٍ * يُوْصِيْكَ بِالْحَقِّ، وَالتَّقْوَى، وَبِالرَّحِمِ

"পূর্ববর্তী নবীগণ নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেন, অনন্তর সেগুলো রহিত হয়ে যায়, আর আপনি আমাদের এমন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ (আল-কুরআন) নিয়ে আসেন যা রহিত হওয়ার নয়। এর চরণসমূহ যতই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই নতুন বলে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এগুলোকে প্রাচীনত্ব ও চিরন্তনের মাহাত্ম্য অলংকৃত করছে। এর একটি উজ্জ্বল শব্দ উচ্চারণ করতে না করতে তা ন্যায়, খোদাভীতি ও দয়ার উপদেশ প্রদান করছে।"

ইসলামের একনিষ্ঠ একত্ববাদ

সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত মহান আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন হিসেবে ইসলাম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّــةُ কাসীদায় ইসলামের খাঁটি একত্ববাদের প্রতি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তাওহীদ বা একত্ববাদ হচ্ছে ইসলামী 'আকীদার ভিত্তি, কারণ এটি স্বভাবসুলভ। প্রাচীনকালে দার্শনিক ও

১২৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

১২৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাবিদগণ একত্ববাদের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান এবং এর সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। কিন্তু মূর্খ লোকেরা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের বিরোধিতা করে ও তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করে। যেমন- বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯ অব্দ) কে তারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ফির'আউনের আমলেও মিসরের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গণকেরা জনগণকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, এমনকি প্রাচীন মিসরীয়রা তাদের বহু উপাস্যের ক্ষেত্রেও তাদেরকে সুমহান এক উপাস্যের প্রতিভু বলে বিশ্বাস করতো। কবির ভাষায়:[১২৯]

بُنِيَــتْ عَلَى التَّوْحِيْدِ، وَهُوَ حَقِـيْقَةٌ * نَادَى بِهَا سُقْــرَاطُ وَالْقُدَمَاءُ
وَجَــدَ الــزُّعَافَ مِنَ السُّمُوْمِ لأَجْلِهَا * كَالشُّهْدِ ، ثُمَّ تَتَابَعَ الشُّهَدَاءُ
وَمَــشَى عَلَى وَجْــهِ الزَّمَــانُ بِنُوْرِهَا * كُهَّانُ وَادِي النِّيْلِ وَالْعُرَفَاءُ
إِيْــزِيْسُ ذَاتُ الْمُــلْكِ حِيْنَ تُوَحَّدَتْ * أَخَذَتْ قِوَامَ أُمُوْرِهَا الأَشْــيَاءُ

"এই মধ্যমনীতি সম্পন্ন ধর্ম (ইসলাম) একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এটি হচ্ছে বাস্তব সত্য; এরই আহ্বান জানিয়েছিলেন সক্রেটিস এবং প্রাচীন পন্ডিত দার্শনিকগণ। তাঁকে এ কারণে মধুর ন্যায় মারাত্মক বিষ পান করতে হয়েছিল, অতঃপর শহীদগণ ক্রমাগতভাবে তাঁকে অনুসরণ করে। আর একত্ববাদের আলোর দ্বারা যুগপৃষ্ঠে নীল উপত্যকায় গণক ও জ্যোতিষগণ পরিভ্রমণ করেন। প্রাচীন মিসরীয় সম্রাজ্ঞী 'ইযীস' যখন একত্ববাদ গ্রহণ করে তখন রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে।"

উক্ত চরণের মাধ্যমে কবি আহমাদ শাওকী কুরাইশদের প্রতি বিদ্রূপ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁদেরকে সত্য স্বভাবসুলভ হৃদয়গ্রাহী ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালে তারা তাঁর চরম বিরোধিতা করে এবং তাঁকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। কুরাইশগণ হিংসা-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে মুক্তবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণে ব্যর্থ হয় এবং নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাসে অটল থাকে। কবি তাদের বুদ্ধি বিভ্রান্তির স্বরূপ উদঘাটন করে বলেন:[১৩০]

لَمَّــا دَعَوْتَ النَّاسَ لَبَّى عَاقِلٌ * وَأَصَمَّ مِنْكَ الْجَاهِــلِيْنَ نِدَاءُ
أَبَوْا الْخُرُوْجَ إِلَيْكَ مِنْ أَوْهَامِهِمْ * وَالنَّاسُ فِي أَوْهَامِهِمْ سُجَــنَاءُ
وَمِنَ الْــعُقُوْلِ جَدَاوِلُ وَ جَلاَمِدُ * وَمِنَ النُّــفُوْسِ حَرَائِرُ وَإِمَاءُ

"যখন আপনি লোকদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহ্বান জানান, তখন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দেন, আপনার পক্ষ থেকে একটি আহ্বান অজ্ঞদেরকে বধির করে দেয়। তারা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা থেকে আপনার প্রতি বের হয়ে আসতে অস্বীকৃতি জানায়, আর লোকেরা স্বীয় কল্পনায় বন্দী। কারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তাসমূহের কোনটি ঝর্ণা ও কোনটি পাষাণ পাথরসদৃশ এবং মানুষের মধ্যে কেউ স্বাধীন ও কেউ পরাধীনমনা।"

ন্যায় ও পরামর্শভিত্তিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা

আহমাদ শাওকী যুগ যুগ ধরে স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণমূলক প্রশাসনের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ

---

১২৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১৩০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষক কাসীদায় বলেন, মানবগোষ্ঠী প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ) এর সময় কাল থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রশাসনের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও শোষণের মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এ থেকে মুক্তি ও আরোগ্য লাভের জন্য একজন মহান ত্রাণকর্তা ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছিল। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও ইনসাফ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীকে এহেন দীর্ঘ মেয়াদী ব্যধি থেকে আরোগ্য করেন এবং তাদের অসাম্য, পরাধীনতা ও অত্যাচারের শৃংখলা থেকে মুক্ত করেন। নবী করীম (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও পরামর্শভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থার পতাকাতলে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেল। এতে শাসক-শাসিত, ধনী-নির্ধন, বংশ-প্রতিপত্তি ও বর্ণ-বৈষম্যের কোন ভেদাভেদ রইল না। ফলে প্রাচীনকালে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীভেদ এবং দুঃশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কবির ভাষায়:[১৩১]

دَاءُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَرَسْطَطَالِيسَ لَمْ * يُوْصَفْ لَــهُ حَتَّى أَتَيْتَ دَوَاءُ
فَرَسَمْتَ بَعْدَكَ لِلْعِبَادِ حُكُوْمَــةً * لاَ سُوْقَــةُ فِيْهَا وَلاَ أُمَـــرَاءُ
اَللهُ فَــوْقَ الْخَلْقِ فِيْهَا وَحْــدَهُ * وَالنَّاسُ تَحْتَ لِوَائِهَا أَكْفَـــاءُ
وَالدِّيْنُ يُسْرٌ، وَالْخِــلاَفَــةُ بَيْعَةٌ * وَالأَمْرُ شُوْرَى، وَالْحُقُوْقُ قَضَاءُ

"এরিষ্টটল থেকে শুরু করে মানব সমাজের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয়নি যে পর্যন্ত না আপনি ঔষধ নিয়ে আগমন করেন। অনন্তর আপনি মহান আল্লাহর বান্দাদের জন্য এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাতে প্রজা ও শাসকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এককভাবে সৃষ্টিকুলের উপর (সার্বভৌমত্বের অধিকারী) রয়েছেন, এর পতাকাতলে লোকেরা সর্বসম। ইসলাম হচ্ছে সহজ আর খিলাফত হচ্ছে আনুগত্য কার্যাবলী পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদনীয় এবং অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ রয়েছে।"

মুসলিম জাতির শক্তি ও গৌরব

আহমাদ শাওকীর ধর্মীয় কবিতাবলীর মধ্যে মুসলমানগণ সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী অনারব ও তাদের প্রতিবেশী থেকে গৃহীত জাগৃতির সংস্কৃতির দ্বারা সংস্কৃতিবান, অজ্ঞতার অন্ধকারের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসার শক্তি, উচ্চ মর্যাদা, পাণ্ডিত্য ও অভিমতের দ্বারা স্বীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মজলিসে শুরার শাসনতন্ত্র আনয়নের দ্বারা মুসলমানগণ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে সগৌরবে উপস্থাপিত হয়েছে।[১৩২]

আহমাদ শাওকী তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ আল-বাইয়্যা' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ الْبَائِيَّــةُ শীর্ষক কবিতায় ইসলামের শিক্ষা অনুসরণের ফলে মুসলমানগণ যে গগনচুম্বি মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করতে পারে এবং ইসলাম যে পরনির্ভরশীলতা, দুর্বলতা ও পশ্চাদপদমুখিতার ধর্ম নয়, বরং ইসলাম কর্মের, শক্তির ও শক্তিশালীদের ধর্ম এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সুস্পষ্ট ভাষণ ও বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে সত্য ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে গৌরবের পথে অগ্রসর হতে এবং স্বহস্তে নিজেদের সৌধ নির্মাণ করতে শিখিয়েছেন। এহেন শিক্ষার

---

১৩১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

১৩২. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণের ফলে কিছুকাল পরে পৃথিবী তাদের অধীনস্থ হয়। কবি আহমাদ শাওকী বলেন যে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা আশার দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় না বরং চেষ্টা ও কর্মনিষ্ঠার দ্বারাই তা অর্জিত হয়। কবির ভাষায়:[১৩৩]

وَكَانَ بَيَانُـــهُ لِلْهُدَى سُبُلاً * وَكَانَتْ خَيْلُهُ لِلْـــحَقِّ غَابَا

وَعَلَّمَنَا بِنَاءَ الْمَجْدِ ، حَتَّى * أَخَذْنَا إِمْرَةَ الأَرْضِ اغْتِصَابَا

"মহানবী (সা.) এর প্রাঞ্জল বর্ণনা হিদায়েতের পথসমূহে পরিণত হয়, তাঁর অশ্বগুলো সত্যের জন্য আক্রমণকারী হয়। আর তিনি আমাদেরকে গৌরব নির্মাণ শিক্ষা দিতেন ফলে আমরা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'মারহাবান বিল হিলাল' مَرْحَـــبًا بِالْهِلاَلِ শীর্ষক কাসীদায় ইসলামের শত্রুগণ কর্তৃক ইসলাম সম্পর্কে দুর্বলতা ও আত্মসমর্পণের ধর্ম সম্পর্কিত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা খন্ডন করে ইসলামের হাকীকতের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাদেরকে গৌরব ও মর্যাদার উপকরণ ধারণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেন যে, ইসলাম ধর্ম সভ্যতার সুউচ্চ মিনার উন্নীত করেছে। ফলে বিশ্ব শত শত বছর ধরে এর দ্বারা উন্নতি ও অগ্রগতির সৎপথ লাভ করে। তিনি মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ফিরিয়ে আনার জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেন যে, তোমাদের আরব পূর্বপুরুষগণ ইসলামের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, সুদৃঢ়, বিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাঁরা একে শক্তি, মর্যাদা, শিক্ষা, সভ্যতা, ন্যায়-নীতি ও সচ্চরিত্রের দ্বারা অলংকৃত করেছিল। জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের প্রতি কোমল নম্র ভাষায় এহেন উপদেশ প্রদান করে সত্যাশ্রয়ী হওয়ার জন্য কবি তাদের 'উমাম আল-হিলাল' أُمَمُ الْهِلاَلِ বা 'নবচন্দ্রের জাতি' বলে সম্বোধন করেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের অবহিত করেন যে, তাদের ধর্ম হচ্ছে কর্ম ও প্রগতির যাতে তারা বুঝতে পারে কর্ম উদ্যম ও অগ্রগামিতা ইসলামের শিক্ষা ও স্বভাব। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বে মুসলমানদের নেতৃত্বের যুগে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাদেরকে অবহিত করে বলেন যে, তাদের পূর্ব পুরুষগণ যেমন সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মপরায়ণতার মাধ্যমে গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেছিল এবং তারা শান্তির ক্ষেত্রে করুণার ফেরেশ্‌তা ও কল্যাণের মেঘমালায় পরিণত হয়েছিল; অনুরূপভাবে তদ্রূপ মর্যাদা পেতে হলে তাদেরকেও ধর্মপরায়ণতার মাধ্যমে দৃঢ় সংকল্প সহকারে সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। কবির ভাষায়:[১৩৪]

أُمَـــمُ الْهِلاَلِ، مَقَالَةً مِنْ صَادِقٍ * وَالصِّـــدْقُ أَلْيَقُ بِالرِّجَالِ مَقَـــالاً

مُتَلَطِّفٍ فِي النُّصْحِ، غَيْرُ مُجَادِلٍ * وَالنُّصْحُ أَضْيَعُ مَا يَكُـــوْنُ جِدَالاً

سَـــرَتِ الْحَضَارَةُ حِقْبَةً فِي ضَوْئِهِ * وَمَشَى الزَّمَانُ بِنُـــوْرِهِ مُخْتَالاً

وَبَـــنَى لَهُ الْعَرَبُ الأَجَاوِدُ دَوْلَةً * كَالشَّـــمْسِ عَرْشاً، وَالنُّجُوْمِ رِجَالاً

"হে নবচন্দ্রের জাতিগণ ! তোমরা একজন সত্যবাদীর বক্তব্য গ্রহণ কর, আর সত্যভাষণ লোকদের কাছে বক্তব্য হিসেবে উপযোগী। যিনি উপদেশে কোমল, ঝগড়াকারী নন; কারণ কলহ বিবাদের লক্ষ্যে যে উপদেশাবলী হয়ে থাকে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইসলামের আলোতে সভ্যতার

---

১৩৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৭১।

১৩৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

জয়যাত্রা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং কালচক্র এর আলোতে আত্মগরিমায় এগিয়ে যায়। আর আরবগণ এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সিংহাসন ও তারকারাজির দীপ্তিমান ব্যক্তিবর্গকে তৈরী করে।"

শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বানের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের অস্ত্রহীনতা অনেক সময় কবিকে ব্যথিত করে। তাই 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةَ কাসীদায় এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করে কবি আহমাদ শাওকী বলেন: [১৩৫]

بِالأَمْسِ مَالَتْ عُرُوْشُ ، وَاعْتَلَتْ سُرُرٌ * لَوْلاَ الْقَذَائِفُ لَمْ تُثْلَمْ ، وَلَمْ تُصَمِ

أَشْيَاعُ عِيْسَى أَعَدُّوْا كُلَّ قَاصِمَةٍ * وَلَمْ نُعِدَّ سِوَى حَالاَتِ مُنْقَصِمِ

"গতকাল কতিপয় সিংহাসনের পতন হয় এবং অপর কতক আসনের উত্থান হয়, যদি সেখানে বোমা নিক্ষেপ করা না হত, তাহলে সেগুলো ভাঙ্গতো না এবং নিস্তব্ধ হত না। হযরত ঈসা (আ.) এর দলভুক্ত ব্যক্তিরা সর্বপ্রকার বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করেছে অথচ আমরা ভঙ্গুরময় ধ্বংসশীল অবস্থাদি ব্যতীত আর কিছুই তৈরী করিনি।"

'দাজীজ আল-হাজীজ' ضَجِيْجُ الْحَجِيْجِ শীর্ষক কবিতায় আহমাদ শাওকী মুসলমানদের হারানো স্বাধীনতা, হৃত গৌরব, তাদের দুর্বলতা এবং অনৈক্যের সুযোগে তাদের উপর আরোপিত বিপর্যয় ও সংকটসমূহে তাঁর গভীর আক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লজ্জায় প্রথমতঃ তাঁর পুঞ্জিভূত বেদনারাশি অব্যক্ত রাখা ও মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি স্বীয় চক্ষু ও কর্ণ বন্ধ রাখার চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু পরে কবি উপলব্ধি করেন যে, বিবেকবান, স্বাধীনমনা ও সংস্কারক ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় সমস্যাবলীর প্রতিকারে দীর্ঘসূত্রিতা এবং উদাসীনতার কোন অবকাশ নেই, তাই তিনি মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। কবি বলেন যে, ইসলামের শত্রুরা এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা মুসলিম দেশসমূহের অবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সেখানে প্রবেশ করেছে। কবির মতে, সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের চেয়ে মৃত্যু সহজতর। কারণ এ সকল কাজের পশ্চাতে রয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র। তাই কবি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি ও তাদের আরব সহযোগীদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরপর কবি বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ও প্রাধান্যের শোকাবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন যে, এর ফলে মুসলমানদের উপর দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্বলতার ঘনঘটায় দুর্যোগ নেমে আসে, আর মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নবীর সুন্নাতের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র গ্রহণ করে। ফলে তারা বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র হয়ে পড়ে, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জল ও স্থলসীমায় তাদের নৌযান ও ঘাঁটি স্থাপন করে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাই কবি আহমাদ শাওকী সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আতাতকারী নেতৃবৃন্দকে অমঙ্গলের শাসক ও ইসলামের শত্রু বলে অভিহিত করে বলেন:[১৩৬]

أَيُّ الصَّغَائِرِ فِي الإِسْلاَمِ فَاشِيَةٌ * تُوْدَىْ بِأَيْسَرِهَا الدَّوْلاَتُ وَالأُمَمُ

يَجِيْشُ صَدْرِيْ، وَلاَ يَجْرِيْ بِهَا قَلَمِيْ * وَلَوْ جَرَى لَبَكَى وَاسْتَضْحَكَ الْقَلَمُ

---

১৩৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।

১৩৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামে কোন ক্ষুদ্র পাপ কি প্রসারিত হওয়ার মত রয়েছে, যার একটি সহজতম পাপের দ্বারা রাষ্ট্র ও জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে? আমার বক্ষ ক্রোধে জ্বলছে এবং এর কারণে আমার কলম চলছে না, আর যদি উহা চলে তাহলে আমার বক্ষ ক্রন্দন করবে।"

কবি আহমাদ শাওকী মুসলমানদের নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ কবিতায় উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য সুদৃঢ় দুর্গসম সুমহান চরিত্র রেখে গেছেন, যা তাদের জন্য অনেক সময় শক্তি, প্রতিরক্ষা ও ভীতি প্রদর্শনের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। যখন তারা এ দুর্গ পরিত্যাগ করবে, তখন তারা দুর্বল, শক্তিহীন ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর দ্বারা কবি এ কথা বুঝিয়েছেন যে, চরিত্র, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জাতির বিজয়, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, ত্যাগ ও ধৈর্যের চাবি-কাঠি। চরিত্র মাধুর্যের দ্বারাই একটি জাতি অপর জাতির উপর বিশেষত্ব, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং একটি প্রাণী অপর প্রাণীর উপর প্রাধান্য লাভ করে থাকে। যদি সিংহ শক্তি ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে ব্যাঘ্র থেকে শ্রেষ্ঠতর না হত তাহলে মর্যাদার ক্ষেত্রে উভয় সমান হয়ে যেতো, অনুরূপভাবে যদি সাহসী অন্তর ও দক্ষ আঘাতকারী হস্ত না থাকত, তবে ধারালো তরবারী ও তার খাপ মানের ক্ষেত্রে সমান বলে পরিগণিত হত। কবির ভাষায়:[১৩৭]

وَلَوْ حَفِظُوْا سَبِيْلَكَ كَانَ نُوْرًا * وَكَانَ مِنَ النُّحُوْسِ لَهُمْ حِجَابًا

بَنَيْتَ لَهُمْ مِنَ الأَخْلاَقِ رُكْنًا * فَخَانُوْا الرُّكْنَ، فَانْهَدَمَ اضْطِرَابًا

"আর (হে নবী!) যদি তারা আপনার পথকে সংরক্ষণ করত তাহলে এটিই তাদের জন্য আলোকস্বরূপ হত এবং অশুভ থেকে তাদের জন্য আচ্ছাদন হত। আপনি তাদের জন্য সৎচরিত্রের একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন, কিন্তু তারা স্তম্ভটিকে সংরক্ষণ করেনি তাই তা অস্থিরতাবশতঃ ধ্বংস হয়ে যায়।"

কবি মুসলমানদের ভূমির কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা বৃহৎ মাতৃভূমির কোন চারণভূমি অন্যের দখলদারিত্বে চলে যাওয়াকে বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। তাই ১৩৫০ হি./১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের মুসলমানদের নেতা বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফনকৃত মাওলানা মুহাম্মদ আলীর স্মরণে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট শোকসভায় উপস্থাপিত শোকগাঁথায় কবি আহমাদ শাওকী বলেন, যে, বায়তুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদ আল-আক্‌সা মুসলমানদের মালিকানাধীন, সুতরাং তাদের থেকে এর দরজার চাবি ছিনিয়ে নেয়ার কেউ নেই। কবির ভাষায়:[১৩৮]

بَيْتٌ عَلَى أَرْضِ الْهُدَى وَسَمَائِهِ * اَلْحَقُّ حَائِطُهُ وَأُسُّ بِنَائِهِ

اَلْفَتْحُ مِنْ أَعْلاَمِهِ، وَالطُّهْرُ مِنْ * أَوْصَافِهِ وَالْقُدْسُ مِنْ أَسْمَائِهِ

تَحْنُوْ مَنَاكِبُهُ عَلَى شُعَبِ الْهُدَى * وَتُظِلُّ سُدَّتُهُ عَلَى سِينَائِهِ

مَنْ ذَا يُنَازِعُنَا مَقَالِيدَ بَابِهِ * وَ جَلاَلَ سُدَّتِهِ، وَ طُهْرَ فِنَائِهِ ؟

"সৎপথের ভূমির উপর এবং এর আকাশের নীচে একটি ভূমি রয়েছে, যার প্রাচীর ও নির্মাণের ভিত্তি হচ্ছে সত্য। বিজয় (আল-ফাত্‌হ) এর পতাকাসমূহে, পবিত্রতা এর গুণাবলীর এবং সম্মানিত (আল-কুদ্‌স) এর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর স্কন্ধসমূহ সৎপথের জাতির প্রতি বিনত এবং এর দ্বারা

---

১৩৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

১৩৮. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

সিনাই পাহাড়ের দিকে উঁকি মেরে দেখছে। কে এর চাবি, দরজার মহত্ত্ব ও এর আঙিনার পবিত্রতাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে ? "

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ধর্ম

আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ শীর্ষক কাসীদায় বলেন যে, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম বিজ্ঞান ও ন্যায়-পরায়ণতার যথার্থ মূল্যায়ন করে এবং এর অনুসারীদের উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এটি সর্বযুগের সর্বাবস্থানের অধিবাসীদের জন্য উপযোগী একটি স্থায়ী বিধান, যাতে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছে। মুসলমানগণ এর আলোর অনুসরণ করে বিশ্বের কর্তৃত্ব লাভ করেছিল এবং দুর্বল মরুবাসীরা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন যে, এ সভ্যতাটি ছিল রোম, পারস্য ও মিসরীয় সভ্যতার চেয়ে অধিক মানবতাসম্পন্ন ও ব্যাপকতর। কারণ এটি ছিল প্রকৃত সভ্যতা ; যা ন্যায়-নীতির মাধ্যমে মানুষের সম্পদে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এই সভ্যতার মাধ্যমে ধনী ও প্রভাবশালীদের সম্পদ থেকে দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সভ্যতা বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। কবি আহমাদ শাওকী এই প্রসঙ্গে ইসলামী বিধি-বিধান ও মুসলিম আইন বিশারদদের অভিমতসমূহ এবং রোমান আইনের মধ্যে তুলনা করে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী বিধান ন্যায়-পরায়ণতা, সরলতা, অনুকম্পা, সাম্য ও মানবতার মূল্যবোধ সংরক্ষণে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কবির ভাষায়:[১৩৯]

شَرِيْعَةٌ لَكَ فَجَّرْتَ الْعُقُوْلَ بِهَا * عَنْ زَاخِرٍ بِصُنُوْفِ الْعِلْمِ مُلْتَطِمِ
يَلُوْحُ حَوْلَ سَنَا التَّوْحِيْدِ جَوْهَرُهَا * كَالْحُلَى لِلسَّيْفِ أَوْ كَالْوَشْيِ لِلْعَلَمِ

"আপনার অধিকারে রয়েছে এমন একটি শরীয়ত (ধর্মীয় বিধি-বিধান), যদ্বারা বুদ্ধিমত্তাসমূহ উচ্ছ্বলভান্ডার থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ নির্গত হয়েছে। তাওহীদের আলোয় চতুর্দিকে এর মৌলিক পদার্থ তরবারীর অলংকার অথবা পতাকার কারুকার্যের ন্যায় চক্চক্ করছে।"

'মিস্র তাজাদ্দাদু নাফসুহা বিনিসাইহা আল-মুতাজাদ্দিদাত' مِصْرُ تُجَدِّدُ نَفْسُهَا بِنِسَائِهَا الْمُتَجَدِّدَاتِ শীর্ষক কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী ইসলামী সভ্যতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নারী শিক্ষার প্রতি উদাত্ত আহ্বান উপলক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক তাঁর কোন কোন মহতি স্ত্রীর জ্ঞান অর্জনের বিশেষ সুযোগ প্রদানের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ কবি কোন কোন মুসলিম নারীর সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে-কর্মে পুরুষের পাশাপাশি তাদের অতুলনীয় অবদান প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। নারীরা অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো, সেখানে যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাতো, তাদের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতো, বীরত্ব অবলম্বনে তাদেরকে উৎসাহিত করতো। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)(৪/৫-৬১ হি./৬২৭-৬৮০ খ্রি.), এর কন্যা সায়্যিদা সাকীনা (রা.)(মৃ. ১১৭ হি./৭৫৩ খ্রি.),উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) (৬১৩/৬১৪ খ্রি.-৫৮ হি.) অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষিতা মহিলাদের মত আল-কুরআনের তাফসীর ও আল-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলিম নারী সমাজে তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রের পান্ডিত্য দ্বারা বাগ্দাদ, দামেশ্ক, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। কবি আহমাদ শাওকী এহেন বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের সামনে এই সত্যটি

---

১৩৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণের প্রয়াস পান যে, ইসলাম কখনো নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, যদিও কোন এক সময় নারীদের শিক্ষাদান ও তাদের অশিক্ষিত রাখা এবং তাদের পর্দাপালন ও পর্দা না পালন সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। কবির ভাষায়:[১৪০]

خُذْ بِالْكِتَابِ، وَبِالْحَدِيْـــــ * ـــثِ وَسِيْرَةِ السَّلَفِ الثِّقَاتِ

وَارْجِعْ إِلَى سُنَنِ الْخَلِيْـــــ * ـــقَةِ، وَاتَّبِعْ نُظُمَ الْحَيَاةِ

هَذَا رَسُوْلُ اللهِ لَـــــمْ * يَـــنْقُصْ حُقُوْقَ الْمُؤْمِنَاتِ

كَانَتْ سُكَيْنَةُ تَمْلَأُ الدُّنْـــ * ـــيَا وَتَـــهْزَأُ بِالــــرُّوَاةِ

رَوَتِ الْحَدِيْثَ ، وَفَسَّرَتْ * آيَ الْكِتَابِ الْبَــــيِّنَاتِ

وَحَضَارَةُ الإِسْلَامِ تَنْــــ * ــطِقُ عَـــنْ مَكَانِ الْمُسْلِمَاتِ

"তুমি আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং প্রাচীন মনীষীদের নির্ভরযোগ্য জীবন-চরিতকে গ্রহণ কর। আর সৎচরিত্রের নীতিমালার প্রতি প্রত্যাবর্তন কর এবং জীবনের রীতি-নীতিকে অনুসরণ কর। ইনি হচ্ছেন মহান আল্লাহর রাসূল, যিনি বিশ্বাসী মহিলাদের অধিকারসমূহকে খর্ব করেননি। সায়্যিদা সাকীনা বিনতে হুসাইন (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিতেন এবং কাঁপিয়ে দিতেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন ও আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। আর ইসলামের সভ্যতা মুসলমান নারীদের উচ্চ মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করছে।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'যিক্‌রা আল-মাওলিদ' ذِكْرَى الْمَوْلِدِ কাসীদায় মহানবী (সা.) কর্তৃক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ বর্ণনা করে শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলিম জাতি তাদের দরিদ্র সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গৌরব ও মর্যাদার সুমহান ফল আহরণ করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ কবি বিভিন্ন দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন যে, এসব শিশুরা শিক্ষিত হয়ে তাদের জাতির গৌরব ও কল্যাণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যদি তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা না হতো, তাহলে তারা দেশের আইন-শৃংখলা বিনষ্টকারী অপরাধী অথবা দেশের কলংকস্বরূপ ভিক্ষুকের দলে পরিণত হত। অতঃপর কবি আহমাদ শাওকী বিস্ময়কর কর্মকান্ড সম্পাদনে সক্ষম একটি মহান প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশুদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহকে উৎসাহ প্রদান করে বলেন:[১৪১]

فَرُبَّ صَغِيْرِ قَـــوْمٍ عَلَّمُوْهُ * سَمَا وَحَمَـــى الْمُسَـــوَّمَةَ الْعِرَابَا

وَكَانَ لِـــقَوْمِهِ نَفْعًا وَفَخْرًا * وَلَوْ تَرَكُـــــوْهُ كَانَ أَذًى وَعَابَا

فَعَلِّمْ مَا اسْتَطَعْتَ لَعَلَّ جِيْلًا * سَيَأْتِي يُحْدِثُ الْعَجَبَ الْعُجَابَا

"অনেক অল্পবয়স্ক সম্প্রদায় ছিল যাদেরকে মুসলমানরা শিক্ষাদান করলে তারা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং দামী দ্রুতগামী অশ্বসমূহকে লালন-পালন করে। আর তারা নিজ নিজ বংশের কল্যাণ ও গৌরব সাধন করে, যদি এদেরকে তারা অশিক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দিতেন তবে এরা দুঃখ-কষ্টের ও

---

১৪০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩-১০৪।

১৪১. আল-শাওকিয়্যাত , ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

কলংকের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সুতরাং যতটুকু সম্ভব তাদেরকে শিক্ষাদান কর, হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে এরা অতীব আশ্চর্য সৃষ্টিকারী প্রজন্ম হিসেবে আবির্ভূত হবে।"

ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক সমাজতন্ত্র

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত ইনসাফ ও সাম্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর অবদানের বিবরটি উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ধনীর সম্পদে দরিদ্র ও সর্বহারাদের অধিকার বাস্তবায়নে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইনসাফভিত্তিক সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আধুনিক সমাজতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও বাড়াবাড়ি রয়েছে, কারণ তারা একেবারেই সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলোৎপাটন করতে চান। ফলে এহেন সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য রোগের চেয়ে ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে হওয়ায় কাম্যফল লাভে ব্যর্থ হয়। কবি বলেন যে, পক্ষান্তরে নবী করীম (সা.) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে যাকাত প্রবর্তনের মাধ্যমে যে প্রতিকার করেছেন তা সঠিক উপযোগী ও সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে এনেছে। কবি বলেন যে, যাকাত হচ্ছে মানুষ ও তার প্রভুর মধ্যে এবং তাঁর ও তার বসবাসরত সমাজের মাঝে একটি চুক্তি বিশেষ। যাকাত ধনীর পক্ষ থেকে দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহ বা ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়। এটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অবশ্য করণীয় ইবাদাত। তিনি বলেন যে, যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তি সবাই সমান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাকাত প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্রদের প্রতি ন্যায়-নীতি প্রদর্শন ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। কারণ পৃথিবীতে দরিদ্রদের বাঁচার অধিকার রয়েছে, বাঁচার অধিকারের ক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন সবাই সমান। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামনে যদি কোন একটি ধর্মকে আবশ্যিকভাবে বেছে নেয়ার জন্য উপস্থাপন করা হতো তাহলে তারা অবশ্যই ইসলামকে তাদের কল্যাণের ধর্ম হিসেবে বেছে নিত। কবির ভাষায়:[১৪২]

اَلاِشْتِرَاكِيُّــــونَ أَنْتَ إِمَامُـــهُمْ * لَوْ لاَ دَعَاوَى الْقَـــوْمِ وَالْغُـــلَوَاءُ
دَاوَيْتَ مُتَّئِـــدًا، وَدَاوَوْا طَـــفْـــرَةً * وَأَخَفُّ مِنْ بَعْضِ الدَّوَاءِ الدَّاءُ
وَالْبِرُّ عِنْدَكَ ذِمَّةٌ وَفَـــرِيْضَـــةٌ * لاَ مِنَّـــةٌ مَمْـــنُوْنَـــةٌ وَجَـــبَاءُ
جَاءَتْ فَوَحَّدَتْ الزَّكَاةُ سَبِيْــــلَهُ * حَتَّى الْتَقَى الْكُرَمَاءُ وَالْبُخَـــلاَءُ
أَنْصَفْتَ أَهْلَ الْفَقْرِ مِنْ أَهْلِ الْغِنَـــى * فَالْكُلُّ فِي حَقِّ الْحَيَاةِ سَـــوَاءُ
فَلَـــوْ أَنَّ إِنْسَـــانًا تَخَـــيَّرَ مِلَّـــةً * مَا اخْتَارَ إِلاَّ دِيْنَكَ الْفُـــقَـــرَاءُ

"সাম্যবাদীদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, দাবী-দাওয়া ও বাড়াবাড়ি না থাকলে আপনি সাম্যবাদীদের ইমাম হতেন। আপনি অর্থব্যবস্থা সংস্কারে ঔষধ প্রয়োগ করেন, আর তারা দ্রুত ঔষধ প্রয়োগ করে, অথচ কোন কোন ঔষধের চেয়ে রোগ সহজেই আরোগ্য হয়ে থাকে। আর আপনার নিকট পরোপকারিতা হচ্ছে একটি দায়িত্ব ও অবশ্যকরণীয় কাজ, এটি এমন কোন অনুগ্রহ এবং অনুদান নয় যার প্রতিদান চাওয়া যেতে পারে। যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, অনন্তর উহা পরোপকারিতার পক্ষে এককভাবে গ্রহণ করে, ফলে দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে মিলিত হয়। আপনি ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ ও দরিদ্রদের প্রতি তা বিতরণের মাধ্যমে ন্যায়নীতি প্রদর্শন

১৪২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, কারণ জীবনধারণের অধিকারে সকলেই সমান। তাই যদি মানুষকে কোন একটি ধর্ম বেছে নেয়ার আবশ্যক হতো, তাহলে দরিদ্রগণ আপনার ধর্ম ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে বেছে নিত না।"

ইসলাম শান্তির দিশারী

আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় ইসলাম যুদ্ধ ও হত্যাকান্ডের ধর্ম, এটি শক্তি ও তরবারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিজিত দেশসমূহে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে লোকদের ধর্মান্তর করেছে, ইসলামের শত্রুদের এহেন মিথ্য অভিযোগ খন্ডন করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিভিন্ন যুদ্ধে সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্য উক্তির অসারতা প্রমাণ করে বলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল তত্ত্ব ও এর কারণগুলো সম্পর্কে হয়তো অজ্ঞ, অথবা সেগুলো জেনে শুনেই মানুষকে বিভ্রান্ত এবং সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেছে। কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার চেষ্টা এবং তাঁর বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডার প্রতি চরম ধৈর্য ধারণ এবং নিজের ও স্বীয় অনুসারীদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। অতঃপর কুরাইশরা নবীজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করতে বাধ্য হন । এর পরও কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের প্রয়াস চালালে নবী করীম (সা.) মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসেবে যুদ্ধের নীতিমালা মেনে চলেন, বিজয়ের পর বিজিতদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বিজয়ের পর কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তাদেরকে স্বীয় ধর্মে বহাল থাকতে অথবা সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। আর তিনি ধর্মকে তাদের নিকট আকর্ষিত করেছেন, তরবারী দ্বারা নয়-যা কিছু লোকেরা দাবী করছে। এই মর্মে কবি বলেন:[১৪৩]

قَالُوْا : غَزَوْتَ، وَرُسْلُ اللهِ مَا بُعِثُوْا * لِقَتْلِ نَفْسٍ، وَلاَ جَاؤُوْا لِسَفْكِ دَمِ
جَهْلٌ، وَتَضْلِيْلُ أَحْلاَمٍ، وَسَفْسَطَةٌ * فَتَحْتَ بِا لسَّيْفِ بَعْدَ الْفَتْحِ بِالْقَلَمِ
لَمَّا أَتَى لَكَ عَفْوًا كُلُّ ذِيْ حَسَبٍ * تَكَفَّلَ السَّيْفُ بِالْجُهَّالِ وَالْعَمَمِ

"তারা (ইসলামের শত্রুরা) বলে যে, আপনি যুদ্ধ করেছেন, অথচ আল্লাহর রাসূলগণ মানুষ হত্যার জন্য প্রেরিত হননি এবং তাঁরা রক্ত প্রবাহিত করার জন্যও আসেননি। এটা তাদের অজ্ঞতা, অলীক কল্পনা ও মিথ্যাচারিতা; আপনি কলমের দ্বারা বিজয় লাভের পর তরবারীর দ্বারা বিজয় অর্জন করেন। তাহলে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ক্ষমার আশা নিয়ে আপনার নিকট আসতো না এবং অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতি আপনার তরবারী যিম্মাদার হতো না।"

অতঃপর কবি আহমাদ শাওকী একই কাসীদায় পুনরায় যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের নীতিমালাসহ সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে তিনি নিজেদের ধর্ম ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নবী কারীম (সা.)কে সম্বোধন করে বলেন:[১৪৪]

عَلَّمْتَهُمْ كُلَّ شَيْئٍ يَجْهَلُوْنَ بِهِ * حَتَّى الْقِتَالِ وَمَا فِيْهِ مِنَ الذِّمَمِ

---

১৪৩. আল-শাওকিয়্যাত ,১ম খণ্ড , পৃ. ২০১।

১৪৪. আল-শাওকিয়্যাত , ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

دَعَوْتَهُمْ لِجِهَادٍ فِيهِ سُؤْدُدُهُمْ * وَالْحَرْبُ أُسُّ نِظَامِ الْكَوْنِ وَالأُمَمِ
لَوْلاَهُ لَمْ نَرَ لِلدَّوْلاَتِ فِي زَمَنٍ * مَا طَالَ مِنْ عَمَدٍ، أَوْ قَرَّ مِنْ دُهُمِ

"(হে নবী!) আপনি তাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানতো না, এমনকি যুদ্ধ এবং এর ভেতর যা কিছু দুর্নামের বিষয় রয়েছে। আপনি তাদেরকে এমন জিহাদের প্রতি আহ্বান করেন, যাতে রয়েছে তাদের সার্বভৌমিক নেতৃত্ব; আর যুদ্ধ হচ্ছে সৃষ্টিকুল ও জাতিসমূহের শৃংখলার ভিত্তি। যদি সার্বভৌমত্ব না থাকতো তাহলে আমরা কোনকালে রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পেতাম না অথবা সাধারণ মানুষের স্থায়িত্ব সম্ভব হতো না।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমরনীতি সম্পর্কে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল-সীরাত আল-নাবাবিয়্যা' اَلسِّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় বলেন:[১৪৫]

فَمَا مَقَالُ الْجَاهِلِ الْمُفَنَّدُ * تَأَسَّسَ الإِسْلاَمُ بِالْمُهَنَّدِ؟
كُلُّ غَزَاةٍ لِلنَّبِيِّ حَقَّهُ * لَمْ يَعْدُ فِي حَرْبِ قُرَيْشٍ حَقَّهُ
لَيْسَ سَوَاءً كُلُّهَا الْعُدْوَانُ * لاَ يَسْتَوِي الدِّفَاعُ وَالْعُدْوَانُ
هُمْ بَلَغُوْا نِهَايَةَ التَّمَرُّدِ * وَطَرَدُوْا الإِسْلاَمَ كُلَّ مَطْرَدِ

"অনন্তর ভ্রান্ত, অজ্ঞ ব্যক্তির কথা কি ঠিক? সুতরাং অজ্ঞ ভ্রান্ত ব্যক্তির বক্তব্য ইসলাম ভারতবর্ষে নির্মিত তরবারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কি সঠিক? নবী করীম (সা.) এর প্রতিটি যুদ্ধের যথার্থতাকে কুরাইশদের যুদ্ধের যথার্থতার ব্যাপারে সমান বলে বিবেচনা করা যায় না। এদের (কুরাইশ) প্রতিটি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ সমান নয়, কারণ আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সমান হতে পারে না। তারা (কুরাইশ) বিদ্রোহের প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে ছিল এবং তারা ইসলামকে সর্বপ্রকার বর্জন করেছিল।"

কবি প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোকে ইসলামী 'আকীদা ও সত্য রক্ষার জন্য পরিচালিত হওয়ায় সেগুলোকে পবিত্র জিহাদরূপে আখ্যায়িত করেন 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ শীর্ষক কাসীদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি সম্বোধন করে কবি বলেন:[১৪৬]

وَإِذَا غَضِبْتَ فَإِنَّمَا هِيَ غَضْبَةٌ * فِي الْحَقِّ، لاَ ضِغْنٌ وَلاَ بَغْضَاءُ
اَلْحَرْبُ فِيْ حَقٍّ لَدَيْكَ شَرِيْعَةٌ * وَمِنَ السُّمُوْمِ النَّاقِعَاتِ دَوَاءُ

"আর (হে নবী!) যখন আপনি রাগান্বিত হন তখন অবশ্যই সেই ক্রোধ সত্যের ও ন্যায়ের জন্য হয়ে থাকে, যা হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ নয়। আপনার নিকট সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুদ্ধ হচ্ছে একটি ধর্মীয় বিধান, কারণ কোন কোন মারাত্মক বিষ থেকে ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে।"

কবি মনে করেন যে, যুদ্ধ প্রতিমাবাদের অপবিত্রতা থেকে মানুষকে পবিত্র করার মহৌষধ। মানব দেহের কোন অঙ্গে পচন ধরলে অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে যেমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। অনুরূপভাবে ইসলাম মানবগোষ্ঠীর অত্যাচারী, দুর্নীতিবাজ, আইন-শৃংখলা বিনষ্টকারী গুটি কতক

---

১৪৫. দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ২৫-২৭।

১৪৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শোষকদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে নিধন করে আপামর জনগোষ্ঠীকে শান্তি, স্বাধীনতা ও ন্যায়-নীতির সাথে বাঁচার ব্যবস্থা করেছে। কবির ভাষায়:[১৪৭]

كَمْ مِنْ غَـــزَاةٍ لِلرَّسُوْلِ كَـــرِيْمَــــةٍ * فِيْهَا رِضًى لِلْحَـــقِّ أَوْ إِعْلاَءُ
كَانَـــــتْ لِجُنْدِ اللهِ فِيْـــهَا شِـــدَّةٌ * فِيْ إِثْرِهَا لِلْعَالَمِـــــيْنَ رَخَاءُ
ضَرَبُوْا الضَّلاَلَةَ ضَرْبَةً ذَهَبَــــتْ بِهَا * فَعَلَى الْجَهَالَةِ وَالضَّلاَلِ عَفَاءُ
دَعَـوْا عَلَى الْحَرْبِ السَّلاَمَ، وَطَالَمَا * حَقَنَتْ دِمَاءً فِي الزَّمَانِ دِمَاءُ

"রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুদ্ধসমূহ কতইনা মহান! এতে উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ অথবা সত্যের উন্নীত করণ। এতে মহান আল্লাহর সৈনিকদের জন্য ছিল অনেক দুঃখ-দুর্দশা, আর এর পশ্চাতে বিশ্ব-জগতের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসে। তারা পথভ্রষ্টতার উপর এমন আঘাত হানেন যে, তা দূরীভূত হয়ে যায়; অনন্তর অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার উপর ক্ষমা প্রাধান্য লাভ করে । তারা যুদ্ধের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, আর অনেক সময় রক্তপাত রক্তপাতকে প্রতিহত করে।"

এমনিভাবে আহমাদ শাওকী ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য রক্তপাত করার অভিযোগকে খন্ডন করে বলেন যে, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার এবং তাদের বিশ্বাসাদি হরণ করার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত। কারণ ইসলামী তরবারী অজ্ঞতার ভিত্তিতে আত্মম্ভরী অবাধ্য অবিশ্বাসী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ন্যায়-পরায়ণতা ও মহৎ মানবিক জীবনের দ্বারা ঘাতক অমঙ্গলের আচ্ছাদন করেছে। এই নীতির উপরই খ্রিষ্টধর্ম মানব জীবনের সংরক্ষণ এবং খ্রিষ্টীয় সমাজের ভেতরে মহৎ জীবন চলমান থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মর্মে কবি বলেন:[১৪৮]

سَلِ الْمَسِيْحِيَّةَ الْغَرَّاءَ كَمْ شَرِبَتْ * بِالصَّابِ مِنْ شَهْوَاتِ الظَّالِمِ الْغَــلِمِ
لَوْلاَ حُمَاةٌ لَهَا هَبُّوْا لِنُصْـــرَتِــهَا * بِالسَّــيْفِ، مَا انْتَفَعَتْ بِالرِّفْقِ وَالرُّحِمِ

"উজ্জ্বল খ্রিষ্টধর্মকে জিজ্ঞাসা কর যে তা অত্যাচারী বিদ্রোহী কামনা-বাসনা থেকে কতইনা সুরা পান করেছে। যদি না উহার রক্ষাকারীগণ তরবারীর দ্বারা এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে না যেত, তাহলে মমতা ও দয়ার মাধ্যমে কোন উপকার সাধিত হতো না।"

এই ভূমিকার পর মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তার ধর্মগ্রন্থসমূহে বিশ্বাসী এবং মতের স্বাধীনতার সংরক্ষক 'আকীদাসমূহ আস্থাস্থাপনকারী জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যের বাণীর উপর সকল ধর্মের মাঝে পরস্পর প্রীতি ও সমঝোতার প্রতি আহ্বান করেন। আর তিনি অত্যাচারী যোদ্ধাদের থেকে ধর্মকে রক্ষায় সহায়ক তরবারীকে এর ভূমিকা পালনের পর একে বর্জন করে ইসলামের চিরন্তন শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন:[১৪৯]

فَجَرِّدِ السَّــيْفَ فِيْ وَقْتٍ يُفِيْــدُ بِهِ * فَإِنَّ لِلسَّــيْفِ يَوْماً ، ثُــمَّ يَنْــصَرِمِ

"সুতরাং তরবারীকে এমন সময় ছেড়ে দাও যখন এতে কল্যাণ সাধিত হয়, কারণ একদিন তরবারীর আবশ্যকতা থাকে অতঃপর এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।"

---

১৪৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

১৪৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১।

১৪৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ.২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা

আহমাদ শাওকী তাঁর 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِيْ وَادِي النِّيلِ শীর্ষক কাসীদায় ইসলামের উদারতা, মহানুভবতা ও সংবেদনশীলতা বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ জয় করার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল সেগুলোকে নতুনভাবে গড়া, সেখানকার দুর্বল লোকদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও প্রশাসনে ন্যায়-পরায়ণতার মাধ্যমে শাসিতদের উন্নতি বিধান। কবির ভাষায়:[১৫০]

وَعَلاَ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَسَمَا الْفَضْـ * ـلُ ، وَنَالَتْ حُقُوْقَهَا الضُّعَفَاءُ

تَحْمِلُ النَّجْمَ، وَالْوَسِيْلَةَ ، وَالْمِيْـ * ـزَانَ مِنْ دِيْنِهَا إِلَى مَنْ تَشَاءُ

وَتُنِيْلُ الْوُجُوْدَ مِنْهُ نِظَامًا * هُوَ طِبُّ الْوُجُوْدِ، وَهُوَ الدَّوَاءُ

"আর মুসলমানদের পদার্পণে লোকদের মধ্যে সত্য প্রাধান্য পায়, মহত্ত্ব উন্নীত হয় এবং দুর্বল লোকেরা তাদের অধিকারসমূহ লাভ করে। তারা তাদের ধর্মের নক্ষত্ররূপ আলো, মধ্যম পন্থা ও ন্যায়-নীতি যাকে খুশী তার নিকট বহন করে নিয়ে যায়। আর অস্তিত্বকুল ইসলাম ধর্মের শৃংখলা লাভ করে যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন অস্তিত্বকুলের চিকিৎসক আর ইসলাম হচ্ছে ঔষধ।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'নাহ্‌জ আল-বুরদা' نَهْجُ الْبُرْدَةِ কাসীদায় আরো বলেন যে, মুসলমানরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যেখানেই বিজয়ী হয়েছে, সেখানেই তারা শিক্ষা-দীক্ষা, ন্যায়-নীতি ও ধর্ম পরায়ণতার দ্বারা তথাকার অধিবাসীদের পরিতৃপ্ত করেছে। বিভিন্ন জাতিরা তাদের প্রতি মুসলমানদের সুমহান আচরণের প্রশংসা করেছে। মুসলমানগণ এসব বিজয় ও প্রশাসন করার ক্ষেত্রে কোমল আচরণ, ন্যায়-নীতি, মর্যাদা প্রদর্শন ও উদার মনোভাব প্রদর্শন এবং বিজিতদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। এটিই মুসলমানদের মর্যাদা ও গৌরবের পরিচায়ক। কারণ ইতোপূর্বে কোন বিজয়ী বিজিত দেশে লোকদের প্রতি শক্তির দাপট, নিপীড়ন ও ধ্বংস করা ছাড়া মুসলমান বিজয়ীদের অনুরূপ উদারতা দেখায়নি। কবির ভাষায়:[১৫১]

كَمْ شَيَّدَ الْمُصْلِحُوْنَ الْعَامِلُوْنَ بِهَا * فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مُلْكاً بَاذِخَ الْعِظَمِ

لِلْعِلْمِ، وَالْعَدْلِ، وَالتَّمْدِيْنِ مَا عَزَمُوْا * مِنَ الأُمُوْرِ، وَمَا شَدُّوْا مِنَ الْحُزُمِ

لاَ يَهْدِمُ الدَّهْرُ رُكْناً شَادَ عَدْلُهُمْ * وَحَائِطُ الْبَغْيِ إِنْ تَلْمَسْهُ يَنْهَدِمِ

"মুসলিম সৎকর্মশীল সংস্কারকগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কতইনা রাজ্য গড়েছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত এবং বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়-পরায়ণতা এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের ন্যায়-পরায়ণতার দ্বারা সুদৃঢ় কোন স্তম্ভকে কালচক্র ধ্বংস করতে পারবে না, অথচ বিদ্রোহীর নির্মিত প্রাচীর তার স্পর্শের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

এই প্রসঙ্গে কবি আহমাদ শাওকী 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কাসীদায় আরবদের বিজয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, আরবদের বিজয়ের পরিধি সম্প্রসারণের

---

১৫০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৫১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাতে ছিল বিজিতদের প্রতি মমত্ববোধ, ন্যায়-নীতি, ক্ষমা প্রদর্শন, সংবেদনশীলতা। এর স্বরূপ তুলে ধরে তিনি বলেন যে, বীরত্বের সাথে কোমল মনের সংযোজন না হলে সেটি পাষণ্ডতায় পর্যবসিত হয়। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমরনীতি অনুসৃত না হলে সেটির মাধ্যমে অর্জিত বিজয় মর্যাদার পরিচায়ক না হয়ে কলংক ডেকে আনে। তাইতো বৃহৎ শক্তির অধিকারী অহংকারীরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটায়, আর দুর্বলেরা এর ধ্বংসযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। কবির ভাষায়:[১৫২]

إِنَّ الشَّجَاعَـــةَ فِي الرِّجَالِ غِـــلاَظَـــةٌ * مَـــالَـــمْ تَزِنْهَا رَأْفَـــةٌ وَسَخَاءُ

وَالْحَرْبُ مِنْ شَرَفِ الشُّعُوْبِ ، فَإِنْ بَغَوْا * فَالْمَـــجْدُ مِمَّا يَـــدَّعُوْنَ بَرَاءُ

وَالْحَـــرْبُ يَبْعَثُـــهَا الْقَـــوِيُّ تَـــجَـــبُّراً * وَيَـــنُوْءُ تَحْتَ بَلاَئِهَا الضُّعَفَاءُ

"নিশ্চয়ই সাহসিকতা লোকদের মধ্যে পাষণ্ডতায় পরিণত হয়, যদি না একে কোমলতা ও বদান্যতা দ্বারা অলংকৃত করা হয়। আর যুদ্ধ বিভিন্ন জাতির গৌরবের অংশ বিশেষ, তবে যদি তারা এতে সীমালংঘন করে তাহলে তারা যে গৌরবের দাবী করে তা মুক্ত হয়ে যায়। আর যুদ্ধ এমন যে শক্তিশালীরা ক্ষমতার দাপটে একে উৎসাহিত করে, আর দুর্বলরা এর ধ্বংসের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আইয়্যুহা আল-নীল' أَيُّهَا النِّيْلُ শীর্ষক কাসীদায় প্রাচীন মিসরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, রোমানদের শাসনাধীনে মিসরের কিবৃতী জাতি ধর্মীয় উৎপীড়ন, নির্যাতনের দ্বারা এমন জঘন্যভাবে নিষ্পেষিত হয়, যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়াতেই সম্রাট জাষ্টিনিয়ান (৪৮২-৫৬৫ খ্রি.) এর নির্দেশে প্রায় দুই লক্ষ মিসরীয় নির্মমভাবে নিহত হয়। অতঃপর মুসলিম শাসনামলে কিবৃতিরা প্রভূত কল্যাণ, সুমহান উদারতা ও আত্মমর্যাদা লাভ করে। মুসলমানরা সেখানে বহুমুখী নির্মাণ ও উন্নয়নের দ্বারা দেশের ও দেশবাসীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কবি আরব বিজয়ীদের প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, তারা অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাদের তরবারীসমূহ স্ব স্ব খাপে রক্ষিত থাকত। কারণ দুর্যোগাদি তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের শিক্ষা দিয়েছিল। তাই তারা অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে সত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের তরবারী ধারণ করত এবং কোষবদ্ধ করত। এভাবে তারা অত্যাচার বা সীমালংঘনমূলক কোন কাজ করত না। এতে শত্রুরা তাদের ভয়ে প্রকম্পিত হত।

কবি আহমাদ শাওকী অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিসর বিজয়ী মুসলিম বীর সেনাপতি 'আমর বিন আল-'আস (মৃ. ৪৩ হি./৬৬৪ খ্রি.)কে একটি ভীতিপ্রদ দৃশ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় চিত্রিত করেন যে, ইসলামের মুকুটে তার উন্নত শির মহিমান্বিত, ন্যায়-পরায়ণতায় তিনি গৌরবান্বিত, আর তাঁর চতুর্দিকে মিসরবাসী খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী তার জন্য প্রার্থনারত। কারণ এই মুসলিম বিজয়ের সুবাদে মিসরবাসী সত্য ধর্ম, উন্নত আরবী ভাষা লাভ করে। কিছু সময় যেতে না যেতেই মিসর ইসলাম ও আরবী ভাষার দুর্গে পরিণত হয়। মিসরীয়গণ আমর বিন আল-আসের উদারতা বুঝতে সক্ষম হয়, তার মধ্যে দুর্বল ও শোষিতরা সকলেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পায়। কবির ভাষায়:[১৫৩]

عَمْرُو عَلَى شَطَبِ الْحَصِيْرِ مُعَصَّبٌ * بِقَـــلاَدَةِ اللهِ الْعَلِيِّ مُـــطَـــوَّقُ

---

১৫২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

১৫৩. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

يَدْعُــوْ لَهُ الْحَاخَامُ فِي صَلَوَاتِــــهِ * مُوْسَى وَيَسْأَلُ فِيْهِ عِيْسَى الْبَطْرَقُ

"আমর বিন আল-আস খেজুর পাতার পাটিতে মুকুট পরিহিত এবং মহান আল্লাহর সম্মানের হারে অলংকৃত। তাঁর জন্য বিনয়াবনত অবস্থায় ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মযাজকগণ প্রার্থনা করছে ও হযরত ঈসা (আ.) এর অনুসারী পাদ্রীগণ সেখানে তাঁর কল্যাণ কামনা করছে।"

আহমাদ শাওকী ইসলামের 'আকীদার স্বাধীনতা ও মনের উদারতার চাহিদানুযায়ী জীবন যাপন করেন। ফলে তাঁর কবিতায় পংক্তিতে পংক্তিতে ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতার আদর্শ ফুটে উঠে। কবি তাঁর 'মাসজিদু আয়া সুফিয়া' مَسْجِدُ أَيَا صُوْفِيَا শীর্ষক কবিতায় ওসমানী তুর্কীদের দ্বারা ১৩৩৬ হি./১৯১৮ সালে 'আয়া সুফিয়া' গীর্জাকে মসজিদে পরিণত হওয়াকে একটি পরম সমাহার ও সমন্বয় হিসেবে চিত্রিত করে বলেন যে, এটি পূর্বে ঈসায়ী উপাসনালয় ছিল; অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ইসলামী উপাসনালয়ে পরিণত হয়েছে। কবির ভাষায়:[১৫৪]

كَنِيْسَةٌ صَارَتْ إِلَى مَسْجِدِ * هَدِيَّـةُ السَّيِّدِ لِلسَّيِّدِ

كَانَتْ لِعِيْسَى حَرَماً ، فَانْتَهَتْ * بِنُصْرَةِ الرُّوْحِ إِلَى أَحْمَدَ

"একটি গীর্জা মসজিদে পরিণত হয়, এটি একজন নেতার পক্ষ থেকে অন্য একজন নেতার প্রতি উপহার স্বরূপ। এটি ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর পবিত্র স্থান, অনন্তর এটা পবিত্র আত্মা জিব্রাঈল (আ.) এর সাহায্যে আহমাদি মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট এসে পৌঁছে।"

১৩২৯ হি./১৯১১ সালে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ঈদে মীলাদে মাসীহ ঈসা (আ.) একই তারীখে উদযাপন উপলক্ষে 'মারহাবান বিল হিলাল' مَرْحَبًا بِالْهِلَالِ নামক কাসীদায় উভয় ধর্মের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যের গৌরব বর্ণনা করে উভয়ের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে কবি আহমাদ শাওকী বলেন:[১৫৫]

عِيْدُ الْمَسِيْحِ، وَعِيْدُ أَحْمَدَ ، أَقْبَلاَ * يَتَبَارَيَانِ وَضَاءَةً وجمالاً

مِيْلاَدُ إِحْسَانٍ ، وَهِجْرَةُ سُؤْدُدٍ * قَدْ غَيَّرَا وَجْهَ الْبَسِيْطَةِ حَالاً

"মাসীহ ঈসা (আ.) এর জন্মোৎসব ও আহমাদ মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মোৎসব উজ্জ্বল ও সুন্দর দু'টি স্রোতধারায় উভয়ে সমাগত। পরোপকারিতার জন্মোৎসব এবং একটি নেতৃত্বের হিযরত উভয়টিই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে।"

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহমাদ শাওকী তাঁর যুগের মুসলমানদের সম্পর্কে উপলব্ধি করেছেন যে, তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলা কর্তব্য, যাতে তিনি এক সাথে মাসীহ হযরত ঈসা (আ.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পথদ্বয়ের উপর তাঁর নিকট তাদের মধ্যে প্রিয়তম ও সম্ভ্রান্ত হতে পারেন। কারণ পূণ্য ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, বরং এটা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্মিলনের নামে প্রতিটি মানুষকে সম্মানিত করে। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[১৫৬]

عِبَادُ اللهِ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ * كِرَامٌ فِيْ بَرِيَّتِهِ ، أُسَاةُ

১৫৪. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

১৫৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

১৫৬. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

كَمَائِدَةِ الْمَسِيْحِ ، يَقُوْمُ بُؤْسٌ *حَوَالَيْهَا، وَتَعْقُدُ بَائِسَاتُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তাঁর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছেন তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক (সান্ত্বনাদানকারী) যেমন মাসীহ হযরত ঈসা (আ.) এর দস্তরখানা (খাবারের টেবিল); যার চতুর্দিকে দুঃখী লোকেরা দাঁড়াতো এবং দুঃখিনী মহিলারা বসতো।"

কবি তাঁর 'আল-দাস্তূর আল ওসমানী' اَلدَّسْتُوْرُ الْعُثْمَانِيُّ শীর্ষক কাসীদায় খ্রিষ্টধর্ম, ইয়াহুদী ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বর্ণনায় এবং এবং এগুলোর মধ্যে তুলনা করার ক্ষেত্রে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে জোরালোভাবে বলেন, যেহেতু সকল ধর্ম মহান আল্লাহর, আর ঐশীধর্ম ও ঐশী ধর্ম গ্রন্থসমূহ এবং আল্লাহর রাসূলগণ হচ্ছেন বুদ্ধিমত্তার ভান্ডার, কল্যাণের উৎস ও সত্যের আলোক বর্তিকা, তাই বিভিন্ন ধর্ম তাদের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণ হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, সকল ধর্মের মূল সুর হচ্ছে মহান আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ভালবাসা, তাঁর পূণ্য লাভের আগ্রহ, শাস্তির ভয়, কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও অকল্যাণের প্রতি নিষেধের সমষ্টি। তাই এখানে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও পারস্পরিক উদারতা প্রদর্শন না করার কোন অবকাশ নেই। কবি আহমাদ শাওকী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতি কামনা করে বলেন: [১৫৭]

اَلدِّيْنُ لِلّٰهِ، مَنْ شَاءَ الإِلٰهُ هَدَى * لِكُلِّ نَفْسٍ هَوًى فِي الدِّيْنِ دَاعِيْهَا

مَا كَانَ مُخْتَلِفُ الأَدْيَانِ دَاعِيَةً * إِلَى اخْتِلاَفِ الْبَرَايَا ، أَوْ تَعَادِيْهَا

اَلْكُتْبُ، وَالرُّسْلُ، وَالأَدْيَانُ قَاطِبَةً * خَزَائِنُ الْحِكْمَةِ الْكُبْرَى لِوَاعِيْهَا

مُحَبَّةُ اللهِ أَصْلٌ فِيْ مَرَاشِدِهَا *وَخَشْيَةُ اللهِ أُسٌّ فِيْ مَبَانِيْهَا

"ধর্ম আল্লাহ তা'আলার জন্য, মহান আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন; ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষের ভালবাসা রয়েছে যা এর প্রতি আহ্বান করে থকে। বিভিন্ন ধর্ম মানুষের মধ্যে মতবিরোধ অথবা পারস্পরিক শত্রুতার দিকে আহ্বান করে না। ধর্মগ্রন্থসমূহ রাসূলগণ এবং যাবতীয় ধর্ম হচ্ছে সংরক্ষণকারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্ডার। সকল ধর্মের শিক্ষাবলীর মূল হচ্ছে মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং এগুলোর সৌধসমূহের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর ভয়।"

ইসলাম যাবতীয় ধর্মের পরিসমাপ্তকারী

আহমাদ শাওকী 'কিবার আল-হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল' كِبَارُ الْحَوَادِثِ فِيْ وَادِي النِّيْلِ শীর্ষক কাসীদায় সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন যে, ইসলাম যাবতীয় ধর্মের পরিসমাপ্তিকারী, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সর্বশেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর মনোনীত ধর্ম হিসেবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছেন, আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের পরিপূর্ণরূপদাতা হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং তাঁকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা সম্বলিত সর্বশেষ ও সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্বমানবতার দিশারী হিসেবে দান করেছেন। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:[১৫৮] إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে আল-ইসলাম।"

---

১৫৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।

১৫৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান: ৩, আয়াত: ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঐশী ধর্মগ্রন্থকে আলো ও সৎপথ প্রদর্শনকারীরূপে উপস্থাপন করে কবি আহমাদ শাওকী বলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী লোকদেরকে হিদায়াত করেন। আলোর দ্বারা আলো যেমন রহিত হয় তদ্রূপ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর সারনির্যাস আল-কুরআনে সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ধর্ম গ্রন্থসমূহ রহিত হয়ে যায়। কবির ভাষায়:[১৫৯]

تِلْكَ آيُ الْفُرْقَانِ أَرْسَلَهَا اللّٰــــــــه * ـــــهُ ضِيَاءً يَــهْدِي بِــهِ مَنْ يَشَاءُ

نَــسَخَتْ سُنَّــةَ النَّبِيِّــيْنَ وَالرُّســـ * ـلِ ، كَمَا يَــنْسَخُ الضِّيَاءَ الضِّيَاءُ

"আল-কুরআনের ঐ আয়াতগুলো এমন যে আল্লাহ পাক এগুলোকে আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রেরণ করেন, যদ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। এগুলো নবী ও রাসূলগণের নীতিকে রহিত করে যেমন আলো আলোকে রহিত করে।"

অতঃপর কবি ইয়াহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্মদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ না করে এ দুটির প্রতি বিশ্বাস ও মর্যাদা রেখে ইসলাম কর্তৃক পূর্ববর্তী ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহ রহিত হওয়ার কথা কোমল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কেননা ইসলামের পূর্বেকার ধর্মগুলো আলো ও সৎপথ প্রদর্শক ছিল, ইসলাম নতুন সৎপথ নিয়ে আসে। এর দ্বারা কবি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ইসলামের পূর্বে যা কিছু ছিল সেগুলোও এর স্বজাতীয়, কিন্তু ইসলাম সেগুলোর চেয়ে শক্তিশালী, অধিক স্পষ্টতর ও সূক্ষ্মতম। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের নবীদ্বয়ের পর দীর্ঘদিন যাবত মানবতা অন্যায় ও অন্ধকারের যে অমানিশায় ছেয়ে পড়ে, তা থেকে মানুষকে আলো ও ন্যায়ের পথে উদ্ধার করার জন্য মানব সমাজের বিবর্তনে সকল যুগের দিশারী, সকল স্থানের উপযোগী একটি সার্বজনীন ধর্মের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, আর এটিই হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-কুরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। এ প্রসঙ্গে 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' اَلْهَمْزِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ কবিতায় কবি বলেন:[১৬০]

اَلذِّكْرُ آيَــةُ رَبِّــكِ الْكُبْرَى الَّــتِيْ * فِيْهَا لِبَاغِي الْمُعْجِزَاتِ غَنَاءُ

نُسِخَتْ بِــهِ التَّوْرَاةُ وَهِيَ وَضِيْئَــةٌ * وَتَخَلَّفَ الإِنْجِيْلُ وَهُوَ ذُكَاءُ

"স্মারক গ্রন্থ আল-কুরআন! আপনার প্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন যাতে অলৌকিক ঘটনাবলী অন্বেষণকারীর জন্য রয়েছে পর্যাপ্ততা। এর দ্বারা দীপ্তিময় 'তাওরাত' রহিত হয়, আর প্রজ্ঞাময় 'ইঞ্জীল' পশ্চাতে সরে যায়।"

যেহেতু দ্বীন ইসলাম জাগৃতি ও গঠনের লক্ষ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রতি জাতিসমূহের চালিকা শক্তি সেহেতু আরব কবি-সম্রাট আহমাদ শাওকী এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, ধর্মীয় গোঁড়ামীর উৎখাতকারী এবং সকল মানুষের জন্য আল্লাহর একত্ববাদে ও অনুভূতিসমূহের ঐক্যে নিকটবর্তীকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মকে কামনা করেছেন। কারণ মানবস্রষ্টা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বিধান করেননি বরং তাদেরকে সংস্কৃতিবান করার জন্য তাদের নিকট নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, আর আসমানী কিতাবসমূহে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। সুতরাং কবির দৃষ্টিতে একমাত্র ধর্মই সকল মানুষকে

---

১৫৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৬০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'আল-ইল্‌ম ওয়া আল-তা'লীম ওয়া ওয়াজিব আল-মু'আল্লিম' العلم والتعليم و واجب المعلم শীর্ষক কবিতায় আহমাদ শাওকী বলেন:[১৬১]

أَرْسَلْتَ بِالتَّوْرَاةِ مُوْسَى مُرْشِداً * وَ ابْنَ الْبَتُوْلِ فَعَلَّمَ الإِنْجِيْلاَ

وَفَجَّرْتَ يَنْبُوْعَ الْبَيَانِ مُحَمَّداً * فَسَقَى الْحَدِيْثَ وَنَاوَلَ التَّنْزِيْلاَ

"(হে আল্লাহ!) আপনি তাওরাত দিয়ে হযরত মূসা (আ.) কে পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং বিবি মরিয়ম তনয় (হযরত ঈসা (আ.)) কেও প্রেরণ করেন, অনন্তর তিনি ইঞ্জীল শিক্ষা দেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আপনি অলংকারপূর্ণ বর্ণনায় দ্বারা ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন ফলে তিনি হাদীস পান করেন এবং ঐশীগ্রন্থ (আল-কুরআন) লাভ করেন।"

---

১৬১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মুসলিম খিলাফতের প্রশংসা

আহমাদ শাওকী ইসলামের দ্বারা মর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং এর ক্ষমতার উপকরণাদির সাথে সংশ্লিষ্ট একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি ছিলেন 'খিলাফত'[১৬২] তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থনকারী, মুসলমানদের ঐক্য ও তাঁদের সংহতিতে উৎসুক এবং মহান আল্লাহর পুরস্কারের প্রতি আগ্রহান্বিত। কবি 'খিলাফাত আল-ইসলাম' خِلاَفَةُ الإِسْلاَمِ শীর্ষক কাসীদায় উল্লেখ করেন যে, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর ধর্মের প্রতি ভালবাসাবশতঃ খিলাফতের পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং বাকী জীবনও তিনি মুসলিম খিলাফতের রক্ষক ও সমর্থক হিসেবে অতিবাহিত করবেন। কবির ভাষায়:[১৬৩]

عَهْدُ الْخِــلاَفَةِ فِيْ أَوَّلِ ذَائِدٍ * عَنْ حَوْضِهَا بِبَرَاعَــةٍ نَضَّاحُ
حُبٌّ لِذَاتِ اللهِ كَانَ، وَلَمْ يَزَلْ * وَهَوًى لِذَاتِ الْحَقِّ وَالإِصْلاَحُ

"আমার মতে খিলাফতের আমল হচ্ছে প্রতিরক্ষাকারীর নিপূণতার দ্বারা তাঁর সিংহাসনের প্রথম রক্ষক। খিলাফতের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে মহান আল্লাহর সত্তাকে ভালবাসা এবং সত্য ও সংস্কারকে ভালবাসা, যা অতীতে ছিল এবং সব সময় থা কবে।"

'দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' دُوَلُ الْعَرَبِ وَعُظَمَاءُ الإِسْـــلاَمِ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে কবি আহমাদ শাওকী ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকে খুলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়্যা, বনু আব্বাস ও ফাতেমীয় খিলাফতের পতন পর্যন্ত মুসলমানদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।[১৬৪] যেমন:-

---

১৬২. 'খিলাফত' خِلاَفَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, কারো মৃত্যু বা অপসারণ হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা। বস্তুতঃ ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ আল্লাহর খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দেয়া বিধি-বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠাকরণ তাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য- এটিই খিলাফতের মূল কথা। সুতরাং আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর গোটা উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করাকেই বলা হয় 'খিলাফত'। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাকে খিলাফত এবং যারা এ গুরু দায়িত্ব পালন করে তাঁদেরকে খলীফা বলা হয়। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় নবুওয়্যাতের পর খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদসম্পন্ন শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religio-Socio-Political Institution)। ইসলামের সরকার পদ্ধতি খিলাফত নামে পরিচিত। আল-কুরআন ও সুন্নাহ ও ভিত্তিক পরিচালিত ও সংগঠিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র। দ্রঃ আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ৩য় পত্র (ক), ইসলামী আদর্শবাদ, পৃ. ১০৯।

১৬৩. আহমাদ শাওকী, আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

১৬৪. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৯৭৭; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস, পৃ. ৮০; ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ.৮০।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশেদীন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁর ওফাতের পর তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এই চারজন খলীফা ইসলামের খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বলে ইসলামের চারজন খলীফার অনুক্রমকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' বা সত্যপথগামী বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল (১১-৪০ হি./৬৩২-৬৬১ খ্রি.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল ইসলামের সত্যিকার স্বর্ণযুগ। এই যুগের খলীফাগণ শান্তি, উদারতা ও ন্যায়-পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এ সময়েই ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলমানগণ রোমান সাম্রাজ্যের চেয়েও বিরাট এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ত্রিশ বৎসর স্থায়ী খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালটি ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রগাঢ় ভক্তি ও আন্তরিকতা সহকারে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের মহান খলীফাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নীতি ও আদর্শ অনুকরণ অনুসরণ করতেন। এতদসম্পর্কে 'আল-খুলাফা আল-রাশিদুন' اَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ শীর্ষক কবিতায় কবি আহমাদ শাওকী বলেন:[১৬৫]

اَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ أَرْبَعَــــــةٌ * مَــــرْضِيَّةٌ سُنَّتُــهُمْ مُتَّبَعَةٌ

فِي الذِّكْرِ لَمْ يُغْفَلْ لَهُمْ حَدِيْثٌ * وَذِكْـــــرُهُمْ سِيْــرَةُ الْحَدِيْثِ

اَلْعُمَرَانُ وَابْــــنُ أَرْوَى وَ عَلِيٌّ * فِي الذِّرْوَةِ الشَّنَاءِ وَالأَوْجُ الْعَلِيٌّ

خَلاَئِفُ اللهِ أَئِمَّـــــةُ الْهُــدَى * وَطَأً لِلْحَقِ بِهِـــــمْ وَمَهْــدًا

"ধর্ম পরায়ণ খলীফা চারজন, যাঁদের পদ্ধতি সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ও অনুসৃত। আল্লাহ তা'আলার স্মরণের ক্ষেত্রে তাঁদের একটি কথাও বিস্মৃত হয়নি, আর তাদের স্মরণ নৈশকালীন কথায় পরিণত হয়েছে। দুই উমর অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.), ওরওয়ার পুত্র হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.); তাঁরা সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার শীর্ষচূড়ায় উপনীত। তাঁরা মহান আল্লাহর খলীফা, সৎপথের নেতৃবৃন্দ, আদর্শের ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হই।"

খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)(৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাসের এক চরম সংকটময় সময়ে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' خَلِيْفَةُ رَسُوْلِ اللهِ বা 'আল্লাহর রাসূলের খলীফা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা.) এর মনোনয়ন অনুযায়ী মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হিসেবে খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে তিনি ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সকল বিদ্রোহ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা তিনি প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ইসলামকে আরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই সংকটজনক মুহূর্তে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার পেছনে হযরত আবূ বকর (রা.) এর যে অবদান তা বিবেচনা করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে ইসলামের রক্ষাকারী (Saviour of Islam) বলা যায়। খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর আড়াই বছরের খিলাফতকাল (১১-১৩ হি./ ৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) ছিল

---

১৬৫. আহমাদ শাওকী বেক, দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সংঘাতবিক্ষুব্ধ। মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, ভন্ড নবীদের উদ্ভব, স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন, আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ প্রভৃতি সমস্যা শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তখন এক বিরাট হুমকিস্বরূপ ছিল। এরূপ ঘনীভূত সংকটের ঘনঘোর অন্ধকারে হযরত আবূ বকর (রা.) এর মত খলীফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র কোনটিই রক্ষা পেত না। মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজ অনিবার্যভাবেই ধ্বংস হত। মুসলিম রাষ্ট্রের এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে ইসলামের ত্রাণকর্তা অকুতোভয় সেনানী হযরত আবু বকর (রা.) এর নির্ভীক প্রচেষ্টা ইসলাম তথা মুসলমানদের অস্তিত্বই কেবল রক্ষা করেনি বরং একে সুসংহত এবং সুবিস্তৃতও করেছিল। তাঁর শাসনামলেই মরুময় আরবের সীমানা অতিক্রম করে মুসলমানগণ ইরাক ও সিরিয়ার ভূখন্ডে নিজেদের বিজয় গৌরব বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর সময়েই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত ও লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে আল-কুরআন সংরক্ষণ করা হয় এবং কালক্রমে এটি একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থের রূপ লাভ করে। কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.) এর অবদান অপরিসীম ও অসামান্য।[১৬৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন সহচর, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর খিলাফতকাল সম্পর্কে আহমাদ শাওকী তাঁর 'খিলাফাতু আবী বকর আল-সিদ্দীক' خِلاَفَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ নামক কবিতায় বলেন:[১৬৭]

سُبْحَانَ مَنْ يُنْعِمُ كَيْفَ شَــاءَ * سَاسَ الْوَرَى مَنْ كَانَ يَرْعَى الشَّاءَ

يَقُــوْدُ بَعْدَ إِبِلِ ابْــنِ عَامِــرِ * مَا دَبَّ فِي غَامِرِهَا وَالْعَــامِرَ

سَنَا سَــمِيــرُ الثَّاقِبِ السَّيَّــارِ * وَالْخَيْرُ عُقْبَى صُحْبَةِ الأَخْــيَارِ

مَنْ أَيَّــدَ الْحَـــــــقَّ بِهِ تَأَيَّدَا * وَعَاشَ أَوْ مَاتَ كَرِيْــمًا سَيِّدًا

"পুতঃপবিত্র সেই সত্ত্বা! যিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা এমন ব্যক্তিকে দান করেন যে মেষ চারণ করতো। যিনি স্বীয় পিতা ওসমান বিন গামেরের উট চারণের পর পৃথিবীর সমতল ও অসমতল ভূমিতে বিচরণকারীদের (মানুষ) পরিচালিত করেন। যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মর্যাদায় আরোহণ করেন, আর সর্বোত্তম ব্যক্তির সাহচর্যের শেষ পরিণতি উত্তম হয়ে থাকে। যিনি সত্যকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেন এবং একজন সম্ভ্রান্ত নেতা হিসেবে জীবন যাপন করেন ও মৃত্যুবরণ করেন।"

খলীফা হযরত উমর (রা.)

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর ইন্তেকালের (১৩ হি./ ৬৩৪ খ্রি.) পর হযরত উমর ফারুক (রা.)(৫৮৩-৬৪৪ খ্রি.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ওফাতের পূর্বে হযরত ওসমান (রা) কে ডেকে তাঁর হাতে মনোনয়নপত্র লেখান যাতে তিনি পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। মনোনয়নপত্র খানা একটি খামে পুরে সীলমোহর করে বিশিষ্ট সাহাবীগণের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদেরকে বলা হলো এ খামে যার নাম আছে তাঁকে যেন খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করা হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে খিলাফত লাভ করে হযরত উমর (রা.) পূর্ববর্তী খলীফার সীমান্ত সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করতে

১৬৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮২), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫; আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ৩য় পত্র (গ), ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৩৭-৪২।

১৬৭. দুওয়াল আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। তাঁর দশ বৎসরের (১৩-২৩ হি./ ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) শাসনকাল ছিল ইসলামের তথা বিশ্বের ইতিহাসে চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ একটি সোনালী অধ্যায়। বিজেতা, শাসক, সংস্কারক, রাজনীতিক ও সংগঠক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিশাল পারস্য, বাইজান্টাইন তথা শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যকে ইসলামের পতাকাতলে এনে বিস্ময়কর চমক সৃষ্টি করেন। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি 'আমীরুল মু'মিনীন' أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ বা 'বিশ্বাসীদের নেতা' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি সর্বপ্রথম আরবী সন, দিন ও তারিখ নির্ণয় করার জন্য আরবদেশে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন এবং তারাবীহ নামায জামাতে আদায় করার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর শাসনামলেই ইসলামের রীতি-নীতি ও জনকল্যাণের উপর ভিত্তি করে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো গড়ে উঠেছিল। হযরত উমর (রা.) শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামের সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে তিনি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেননি। কিংবা নিজে সাধারণ প্রজা অপেক্ষা বেশী সুযোগ সবিধা ভোগ করেন নি। তাঁর নিকট সকলেই সমান ছিল। হযরত উমর (রা.) এর আমলেই খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদ অক্ষুন্ন রাখাই ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবী করীম (সা.) আরবে ইসলামী সাধারণতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন; খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) একে স্বধর্মত্যাগীদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) একে সুসংহত, শক্তিশালী এবং একটি বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। অত্যন্ত সফলতা ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি খিলাফত পরিচালনা করেন এবং বিজিত অঞ্চলে ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন করেন।[১৬৮]

খলীফা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকাল সম্পর্কে কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'খিলাফতু উমর বিন আল-খাত্তাব' خِلاَفَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ শীর্ষক কবিতার প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণে বলেন:[১৬৯]

مَضَى أَبُوْ بَكْرٍ، وَوَلاَّهَا عُمَرَ * الشَّمْسُ لاَ تُخْلَفُ إِلاَّ بِالْقَمَرِ

مَا مَالَ حَائِطُ الْهُدَى حَتَّى اعْتَدَلَ * وَالرُّكْنُ إِنْ سُدَّ مِنَ الرُّكْنِ بَدَلُ

بِزَاهِدٍ قَامَ مَكَانَ الزَّاهِدِ * مُجَاهِدٌ نَابَ عَنِ الْمُجَاهِدِ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ نَهَضَ الأَمِيْرُ * مُضْطَلِعٌ بِأَمْرِهِمْ شَيِّرُ

"খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন, আর হযরত উমর (রা.) খিলাফত লাভ করেন, সূর্য একমাত্র চন্দ্রের দ্বারাই প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে। সৎপথের কোন প্রাচীর ঝুঁকে যাওয়ার সাথে সাথেই তাকে সোজা করা হয়, আর একটি স্তম্ভ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তখন অন্য স্তম্ভ দ্বারা একে পরিপূর্ণ করা হয়। এমন একজন ধর্ম পরায়ণের দ্বারা যিনি অপর একজন ধর্ম পরায়ণের স্থলাভিষিক্ত হন, একজন মুজাহিদের মাধ্যমে যিনি অপর একজন মুজাহিদের প্রতিনিধিত্ব করেন। মুসলমানদের শাসক 'আমীরুল মু'মিনীন' (হযরত উমর (রা.)) বিশ্বাসীদের নিয়ে উজ্জীবিত হন, আর তিনি কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ।"

---

১৬৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৯), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২২-৩৬; কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭, দশম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ১৬৫-২১৯।

১৬৯. দুওয়াল আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হযরত ওসমান (রা.)

হযরত উমর (রা.) এর ইন্তেকালের (২৩ হি./৬৪৪ খ্রি.) পর হযরত ওসমান (রা.) (৬৫৬ খ্রি.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা। ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমন্ডলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়'আত করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁর ডাক নাম ছিল প্রথমে আবূ আমর ও পরে আবদুল্লাহ। বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য হযরত ওসমান (রা.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর অশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় কন্যা 'রুকাইয়্যা'কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার আকস্মিক ইন্তেকাল হলে নবী করীম (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা 'উম্মে কুলসুম'কে হযরত ওসমান (রা.) এর কাছে বিবাহ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন একারণে তিনি 'যুন নূরাইন' ذُو النُّوْرَيْــــنِ 'দুই জ্যোতির অধিকারী' উপাধি লাভ করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হযরত ওসমান (রা.) পূর্ববর্তী খলীফা হযরত উমর (রা.) এর কার্যাবলী অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তিনিই মুসলিম জাহানের একমাত্র খলীফা যিনি তাঁর নিজের ভরণ-পোষণের জন্য বায়তুল মাল থেকে একটি কপর্দকও নিতেন না। উপরন্তু ইসলাম ও জনসাধারণের খেদমতে তিনি অকাতরে তাঁর অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) এর খিলাফত আমলে (২৩-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৩ খ্রি.) সাম্রাজ্যের বিজয়াভিযান পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। মুসলিম সেনাবাহিনী পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রাজ্য জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। তিনি বেলুচিস্তান দখল করে ভারতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আফ্রিকা মহাদেশসহ কতিপয় ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে আরবদের অধিকার সম্প্রসারণ করেছিলেন। এভাবে হযরত ওসমান (রা.) এর আমলে জলে-স্থলে উভয় দিকেই মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। এ সকল বিজয় তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামলের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় সংযোজন করে। হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামলে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআন সংকলন করা হয়, এজন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' جَامِعُ الْقُرْآنِ বা 'কুরআনের সংকলনকারী' বলা হয়।[১৭০] এ বিষয়টি কবি আহমাদ শাওকী 'খিলাফাত ওসমান বিন আফ্‌ফান' خِلَافَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ নামক কবিতার শেষ কয়েকটি চরণে চিত্রিত করে করে বলেন: [১৭১]

وَخَفَقَتْ كَتَائِبُ الإِسْــــــلاَمِ * فِي الْبَحْرِ أَعْلاَماً عَلَى أَعْلاَمِ
فَـــخْرٌ لِذِيْ النُّوْرَيْنِ أَيُّ فَخْــرِ * وَحِـــجَّةٌ تُـــذْكَرُ لاِبْنِ صَخْرِ
يَا طَالَمَا بَالَـــــغَ فِي الْخطَابِ * فَــلَمْ يَتَهَلَّنْ فَتَى الْخِطَابِ
سُبْحَانَ مَنْ فَـــــرَّقَ فِي الأَئمَّةِ * مَا حَلَّ مِنْ مَنْقَبَةٍ وَهَــــبِهِ
لَهُ الْـــكَمَالُ وَحْـــــدَهُ وَالْمُلْكُ * وَهُـــوَ الدَّوَامُ وَسَوَاءٌ هَلَكَ

"আর ইসলামের সেনাবাহিনীগণ সমুদ্রের মাঝে পতাকার পর পতাকাকে স্থাপন করেছে। এটি ছিল দুই নূরের অধিকারী হযরত ওসমান (রা.) এর জন্য সর্বপ্রকারের গৌরব, আর ইব্‌ন সাখর

---

১৭০. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৬০-৫৬৬; আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ৩য় পত্র (গ), 'ইসলামের ইতিহাস', পৃ. ৫১-৫৬; কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ২২০-২৫৪।

১৭১. দুওয়াল আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মু'আবিয়া (রা.) এর জন্য ছিল উল্লেখযোগ্য সাহসিকতা। ওহে ব্যক্তি! যিনি অনেক সময় দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেছেন, অনন্তর অনুরূপ অলংকারপূর্ণ ভাষণ দানকারী যুবকগণ তা লাভ করতে পারেনি। সুমহান সেই সত্তা! যিনি নেতাদের মধ্যে মহৎ গুণাবলী ও সাহসিকতায় মহত্ত্বের দ্বারা পার্থক্য করেছেন। তাঁর অধিকারে রয়েছে এককভাবে সাম্রাজ্য, তিনি চিরস্থায়ী এবং তিনি ব্যতীত সবই ধ্বংসশীল।"

খলীফা হযরত আলী (রা.)

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) (৬০০-৬৬১ খ্রি.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা আবূ তালিবের পুত্র। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। নবী করীম (সা.)ও এই গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (রা.) কে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং হিজরী প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ষে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা বিবি ফাতিমা আয-যাহ্রা (রা.) কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও সাহসের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। ইসলামের জন্য হযরত আলী (রা.) এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি তাবুক অভিযান (৬৩১ খ্রি.) ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, বনু কুরাইযার যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়সহ বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযানে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' أَسَدُ اللهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর সিংহ', 'হায়দার' حَيْــــدَرٌ তথা 'বলবান' উপাধিসহ 'যুলফিকার' ذُو الْفِقَارِ নামক একখানি তরবারী উপহার দেন। হযরত আলী (রা.) রাজনৈতিক অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে ৬৫৬ খ্রি./৩৫ হিজরী সনে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফ্ফীনের যুদ্ধ (৬৫৬-৬৫৭ খ্রি.) সংঘটিত হয়। তাঁর শাসনামলে একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ব্যতীত মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তিনি চার বছর নয় মাস (৩৫-৪০ হি./ ৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) খিলাফত পরিচালনা করেন।[১৭২] তিনি নিজেকে সর্বোতভাবে ইসলামের বিস্তার ও সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর সময়েই ইসলামী খিলাফত বিভক্ত এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। কবি আহমাদ শাওকী 'আমীর আল-মু'মিনীন আলী বিন আবী তালিব' أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ শীর্ষক কবিতার প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণে ইসলামের প্রথম যুবক মুসলমান হযরত আলী (রা.) এর দুঃসাহসিক কৃতিত্ব সম্পর্কে বলেন:[১৭৩]

أَمَّا الإِمَامُ فَالأَغَــرُّ الْهَادِيُ * حَامِيْ عَرِيْنِ الْحَقِّ وَالْجِــهَادِ

اَلْعُمَــــــرَانِ يَأْخُذَانِ عَنْهُ * وَالْقَمَرَانِ نُسْخَتَانِ مِـنْهُ

أَصْلُ النَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَفَرْعُهُ * وَدِيْنُـــهُ مِنْ بَعْدِهِ وَشَرْعُــهُ

وَصَــفْحَــتَاهُ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا * وَفِي الْوَغَا وَحِيْنَ يَرْقَى الْمِنْبَرَا

"অনন্তর সর্বাধিক উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক ইমাম হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন সত্য ও সংগ্রামের শক্তির রক্ষক। দুই উমর অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা.) উভয়েই তাঁর নিকট থেকে উহা

---

১৭২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮-৭১; আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ৩য় পত্র, (গ), ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৫৭-৬২; কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ২৫৫-২৯২।

১৭৩. দুওয়াল আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন, দু'টি চন্দ্র অর্থাৎ ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর দুটি প্রতিচ্ছবি। তিনি মনোনীত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মূল, তাঁর শাখা, তাঁর তিরোধানের পর তিনি হচ্ছেন ধর্ম এবং বিধান। অগ্রগামী ও পশ্চাদগমনকারী হিসেবে এবং রনাঙ্গণে ও মিম্বরে আরোহণকালে তিনি নবী করীম (সা.) এর দু'টি পার্শ্ব।"

উমাইয়া খিলাফত

খলীফা হযরত আলী (রা.) ও সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া ইব্‌নে আবূ সুফিয়ান (৬০৬-৬৮০ খ্রি.) এর মধ্যে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিফ্‌ফীনের গৃহ যুদ্ধে খলীফার মৃত্যু ও তাঁর পুত্র ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগের পর ইসলামী সাম্রাজ্যে উমাইয়া বংশ ক্ষমতা লাভ করে । এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে উমাইয়া খিলাফত (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে 'দাওলাতু বনী উমাইয়া' دَوْلَةُ بَنِيْ أُمَيَّةِ শীর্ষক কবিতার প্রারম্ভিক চরণদ্বয়ে কবি আহমাদ শাওকী বলেন;[১৭৪]

عَلِمْتُ أَنَّ السَّيْفَ بَنَّاءُ الدُّوَلِ * وَرُكْنُهَا فِي الآخِرِيْنَ وَالأُوَلِ

مَا زَالَ فِي الْمَسَالِكِ الأَسَاسَا * بِهِ بَنَاهَا مَنْ بَنَى وَسَاسَا

"আমি অবগত হয়েছি যে, তরবারী হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহের নির্মাতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এর স্তম্ভ। এটা সর্বদাই রাজ্যসমূহের ভিত্তি হিসেবে চলে আসছে, এর দ্বারা রাজ্যসমূহকে নির্মাণ করেছেন এমন ব্যক্তি যিনি নির্মাণ করেছেন ও শাসন করেছেন।"

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু হিজরী ৪০ সালে হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করলে হযরত মু'আবিয়া (রা.) মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র আমীর নিযুক্ত হন। উমাইয়া বংশের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান খিলাফত লাভ করে নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য কুফা নগরী থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী সিরিয়ার দামেশ্‌কে স্থানান্তরিত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পর রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করে দেশ বিজয়ে মনোনিবেশ করলেন। খলীফা হযরত উমর (রা.) এর পর একমাত্র তিনি ইসলামী রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। মুসলিম বাহিনী পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিজয় পতাকা উড়িয়ে চললো। মু'আবিয়ার সেনাপতিদের পরিচালনায় ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করে। রাষ্ট্রের উন্নয়নেও তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[১৭৫] তাঁর প্রায় ২০ বছরের শাসনামলে (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৮০ খ্রি.) খিলাফত কেবল সুসংহতই হয়নি বরং এর আঞ্চলিক সম্প্রসারণও সাধিত হয়েছিল। কবির ভাষায়:[১৭৬]

فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ بَثْ أُمَيَّهْ * سَلْطَنَةً لَيْسَ لَهَا سَمِيَّهْ

خِلاَفَةً عَلَى الْبَسِيْطَةِ احْتَوَتْ * شَرْقَ الثَّرَى حَازَتْ وَغَرْبَهُ حَوَتْ

خَيَّرْتُ بِجُنْدِ الْخَيْلَ الْمُجَنَّدِ * وَأَحْرَزْتُ بِالرَّأْيِ وَالْمُهَنَّدِ

---

১৭৪. দুওয়াল আল-আয়ব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৬৬।

১৭৫. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ৩য় পত্র (গ), 'ইসলামের ইতিহাস', পৃ.৬৬-৬৯; কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৩১৯-৩৪২।

১৭৬. দুওয়াল আল-আয়ব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

احْتَازَهَا مِــنَ الْجَرْيِ الْقُلَّبُ * وَغَلَبَ اللَّــيْثُ عَلَيْهَا الــثَّعْلَــبَ

"প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উমাইয়া বংশ এমন একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কোন তুলনা নেই। এমন একটি বিশাল খিলাফত যা প্রাচ্যের ভূমিকে পরিচর্যা করেছে এবং তাঁরা পাশ্চাত্যের ভূমিকা একত্রিত করেছে ও ছিনিয়ে এনেছে। তাঁরা সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা তাদেরকে পদানত করেছে এবং তাঁরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও ভারতবর্ষে নির্মিত তরবারী দ্বারা খিলাফতকে সংরক্ষণ করে। একে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ও দূরদর্শী ব্যক্তি সুসংহত করে এবং সেখানে শিয়াল সিংহের উপর জয়যুক্ত হয়।"

আব্বাসীয় খিলাফত

খুলাফায়ে রাশেদীন (১১-৪০ হি./৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ছিল ইসলামী ধর্মতন্ত্র, উমাইয়া খিলাফত (৪০-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ছিল আরবদের গোত্রগত ও জাতিগত রাজতন্ত্র, আর আব্বাসীয় খিলাফত (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ছিল ইসলামী সাম্রাজ্য ও মুসলিম রাজতন্ত্র। ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় খিলাফতকাল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়, বরং আব্বাসীয় যুগ জ্ঞানাত্মক জাগরণের মাধ্যমে চিন্তা ও সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান বিন মুহাম্মদ (৭২-১৩২ হি./৬৯২-৭৫০ খ্রি.)কে পরাজিত করে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-সাফ্ফাহ (১০৪-১৩৫ হি./৭২২-৭৫৪ খ্রি.) ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলীফা। ১২৫৮ সালে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল অধিপতি হালাকু খান (১২১৭-১২৬৫ খ্রি.) এর বাগদাদ আক্রমণের ফলে খলীফা আবদুল্লাহ আল-মুসতা'সিম বিন মাসনুর আল-মুস্তানসির বিন মানসুর (৬০৯-৬৫৬ হি./১২১২-১২৫৮ খ্রি.) এর শোচনীয় পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাহান কিছুদিনের জন্য খলীফাশূন্য হয়ে পড়ে এবং আব্বাসীয় বংশের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। আবুল আব্বাস আল-সাফ্ফাহ (খিলাফতকাল-১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) থেকে আবদুল্লাহ আল-মুসতা'সিম বিল্লাহ (খিলাফতকাল-৬৪০-৬৫৫ হি./১২৪২-১২৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত ৩৭ জন আব্বাসীয় বংশের খলীফা মুসলিম খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন।[১৭৭]

আব্বাসীয় খলীফাগণ ছিলেন স্বঘোষিত ইসলামের রক্ষাকর্তা। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল সকল শ্রেণীর মুসলমানের জন্য, গোত্র ও জাতির জন্য সেখানে কোন পার্থক্য ছিল না। এমনিভাবে আব্বাসীয় শাসন গোত্র-জাতি নির্বিশেষে সকল মুসলমানের একটি আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছিল। সার্বজনীন ইসলামী সাম্রাজ্য আব্বাসীয় আমলে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল-মানসুর (খিলাফতকাল-১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.), হারুন আল-রশীদ (খিলাফতকাল-১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ও আবদুল্লাহ আল-মামুন (খিলাফতকাল-১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তাই শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার কারণে ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয়। আব্বাসীয় খিলাফত সম্পর্কে 'আল-দাওলাতু আল-আব্বাসীয়া' اَلدَّوْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ নামক কবিতায় আহমাদ শাওকী বলেন:[১৭৮]

---

১৭৭. জুরজী যায়দান, তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

১৭৮. দুওয়ান আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

وَدَوْلَــةُ الْحَــــــقِّ بَدَتْ لِلنَّاسِ * بَيْنَ رِضَى الْخَلْقِ وَالاِسْتِئْنَاسِ

وَعَــدَ النَّـبِــيُّ فِي الْحَيَاةِ عَمَّــهُ * اللهُ مِنْ بَــعْدِ هِمَا أَتَــمَّــهُ

"সৃষ্টিকুলের ও শাসন ক্ষমতার সন্তুষ্টির মধ্যে মানুষের কল্যাণার্থে একটি সত্যের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর চাচা (আব্বাস) কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ফল; যা আল্লাহ তা'আলা তাদের পর বাস্তবায়ন করেছেন।"

ফাতেমীয় খিলাফত

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) ও তাঁর স্ত্রী নবী-দুহিতা বিবি ফাতিমা আল-যাহ্‌রা (রা.) এর বংশধরগণ ইতিহাসে ফাতেমীয় (Fatimids) নামে পরিচিত। ৬১ হি./ ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালা প্রান্তরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এর নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণের পর থেকে হযরত আলী (রা.) ও বিবি ফাতিমা (রা.) এর বংশধরগণ উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের মতে, হযরত আলী (রা.) এবং বিবি ফাতিমা (রা.) এর বংশধরগণই ইসলামী খিলাফতের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণ অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ দ্বারা তাদেরকে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। ফলে স্বভাবতই একদল মুসলমান ইমাম হুসাইন বিন আলী (রা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তারা হযরত আলী (রা.) এর বংশধরদের ইসলামী খিলাফতের যথার্থ দাবীদার এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইমাম বলে মনে করতেন। এই সময় হযরত আলী (রা.) এর সমর্থকগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কালক্রমে তাদের বিদ্রোহ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে এবং তাঁরা সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে দুর্বল আব্বাসীয় খলীফাদের বিরুদ্ধে একটি বংশ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চালাতে থাকে। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খলীফাদের ইসলাম জগতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতিবাদ স্বরূপ ফাতেমীয় খিলাফত ৯০৯ সালে আফ্রিকাতে সর্বপ্রথম শিয়া রাজবংশ হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ইমাম ওবায়দুল্লাহ আল-মাহ্‌দী (মৃ. ৩২২ হি./৯৩৪ খ্রি.) আগলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর ২৯৭ হি./৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে ইমাম ইসমাঈল বিন জা'ফর আল-সাদিক (মৃ.১৩৩ হি./ ৭৫০ খ্রি.) এবং ইমাম হুসায়ন বিন আলী (রা.) এর মাধ্যমে হযরতের কন্যা বিবি ফাতিমা আল-যাহ্‌রা (রা.) এর বংশধর দাবী করতেন বলে ইসলামের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ফাতেমীয় খিলাফত নামে অভিহিত হয়ে আসছে।[১৭৯]

এমনিভাবে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহ্‌দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ প্রায় দুই শতাধিক বৎসর কালের স্থায়ী ৯০৯-১১৭১ সাল পর্যন্ত ফাতেমীয় খিলাফত পরিচালনা করেন। তিনি প্রথমতঃ তিউনিসিয়ায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, পরে সমগ্র উত্তর অফ্রিকা তাদের অধীনস্থ হয়। অতঃপর চতুর্থ ফাতেমীয় খলীফা আল-মুইয লি-দীনিল্লাহ (৩১৯-৩৬৫ হি./৯৩১-৯৭৫ খ্রি.)এর শাসনামলে (৩৪১-৩৬৫ হি./৯৫৩-৯৭৫ খ্রি.) মিসর তাদের অধিকারে আসে। যিনি রাষ্ট্রের সীমানা আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলসমূহে প্রসারিত করেন। তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি আল-জাওহারের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তিনি

---

১৭৯. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯), পৃ. ৫৫৮-৫৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬৯ সালে মিসর দখল কর নেন। প্রখ্যাত সেনাপতি আল-জাওহার সেখানে 'আল-কাহিরা' اَلْقَاهِرَةُ বা কায়রো নামে একটি নতুন নগরীর গোড়াপত্তন করে একে মিসরের রাজধানী নির্বাচন করেন। অতঃপর সেনাপতি একে একে হিজাজ, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবানন দখল করে সে সব অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফা আল-মুইযের সুদক্ষ শাসনে এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ফাতেমীয় শক্তি অনেকাংশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। শাসন ব্যাপারে ফাতেমীয় খলীফাগণ আব্বাসীয়দের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ফাতেমীয়দের শাসনামলে ইসলামী সংস্কৃতি এর শীর্ষস্থানে পৌঁছে। ফলে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং বহির্দেশ থেকে পন্ডিত ও বিজ্ঞানীদেরকে মিসরে আহ্বান করে বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত করেন। তাদের শাসনব্যবস্থা অন্যান্য যে কোন মুসলিম শাসন ব্যবস্থা থেকে নিকৃষ্ট ছিল না। তাদের সুশাসনে দেশে শান্তি-শৃংখলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। মিসরের ইতিহাসে হযরত আলী (রা.) ও বিবি ফাতিমা (রা.) এর বংশধরদের শাসন তথা ফাতেমীয় খিলাফত একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে।[১৮০]

ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কবি আহমাদ শাওকী তাঁর 'দাওলাতু আল-ফাতিমীয়্যীন' دَوْلَةُ الْفَاطِمِيِّـيْنَ শীর্ষক কবিতায় চিত্রিত করে বলেন:[১৮১]

قَامَ إِمَامٌ مِنْ بَنِي فَاطِمَةْ * خَلِيفَةٌ ثُمَّ تَلاهُ مَنْ تَلاَ
مَا عَجَبِي لِمُلْكِهِمْ كَيْفَ بَنَى * بَلْ عَجَبِي كَيْفَ تَأَخَّرَ الْبِنَا
فَيَا جَزَى اللهُ بَنِي فَاطِمَةْ * عَنْ مِصْرَ خَيْرَ مَا أَثَابَ وَجَزَى

"ফাতেমী বংশ থেকে একজন ইমাম (নেতা) খলীফা হিসেবে আবির্ভূত হন, অনন্তর তাঁকে যারা অনুসরণ করার ছিল, তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার আশ্চর্যের কিছু নেই। বরং আমার আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এটি কিভাবে আমাদের নিকট পর্যন্ত চলে এলো! হে ফাতেমী বংশ ! আল্লাহ পাক আপনাদের মিসরের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পূণ্য ও বিনিময় প্রদান করুন।"

ওসমানীয় তুর্কী খিলাফত

আহমাদ শাওকীর কাব্যসংকলন 'আল-শাওকিয়্যাত اَلشَّوْقِيَّاتُ এ ওসমানীয় তুর্কী খিলাফত (১৩২৬-১৯২৪ খ্রি.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কাসীদার সন্ধান পাওয়া যায়। ওসমানীয় বা অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান ওসমান (১২৫৮-১৩২৬ খ্রি.) এর বংশধরগণকে তাঁর নামানুসারে 'ওসমানীয়' (Osmanly) বলা হয়। যদিও বিদেশী লেখকদের হাতে এটা বিকৃত হয়ে অটোমান হয়েছে এবং ইতিহাসে এ নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। ওসমানীয়রা ১৩২৬-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। অতঃপর ১৫১৬-১৯২৪ সাল পর্যন্ত তুর্কী খিলাফত সুচারুভাবে পরিচালনা করেন।[১৮২]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে ওসমানীয় তুর্কী খলীফাগণ এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। যখন বিশ্বের বুক থেকে দ্বীন ইসলামকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য মধ্য-এশিয়ার যাযাবর

---

১৮০. ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৫১৮।

১৮১. দুওয়াল আল-আরব ওয়া 'উযামা আল-ইসলাম, পৃ. ৯১ ও ৭৯।

১৮২. ফারদীনান তূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৪৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাতার জাতি মোঙ্গল ও খ্রিষ্টানগণ বদ্ধপরিকর, তখন অটোমান বা ওসমানীয় তুর্কীগণ খলীফাদের নেতৃত্বে ইসলামের রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইসলামকে শুধু আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেননি, বরং ইসলামের বিজয় পতাকাকে ইউরোপেও উড্ডীন করেছিলেন।[১৮৩]

তাই কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী ইসলাম ধর্মের প্রতীক ও গৌরবের নিদর্শন হিসেবে ওসমানীয় তুর্কী খিলাফতকে বিবেচনা করেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁদের সমর্থন করেন। কেননা মিসর ছিল সেই তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। আর তদানীন্তনকালে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন তুর্কী খলীফাবৃন্দ। মূলতঃ তাদের রাজধানী ছিল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক যোগসূত্রতার প্রতীক। ফলে তাদের সাহায্য করার অর্থ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়তা সমর্থন করা। নিঃসন্দেহে মিসরীয় কবিদের মধ্যে আহমাদ শাওকী ছিলেন খিলাফতের জন্য অধিক সম্মানদাকারী। তুর্কীরা যখন সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে তিনি সাহায্য প্রদান করেছেন, তাঁদের বীরত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। তারা যখন পরাজিত হয়েছে তখন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁদের কোন অঞ্চল খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি বেদনাহত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন।[১৮৪]

উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় আমলে মুসলিম জাহান বাগদাদে আব্বাসীয়, মিসরে ফাতেমীয় ও স্পেনের উমাইয়া এই তিনটি খিলাফতের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ওসমানীয় বংশের সুলতান প্রথম সেলিম (১৪৬৬-১৫২০ খ্রি.) এর শাসনকালের (১৫১২-১৫২০ খ্রি.) পরেই খিলাফত তুর্কীদের অধীনে চলে যায়। অনন্তর উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ অধিকাংশ মুসলিম দেশে শিকড় গেড়ে বসে তখন এই অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয়রা কেবল মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর অংশই করায়ত্ত করেনি, বরং ইসলামের অস্তিত্বকেও প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিল। মুসলিম জাতির এই বিশেষ ক্রান্তিকালীন যুগ সন্ধিক্ষণে ওসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ (১২৫৮-১৩৩৭ হি./১৮৪২-১৯১৮ খ্রি.) ছিলেন মুসলিম জাহানের একমাত্র রক্ষাকবচ। তিনি তাঁর খিলাফতকালে (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.) জাতীয়তাবাদ ও পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে একই খলীফার অধীনে রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য 'বিশ্ব-ইসলামীবাদ' (Pan-Islamism) এর পক্ষে এক শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলেন। তিনি খিলাফতের গুরুত্বকে পুনর্জীবিত করে মুসলিম জাহানকে এটা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ফলশ্রুতিতে তুরস্কে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ক্রমবর্ধমান হামলা প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা থেকে বিশ্ব-ইসলামীবাদের সৃষ্টি। একই ঐক্যবন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্ব-ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। আর ক্ষয়িষ্ণু খিলাফতের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং ইউরোপীয়দের হামলার বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বিশ্ব-ইসলামীবাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্বের সর্বত্র দূত প্রেরণ করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু বিশ্ব-ইসলামীবাদ তথা খিলাফত আন্দোলন এর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও তা মুসলিম জাহানে যে জাগরণ এনেছিল আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[১৮৫]

---

১৮৩. কে.আলী, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, নবম সংস্করণ, ১৯৮৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১।

১৮৪. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ২৩৭-২৭৮।

১৮৫. কে. আলী, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩-২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ শাওকী স্বীয় মাতৃভূমি মিসরের উপলক্ষসমূহের কাসীদা রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি তুর্কী ও ওসমানী খিলাফতের উপলক্ষাদির প্রতি তাঁর রচনার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছেন। ফলে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে তুর্কী খলীফার বিজয়সমূহের প্রশংসায় সুদীর্ঘ অনেক কাসীদা রচনা করেছেন। [১৮৬]

১৩১৪ হি./১৮৯৬ সালে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যখন তুর্কীরা বিজয় লাভ করে তখন কবি আহমাদ শাওকী 'তাহিয়্যাতুন লিল-তুর্ক' تَحِيَّةٌ لِلتُّرْكِ শীর্ষক কাসীদায় খলীফার বিজয় অর্জনকে অভিনন্দিত করে বলেন যে, এহেন বিজয়ের গৌরব খলীফার একার নয়, এজন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা খলীফার একার কাজ নয়, বরং এটি সকল মুসলমানের বিজয়। তাই এ বিজয়ে তাদের সকলেরই মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা উচিত। আহমাদ শাওকী এই কাসীদায় সকল মুসলমানের মুখপাত্র হয়ে এহেন বিজয়ের দ্বারা গৌরবান্বিত একজন মুসলমান হিসেবে আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং খলীফার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন:[১৮৭]

بِحَمْدِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَا * وَحَمْدِكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَا
لَقِيْنَا فِي عَدُوِّكَ مَا لَقِيْنَا * لَقِيْنَا الْفَتْحَ وَالنَّصْرَ الْمُبِيْنَا
جَمَعْتَ لَنَا الْمَسَالِكَ وَالشُّعُوْبَا * وَكَانَتْ فِيْ سِيَاسَتِهَا ضُرُوْبَا
وَلاَ وَاللهِ وَالرُّسُلِ الْكِرَام * وَبَيْتُكَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الأَنَامِ

"সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, আর হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রশংসা সহকারে আমরা আপনার শত্রুদের সাথে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজন ছিল তা করেছি, ফলে আমরা বিজয় এবং সুস্পষ্ট জয় লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য বিভিন্ন রাজ্য এবং গোত্রসমূহ একত্রিত করেছেন এবং এগুলোর কৌশলের মধ্যে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজ্ঞা। না, আল্লাহ পাক এবং সুমহান রাসূলদের শপথ যে, আপনার পরিবারই সৃষ্টিকুলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পরিবার।"

এই কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী যুদ্ধের বর্ণনা, খলীফার বিজয়ের প্রশংসা এবং যুদ্ধে গ্রীকদের পরাজয়ে সন্তুষ্টি বর্ণনা দিয়ে এহেন বিজয়কে শ্রেষ্ঠ বিজয় আখ্যায়িত করে কাসীদার পরিসমাপ্তি ঘটান এভাবে:[১৮৮]

بَنِيْ عُثْمَانَ، إِنَّا قَدْ قَدِرْنَا * فُتُوْحَكُمُ الْكِبَارَ وَقَدْ شَكَرْنَا
سَأَلْنَا اللهَ نَصْرًا فَانْتَصَرْنَا * بِكُمْ، وَاللهُ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَا

"ওসমানের বংশধর! অবশ্যই আমরা তোমাদের বিরাট বিজয়সমূহ মূল্যায়ন করি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা আল্লাহ পাকের নিকট বিজয় প্রার্থনা করি, অনন্তর তিনি আপনাদের মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয় দান করেন এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম সাহায্যকারী।"

নিঃসন্দেহে তুর্কীদের প্রতি আহমাদ শাওকীর আবেগ প্রবণতা ছিল তাঁর ইসলামী আবেগ-অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। ইসলাম ধর্ম, মুসলমান, আরব ও ইসলামী দেশগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তিনি তুর্কীদের সমর্থ করেন। অধিকন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং আরব ও ইসলামী দেশগুলোর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর লোভ-লালসাই মূলতঃ কবিকে ইসলাম ও তুর্কীদের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক

---

১৮৬. মুহাম্মদ মানদূর, আহমাদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৮৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০-২৮১।

১৮৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনে বাধ্য করেছিল। ইসলামী ঐক্যজোট হওয়ার কারণে তিনি ও তাঁর মত অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকগণ মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো একে খণ্ড বিখণ্ড ও এর অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো জবর দখল করার পায়তারা করছে।

আহমাদ শাওকী তাঁর 'তাহিয়্যাতুন লিল-তুর্ক' تَحِيَّةٌ لِلتُّرْكِ শীর্ষক কাসীদায় তুর্কী বলতে তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিত্বশীলদের বুঝিয়েছেন এবং কামনা করেছেন তাঁরা যেন তাঁদের ধর্মীয় মর্যাদায় শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ইসলাম যেন তাঁদের মধ্যে চেতনার উৎস হয়ে থাকে। এজন্য তিনি তাঁদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে শক্তি ও মর্যাদার উপকরণ গ্রহণ করার লক্ষ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:[১৮৯]

يَا فِتْيَـــةَ التُّرْكِ، حَيَّا اللهُ طَلْعَتَكُمْ * وَصَانَكُمْ، وَهَدَاكُمْ صَادِقَ الْخَدَمِ

أَنْتُمْ غَدُ الْمُلْكِ وَالإِسْلَامِ، لاَ بَرِحَا * مِنْكُمْ بِخَيْرِ غَدٍ فِي الْمَجْدِ مُبْتَسِمِ

"হে তুর্কী যুবকগণ! আল্লাহ পাক তোমাদের আনন্দিত করুন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করুন, তোমাদেরকে যথার্থ সেবা কার্যাদির প্রতি পরিচালিত করুন। তোমরা রাজ্যের ও ইসলামের ভবিষ্যত, তোমাদের মধ্য থেকে গৌরবের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টিকারী সর্বদা বিদ্যমান থাকুক।"

মিসরের খেদীব বংশ রক্ত ও রাজনৈতিক দিক থেকে তুর্কীদের সাথে সংযুক্ত ছিল। আহমাদ শাওকী যেহেতু খেদীবী রাজদরবারী কবি ও রাজ প্রাসাদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন, সেহেতু তাঁর কবিতায় রাজদরবারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু তাঁর ধমনীতে তুর্কী রক্ত প্রবাহমান ছিল তাই তুর্কীদের প্রতি তাঁর ভালবাসার আধিক্য ছিল। এজন্য কেউ কেউ তুর্কী বংশোদ্ভূত খেদীবদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আহমাদ শাওকী তুর্কীদের প্রশংসা করেছিলেন বলে মনে করেন। কিন্তু ধারণাটি যে অমূলক এ ব্যাপারে ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী বলেন যে, "আহমাদ শাওকী তাঁর তুর্কী কাসীদাসমূহের দ্বারা রাজপ্রাসাদকে সন্তুষ্ট করতে চাননি বরং তিনি এর মাধ্যমে তাঁর বৃহত্তম, গভীরতম ও অধিক ধারালো ইসলামী অনুভূতির জয়গান করেছেন। তাঁর ইসলামী তুর্কী কাসীদাগুলো রচনার প্রথম শক্তিশালী কারণ ছিল তাঁর ইসলামী আবেগ-অনুভূতি।" [১৯০]

খেদীবীদের রাজপ্রাসাদসমূহে লালিত-পালিত এবং তাদের থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণকারী তুর্কী রাজ্যের প্রতি প্রীতি লালনকারী কবি আহমাদ শাওকী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে মিসরের অধীনস্থ থাকার বিরুদ্ধবাদীদের সহায়তা করার দিকে আকৃষ্ট হন। আর এই আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তুর্কী রাজ্য ইসলামের সহায়তা করছে। তাই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ কবিতাকে ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজের সাথে মিলিয়ে নেন। অতঃপর মিসরে মুহাম্মদ আলী পাশা (১১৮৪-১২৬৫ হি./১৭৭০-১৯৪৯ খ্রি.) এর শাসনকাল (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গের সমীপে তাঁর কাসীদাসমূহের রচনার দিন পর্যন্ত তিনি খেদীবীদের চরিত্রকে এমন ইসলামের চরিত্রে পরিণত করেন যা সর্বপ্রকার ভেদাভেদ অথবা এমন পক্ষপাতমুক্ত, যা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতায় বাধাপ্রদান করে আল্লাহর অনুগ্রহে যিনি খেদীবীদেরকে তার তরবারীসমূহের তরবারীতে পরিণত করেছেন এবং নবী

---

১৮৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫।

১৯০. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ২৪০-২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

করীম (সা.) এর সহায়তায় যিনি বুরাকে আরোহণ করে মহাকাশে নৈশভ্রমণের বিজয় অর্জন করেন।[১৯১] এই মর্মে কবি বলেন:[১৯২]

هُوَ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ * أَوْ مِنْ سُيُوْفِ الْهِنْدِ عِنْدَ قَضَائِهِ

فَــتَحَ الــنَّـــبِيُّ لَهُ مُنَاخَ بُرَاقِهِ * وَمَعَارِجَ الــشَّــرِيْفِ مِنْ إِسْرَائِهِ

"তিনি মহিমাময় আল্লাহর তরবারী সমূহের অন্তর্ভুক্ত অথবা তাঁর ফয়সালা করার সময় ভারতবর্ষের তরবারীসমূহের একটি তরবারী। নবী করীম (সা.) তাঁর জন্য স্বীয় বুরাকের আবহাওয়াকে বশীভূত করেন এবং স্বীয় নৈশভ্রমণের দ্বারা মর্যাদার সিঁড়িসমূহ জয়লাভ করেন।"

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ

কবি তুর্কীদের বিজয়ে ইসলামের বিজয় এবং তাদের দুর্বলতার মাঝে ইসলামের দুর্বলতা খুঁজে পান। কেননা তৎকালীন সময় তারাই ছিল ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিনিধিত্বকারী। 'সাদা আল-হারব' صَدَى الْحَــــرْب শীর্ষক কবিতায় কবি ওসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ (১২৫৮-১৩৩৭ হি./১৮৪২-১৯১৮ খ্রি.) এর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সহযোগিতাপূর্ণ বিজয়কে অভিনন্দিত করেছেন ও তাঁর সমর নায়কদের প্রশংসা করে বলেন:[১৯৩]

بِسَيْفِكَ يَعْلُوْ الْحَقُّ، وَالْحَقُّ أَغْلَبُ * وَيَنْصُــــرُ دِيْــنَ اللهِ أَيَّانَ تَضْــرِبُ

فَأَدِّبْ بِهِ الْقَوْمَ الطُّـــغَاةَ ، فَإِنَّهُ * لَــنِعْمَ الْمُـــرَبِّيْ لِلطُّغَــاةِ الْمُــؤَدِّبُ

إِذَا مَا صَــدَعْتِ الْحَادِثَاتُ بِحَدِّهِ * تَكَشَّفَ دَاجِيَ الْخَطْبِ، وَانْجَابَ غَيْهَبُ

"আপনার তরবারীর সাহায্যে সত্য উন্নীত হয়, আর সত্যই অধিক পরাক্রমশালী, আর আপনি যেখানেই আঘাত হানেন সেখানেই মহান আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়। সুতরাং আপনি এর মধ্যেই অবাধ্য সম্প্রদায়কে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন, কারণ নিশ্চয়ই তা অবাধ্যদেরকে কতইনা চমৎকার শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী অভিভাবক। যখন আপনি তারবারীর ধারালো অংশের সাহায্যে দুর্যোগাদি অতিক্রম করেন, তখন দুর্যোগের অন্ধকার উন্মোচিত হয় এবং অন্ধকার পরিস্ফুট হয়।"

আহমাদ শাওকী তুর্কীদের জয়গান করেছেন এবং বিশেষতঃ সুলতান আবদুল হামীদকে সংবেদনশীল ধর্মের রক্ষক হিসেবে মনে করতেন, বিদেশীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত সুলতানকে প্রতিরোধকারী হিসেবে ঘোষণা করে দিতেন ও উৎসর্গীকৃত প্রাণরূপে আখ্যায়িত করতেন। যারা খলীফার সুনামকে কলুষিত করতে সচেষ্ট ছিল, আর তিনি ছিলেন তুরস্কে তার পদস্খলনের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ।[১৯৪]

কবি আহমাদ শাওকী ইউরোপ থেকে ইস্তাম্বুল আগমনকালে রচিত কাসীদায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও পূণ্য লাভের আশায় তিনি খলীফাকে ভালবাসেন এবং কবিতার দ্বারা তাঁকে সমর্থনের কথা উল্লেখ করে বলেন:[১৯৫]

---

১৯১. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৫০।

১৯২. আল-শাওকিয়্যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

১৯৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

১৯৪. হুসাইন শাওকী, আবী শাওকী, পৃ. ২৪।

১৯৫. আল-শাওকিয়্যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

يَا وَاحِدَ الإِسْـلَامِ غَيْرَ مُدَافَعٍ * أَنَا فِي زَمَانِكَ وَاحِدُ الأَشْـعَارِ
أَخْلَصْتُ حُبِّيْ فِي الإِمَامِ دِيَانَةً * وَجَعَلْتُـهُ حَتَّى الْمَمَاتِ شِعَارِيْ
لَمْ أَلْتَمِسْ عَرَضَ الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا * أَقْـرَضْتُهُ فِي اللهِ وَالْمُخْتَارِ

"হে প্রতিরক্ষক ব্যতীত একক ইসলাম ধর্ম! আমি তোমার যুগে কবিতার একক ব্যক্তি (কবি)। আমি ধর্মপরায়ণতাবশতঃ নেতাদের প্রতি আমার ভালবাসাকে একনিষ্ঠ করেছি এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাকে আমার শ্লোগানে পরিণত করেছি। আমি জীবনের প্রশস্তি কামনা করিনি, বরং আমি একে মহান আল্লাহর রাস্তায় ও সৎ পথে ব্যয় করেছি।"

আহমাদ শাওকী ছিলেন ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ইসলামী আবেগ-অনুভূতি বশেই কবি অটোমান খিলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। ১৩২৩ হি./১৯০৫ সালে অটোমান খলীফা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ (১২৫৮-১৩৩৭ হি./১৮৪২-১৯১৮ খ্রি.) আর্মেনিয়ার যুদ্ধে খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক নিক্ষেপিত বোমায় আক্রান্ত হন, সে হামলায় অনেক মুসল্লী নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু খলীফা প্রাণে বেঁচে যান এবং পরে সুস্থতা লাভ করেন। কবি এই বোমা হামলা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কারণে খলীফাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে 'নাজাত' نَجَاةٌ শীর্ষক কাসীদায় বলেন:[১৯৬]

هَنِيْئًا أَمِيْرَ الْمُؤْمِـنِيْنَ، فَإِنَّمَا * نَجَاتُكَ لِلدِّيْنِ الْحَنِيْفِ نَجَـاةُ
هَنِيْئًا لِطَـهَ، وَالْكِتَابِ، وَأُمَّـةٍ * بَقَاؤُكَ إِبْقَـاءٌ لَهَا وَحَيَـاةُ
فَلَوْ لَاكَ مُلْكُ الْمُسْلِمِيْنَ مُضَيَّـعٌ * وَلَوْ لَاكَ شَمْلُ الْمُسْلِمِيْنَ شَتَاتُ

"আপনাকে মুবারকবাদ, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে সঠিক ধর্মের মুক্তি। হযরত মুহাম্মদ (সা.), আল-কুরআন ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি মুবারকবাদ! আপনার বেঁচে থাকা মুসলিম উম্মাহর বেঁচে থাকা ও তাঁদের জীবনের নামান্তর। অনন্তর আপনি যদি (খলীফা) না হতেন তাহলে মুসলমানদের রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত এবং আপনি না থাকলে মুসলমানদের ঐক্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।"

কবি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের নৈকট্য লাভ এবং উপহার-উপঢৌকনের আশায় খিলাফতের সমর্থন করেননি। বরং মহান আল্লাহর নৈকট্য ও পূণ্য লাভের প্রত্যাশায় তিনি সুলতানের প্রশংসা করেছিলেন। কবির ভাষায়:[১৯৭]

وَمَا زِلْتُ حَسَانَ الْمَقَامِ، وَلَمْ تَـزَلْ * تَلِيْنُ، وَتَسْرِيْ مِنْكَ لِيَ النَّفَحَاتُ
زَهَدْتُ الَّذِيْ فِيْ رَاحَتَيْكَ، وَشَاقَـنِيْ * جَوَائِـزُ عِنْدَ اللهِ مُبْتَغَيَاتُ

"আর আমি আপনার দরবারে কবি হাস্সান বিন সাবিতের স্থানে অবস্থান করছি, (যেরূপ স্থানে তিনি নবীজির দরবারে সমাসীন ছিলেন) এবং আমার নিকট আপনার পক্ষ থেকে দান-অনুদান সর্বদা আগমন করছে। আমি আমার দু'হাতের তালুর মধ্যে যা রয়েছে তা ত্যাগ করেছি, আর আল্লাহ পাকের নিকট আশান্বিত উপহারসমূহ আমাকে আগ্রহান্বিত করেছে।"

---

১৯৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৫।

১৯৭. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আহমাদ শাওকীর মতে, খলীফা বা খিলাফতের শত্রুরাই ইসলামের শত্রু আর যারা খিলাফতের বিরোধিতা করছে, তারা রাষ্ট্রের নয় বরং ইসলামেরই বিরোধিতায় লিপ্ত। কবির ভাষায়:[১৯৮]

نَحْنُ أُمَّةٌ لَمَّا نَجَوْتَ، وَدُوِّرَتْ * بِلَادٌ ، وَطَالَتْ لِلسَّرِيرِ حَيَاةٌ

وَصِينَ جَلَالُ الْمُلْكِ، وَاشْتَدَّ عِزُّهُ * وَدَامَ عَلَيْهِ الْحُسْنُ وَالْحَسَنَاتُ

وَأُمِّنَ فِي شَرْقِ الْبِلَادِ وَغَرْبِهَا * يَتَلَمَّسُ عَلَى أَقْوَاتِهِمْ، وَعَفَاةٌ

سَلَامِيْ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ مُقَصِّرٌ * عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ وَالْبَرَكَاتُ

"(হে সুলতান!) আপনার পরিত্রাণের মাধ্যমে মুসলিম জাতি মুক্তি লাভ করে, নগরসমূহ সুসংহত হয় এবং সিংহাসনের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায়। আর রাজ্যের গৌরব সংরক্ষিত হয়, এর মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তিনি মুসলিম রাজ্যের প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে অনাথ ও কল্যাণকামীদের আহারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এ স্থান থেকে আপনার প্রতি আমার অভিবাদন অতি নগণ্য, আপনার প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হোক।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'দায়ফ আমীর আল-মু'মিনীন' ضَيْفُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ নামক কাসীদায় ওসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, খিলাফত ব্যতীত ইসলামী বিশ্বকে একত্রিত করতে পারে এমন কোন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক সংগঠন নেই। মুসলমানরা যেন তাদের ঐক্য দ্বারা বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনায় দৃঢ় থাকতে সক্ষম হয় এবং মুসলমানরা দুর্গ হিসেবে পরিণত হয়, এমন একটি ইসলামী সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কবির ভাষায়:[১৯৯]

رَضِيَ الْمُسْلِمُوْنَ وَالإِسْلَامُ * فَرْعَ عُثْمَانَ، دُمْ، فِدَاكَ الدَّوَامُ

كَيْفَ نُحْصِيْ عَلَى عُلَاكَ ثَنَاءً ؟ * لَكَ مِنْكَ الثَّنَاءُ وَالإِكْرَامُ

وَضَعَ الشَّرْقُ فِي يَدَيْكَ يَدَيْهِ * وَأَنْتَ مِنْ حُمَاتِهِ الأَقْسَامُ

"ওসমানের শাখার (সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ) উপর মুসলমানগণ এবং ইসলাম সন্তুষ্ট হয়েছে, আপনি চিরস্থায়ী হোন এবং চিরস্থায়িত্ব আপনার জন্য উৎসর্গীত। আমরা কিভাবে আপনার উচ্চ মর্যাদার প্রশংসাকে সীমিত করতে পারি? আপনার জন্য রয়েছে আপনার পক্ষ থেকেই প্রশংসা ও সম্মান। প্রাচ্য তার হস্তদ্বয়কে আপনার হস্তদ্বয়ে স্থাপন করেছে, আর আপনি এর রক্ষকদের বিশ্বাস স্বরূপ।"

সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ আল-রাশাদ

কবি আহমাদ শাওকী 'ঈদ-আল-দাহ্‌র ওয়া লাইলাতু আল-কাদ্‌র' عِيْدُ الدَّهْرِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ শীর্ষক কাসীদায় ওসমানীয় তুর্কী সুলতান আবদুল হামীদের ভ্রাতা সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ আল-রাশাদ (১২৬০-১৩৩৭ হি./১৮৪৪-১৯১৮ খ্রি.) এর উদ্দেশ্যে বলেন:[২০০]

اَلْمُلْكُ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي إِقْبَالِهِ * عَوَّذْتُ مُلْكَكَ بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ

---

১৯৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

১৯৯. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪২।

২০০. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

رَضِيَ الْمُهَيْمِنُ، وَالْمَسِيحُ ، وَأَحْمَدُ * عَنْ جَيْشِكَ الْغَادِيْ وَعَنْ أَبْطَالِهِ

"সাম্রাজ্য তার অগ্রযাত্রায় আপনার হস্তদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত, আমি নবী করীম (সা.) ও তাঁর পরিবারের মাধ্যমে আপনার রাজ্যের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছি। আপনার উৎসর্গীত সৈন্য এবং এর বীরযোদ্ধাদের প্রতি মহান আল্লাহ, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

আহমাদ শাওকী তাঁর 'আল উস্তুল আল-ওসমানী' اَلأُسْطُوْلُ الْعُثْمَانِيُّ শীর্ষক কাসীদার সূচনায় ওসমানীয় তুর্কী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ আল-রাশাদকে সম্বোধন করে তাঁকে ইসলামের গৌরব হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তাঁর শাসনামল (১৯০৯-১৯১৮ খ্রি.) এর প্রশংসা করেন, তাঁর ক্রয়কৃত দু'টি যুদ্ধ জাহাজের প্রশংসা করেন এবং মুসলমানদেরকে স্বীয় সম্পদ ও সামর্থ দ্বারা ওসমানীয় সামরিক ও নৌ বহরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আকুল আহবান জানান। অতঃপর কবি ওসমানী রাষ্ট্রকে আর্থিক সাহায্য না করায় মুসলিম দেশসমূহকে তিরস্কার করে বলেন:[২০১]

هَزَّ اللِّوَاءَ بِعِزِّكَ الإِسْلاَمُ * وَعَنَتْ لِقَائِمِ سَيْفِكَ الأَيَّامُ
وَانْقَادَتِ الدُّنْيَا إِلَيْكَ، فَحَسْبُهَا * عُذْراً قِيَادُ أَسْلَسَتْ وَزِمَامُ
يَا مَعْشَرَ الإِسْلاَمِ، فِي أُسْطُوْلِكُمْ * عِزٌّ لَكُمْ، وَوِقَايَةٌ، وَسَلاَمٌ
جُوْدُوْا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ، وَاقْضُوْا لَهُ * مَا تُوْجِبُ الأَعْلاَقُ وَالأَرْحَامُ

"ইসলাম আপনার মর্যাদার দ্বারা পতাকাকে আন্দোলিত করেছে, আর যুগ আপনার তরবারীর হাতলকে বিনীত করেছে। আর দুনিয়া আপনার প্রতি অনুগত হয়েছে, অনন্তর তাঁর জন্য ক্ষমা হিসেবে একটি কোমল আনুগত্য ও পরিচালিত উষ্ট্রপাল যথেষ্ট। হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের নৌ বহরে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা, প্রতিরক্ষা এবং শান্তি। তোমরা নিজেদের সম্পদের দ্বারা এতে সাহায্য কর এবং এর প্রতি আবশ্যকীয় উত্তম বস্তু প্রদান ও আত্মীয়তাবোধ প্রকাশ কর।"

ইতালীয় সেনাবাহিনীর হামলার মোকাবেলায় পশ্চিম ত্রিপলীতে যুদ্ধরত অটোমান খিলাফতের সৈন্যদের সহায়তার জন্য অনুদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিসরে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এক সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে কবি আহমাদ শাওকী 'আল-হিলাল আল-আহমার' اَلْهِلاَلُ الأَحْمَرُ শীর্ষক কাসীদা রচনা করে বলেন:[২০২]

يَا قَوْمَ عُثْمَانَ – وَالدُّنْيَا مُدَاوِلَةٌ – * تَعَاوَنُوْا بَيْنَكُمْ يَا قَوْمَ عُثْمَانَ
كُوْنُوْا الْجِدَارَ الَّذِيْ يُقَوِّي الْجِدَارُ بِهِ * فَاللّٰهُ قَدْ جَعَلَ الإِسْلاَمَ بُنْيَانَا
اَلْبِرُّ مِنْ شُعَبِ الإِيْمَانِ أَفْضَلُهَا * لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ دُوْنَ الْبِرِّ إِيْمَانَا

"হে ওসমানের সম্প্রদায়! পৃথিবী পরিবর্তনশীল, তোমরা তোমাদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা কর, হে ওসমানের বংশধর! তোমরা এমন প্রাচীরে পরিণত হও, যদ্বারা অন্য প্রাচীর শক্তিশালী হয়; অনন্তর আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে একটি প্রাচীরে পরিণত করেছেন। পরোপকারিতা ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখার অন্তর্গত, আল্লাহ পাক পরোপকারিতা ব্যতীত ঈমানকে গ্রহণ করেন না।"

---

২০১. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৩০।
২০২. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম খিলাফতের বিরুদ্ধে যখন পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো জয়লাভ করছিল অথবা খিলাফত থেকে এর অঙ্গরাজ্যগুলো বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল, তখন কবি গভীর বেদনাপ্লুত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বিলাপ করেন। অতঃপর ১৩৩০ হি./১৯১২ সালে বুলগেরিয়ার হাতে যখন আদির্নার পতন ঘটে এবং ওসমানী সাম্রাজ্য হতে একে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তখন কবি আহমাদ শাওকী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে 'আল-আন্দালুস আল-জাদীদা' اَلأَنْدَلُسُ الْجَدِيْدَةُ শীর্ষক একটি কাসীদা রচনা করেন। কেননা আদির্নার পতন ছিল ইসলামের গৌরবের একটি স্তম্ভের কর্তনস্বরূপ। অনুরূপভাবে স্পেন থেকে আরবদের শাসনের পতন ছিল ইসলামের সুশীতল ছায়ার অপসারণের নামান্তর। আহমাদ শাওকী আদির্নার পতন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান এবং তুর্কীদের শক্তি অর্জনে তৎপর, ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামী বিশ্বের অবশিষ্ট অংশসমূহের সংরক্ষণ করার জন্য উপদেশ দেন। অতঃপর কবি আদির্নার ঐ সকল বীরদের প্রশংসা করেন যারা পাঁচ মাস পর্যন্ত আদির্নার রক্ষার ব্যাপারে নিদারুণ দুর্দশায় ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের শত্রুদের রক্ত বিন্দুতে এর ভূখন্ডের প্রতিটি ইঞ্চি বিক্রি করেন। আদির্নার বিপর্যয়ে কবি আহমাদ শাওকী আন্তরিক শোক প্রকাশ করে এর জন্য পুনরায় বিলাপ করে বলেন:[২০৩]

يَا أُخْتَ أَنْدَلُسَ، عَلَيْكِ سَلاَمٌ * هَوَتِ الْخِلاَفَةُ عَنْكِ، وَالإِسْلاَمُ

نَزَلَ الْهِلاَلُ عَنِ السَّمَاءِ ، فَلَيْتَهَا * طُوِيَتْ ، وَعَمَّ الْعَالَمِيْنَ ظَلاَمُ

صَبْراً أدرنَةُ ! كُلُّ مُلْكٍ زَائِلٌ * يَوْمًا، وَيَبْقَى الْمَالِكُ الْعَلاَّمُ

خَفَتَ الأَذَانُ ، فَمَا عَلَيْكِ مُوَحِّدٌ * يَسْعَى ، وَلاَ الْجُمَعُ الْحِسَانُ تُقَامُ

وَخَبَتْ مَسَاجِدُ كُنَّ نُوْراً جَامِعًا * تَمْشِيْ إِلَيهِ الأُسْدُ وَالآرَامُ

"হে স্পেনের বোন (আদির্না নগরী)! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, খিলাফত এবং ইসলাম তোমার নিকট থেকে হারিয়ে গেছে। নব চন্দ্র তোমার আকাশ থেকে পতিত হয়েছে, অনন্তর হায়! যদি তা ভাজ করা হত এবং সমগ্র বিশ্বকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলতো! হে আদির্না! তুমি ধৈর্য ধারণ কর, একদিন না একদিন প্রত্যেক রাজ্যই ধ্বংস হবে এবং সর্বজ্ঞ অধিপতি সর্বদা স্থায়ী থাকবেন। আযানের ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে, অনন্তর তোমার বুকে এমন কোন একত্ববাদী নেই যে প্রচেষ্টা করবে, আর সুন্দর জুম'আর নামাযসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর মসজিদগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, যা ছিল এমন সামগ্রিক আলো, যার প্রতি সিংহতুল্য পুরুষগণ ও শুভ্র হরিণী তুল্য মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য গমনাগমন করতো।"

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

১৩৩৯ হি./১৯২১ সালে যখন সুলতান মুহাম্মদ ওয়াহীদ উদ্দীন (১৮৬১-১৯২৬ খ্রি.) অপসারিত হন এবং মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১২৯৯-১৩৫৩ হি./১৮৮১-১৯৩৮ খ্রি.) ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁর শাসনামলে (১৯২৩-১৯৩৮ খ্রি.) ইস্তাম্বুল থেকে আংকারায় তুরস্কের রাজধানী স্থানান্তর করেন, তখন আহমাদ শাওকী তাঁর 'তাক্লীল আনকারাত ওয়া আয্‌ল আল-আস্‌তানা' تَكْلِيْلُ أَنْقَرَةَ وَعَزْلُ اَلآسْتَانَةِ

---

২০৩. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০ ও ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষক কাসীদায় মোস্তফা কামালের হাতে ইসলাম ও মুসলিম খিলাফতের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মর্যাদা বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করে বলেন:[২০৪]

يَا دَوْلَةَ الْخَلْقِ الَّتِي تَاهَتْ عَلَى * رُكْنِ السِّمَاكِ بِرُكْنِهَا الْمَسْمُوكِ

بَيْنِي وَبَيْنَكِ مِلَّةٌ وَكِتَابُهَا * وَالشَّرْقُ يُنْبِيْنِي كَمَا يُنْبِيْكِ

قَدْ ظَنَّنِي اللاَّحِي نَطَقْتُ عَنِ الْهَوَى * وَرَكِبْتُ مَتْنَ الْجَهْلِ إِذْ أُطْرِيْكِ

لَمْ يُنْقِذِ الإِسْلاَمَ أَوْ يَرْفَعْ لَهُ * رَأْسًا سِوَى النَّفَرِ الأُلَى رَفَعُوْكِ

"হে আদর্শের রাষ্ট্র! যা তার সুউচ্চ স্তম্ভের দ্বারা 'সিমাক' তারকার স্তম্ভের উপর ভ্রমণ করেছে। তোমার ও আমার মধ্যে রয়েছে একটি জাতি ও এর একটি গ্রন্থ রয়েছে, আর প্রাচ্য আমাকে আঘাত করেছে যেমন তোমাকে আঘাত করছে। ভর্ৎসনাকারী আমাকে ধারণা করেছে যে, আমি মন গড়া কথা বলছি এবং অজ্ঞতার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করছি, কারণ আমি তোমার প্রচুর প্রশংসা করছি। প্রাথমিক একদল লোক যারা তোমাকে উন্নীত করেছে তারা ব্যতীত কেউই ইসলামকে রক্ষা করেনি, অথবা এর জন্য শির উঁচু করেনি।"

১৩৪১ হি./১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এশিয়া মাইনরে গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনীতি ও যুদ্ধে জয় লাভ করলে আহমাদ শাওকী 'ইন্তিসার আল-আতরাক ফী আল-হারব ওয়া আল-সিয়াসা' اِنْتِصَارُ الأَتْرَاكِ فِي الْحَرْبِ وَالسِّيَاسَةِ কাসীদায় মোস্তফা কামালের এহেন বিপ্লবকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ হিসেবে চিহ্নিত করে আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর মাধ্যমে মুসলিম খিলাফতের গৌরব ও প্রতিপত্তি এবং আরব ও ইসলামী দেশগুলোর মর্যাদা ও স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর মোস্তফা কামাল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রশংসা করে কবি তাদের বীরত্ব ও বিপ্লবের জয়গান করেন। ভারতবর্ষ, সিরিয়া, হিজাজ ও মিসরকে এই বিজয়ে উৎফুল্লরূপে চিত্রিত করে তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, ইসলামই হচ্ছে তুরস্ক ও মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন। কবির ভাষায়:[২০৫]

اللهُ أَكْبَرُ ، كَمْ فِي الْفَتْحِ مِنْ عَجَبٍ * يَا خَالِدَ التُّرْكِ جَدِّدْ خَالِدَ الْعَرَبِ

صُلْحٌ عَزِيْزٌ عَلَى حَرْبٍ مُظَفَّرَةٍ * فَالسَّيْفُ فِي غِمْدِهِ وَالْحَقُّ فِي النُّصُبِ

وَلاَ أُزِيْدُكَ بِالإِسْلاَمِ مَعْرِفَةً * كُلُّ الْمُرُوْءَةِ فِي الإِسْلاَمِ وَالْحَسَبِ

وَمُسْلِمُوْا(الْهِنْدِ) وَ(الْهِنْدُوْسُ) فِي جَذَلٍ * وَمُسْلِمُوْا(مِصْرَ) وَالأَقْبَاطُ فِي طَرَبِ

مَمَالِكٌ ضَمَّهَا الإِسْلاَمُ فِي رَحِمٍ * وَشِيْجَةٍ، وَحَوَاهَا الشَّرْقُ فِي نَسَبِ

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আপনার বিজয়ের মধ্যে কতই না বিস্ময় রয়েছে, হে তুর্কীদের খালেদ (মোস্তফা কামাল)! আরবের খালেদ বিন ওয়ালিদকে নবায়ন করুন। একটি বিজিত যুদ্ধের উপর একটি শক্তিশালী সন্ধি সম্পাদিত হয়, ফলে তরবারী তাঁর কোষের মধ্যে আর সত্য তাঁর মূলের মধ্যে অবস্থান করে। আর আমি ইসলামের দ্বারা আপনার পরিচিতিকে বৃদ্ধি করছি না; ইসলামের মধ্যেই সর্ব প্রকারের মানবতা এবং কৌলিন্য রয়েছে। আর ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এবং হিন্দুরা আনন্দে বিভোর এবং

২০৪. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

২০৫. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরীয় মুসলমানগণ ও কিবৃতীরা খুশীতে আত্মহারা। ইসলাম এ রাজ্যসমূহকে একটি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং প্রাচ্য একটি বংশ তালিকায় তাদেরকে লালন-পালন করেছে।"

খিলাফতের পতন

কবি আহমাদ শাওকী পশ্চিমা ক্ষমতালিপ্সু শত্রুদের থেকে খিলাফতকে রক্ষা করাকে ইসলামের গৌরব ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতেন। তাই ১৩৪২ হি./১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল কর্তৃক খিলাফত বাতিল এবং তুরস্ক ও অন্যান্য দুর্নীতিগ্রস্ত, জবর দখলকৃত ও নির্যাতিত অঞ্চলসমূহকে তুর্কী শাসনমুক্ত করতে না করতেই আহমাদ শাওকী ওসমানী খিলাফতের ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত হন এবং তাঁর 'খিলাফত আল ইসলাম' خِلَافَةُ الإِسْلَامِ নামক কাসীদায় সন্তানহারা ব্যক্তির ন্যায় খিলাফতের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং মুসলিম বিশ্বকে গাজীর প্রতি উপদেশ দানে উৎসাহিত করেন, যাতে তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং যা ধ্বংস করেছেন তা পুনঃ নির্মাণ করেন। কবি ইতোপূর্বে মোস্তফা কামালের প্রশংসা করার পর তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণকে এই বলে ভুল স্বীকার করেন যে, তাঁর নিকট সত্য অধিক পছন্দনীয় এবং এর তত্ত্বাবধান করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কবির ভাষায়:[২০৬]

ضَجَّتْ عَلَيْكِ مَآذِنٌ، وَمَنَابِرُ * وَبَكَتْ عَلَيْكِ مَمَالِكٌ ، وَنَوَاحِ
اَلْهِنْدُ وَالِهَةٌ، وَمِصْرُ حَزِيْنَةٌ * تَبْكِيْ عَلَيْكِ بِمَدْمَعٍ سَحَّاحِ
وَالشَّامُ تَسْأَلُ ، وَالْعِرَاقُ وَفَارِسُ * أَ مَحَا مِنَ الأَرْضِ الْخِلَافَةَ مَاحٍ ؟

"তোমার উপর আযানের মিনার ও মিম্বরসমূহ কলরব করছে এবং রাজ্য ও দিকসমূহ তোমার উপর ক্রন্দন করছে। ভারতবর্ষ দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং মিসর ব্যথিত হয়ে প্রবাহমান অশ্রুর মাধ্যমে তোমার উপর ক্রন্দন করছে। আর সিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং ইরাক ও পারস্য উভয়ে পৃথিবী থেকে খিলাফতকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে?"

১৩৪৪ হি./১৯২৬ সালে 'উকায' পত্রিকার জুন ১২১ সংখ্যায় প্রকাশিত খিলাফতের প্রশংসায় রচিত ৬৩ পংক্তি বিশিষ্ট 'বুকা আল-খিলাফত' بُكَاءُ الْخِلَافَةِ শীর্ষক কাসীদায় কবি আহমাদ শাওকী সুস্পষ্টভাবে তাঁর ধর্মীয় ঐক্য যা কিনা বিভিন্ন ইসলামী জাতির মাঝে চেতনা সঞ্চারিত করে যে ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা ব্যক্ত করে আবেগ-আপ্লুত অবস্থায় কান্না বিজরিত কণ্ঠে বলেন:[২০৭]

غَنَّيْتُهَا لَحْنًا تَغَلْغَلَ فِي الْبُكَا * يَا رُبَّ بَاكٍ فِي ظَوَاهِرَ شَادٍ
وَنَصَرْتُهَا نَصْرَ الْمُجَاهِدِ فِي ذَرَا * عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَفِيْ جَنَاحِ رَشَادِ
وَدَفَنْتُهَا وَدَفَنْتُ خَيْرَ قَصَائِدِيْ * مَعَهَا وَطَالَ بِقَبْرِهَا إِنْشَادِيْ
حَتَّى أُتُهِمْتُ فَقِيْلَ تُرْكِيُّ الْهَوَى * صَدَقُوْا هَوَى الأَبْطَالِ مِلْءُ فُؤَادِيْ
وَاللهُ يَعْلَمُ مَا انْفَرَدْتُ وَإِنَّمَا * صَوَّرْتُ شِعْرِيْ مِنْ شُعُوْرِ الْوَادِيْ

"আমি একে এমন সুরে গেয়েছি যে তা ক্রন্দনে পৌঁছেছে, হে অনেক ক্রন্দনকারী! আর প্রকাশ্য নির্মাণকারীর ব্যাপারে আমি তাকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের ধুসর কেশে ও সুলতান পঞ্চম

---

২০৬. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

২০৭. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ রাশাদের বাহুতে একজন মুজাহিদদের সাহায্য করার ন্যায় সাহায্য করেছি। আর আমি এটি পুঁতে ফেলেছি এবং এর সাথে আমার উত্তম কাসীদাগুলোকেও পুঁতে ফেলেছি, আর এগুলোর কবরে আমার আবৃত্তি দীর্ঘ হয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে, আমি তুর্কীদের ভক্ত, তারা ঠিকই বলেছে যে, আমার অন্তর বীরপুরুষদের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়েছে।... আর আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, আমি বিচ্ছিন্ন হইনি, বরং আমি আমার কবিতাকে উপত্যকার অনুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছি।"

ইউরোপে নির্বাসনের পর আহমাদ শাওকীর নিকট ধর্মের প্রতি এহেন দৃষ্টিভঙ্গীটি স্থায়ী থাকেনি। কারণ তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে আপামর জন-সাধারণের প্রতি এমন একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে বেরিয়ে আসেন যে স্বীয় মাতৃভূমির গৌরব বর্ণনা করেন এবং দেশপ্রেমকে স্বীয় ধর্মে পরিণত করেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন:[২০৮]

وَيَا وَطَنِي لَقِيتُكَ بَعْدَ يَأْسٍ * كَأَنِّي قَدْ لَقِيتُ بِكَ الشَّبَابَا

وَلَوْ أَنِّي دُعِيتُ لَكُنْتَ دِينِي * عَلَيْهِ أُقَابِلُ الْحَتْمَ الْمُجَابَا

أُدِيرُ إِلَيْكَ قَبْلَ الْبَيْتِ وَجْهِي * إِذَا فُهْتُ الشَّهَادَةَ وَالْمَتَابَا

"হে আমার মাতৃভূমি! আমি যাতনার পর তোমার সাথে সাক্ষাত করেছি এমনভাবে যেন আমি তোমার মাধ্যমে যৌবনের সাক্ষাত লাভ করেছি। আর যদি আমাকে আহ্বান করা হতো তবে তুমি আমার ধর্মে পরিণত হতে, যাতে আমি কর্তব্যগ্রহণকারীর ন্যায় সাড়া দিতাম। আল্লাহর গৃহের পূর্বে তোমার দিকেই আমি স্বীয় মুখমন্ডল ঘুরিয়ে থাকি, যখন আমি শাহাদাত ও তাওবার বাণী উচ্চারণ করি।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আহমাদ শাওকী মুসলিম খিলাফতের প্রশংসা ও ইসলামের খ্যাতনামা বীরপুরুষদের গৌরবগাঁথা এবং মুসলমানদের অবস্থার কৃতিত্বের জয়গান সত্ত্বেও তিনি ধর্মীয় ধারাকে পুনরায় আঁকড়িয়ে ধরেছেন। এটি ছিল ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ, যেখানে তাঁকে ঘটনাবলী ও প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থাদির সাথে সমন্বয় সাধন কতে হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে তাঁর পরিভ্রমণ এবং ধর্মীয় ও মাযহাবী বিশ্বাস থেকে মুক্ত রেনেঁসা অবলোকনের পর তিনি সকল জাতি ও ধর্মের জন্য একটি সামগ্রিক দেশাত্মবোধ উপস্থাপন করেন এবং দেশবাসীর হাতে প্রীতি ও একত্ববাদের বাণী পেশ করেন। আমাদের কবির আমোদ-প্রমোদের জীবন, মদ্যপানের প্রতি আসক্তি এবং সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত স্বাধীনচেতা শাওকীর অভ্যাসের কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। তাহলে আমরা শাওকীর প্রকৃত চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে সক্ষম হব। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক বৈষয়িক লালসা সংবরণ বিষয়ক দৃশ্যাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এটি ব্যক্তিগত কৃত্রিমতা; যদ্বারা চিরাচরিত অভ্যাস ও বিশ্বাসে আবদ্ধ অবস্থায় প্রকাশিত হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন, যাতে তাদের সমাজ থেকে চ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি গণ্য না হন।[২০৯]

২০৮. আল-শাওকিয়্যাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।

২০৯. ড. আবদুল মাজীদ আল-হুর, আহমাদ শাওকী, পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা

বাঙালী জাতির নবজাগরণের ও ধর্মীয় ঐতিহ্য চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য চর্চার প্রারম্ভিক উৎস ও অনুপ্রেরণা মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্ম থেকে আসাই স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলমান। পারিবারিক ও বংশগত ইসলামিক পরিবেশেই তিনি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং ঐতিহ্যগতভাবেই তিনি বিশিষ্ট ধর্মীয় অনুভূতি দ্বারা লালিত ছিলেন। তাঁর পিতা, পিতামহ ও উর্ধ্বতন পূর্ব-পুরুষগণ ছিলেন আরবী-ফারসীর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় সুপন্ডিত। তাই উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রবাহিত হচ্ছিল ইসলামের ঐতিহ্য, ধর্মের প্রদীপ্ত বাণী। উপরন্তু কৈশোরে মসজিদের ইমামতি, গ্রামের মক্তবে মোল্লাগিরি এবং পবিত্র মাজার শরীফের খাদেমগিরির পটভূমিতে কবি নজরুল ইসলামের ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। এসকল ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা কবিকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে ইসলামী ভাবধারার একটি দিগন্ত উন্মোচন করতে সহায়তা করে। ফলে অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে রক্ষিত ইসলামী চিন্তাধারা গুলো বাল্যকাল থেকেই সময় সুযোগমত পরবর্তী জীবনে অসংখ্য ইসলামী কবিতা, হাম্‌দ, না'ত, গজল ও গানে রূপ লাভ করেছিল।[১]

কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী ভাবধারা, ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন। ইসলামের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম দরদ ও দায়িত্বশীলতা। এ নিগূঢ় ভালবাসার কারণেই নজরুল ইসলাম তাঁর বহু কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারাকে সূচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[২] ইসলামী ঐতিহ্য তাঁর কাব্যের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। একজন মুমিন মুসলমানের বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাব ও মনোবল সৈনিক কবি নজরুল ইসলামকে যুদ্ধের ময়দানে নামিয়েছিল। লেখনীর মাধ্যমে সে যুদ্ধ অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত হেনেছিল। অসংখ্য ইসলামী গজল ও কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম সুপ্ত ও স্বপ্নাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে নিদ্রার ঘোর কাটিয়ে, ঘুমন্ত বিবেককে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে জাগ্রত করেছিলেন। নজরুল ইসলামের কবিতায় স্থান পেয়েছিল ইসলামের মানবতাবাদ ও সাম্যবাদ। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম 'সত্যবাণী' প্রবন্ধে বলেন, "ইসলাম! জাগো! মুসলিম জাগো! আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী, সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য, তুমি জাগো!...ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। ইসলাম অবমাননা সহে নাই। তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান।...ইসলাম এক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট শির নোয়ায় না।"[৩]

---

১. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, (কুমিল্লাঃ ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর , ১৯৭০), পৃ. ৬-৭; মোঃ হারুন অর-রশীদ, নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৪০৩/ অক্টোবর ১৯৯৬), পৃ. ২৩।

২. কামরুন্নেসা আজাদ, ধর্মীয় চেতনায় নজরুল, (ঢাকাঃ নজরুল ইনস্টিটিউট, চৈত্র, ১৪০৭/ এপ্রিল, ২০০১), পৃ. ২৩।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সত্যবাণী', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের অসীম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভক্তি, আন্তরিক ভালবাসা ও ঈমানী চেতনার এটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যবাণীর ন্যায় সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইসলামের চাইতে অধিক সাম্য অন্য কোন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, বর্ণ ও ভাষাকেন্দ্রিক ভেদ-বৈষম্যের মূলোৎপাটনে ইসলামের চাইতে অধিক সাফল্য বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কবি নজরুল ইসলাম মনে-প্রাণে ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। কেননা কবির জীবনের যা ব্রত তা ইসলামের মত আর কোন ধর্ম এত দৃঢ়তার সাথে এমন সুস্পষ্টভাবে বলেনি। নজরুল ইসলাম চেয়েছেন মানুষের ব্যক্তি মর্যাদার সাথে সাম্য, বিত্ত-বৃত্তি নিরপেক্ষ ভ্রাতৃত্ব , ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, শোষণ-অত্যাচার, আভিজাত্যবোধের উৎসারণ। ইসলামের শিক্ষাও তাই। ইসলামের এই সুবোধ শিক্ষাই কবিকে মুগ্ধ করেছে। এ জন্য কবি ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ইসলামের মানবতা ও উদারতা তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ অনুকূল বলেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মিলন পীঠ কা'বার ছবি তাঁর বক্ষে অংকিত, মানবতা ও সাম্যের বাণী বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর নাম তাঁর 'জপমালা'। তাই মর্যাদার পূজারী উন্নত শির কবির হৃদয়ে কালেমা তাইয়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আন্দোলন জাগায়। তাঁর এহেন ইসলাম প্রীতি ধার্মিকতা প্রসূত নয়, মানবতা ও ব্যক্তি নিষ্ঠাজাত ধর্মপ্রাণতা নয়, আদর্শানুগত্য। তাঁর আদর্শের সাধনার অনুকূলে ইসলামী চিন্তাধারার উপাদান তিনি যেখানেই পেয়েছেন গ্রহণ করেছেন।

খলীফা হযরত উমর (রা.) তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন শুধু ধার্মিক বলে নয়, ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্য বিধাতা বলেও নন, মানুষকে ভালবেসেছেন বলে। এমনভাবে নজরুল ইসলাম তাঁর বিভিন্ন রচনায় ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের মানবতার দিকটি উদঘাটন করেছেন। ইসলামের ও রাসূলের জীবন-চরিতের এই সৌন্দর্য শিক্ষায় তিনি বিমুগ্ধ ছিলেন। স্বীয় জীবনে ও সমাজে এ শিক্ষার বাস্তব রূপায়নেই তাঁর সাধনা নিয়োজিত ছিল।[৪]

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তথা জীবনের সর্বস্তরে বাংলার মুসলমানদের দৈন্য বিশ্লেষণ করে এবং তাদের ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত করে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ১৯২৫ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, লেখক, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, মুসলিম বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দিশারী প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮ খ্রি.) কাজী নজরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে এক পত্রে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন;

"ভাই নজরুল ইসলাম,

বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণী পুনঃপ্রতিধ্বনিত হবে, ইসরাফিলের শিঙ্গার মত সেই প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সামাজকে মহা-আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন আসন মাত্র, সিংহাসন নয়। আজ বাঙলার মুসলমান সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়।...বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে, বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর। ... ইসলামের মহান উদার আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্ত্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহান নীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমীন।"[৫]

---

৪. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'নজরুলের ইসলামী গান ও মুসলিম সমাজ', (ঢাকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯৪), উদ্ধৃত তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ২১৯।

৫. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলাম প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর এ দাবী অনেকখানি পূর্ণ করেছিলেন। হয়তো সামগ্রিকভাবে করতে না পারলেও তাঁর আপন কবি মানস তাঁকে যে পথে পরিচালিত করেছে তিনি কোন ধর্মপ্রচারক বা সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্পে সে কবি-মানসের বিরোধিতা করেননি। তিনি কবি হিসেবেও স্বধর্মচ্যুত হননি। এটি স্বীকার করেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিম রেনেঁসায় তার অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯২৭ সালে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর চিঠির জবাবে কাজী নজরুল ইসলাম এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখেন যে, "ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না, তা হলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। ... আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"[৬]

ইসলামের শাস্ত্রকে নিয়ে কাব্য রচনা করার কল্পনা নজরুল ইসলাম করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিই সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের সত্যকে কাব্য, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে তুলে আনতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং এটাকে তিনি তাঁর ঈমানী দায়িত্ব বলেই মনে করতেন। কবি নজরুল ইসলাম কেবল ইসলামের মহান সত্যকে নিয়েই সাহিত্য, সঙ্গীত সৃষ্টি করেননি, অনন্য সাহিত্য গুণসম্পন্ন ইসলামের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শাস্ত্রকেও তিনি তাঁর কাব্যে মর্যাদায় সমাসীন করতে চেয়েছেন। ইসলামী চিন্তাধারাকে কবি নজরুল ইসলাম যে সাবলীল ভাষায় ও আঙ্গিকে পরিবেশন করেছিলেন তাঁর সমাজ সেটাকে দারুণ আগ্রহ, আবেগ ও অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে গ্রহণ করেছিল। নজরুল ইসলামের কবিতা, হামদ, না'ত, গজল ও ইসলামী সঙ্গীতে বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজ পুনরুজ্জীবিত এবং নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

তাই মুসলিম রেনেঁসায় কবি নজরুল ইসলামের অবদান অপরিসীম। নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ও তাঁর অস্তিত্বই মুসলিম জাগরণকে আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণবন্ত করে তুললো। বাঙালী মুসলমান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো যে, একজন মুসলমান কবি এরকম লিখতে পারেন। মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতির কথা, তার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা, তার বহু পরিচিত ভাব-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কথা, আরবী, ফারসী শব্দ ও বাংলা শব্দের সঙ্গে এমন সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি করে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে শুধু প্রবেশ লাভ নয়, এমনভাবে অভিনন্দিত ও সমাদৃত হতে পারে, এ যে কি অপার বিস্ময় তা কেবল তৎকালীন মুসলমানরাই প্রকৃত অনুভব করেছিল। একদিনে যেন তাদের সমস্ত ভীরুতা ও হীনমন্যতা ঘুচে গেল। সমকালীন নবজাগরণের পুরোধায় যারা ছিলেন আশায়, আনন্দে ও চঞ্চলতায় তাঁদের মন-প্রাণ ভরে উঠলো।[৭]

মুসলিম রেনেঁসা বা নবজাগরণে কবি নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী (জন্ম-১৯২২ খ্রি.) এর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "নজরুল ইসলাম তাঁর বহু কবিতায় ও গানে উদাত্ত কণ্ঠে ইসলামের মহিমার কথা বলেন। তাঁর কাব্য

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২-৪৮৩; শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, নজরুলের পত্রাবলী, (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২/ মে, ১৯৯৫)।

৭. কবির চৌধুরী, 'মুসলিম রেনেঁসা ও কাজী নজরুল ইসলাম', মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম, (করাচী: বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৬৯), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভার গুণে, শব্দ চয়ন, রূপকল্প, ছন্দ ঝংকার ও প্রাণবন্ত ভঙ্গীর জন্য সে সব রচনা জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকম কার্যকরী হয়ে উঠে। একদিকে তিনি যেমন ইসলামের প্রাচীন গৌরবের কথা শোনালেন অন্যদিকে তেমনি বর্তমান অধঃপতিত হীনমনা মুসলিম জাতির দুর্দশাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে বিধ্বস্ত করে নতুন চেতনা সঞ্চারে অগ্রসর হলেন। সেই সঙ্গে মুসলিম যে আবার জেগে উঠে তার প্রাচীন গৌরব উদ্ধার করতে সমর্থ হবে সে আশ্বাস ও আশার বাণীও শোনালেন তিনি। এ কারণেই তাঁকে বাংলায় মুসলিম রেনেঁসার অগ্রদূত বলে চিহ্নিত করলে তা ভুল হবে না।[৮]

১৯৪৩ সালের আশ্বিন মাসে বাংলার মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং কলকাতায় প্রচারিত এক ব্যক্তিগত ইশ্‌তেহারে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, "আমি আমার কবিতায়, ইসলামী গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমার বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছি। আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে আজ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়।.... আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার যথাসাধ্য কওমের ও ইসলাম ধর্মের খেদমত করিয়া আসিতেছি।"[৯]

নজরুল ইসলামের সাহিত্য সৃষ্টির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলাম ভিত্তিক রচনা। কবি নজরুল ইসলামের ইসলাম সম্পর্কিত, ইসলাম কেন্দ্রিক বা জাগরণী ও প্রেরণামূলক ইসলামী বিষয় কেন্দ্রিক কাব্যসংকলনে সে ইসলামী আদর্শের চরিত্র চিত্রিত বা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের বিশ্বপ্রেমিক মানবতাবাদী ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নজরুল ইসলাম বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের যে আদর্শ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে, সে সামগ্রিক দর্শন কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর আদর্শ শুধু নয়, তা বিশ্বমানবের। নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারার কবিতা সেই ভাব কল্পনায় সমৃদ্ধ।[১০]

সুতরাং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামের ভূমিকা নগণ্য নয়। নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২ খ্রি.) এর ১২টি কবিতার মধ্যে ৫টিতে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ তথা ইসলামের আদর্শ অথবা ইসলামী ভাবধারা রূপলাভ করেছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে যেসব কবিতায় ইসলামের প্রসঙ্গ আছে তা হচ্ছে, 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম'। 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' আবির্ভাব ও তিরোভাব নামক প্রথম দু'টি কবিতা রাসূল-প্রশস্তিগাঁথা। 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে আছে 'শহীদি ঈদ' নামক একটি ইসলামী ঐতিহ্যমূলক কবিতা। 'জিঞ্জীর' (১৯২৮ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের ১৬ টি কবিতার মধ্যে ৫টি কবিতায় তিনি ইসলামী ভাবাদর্শকে রূপায়িত করেছেন। 'খালেদ', 'সুবৃহ-উম্মেদ', 'ঈদ-মোবারক', 'আমানুল্লাহ' ও 'উমর ফারুক' কবিতায় ইসলামের প্রসঙ্গ আছে। 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের ১৯ টি কবিতার মধ্যে 'নতুন চাঁদ', 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'আজাদ' ও 'ঈদের চাঁদ' এ ৫টি কবিতায় ইসলামী প্রসঙ্গ রয়েছে। 'শেষ সওগাত' (১৯৫৯ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের ৪২ টি কবিতার মধ্যে ১১ টি কবিতার

---

৮. কবীর চৌধুরী, নজরুল দর্শন, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৯৮/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২), পৃ. ২৩।

৯. সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২ খ্রি.) সম্পাদিত, 'শনিবারের চিঠি', পত্রিকাটিতে ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইশ্‌তেহারটি প্রকাশিত হয়। দ্র: শেখ নূরুল ইসলাম, জাতীয় কবির মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলার চক্রান্ত, (ঢাকা: দৈনিক দিনকাল, ১২ ভাদ্র, ১৪০৬/২৭ আগষ্ট, ১৯৯৯), পৃ. ৬; তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ,পৃ. ১১০; সৈকত আসগর, নজরুলের গদ্য রচনা ভাবলোক ও শিল্পরূপ, পৃ. ২৬১-২৬২।

১০. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, মে, ১৯৮২, তৃতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৪/ জুন,১৯৯৭), পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ ইসলাম। যথা:- 'নিত্য প্রবল হও', 'ভয় করিও না হে মানবাত্মা', 'মোহর্‌রম', 'বিশ্বাস ও আশা', 'ডুবিবে না আশাতরী', 'বকরীদ', 'আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও', 'এ কি আল্লা কৃপা নয়?', 'মহাত্মা মোহসীন', 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ', 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' প্রভৃতি।

'নজরুলের কবিতা সমগ্র' (২০০০ খ্রি.) এর পরিশিষ্টে রয়েছে 'জয় হোক! জয় হোক!', 'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর', 'চির-নির্ভর', 'মহাসমর' প্রভৃতি ইসলাম সম্পর্কিত কবিতা। এতদ্ব্যতীত রয়েছে পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা' (১৯৩৩ খ্রি.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনীকাব্য 'মরু-ভাস্কর' (১৯৫১ খ্রি.)।

ইসলামী আদর্শ বিষয়ে যে ভূমিকা সবচেয়ে মুখ্য তা নজরুল ইসলাম বিরচিত অসংখ্য হাম্‌দ, না'ত, গজল তথা ইসলামী সঙ্গীতে বিদ্যমান। কেবলমাত্র ইসলামী গজল-গান নিয়ে নজরুল ইসলামের 'জুলফিক্‌কার' (১৯৩২ খ্রি.) নামে একটি বিশাল কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও তিনি দু'শর বেশী ইসলামী গান লিখেছেন এবং এককভাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইসলামী সঙ্গীতের ভাবধারার হাম্‌দ, না'ত ও কাওয়ালী গজল রচনা করে মুসলিম ঐতিহ্য এবং আবহ সৃষ্টি করেছেন।[১১]

এসব কবিতায় ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্য ও তার শৌর্য-বীর্যের রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। ত্যাগ-তিতিক্ষা, বীরত্ব-সাহসিকতা, আত্মদান ও আত্মমর্যাদা, শক্তি ও স্বাধীনতার যে মহোত্তম রূপ দিয়ে ইসলাম মুসলমানদের ইতিহাসের পাতাকে গৌরবোজ্জ্বল করেছিল, কবি নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ ভাষায় এসব কবিতায় তা অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রণ করেছেন। প্রকৃত মুসলমান কে? তার সত্যিকার রূপ কি? ইসলাম বলতে কি বোঝায়? তার সুস্পষ্ট চিন্তাধারাকে ছন্দের কারুকার্যে, শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্যে এবং মুসলিম ইতিহাস ও ইসলামী ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কবি নজরুল ইসলাম চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[১২]

কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয় সঙ্গীত তথা ইসলামী ভাবধারা সম্পর্কে প্রখ্যাত নজরুল গবেষক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন, "নজরুল প্রায় এক হাজার ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেন, যার মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্যের শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন এবং ইসলামী ঐতিহ্যের হাম্‌দ, না'ত, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, ঈদ, মর্সিয়া প্রভৃতি বিষয়ের গান। এসব গানের রচনা ত্রিশের দশকের শেষ অবধি চলতে থাকে এবং নজরুলের মৌলিক সঙ্গীত রচনার তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি 'ভক্তিমূলক ও ইসলামী' গান পর্ব।"[১৩]

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারার কবিতাবলী মূল্যায়ন করেছি। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে 'নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা' শিরোনামের এ অধ্যায়টিকে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

---

১১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট, ১৯৮০, ৩য় মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪০৩/ জুন, ১৯৯৬), পৃ. ১০৩।

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৩. রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রশংসাসূচক 'হাম্‌দ' ও 'কাব্য আমপারা'

১. হাম্‌দ-এ-বারী তা'আলা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসাসূচক 'হাম্‌দ' বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন। যেসব কবিতা ও ইসলামী গজল-সঙ্গীতে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও প্রশস্তিমূলক গুণগান রয়েছে সেগুলোকে 'হাম্‌দ' বলা হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আল্লাহ পাকের প্রশস্তিমূলক 'হাম্‌দ' জাতীয় ইসলামী কবিতা ও গজল-গানের মহান ঐতিহ্যের আবহ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ এই ধারা অনুসরণ করে আল্লাহর প্রশংসা বিষয়ক 'হাম্‌দ' রচনা করলেও কেউ এর পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলামকে অতিক্রম করতে পারেনি।[১৪]

কাজী নজরুল ইসলামের একক প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা কাব্য সঙ্গীতের জগতে ইসলামী ভাবধারার উন্মেষ ঘটেছিল, নজরুল ইসলামের পূর্বেও হাম্‌দ, না'ত প্রভৃতি ইসলামী চিন্তাধারাসম্পন্ন ভক্তিমূলক গীতিকবিতা পর্যায়ের যেসব সঙ্গীত রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশই লোকগীতি পর্যায়ের ছিল। বাণী ও সুরে সেসব গীতিকবিতা আধুনিককালের সঙ্গীত ভাবাশ্রিত মুসলিম শ্রোতামন্ডলীর অন্তঃস্থলে ধর্মীয় ভাবধারা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও ধর্মীয় সঙ্গীত পিপাসু বাঙালী মুসলিম সমাজে আল্লাহ ও রাসূলের প্রশস্তিগাঁথাসহ ইসলামী ভাবাশ্রিত কাওয়ালী, গজল-গীতি ও উর্দু গানের প্রচলন ছিল। তথাপি এসব ধর্মসঙ্গীত মুসলিম সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্খা মোচন করতে পারেনি। সেকালে তেমন কোন ধর্মীয় সঙ্গীতের গীতিকারও ছিল না। যিনি মুসলমানদের এই অভাব পূর্ণ করে দিবেন। ঠিক এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে গ্রামোফোন কোম্পানীর মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তিনি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় 'হাম্‌দ', না'তসহ ধর্মীয় প্রশস্তিমূলক অসংখ্য ইসলামী গজল-গান রচনা করেন। এসব ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ সঙ্গীতের ভেতর দিয়েই কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়ের মণিকোঠায় এক স্থায়ী আসন করে নেন।[১৫]

ইসলামী চিন্তাধারায় রচিত 'হাম্‌দ-এ-বারী তা'আলা'য় আল্লাহ পাকের অপার মহিমা কীর্তণই কবি নজরুল ইসলামের মূল উপপাদ্য বিষয়। বস্তুতঃ মহান আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত গজল-গানে ও তাঁর অশেষ মহিমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নজরুল ইসলাম যে মহৎ শিল্প সৃষ্টিতে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে অলংকারপূর্ণ বর্ণনায়, ভাবসৃষ্টিতে ও সুরারোপে তা সত্যিই অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসূচক 'হাম্‌দ' জাতীয় ইসলামী চিন্তাধারার কবিতা ও গজল-সঙ্গীতগুলো মুসলমানদের তাওহীদের প্রতি ঈমানকে মজবুত ও বলিষ্ঠ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে চলেছে। সেইসাথে লোকদের আধ্যাত্মিক চেতনা আত্মোপলব্ধির শক্তি তথা মা'রফতী অনুভূতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

---

১৪. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭/মে, ১৯৮০, ২য় প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৯২/ আগষ্ট, ১৯৮৫), পৃ. ১২৭।

১৫. কামরুন্নেছা আজাদ, ধর্মীয় চেতনায় নজরুল, পৃ. ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর প্রতি ঈমান

কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী সাহিত্য চর্চা ও চিন্তা চেতনার মূল উৎস বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আল্লাহর প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ও আল্লাহর কালাম 'আল-কুরআন আল-কারীম'। আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামী 'আকীদায় তাঁর ছিল পূর্ণ ঈমান। তিনি যে মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উম্মত এ কথাটি তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। কবি নিজেকে একজন অনুগত মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন। মহান আল্লাহকে একমাত্র আরাধ্য প্রভু, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের প্রধান সম্বলরূপে গ্রহণ করে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[১৬]

কবি মুসলমানদের ঈমানী জোশ সঞ্জীবিত রাখার জন্য তথা ইসলামী ঝাণ্ডাকে সবার উপরে তুলে ধরার তাগিদে প্রেরণা জুগিয়ে রচনা করেছেন 'আল্লাহ আমার প্রভু' শীর্ষক জাগরণী কবিতা, যাতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ কবি নজরুল ইসলাম সগর্বে আত্মপরিচয় দিয়ে আবৃত্তি করেন,

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙ্কা
কোর্‌আন আমার ডঙ্কা
ইস্‌লাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥
কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ
ঈমান আমার বর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।
'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী
আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যথায় রয় ॥[১৭]

আল্লাহর প্রতি অসীম ভালবাসার কারণেই তিনি আল্লাহর মহিমা সংক্রান্ত 'হাম্‌দ' রচনা করতে পেরেছেন। 'হাম্‌দ' উন্নত শির আনত করে, সব দ্বার থেকে নিরাশ হয়ে কবি যখন ব্যর্থ মনোরথে মহান স্রষ্টার দরবারে ফিরে আসেন তখন আল্লাহ নামের মধুর স্পর্শে কবির চিত্ত কানায় কানায় ভরে উঠে। কবি নজরুল ইসলাম নিজে একজন মুমিন মুসলমান-এটা তাঁর অমিত গর্ব। এই গর্বভরে কবি ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। বিশ্বের সকল শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর তিনি। এই পরম শক্তির মূল উৎস সম্পর্কে নজরুল ইসলাম তাঁর গর্বিত লেখনীতে নিজের অবস্থানের বিবরটি চমৎকারভাবে উল্লেখ করে বলেছেনঃ

চীন আরব হিন্দুস্তান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায় চেনে আমায়, মুসলিম আমার নাম।
অন্ধকারে আজান দিয়ে, ভাঙনু ঘুমের ঘোর,
আলোর অভিযান এনেছি, রাত করেছি ভোর ॥[১৮]

ইসলামী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় প্রাথমিক জীবনেই আদর্শ মুসলিম পরিবারের ছেলেদের মত তিনি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ

---

১৬. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭০/ ৪র্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৪/ মে, ১৯৯৭), পৃ. ২২।

১৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-২১১।

১৮. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৭৩; কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছিলেন। বাল্যবয়সেই রীতিমতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, রোযাব্রত পালন, মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদের ইমামতি ও পীরের মাজারের খাদেম প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে তিনি দারুণ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র বার/তের বছর বয়সেই মা'রফতী গানের ভেতর দিয়ে নজরুল ইসলামের ভক্তিবাদী মনোভাব অতি চমৎকারভাবে উৎসারিত হয়েছিল, এমনিভাবে তিনি মুসলিম সূফী মরমীবাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন। তাই তো কিশোর কবির বাল্য রচনা 'চাষার গীত' এ ইসলামের মূল তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বহিঃপ্রকাশ এবং ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি একজন নিষ্ঠাবান মুমিনের অন্তরের অনুভূতির এক চমৎকার স্ফুরণ ধ্বনিত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।
নয়টা নালা আছে তাহার
অজুর পানি সিয়াত যাহার
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।
যদি ভাল হয় হে জমিতে
হজ্জ জাকাত লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে।[১৯]

এমনিভাবে পাঠশালা পড়া লেটোদলের ব্যাঙাচি কবি নজরুল ইসলামের কচি হাতের লেখনীর মধ্যে অনাগতকালের শুভ ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ছিল। সে সময়কার লেখা 'আকবর বাদশার সঙ' শীর্ষক পালাগানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কবির পরম বিশ্বাস, অকৃত্রিম বন্দনা, ভক্তি ও তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হাম্দ' এর শুরুতেই ইসলামী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। কবি বলছেনঃ

সর্ব প্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো 'বারী তা'লা'।
তারপরে দরুদ পড়ি
মোহাম্মদ সাল্লে 'আলা ॥
সকল পীর আর দরবেশ-কূলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে
হয় যেন গো মুখ উজালা ॥[২০]

বালক কবি নজরুল ইসলামের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই যে প্রাচ্যের সূফী চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল উপরোক্ত বন্দনা গান থেকে তা সহজেই অনুমেয়। নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম পর্যায়ে এই যে মরমী সূফী সাধকের সুরটি ধ্বনিত হয়েছিল যা তাঁর কবি জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রবাহে স্তিমিত হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে অবচেতন মনে স্থান পরিগ্রহ করে তা নতুনরূপে বিকশিত হয়েছিল। বাল্যকালীন লেখা 'কর ভাই বন্দেগী' শীর্ষক ইসলামী সঙ্গীতের নিম্নোক্ত চরণত্রয়ে কবি

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চাষীর গীত', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১২।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

নজরুল ইসলাম বলে কর ভাই বন্দেগী
খোওয়াইও না আজন্ম গুনাহতে জিন্দেগী
শারমিন্দেগী হবে হাশরের মাঝে।[২১]

এহেন ইসলামী ভাবাশ্রিত বাল্যরচনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি কবির গভীর বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'- এ চরম সত্যটিকে কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন।

আল্লাহ প্রেম

কাজী নজরুল ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও সুন্দরকে অভিন্ন হিসেবে দেখেছেন। তিনি তাঁর কবিতা, ইসলামী সঙ্গীত ও হাম্‌দ-এ চির সুন্দর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার স্তব-স্তুতি করেছেন। তিনি আল্লাহ পাককে অত্যন্ত সুন্দররূপে চিন্তা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক সুন্দরতম, পরম প্রেমময়। আল্লাহর পবিত্র নামে কবির জীবন-মৃত্যু সবকিছুই নিবেদিত। আর এহেন আত্মনিবেদনের কারণও তাঁর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস। অদৃশ্য শক্তিতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস তথা ঈমান না থাকলে তাঁর এহেন ইসলামী চিন্তাধারা আসত না। সুতরাং সকল ভাববাদী মত অনুসারে অনুমিত হয় যে, তিনি অদৃশ্যে বিশ্বাস করতেন। কবি- জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর' নামক কবিতায় মহান আল্লাহর প্রতি কবির যে মনোভাব ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস। নিম্নের চরণগুলো এরই স্বাক্ষর বহন করছে;

আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর, আল্লাহ তো দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান, তনু-মন-প্রাণ, আমার পরম গতি।[২২]

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাকে প্রিয়তম, প্রেমময়, পরম সুন্দর, পরম পতি, ধ্যান-জ্ঞান, তনু-মন-প্রাণ ও পরমগতিরূপে কল্পনা করা মরমী সূফী-সাধকদের রীতি। কাজী নজরুল ইসলামের কবি-জীবনের শেষ পর্যায়ের কোন কোন কবিতা রচনায় সূফীবাদের প্রভাব পড়েছিল, তন্মধ্যে বিভিন্ন লেখনীতে মহান আল্লাহ 'পরম সুন্দর' এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মরমীবাদী সূফী-সাধকরা আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত প্রেমের আকাঙ্খায় তাদের দেহ-মন-প্রাণ সবকিছু মহান আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এক আল্লাহতে আত্মবিলোপ হয়ে যান। তাদের আকুল প্রেম-উন্মত্ততা সাধারণ মানুষের কাছে পাগলামি এবং শাস্ত্রবিদগণের কাছে কল্পনা ও বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। তাইতো আল্লাহ তা'আলার প্রেমে দিওয়ানা কবি নজরুল ইসলাম 'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর' কবিতায় ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছেন:

কোন প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আত্মার আহলাদ।
আমি কেঁদে বলি, তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস, শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয়!
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বধু,

---

২১. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ১২১।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর', নজরুলের কবিতাসমগ্র, পৃ. ৯১৮।

Dhaka University Institutional Repository

কেন কালি মাখ পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু!
মোরে ভালোবাস বলে তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু ত সত্য বটে।[২৩]

সর্বশক্তিমান প্রেম সুন্দর আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের প্রতি পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে কবি নজরুল ইসলাম তরুণদের আল্লাহ তা'আলার পথে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে এক অভিভাষণে বলেছিলেন, "আমি জানি, তোমাদের মাঝে বহু তরুণ আছে যাদের রুহ, আত্মা জাগ্রত। যারা বাইরের সম্মান, লোভ, খ্যাতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে রাহে লিল্লাহ আপনাকে সদ্‌কা দিতে রাজী আছেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি গ্রহণ করবেন দুনিয়ার এই ক্ষণিক ভোগের পথ? তারা কি গ্রহণ করবেন না এই মহামন্ত্রঃ "ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্‌য়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন- আমার সব প্রার্থনা, নামাজ, রোজা, তপস্যা, জীবন-মরণ সবকিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত।"[২৪] এইতো ইসলামের চিরন্তন শ্বাশ্বত বাণী। সূফীবাদের প্রকৃত মর্মকথাও কালামে পাকের উক্ত আয়াতটি। ইশ্‌কে ইলাহী সূফী-সাধকদের আত্মার খাদ্য। ইহকালীন জগতে মানব-মানবীর প্রেম-ভালবাসা আল্লাহর প্রেমের কাছে অতি নগণ্য। তাইতো আল্লাহ প্রেমে দিওয়ানা কবি নজরুল ইসলাম মনে প্রাণে গেয়েছেনঃ

লায়লির প্রেমে মজনু পাগল
আমি পাগল 'লা-ইলা'র;
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে,
অরসিকে কয় বাতুল ॥
হৃদয়ে মোর খুশীর বাগান
বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার-রহম মাগে
আমি খোদার 'ইশ্‌ক' চাই ॥[২৫]

আল্লাহর জয়ধ্বনি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে মহান উদ্দেশ্যে আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবরূপে মানব সৃষ্টি করেছেন তা হল পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করা। কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষুরধার লেখনীতে সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন রূপায়িত হয়েছে। এক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মানুষে মানুষে যে পাহাড় সম অসামান্য ভেদাভেদ রয়েছে তা চিরতরে উৎখাত করার জন্য নজরুল ইসলাম সাম্যের কবিতা লিখেছেন, প্রেম-প্রীতির গান পরিবেশন করেছেন, যাতে স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভাষায়ঃ

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ , অভেদ ধর্ম জাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[২৬]

---

২৩. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম :ইসলামী কবিতা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, মে, ১৯৮২, ৩য় প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪০৪/ জুন, ১৯৯৭), পৃ. ৫-৬।

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ', নজরুল রচনাসম্ভার, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকাঃ পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ১৩৬৮), পৃ. ২৯১-২৯২; মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, পৃ. ৮।

২৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবি-জীবনের শেষপর্বে নজরুল ইসলাম বেশ কিছু আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন যেগুলোর প্রধান আবেগ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জয়গান ও জয়ধ্বনি করা। যেমন-'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' শীর্ষক কবিতায় একেশ্বরবাদ এবং তজ্জনিত সাম্য, শান্তি ও উদারতার বাণী উচ্চারণ করতঃ বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে স্বপন্থীদের প্রভেদ দেখাতে গিয়ে কবি মহান আল্লাহ তা'আলার জয়গান করে জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

উহারা প্রচার করুক, হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।"
উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ। [২৭]

'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' নামক কবিতার মতো 'জয় হোক! জয় হোক! শীর্ষক কবিতাটিতেও কাজী নজরুল ইসলাম দৃপ্তকণ্ঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছেন। লেখনী স্তব্ধ হওয়ার বছর খানেকের কিছু আগে কবি-জীবনের শেষপ্রান্তে রচিত কবিতাটি 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪১ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় মহান আল্লাহর জয়ধ্বনি অনুরণিত হওয়ার সাথে সাথে শান্তি , সাম্য ও যৌবনের জয়ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছে। কবির ভাষায়:

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক ।
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!
আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার;
রবি শশী আলো দেয় বৃষ্টি ঝরে-
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার! [২৮]

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত 'একি আল্লাহর কৃপা নয়?' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও সাহায্যেই পরাজয় ও ভয়ের বদলে জয় আসে। তিনিই সর্বকল্যাণ দাতা, সর্ববিপদ ত্রাতা, সহজ-সরল পথের দিশারী ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি প্রেম দিলে ত্রিভূবন সাম্য, শান্তিময় হয়। তাই কবি নজরুল ইসলাম আল্লাহর জয়ধ্বনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন;

নির্যাতিতের আল্লা তিনি কোন জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁর প্রবল মার।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই যে মানে এক সে আল্লাহর ফরমান।
আমি বুঝি না ক কোনো সে 'ইজম' কোনরূপ রাজনীতি
আমি শুধু জানি আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি।[২৯]

---

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মানুষ', 'সাম্যবাদী', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ২৬৫।

২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ', 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জয় হোক! জয় হোক!', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯১৫-৯১৭; নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, পৃ. ১৬-১৭।

২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'এ কি আল্লাহর কৃপা নয়?', 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৫-২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ নির্ভরতা

কবি নজরুল ইসলাম অসুস্থ ও সম্বিতহারা হওয়ার মাত্র চার মাস আগে রচিত 'চির-নির্ভর' কবিতাটি 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪২ সালের ৯ ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হয়। কবি-জীবনের শেষপ্রান্তে লিখিত 'চির-নির্ভর' কবিতাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও চির নির্ভরতার প্রামাণ্য দলিল। নির্ভীক কবি মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে তাঁর সাহায্যে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেনঃ

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয় !
কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি উর্ধ্ব হ'তে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে !
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে ![৩০]

আলোচ্য কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের জীবন কাহিনী ও অভিজ্ঞতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাই কবিতাটি যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। আত্মজীবনীমূলক রচনাটিতে নজরুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার অপার রহমত ও কৃপায় আজন্ম চির-নির্ভর হওয়ার ঘটনাবলী উল্লেখ করে বলেছেন;

অবিশ্বাসীরা শোনো শোনো সবে জন্ম-কাহিনী মোর
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার।
'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনে প্রথম জনমি আমি
আল্লার নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি।
সেই পবিত্র ধ্বনি রণধ্বনি উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।[৩১]

কবি-জীবনের অন্তিম পর্যায়ে নজরুল ইসলামের ধমনী সচেতন ও অচেতন চিত্তে আল্লাহ পাকের নামের ধ্বনি অনুসরণের এহেন ঘোষণা ধর্ম বিশ্বাসী কবির অন্তরের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। জন্ম ক্ষণের ঝড়ের আবর্তে কবিকে অনন্ত অজানা অদেখা পথে, গিরি, অরণ্য, সাগর, মরু-প্রান্তে ঘুরে ফিরতে হয়েছে। তখন বারে বারে জন্মক্ষণের সেই বিষাণ আযান তিনি শুনতে পেয়েছেন। আর দারিদ্র, অভাব-অনটন, দুঃখ-শোকের পথে তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর অপার কৃপা রহমত লাভ করেছেন। কোন ভয়-ভীতি কবিকে অগ্রে চলা থেকে ফেরাতে পারেনি। স্বপ্নে জাগরণে কবিকে কে যেন বার বার নাম ধরে ডেকে গিয়েছেন এবং এগিয়ে চলার আহ্বানে অনুপ্রাণিত করেছেন। সুদূরের ডাক, পরম পুরুষের বেদনায় যে কবি অভিভূত হতেন, নিজের মধ্যে যে তাকে অনুভব করতেন, ভাল-মন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্বে যে তিনি দোলায়িত হতেন সে আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার ছাপ 'চির-নির্ভর' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ ।
সে কি আল্লাহ? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী ?

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চির-নির্ভর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯২১।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১২: নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা ? সে কি আমি? [৩২]

স্রষ্টার অসীম রহস্যালোকে উত্তীর্ণ কবির মনে পরম সুন্দরের যে আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল তা কোনদিন অবদমিত হয়নি বরং তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরম শক্তিমানের জন্যে আকুলতা ও ক্রন্দন কবি-চিত্তের সেই দিকটিকে উম্মোচিত করে। অনন্তর কবির নিজেকে মনে হয়েছে অসীম নীলাম্বরে বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুকের তীর যে ধনুকের ছিলা ধরে শয়তান তাঁকে আধারের গহ্বরে টেনেছে কিন্তু পরম প্রবল আল্লাহর তেজ তাঁকে অবলীলাক্রমে রক্ষা করেছে,

জন্মক্ষণের সাথী ঝড় এল বিষাণের আহ্বান,
'আল্লাহু আকবার' বলি আমি ধনুকে মারিনু টান
শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুঁড়িলাম আমি তীর;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আত্মার নীড় !
চেয়ে দেখি একি পরম বিলাস ! এ যে আল্লাহ মোর ;
কোথা শয়তান ? এ যে আনন্দ-রস-মধু-ঘনঘোর।[৩৩]

আল্লাহ তা'আলার নামে সবকিছু সমর্পণ করে এক আল্লাহর আজ্ঞাবহ দাসরূপে ইহকালে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গই যে ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য- এ কথাও নজরুল ইসলাম অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। আত্মসমর্পণকারী মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী অসীম ক্ষমতার অধিকারী এমন অসংখ্য মানুষের প্রয়োজন। কবি নজরুল ইসলাম এমন ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মানুষ মনে-প্রাণে কামনা করে অন্যায়-অত্যাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং অত্যাচারী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আজীবন জিহাদ করেছেন। নির্ভীক কবি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে 'আল্লাহর সৈনিক' আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তুফান, বিপ্লব, জিহাদ, বিদ্রোহ যার সাথী; পুরাতন ও জরাজীর্ণতা সংস্কারের আবর্জনা যিনি দগ্ধ করে ফেলেন, কোন আসমান, গ্রহ-তারা, আবরণ, শৃংখল বা কোন কারাগার তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। চরম নিত্য ও পরম পরিপূর্ণ টানে তিনি অপরাজেয় সর্ব ভয়-ভীতি ও মৃত্যুহীন, জিহাদ ও বিপ্লব যার সঙ্গীত। কবি-জীবনের শেষপর্বের মানস প্রকৃতি 'চির-নির্ভয়' কবিতায় নজরুল ইসলাম বজ্রকণ্ঠে গেয়েছেন;

আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোন বাধা-ভয় নাই,
তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া।
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মনা।
পরম নিত্য পরম পূর্ণ টানে মোরে নিশিদিন,
আমি তাই অপরাজেয় সর্বভয় ও মৃত্যুহীন।[৩৪]

'সওগাত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ 'যুদ্ধ সংখ্যা'য় কাজী নজরুল ইসলামের 'মহা-সমর' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ আর বহুত্ববাদের মহা-সমরে জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে ভেদ জ্ঞানের বিরুদ্ধে এবং এক ও অভিন্ন স্রষ্টার সৃষ্টিতে, মানব জাতির একক সত্তার পরম বিশ্বাসে কবির লেখনীতে মহান আল্লাহর জয়ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে;

---

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জাগরণ', আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৮৭/ আগষ্ট, ১৯৮০), পৃ. ৯।

৩৩. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'চির-নির্ভয়', পৃ. ১১।

৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চির-নির্ভয়', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯২৩-৯২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৌহীদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহা-সমর,
'লা- শরীক' এক হবে জয়ী কহিছে 'আল্লাহু আকবার'।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ'-মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।
বিশ্বাস কর অবিশ্বাসীরা রহমত তাঁর আসিছে ঐ-
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ।
তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন,
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির স্বাধীন!
অসুরে অসুরে বাধায় সমর, উর্ধ্বে আল্লা নির্বিকার,
দেখিছেন খেলা; তিমির অন্ধ! দেখ্‌রে তাঁহার দেখ বিচার! [৩৫]

কবি নজরুল ইসলাম ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিক জগতে স্বেচ্ছায়ই প্রবেশ করেছেন। সেখান থেকে মানব জাতির সত্য ও মুক্তির জন্য তিনি যে আশাতরী ভাসিয়েছেন তা কখনো ডুববে না। সাগর-জলে, নদী-কূলে তরী বেয়ে পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সওগাত অর্জন করেছেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মানবকুলের জন্য মহান আল্লাহর বাণী থেকে শেষ সওগাতরূপে তাওহীদ, ঈমান, ঐক্য, শক্তি, শান্তি ও শৃংখলা কুড়িয়ে এনেছেন- যা মানুষকে স্থিতিশীল করে তুলবে এমন এক রাজ্যে, যেখানে মানুষে মানুষে অনৈক্য, বিবাদ-কলহ, বিদ্বেষ ও হানাহানি থাকবে না। থাকবে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানের সাথে ইসলামী জীবনবোধ। তাই কবি নজরুল ইসলাম 'ডুবিবে না আশাতরী' নামক কবিতায় মানুষকে দৃপ্তকণ্ঠে আশার বাণী শুনিয়েছেন;

মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
পাব কূল মোরা পাব আশ্রয়-রাখো বিশ্বাস রাখো,
তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা-তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো!
পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া স্থির করো প্রাণ-মন,
দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে, প্রভঞ্জন!
হয়ত প্রভুর পরীক্ষা ইহা ভয় দেখাইয়া তিনি
ভয় করিবেন দূর আমাদের, জ্ঞাতা একক যিনি।[৩৬]

আশাবাদী কবি নজরুল ইসলাম মানুষের মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়ে বৃহৎ প্রাপ্তির কল্পনা করে মহৎ স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস ও আশা-নিরানন্দের মাঝেও আল্লাহর অপার করুণা নেমে আসবে। মানুষ যদি পূর্ণ আশা ও ভরসায় প্রাণভরে আল্লাহ পাকের যিক্‌র-আয্‌কার করে, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করে, মুনাজাত করে, তাহলে মানবজাতির উপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত তথা করুণাধারা বর্ষিত হবে বলে কবি নজরুল ইসলামের একান্ত বিশ্বাস ও আশা । কবির ভাষায়ঃ

আমি বলি, শোনো মানুষ ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরোথরো।
ইহা আল্লাহর বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লাহর হয়ে যায়।
চাওয়া যদি হয় বৃহৎ বৃহৎ সাধনাও তার হয়,

---

৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মহা-সমর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯২৬-৯২৭; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, পৃ. ১২-১৩।

৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ডুবিবে না আশাতরী', 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-২৪৫।

তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্ব্বজয়।
পূর্ণ পরম-বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই।
তাহারে ছুঁয়োনা, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই।[৩৭]

দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে গিয়ে কর্মব্যস্ত মানুষ দ্বীন ইসলামের কাজে প্রায়শঃ অমনোযোগী হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগী তথা তাঁর যাবতীয় নি'আমতের প্রতি শোকর গুজার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিক্র-আয্কার করতেও ভুলে যায়। তাই কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানদের এক আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য নসীহত করে মরমী গান রচনা করেছেন। সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ও প্রার্থনা হাসিলের একমাত্র প্রেরণার উৎস আল্লাহ। আকাশ সমতুল্য বিপদ-আপদেও মানুষ যেন দিশেহারা না হয়। সকল দুঃখ-কষ্টে তারা পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর উপর ভরসা করে। এ হাম্দটিতে তাই বলা হয়েছে,

ও মন কারো ভরসা করিসনে তুই,
এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
ভাবনা কিসের, কিসের ডর।
রোগে শোকে দুখে ধনে
নাই ভরসা আল্লা বিনে
তুই মানুষের সহায় মাগিস্,
তাই পাস্‌নে খোদার নেক্ নজর ॥[৩৮]

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্তরে আল্লাহ্ পাকের যিক্র থাকা অত্যাবশ্যক। দিবা-রাত্রিতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করলে করুণাময় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়, বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়। তাই কবি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সকল কাজে মহান আল্লাহর নাম জপতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন;

আল্লাহর নাম জপিও ভাই দিবস ও রাতে
সকল কাজের মাঝে রে ভাই তাঁহার রহম পেতে।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥
হাত করবে কাজ রে ভাই মন জপ্‌বে নাম
ঐ নাম জপতে লাগে না ভাই টাকা কড়ি দাম,
নাম জপো ভাই, মাঠে-ঘাটে, হাটের পথে যেতে
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥
ঐ আল্লার নাম যদি রে ভাই তুমি থাক ধরে
ঐ নামও তোমায় থাকবে ধরে দুঃখ-বিপদ-ঝড়ে। [৩৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ধ্যানে-জ্ঞানে বাহিরে-ভিতরে সদা বিদ্যমান। আমরা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া থেকে কোন মুহূর্তেই বিন্দুমাত্র পৃথক নই। আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে পারলে আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও সকল কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। তাই মহান আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হয়ে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর মরমীবাদী ইসলামী সঙ্গীতে লিখেছেন;

---

৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিশ্বাস ও আশা', 'শেষ সওগাত', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮২৪-৮২৫।

৩৮. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, 'মরমী', পৃ. ১৫৫; কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার: দ্বিতীয় খণ্ড', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল গীতি অখণ্ড, আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত, (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৯৯), পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল, বেচব তা'রে কেয়ামতের হাটে ॥
পত্তনীদার যে এ জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর
বেহেশতেরই তালুক কিনে বসবো সোনার খাটে ॥
মসজিদে মোর মরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি,
'মনকীর', 'নকীর' দুই ফেরেশ্‌তা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ঈমানকে মোর সাথী করে
রদ হবে না কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে ॥[৪০]

আল্লাহ নি'আমতরাজী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পার্থিব জগত সৃষ্টি করেছেন এবং আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানব জাতির সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও আনন্দ-উপভোগের নিমিত্তে যাবতীয় নি'আমতরাজীও সৃজন করেছেন। দয়াময় রহমান আল্লাহর করুণায় মাটিতে গাছ-পালা, লতাপাতা, ফল-মূল জন্মায়। সমুদ্র, পুকুর, নদ-নদী, কূয়া প্রভৃতির পানি আমাদের দৈনন্দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ, আহার-বিহার ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহৃত হয়। নিখিলের এহেন সুন্দর মনোরম পরিবেশ সৃজন করে আল্লাহ পাকের অপার রহমতে মানব জাতির এক মধুর জীবন যাপনে সাহায্য সহায়তা এ সবই সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানী। দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইহ্‌সানের এগুলো পর্যাপ্ত নিদর্শন। কবি নজরুল ইসলাম মহান আল্লাহর নি'আমতরাজীর প্রশংসায় রচিত 'তোমার মেহেরবানী' শীর্ষক 'হাম্‌দ'-এ এহেন দয়াদ্রতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেয়েছেন;

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী,
শস্য শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালি খানি
খোদা তোমার মেহেরবানী।
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন,
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও
মানি চাই না মানি ।
খোদা ! তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাচাঁও এ বান্দায়।[৪১]

কবি নজরুল ইসলাম বিশ্বমানবতার মূল উপকরণ প্রাকৃতিক জগতের রূপ-বৈচিত্র্যে মহান আল্লাহর নি'আমতরাজী প্রত্যক্ষ করে কবিতা লিখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক জগতের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ-মাটি, গাছ-পালা, ফল-মূল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, আগুন-পানি, আলো-বাতাস, জীব-জানোয়ার প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু মানবতার সেবায় অকৃপণভাবে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সদা নিয়োজিত। এক্ষেত্রে কবি নিখুঁত 'দ্রষ্টা'।

---

৪০. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'মরমী', পৃ. ১৫৪; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩; কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকারঃ দ্বিতীয় খণ্ড', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৪১. নজরুল ইসলাম, ইসলামী গান, 'হামদ', পৃ. ১৩৩; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২১২; কাজী নজরুল ইসলাম, 'বনগীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্যে অভিভূত কবি নজরুল ইসলামের অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের সফল কাব্যরূপ নিম্নের চরণগুলোতে চিত্রিত হয়েছে । কবির ভাষায়ঃ

তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশে সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
তাঁর চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্ম ভেদ,
সব জাতির ঘরে আসে, কই আনে না তো বিচ্ছেদ !
তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীর মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁর অগ্নি জলবায়ু বহে সকলের সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল-ফুল দেয় সর্ব জাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?
কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বরে
অন্য ধর্মে দেয়নি কো গালি কে রাখে তার খবর?
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও
কোরানে আল্লাহ এদেরই কন-"শাখা-মৃগ হয়ে যাও।"[৪২]

আল্লাহ পাকের দেয়া এসব নি'আমত উপভোগ করে আমাদের খোদাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রতি মুহূর্তে দিবা-রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার এ সব নি'আমত তথা ভোগের সামগ্রীর জন্য আমাদের তাঁর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত। তাই সকল কাজে ও ধ্যানে আল্লাহর নাম জপে তাঁর অশেষ নি'আমতের উল্লেখ করতঃ কবি নজরুল ইসলাম শুক্‌রিয়া আদায় করে প্রার্থনামূলক গান গেয়েছেন;

তুমি অনেক দিলে খোদা,
দিলে অশেষ নিয়ামত-
আমি লোভী, তাই তে আমার
মেটে না হস্‌রত ॥ ...
কোরান দিলে পথ দেখাতে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেখাতে,
নামাজ দিয়ে দেখাইলে মসজিদেরই পথ
তুমি কেয়ামতের শেষে দিবে বেহেশ্‌তী দৌলত ॥[৪৩]

আল্লাহ্ চির-বিরাজমান

মহাশক্তিশালী আল্লাহর শক্তি প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান। নজরুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমা ও কুদরতের কথা ভেবে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন যে, পৃথিবী বা প্রকৃতির সকল কিছুই সৃষ্টিকর্তা চির বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে নিত্য মশগুল। মহান আল্লাহর নাম জপ করতে সদা নিমগ্ন। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইর্‌শাদ হয়েছেঃ[৪৪]

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط

"পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় তাস্‌বীহ পাঠ করে থাকে, অবশ্য তোমরা তাদের এই তাস্‌বীহ পাঠ বুঝতে সক্ষম হও না।"

৪২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গোড়ামী ধর্ম নয়', শেষ সওগাত, নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮৪০-৮৪১।

৪৩. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, 'হামদ', পৃ. ১৪৩; কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।

৪৪. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১৭, আয়াতঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সীমিত চিন্তায় সেসব আমরা কেবল অনুভব করতে পারি। প্রকৃতি যেখানে মহান আল্লাহর প্রশংসায় তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল পাঠ করতে পারে, মানুষও তো প্রাকৃতিক জীব এবং সৃষ্টির সেরা 'আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত' তারা কেন এমন পুতঃপবিত্রময় হতে পারে না। হ্যা পারে, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। সত্য সন্ধানীরা সত্যের জন্য এভাবেই অনুসন্ধিৎসু হন। তাই কবি নজরুল ইসলাম প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'জপে তোমারি নাম' শীর্ষক গান গেয়েছিলেন;

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান
জপে তোমারি নাম।
তারায় গাঁথা তস্‌বী লয়ে নিশীথে আসমান্
জপে তোমারি নাম।
ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া;
হাতে লয়ে ফুল কুড়ির তস্‌বী ফুলের বাগান
জপে তোমারি নাম।
বৃষ্টি ধারার তস্‌বী লয়ে
নাম জপে, মেঘ ব্যকুল হয়ে
সাগর-কল্লোল, সমীর হিন্দোল, বাদল ঝড়-তুফান
জপে তোমারি নাম।[৪৫]

আল্লাহর ইবাদাত

ইসলাম ধর্মে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইবাদাত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ যাতে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর উপাসনা তথা ইবাদাত-বন্দেগী করে পরম শান্তি ও চরম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, সেজন্য স্বীয় বান্দাদের উপর নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত বিধিবদ্ধ করেছেন।

১৯৪০ সালের ১১ ই ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য করে 'জেহাদ' সম্পাদককে প্রেরিত এক বাণীতে কবি নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, "আমার মন্ত্র-'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন'- কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। আমি ফকির, আল্লাহর দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষুক; যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই, ইনশাআল্লাহ শুধু ভারত কেন, সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে উঠবে-তৌহীদের পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে।"[৪৬]

কবি নজরুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভ যথা-কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-এই মৌলিক ইবাদাত বা বন্দেগীর সাথে মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা ও সুদৃঢ় করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক হাম্‌দ ও ইসলামী গান রচনা করেছেন, যাতে আন্তরিক উচ্চারণে সমর্পিত চিত্তে আহ্বান জানানো হয়েছে;

আল্লার নাম লইয়া বান্দা রোজ ফজরে উঠিও
আল্লা নামের আহলাদে ভাই ফুলের মত ফুটিও ॥
কাজে তোমার যাইও বান্দা আল্লার নাম লইয়া

---

৪৫. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, 'হাম্‌দ', পৃ. ১৩৬।

৪৬. উদ্ধৃত আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ নামের গুণে কাজের ভার যাইবে হাল্‌কা হইয়া
শুনলে আজান, কাজ ফেইল্যা মসজিদে শির লুটিও ॥
আল্লার নাম লইয়া রে ভাই কইরো খানা-পিনা
হাটে-মাঠে যাইও না ভাই আল্লার নাম বিনা ॥
স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার খোদার সপে দিও
আল্লার নাম জিকির কইর‍্যা নিশীথে ঘুমিও।
ঐ নাম শুইন্যা জন্মেছো ভাই, ঐ নাম লইয়া মরিও ॥[৪৭]

কবি নজরুল ইসলামের ভেতর ইসলামের রূপ যেন এক অলৌকিক জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছিল। তাঁর লেখনী যেদিন অজস্র ধারায় ইসলামী গান লিখতে শুরু করল, সেদিন সেই জ্যোতিই যেন ইসলামের সুমহান বাণী হয়ে কাব্যময়রূপে প্রকাশিত হল। তাইতো দ্বীন ইসলামী মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কবি নজরুল ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বিষয় তথা কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি আবশ্যিক বিষয় নিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী গান রচনা করেছেন;

নামাজ পড়, রোজা রাখ, কল্‌মা পড় ভাই,
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই।
সম্বল যার আছে হাতে
হজ্জের তরে যা কা'বাতে
যাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়েত যে পাই ॥
ফরজ তরক করে করলি করজ ভবের দেনা,
আল্লা ও রাসূলের সাথে হ'ল না তোর চেনা।
পরানে রাখ কোরআন বেঁধে
নবীরে ডাক কেঁদে কেঁদে
রাত দিন তুই কর মুনাজাত
'আল্লাহ তোমায় চাই' ॥[৪৮]

কলেমা

ইসলামের মূল পাঁচটি রোকনের মধ্যে কলেমা হলো প্রথম ভিত্তি। পাঁচটি কলেমা যথা: কলেমা তাইয়্যেবা অর্থে অতি পবিত্র, কলেমা শাহাদাত অর্থে সাক্ষ্যদান, কলেমা তাওহীদ অর্থে একত্ববাদ, কলেমা তামজীদ অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা এবং কলেমা তাহমীদ অর্থে প্রশংসা বর্ণনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতের সোপান হিসেবে কলেমার গুরুত্ব ও ফজীলত অপরিসীম। কবি নজরুল ইসলাম মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগী করতে মুসলমানদের প্রতিনিয়ত কলেমা পড়ার তাগিদ দিয়ে এবং কলেমার গুনাবলী ব্যাখ্যা করে 'হাম্‌দ' রচনা করে বলেছেন;

কলেমা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি ॥
ঐ কলেমা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কলেমা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুঃখের সংসার সুখময় হয় তার-
মুসিবত আসে নাকো, হয় না ক্ষতি ॥
হরদম জপে মন কলেমা যে জন

---

৪৭. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'হাম্‌দ', পৃ. ১৪১।

৪৮. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৮৪: নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন;
দিলের আয়না তার হয়ে যায় পাক্ সাফ
সদা আল্লাহর রাহে তার রহে মতি ॥[৪৯]

এখানে কবি দেহ-মন সব কিছু উজাড় করে দিয়ে এক আল্লাহ পাকের ইবাদাত করতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে 'আবদ' عَبْدٌ ধাতু থেকে 'ইবাদাত' عِبَادَةٌ শব্দটি উদ্ভূত; যার অর্থ দাসত্ব করা। নজরুল ইসলাম মহান আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য মসজিদের খাদেম হতে চেয়েছেন, সুখে-দুঃখে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হয়ে থাকতে চেয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেমের আবে হায়াতে অবগাহন করে দেহমন শীতল করে দুনিয়ার জিন্দেগীতে মহান প্রতিপালকের একান্ত অনুগত থাকতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার মহিমা গেয়ে তাঁর নামের কলেমায় মৃত্যুর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কবির ভাষায়:

মুখে যেন জপি আমি
কল্‌মা তোমার দিবস-যামী
তোমার মসজিদেরই ঝাড়ু-বর্দ্দার
হোক্ আমার এ হাত ॥
সুখে তুমি দুঃখে তুমি,
চোখে তুমি, বুকে তুমি
এই পিয়াসী প্রাণের খোদা
তুমিই আব-হায়াত ॥[৫০]

কবি নজরুল ইসলাম আমাদের ইসলামী জোশ সঞ্জীবিত করার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়ে অসংখ্য ইসলামী সঙ্গীতের মধ্যে ইসলামের প্রথম রোকন কলেমা সংক্রান্ত অনেক গান রচনা করেছেন। অবশ্য কলেমাকে আলাদাভাবে বর্ণনা করা সহজ ব্যাপার নয়; এর সঙ্গে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, তাবিজ প্রভৃতি বহু বিষয় জড়িত। মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কাজে পরিণত করাই হচ্ছে ঈমানের মূল বিষয়। কবির ভাষায়:

মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক আল্লার
চল্ আগে চল্ বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান ॥[৫১]

নামায

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের যে সকল পন্থা রয়েছে তন্মধ্যে নামায অন্যতম। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় রোকন নামায। আরবীতে নামাযকে সালাত صَلَوةٌ বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্ক ও সান্নিধ্য। ইসলামের পরিভাষায় এই সালাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর বান্দাদের

---

৪৯. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'হামদ', পৃ. ১৩৮; কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতাঞ্জলি, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮।

৫০. নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫; নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৩৫।

৫১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা', 'গুল-বাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ও সান্নিধ্যের এমন এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলে যা অন্য কোন ইবাদাতের বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।[৫২] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিরাশি স্থানে প্রত্যক্ষভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:[৫৩] وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ " আর তোমরা নামায কায়েম কর।"

অতএব, নামাযের গুরুত্ব অত্যাধিক। এই নামাযের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কবি নজরুল ইসলাম নামাযের ধর্মীয় এবং সামাজিক উভয় দিকের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে জামাতে নামায পড়ার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। নামাযের জামাতে ইমাম-মুসল্লী সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শৃংখলার সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, রুকূ' করে, সিজ্দা করে। শৃংখলাবোধের এ এক অতুলনীয় শিক্ষা । জামাতে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব হাসিল করা যায়। উল্লেখ্য যে, সবার সাথে এক জামাতে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে সাধারণ নেকীর চেয়ে ২৭ গুণ বেশী নেকী লাভ করা যায়। কবি নজরুল ইসলাম এখানে জামাতে নামায আদায় করলে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সামাজিক গুরুত্বের দিকে একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত করেছেন। নামাযে মনে প্রশান্তি আনে। কবি নজরুল ইসলাম মাত্র এগার বছর বয়সে গ্রামের মসজিদে নামাযে ইমামতি করেছেন। তাই তো বালক কবি তার ইসলামী সঙ্গীতে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জামাতে নামায পড়ার তাৎপর্য অনুধাবন করে বলেছেন:

নামাজ পড় মিঞা ওগো নামাজ পড় মিঞা
সবার সাথে জমায়েতে মস্জিদেতে গিয়া,
তাতে যে নেকী পাবে বেশী
পর সে হবে খুশী
থাকবে নাকো কীনা, প্রেমে পূর্ণ হবে হিয়া ॥[৫৪]

এই নামাযের আরেকটি আভিধানিক অর্থ 'ইস্তিকামাত' اِسْتِقَامَةٌ বা বাঁকা কাঠকে তাপ বা সেঁক দিয়ে সোজা করা। অর্থাৎ আগুনের তাপে যেমন বাঁকা কাঠ সোজা হয়ে যায়, তেমনি নামাযও বান্দাকে আল্লাহ পাকের বিরোধিতার বক্রতা থেকে বিরত রেখে তাঁর ইবাদাত ও সেবায় প্রতিষ্ঠিত ও সোজা করে। সর্বোপরি নামায ধর্মের খুটি বা স্তম্ভ। নামায আদায় করলে ধর্ম ঠিক থাকে, আর নামায আদায় না করলে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। বাল্য বয়সেই নজরুল ইসলাম ইসলাম ধর্মের মূল রহস্য উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃত ধার্মিক হতে গেলে যে মনের একাগ্রতার প্রয়োজন তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই ঠিকমত নামায আদায়ের জন্য তিনি জাগরণমূলক ইসলামী গান লিখেছেন;

সে নামাজ আর বন্দেগীতে নাই ফল ভাই রে,
যাতে দেহের সাথে দিলের যোগ নাই রে।
মন আছে ক্ষেতে ভূঁইয়ে
তন আছে মজিদে ছুঁইয়ে
দেহ আর দেল দূরে দূরে দুই ঠাঁই রে ॥[৫৫]

পরিণত বয়সেও কবি ছোটবেলার ইসলাম ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারেননি। তাই তিনি আপন প্রাণের তাগিদে ইসলামী সঙ্গীতে নামায আদায়ের বিষয়টি বহুবার উল্লেখ করেছেন। নামাযের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আযান, মসজিদ ও মুনাজাত প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে এসে

---

৫২. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক স্টাডিজ, ২য় পত্র, পৃ. ২৩২।

৫৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল:৭৩, আয়াত: ২০।

৫৪. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ১২২।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, একটির সঙ্গে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ জন্য নজরুল ইসলাম আযান, মসজিদ, নামায ও মুনাজাতের বিষয় অবলম্বনে বিপুল পরিমাণে ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেমন- আল্লাহর ঘর মসজিদে নামায আদায়ের জন্য কবি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন;

হে নামাজী, আমার ঘরে নামাজ পড় আজ।
(পেতে) দিলাম তোমার চরণতলে হৃদয়-জায়নামাজ।
আমি গুনাহ্গার বে-খবর
মোর নামাজ পড়ার নাই অবসর
(তব) চরণ-ছোঁয়ায় এই পাপীরে কর সরফরাজ।
তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরাণ দিয়ে,
আমার এ ঘর মস্‌জিদ হোক তোমার পরশ নিয়ে।
(সেই) শয়তান যাক দূরে শুনে তক্‌বীরের আওয়াজ।[৫৬]

নামায মানুষের মনকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে দেয়। মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ ও জরাজীর্ণতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। তাই তাক্‌বীর ধ্বনির বজ্রকণ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তথা মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযান শুনলেই যেন মসজিদে ধাবিত হতে হয়। আমরা যেন অযথা গাফিলতি বা অলসতা না করে ঘুমের চেয়ে নামাযকে বেশী প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেই। কবি নজরুল ইসলামের তাই একান্ত কামনা। কবির ভাষায়:

আঁধার মনের মিনারে মোর,
হে মুয়াজ্জিন, দাও আজান ॥
গাফেলতির ঘুম ভেঙ্গে দাও
হউক নিশি অবসান।
আল্লাহ নামের যে তকবীরে,
ঝর্ণা বহে পাষাণ চিরে,
শুনি সে তকবীরের ধ্বনি,
জাগুক আমার পাষাণ প্রাণ ॥[৫৭]

মুসলমানদের বিভিন্ন সময়ের ফরজ ইবাদাত তথা নামায বা প্রার্থনার নির্দিষ্ট নাম, প্রাতঃকালের 'ফজর', দ্বিপ্রহরের 'যুহর', অপরাহ্নের 'আসর', দিন শেষের 'মাগ্‌রিব' এবং রাত্রিকালের 'ইশা' এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাতের বিষয়টি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কয়েকটি কবিতা ও ইসলামী গানে সংঘবদ্ধতা ও মুসলিম জাগরণের প্রতীক হিসেবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গুল-বাগিচা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা' শীর্ষক ইসলামী জাগরণী গানের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে কবি অলসতা অবহেলা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগীতে জামাতের সাথে শরীক হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর,
মাগরেবের আজ শুনি আজান।
জামাত্ শামিল হওরে এশাতে
এখনো জামাতে আছে স্থান ॥[৫৮]

---

৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২৪৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলামের একান্ত বিশ্বাস ছিল মসজিদে নামায আদায় করলে শত দুঃখ-কষ্টে, বিপদে-আপদেও মনে চরম প্রশান্তি আসবে, পরপারের সম্বল হবে এবং মৃত্যুর পরে অপার শান্তি পাওয়া যায়। আর তা আসবে একমাত্র জায়নামাযে দাঁড়ালে। তাই কবি নজরুল ইসলাম কেবল জীবদ্দশায়ই নয়, মৃত্যুর পরও নীরব নিস্তব্ধ সমাধিতে মসজিদের পাশে চিরতরে শায়িত হতে চেয়েছেন এবং হয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ওপারে বসেও তিনি মুয়াজ্জিনের সুমধুর আযান এবং নামাযীর পবিত্র পদধ্বনি শোনার গভীর প্রতীক্ষায় থাকবেন। সেজন্য কবি নজরুল ইসলাম আযান শুনার সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেনঃ

মসজিদে ঐ শোনরে আজান চল নামাযে চল।
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল নামাজে চল ॥
ময়লা মাটি লাগলো যা তোর দেহ মনের মাঝে,
সাফ হবে সব দাঁড়াবি তুই যেমনি জায়নামাযে,
রোজগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল।
ওরে চল নামাজে চল ॥ [৫৯]

রোযা

পবিত্র রমজান মাসে ত্রিশ রোযা পালন ইসলামের তৃতীয় রোকন। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাতের নিয়তে সুব্হে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনরূপ পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। এই রোযার ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। আর মাহে রমজান একটি ফজীলতের মাস। ঈমানদার মুসলমানগণ এ মাসের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। মূলতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সাধনা বা সংযম এবং এর পুরস্কার হল বেহেশত। কবি নজরুল ইসলাম পবিত্র রমজান মাসের রোজার ফজীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অসংখ্য ইসলামী সঙ্গীত লিখেছেন;

ফিরে এলো আজি ফের মাহে রমজান
দুনিয়াতে আল্লাহর বেহেস্তী দান
একটি বছর পরে
এলো যে মোদের ঘরে
তসলিম জানায়, আজি মুসলিম জাহান।[৬০]

রোযা পালনের মাধ্যমে তাক্ওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা যায়, রমজান মাসে রোযাদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণপূর্বক সর্বপ্রকার পাপাচার ও পানাহার থেকে বিরত থাকেন। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বেহেশ্‌ত দান করবেন। সমগ্র মুসলিম জাহান এই পবিত্র রহমত, বরকত ও নাজাতের মাসের জন্য একটি বছর প্রতীক্ষায় থাকে। রমজান মাসের আগমনে কবি নজরুল ইসলাম তাই এ মাসের তাৎপর্য ও অপার মহিমা বর্ণনা করে ১৯৩৬ সালে মাহে রমজানের গান রচনা করেন;

এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারী ভোল

---

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুল-বাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

৫৯. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৬০. ডি. এফ. আহমদ, 'নজরুলের গানে ইসলামী আকীদা', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ১৬শ খণ্ড, ফাল্গুন, ১৪০০/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪), পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সারা বর্ষ ছিলি গাফিল এবার আঁখি খোল
এই এক মাস রোযা রেখে
পরহেজ থাক গোনাহ্ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামতে তোর ঝুলি ভরে তোল
বন্দী রহে এই মাসে শয়তান মালাউন
এই মাসে যা করবি সওয়াব দর্জা হাজার গুণ
তোর বিলাসের মাখলি যে পাঁক,
রমজানে তা হবে রে সাফ
একতারে তোর করবে সামান আল্লাহ্ রাসূল বোল ॥[৬১]

মানুষ যখন রোযা রাখে তখন সে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। রোযা মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়, মানুষের কু-প্রবৃত্তি ধুয়ে মুছে দেয় এবং আত্মাকে দহন করে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সঞ্জীবিত করে। সর্বোপরি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। রমজান মাস রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও দু'আ কবুলের মাস। তাই এ পুতঃপবিত্র মাসের পরিসমাপ্তিতে কবি নজরুল ইসলামের মন-প্রাণ উদাস, সেই অভিব্যক্তি তাঁর 'মোবারক মাস' শীর্ষক মাহে রমজানের বিদায়লগ্নের গানে প্রকাশ পেয়েছে;

ঘুরিয়ে এলো রমজানেরই মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস।
রোযা রেখেছিলি হে পরহেজগার মুমিন
ভুলে ছিলি দুনিয়াদারী রোযার তিরিশ দিন।
তরক করেছিলি তোরা কে কে ভোগ-বিলাস,
সারা বছর গুনাহ যতো ছিলো রে জমা,
রোযা রেখে খোদার কাছে পেলি সে ক্ষমা
ফেরেস্তা সব সালাম করে কহিছে সাবাস![৬২]

রমজান মাসের ফজীলত অপরিসীম। এ পবিত্র মাসে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। তাই রোযা আমাদের জন্য বরকত ও রহমত স্বরূপ। এর মধ্যে মহান আল্লাহর নি'আমত, বরকত, মাগফিরাত তথা মানুষের জন্য মুক্তি, শান্তি ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। রমজানের প্রথম রাত্রি থেকে শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয় এবং অবাধ্য জ্বিনগুলোকে আবদ্ধ রাখা হয়। আর দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয়, সারা রমজান মাসে উহা খোলা হয় না। আর বেহেশ্তের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, সারা রমজান মাসে উহা বন্ধ করা হয় না।[৬৩] যখনই মাহে রমজানের বিদায়লগ্ন আসে তখনই ব্যথায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। যদিও রোযা আমাদের উপহার দিয়ে যায় অনেক বড় আনন্দ উৎসব মুখর ঈদুল ফিতর। তবু এ রহমতের মাসকে ভুলে থাকা যায় না। চরম পাপীও এ পবিত্র মাসে তার পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। কবি নজরুল ইসলামও এ মাসকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন, তাই এ মাসকে বিদায় জানাতে তার হৃদয়ে করুণ সুরের রাগিনী বেজে উঠে। রমজান মাসের ফজীলত বর্ণনা করে নজরুল ইসলাম আল-বিদা মাহে রমজানের গান রচনা করেন;

৬১. ডি. এফ. আহমদ, 'নজরুলের রচনায় মাহে রমযান', (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ পৌষ, ১৪০৬; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯), পৃ. ৭; গানটি শিল্পী রাবেয়া খাতুন নামে হিজ মাষ্টার্স ভয়েসে বাণীবদ্ধ হয়। রেকর্ড নং এন ৯৮২২, ডিসেম্বর ১৯৩৬।

৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২৩৪; নজরুল ইসলাম:ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৮৫।

৬৩. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক স্টাডিজ, ২য় পত্র, পৃ. ২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

যাবার বেলায় সালাম লহ হে পাক রমজান।
তব বিদায়-ব্যথায় কাঁদিছে নিখিল মুসলিম জাহান॥
ওগো রমজান, তোমারি তরে মুসলিম যত
রাখিয়া রোজা, ছিল জাগিয়া চাহি তব পথ;
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কুরআন।
পাপীর তরে তুমি পারের তরী ছিলে দুনিয়ায়
তোমরি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়;
তোমারি ভয়ে লুকিয়ে ছিল দূরে শয়তান ॥
পরহেজগারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী
মসজিদে তুমি যে জালাও নূরের বাতি
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলায় নতুন ঈদের চাঁদের নিশান ॥ [৬৪]

মাহে রমজানের সুদীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা, ইবাদাত-বন্দেগীর পর রোযাদারদের জন্য ধরনীতে নেমে আসে আনন্দের ঢল, মুসলমানদের ঘরে ঘরে শুরু হয় ঈদের আনন্দ তথা ঈদুল ফিতর। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তনের আনন্দ। রোযাদারদের কষ্ট ও ভোগ-বিলাস থেকে নিজকে সংযত করার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেন ঈদের আনুষ্ঠানিকতা এবং সকল মুসলমান রেষারেষি ভুলে গিয়ে এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক জামাতে নামায আদায় করে। ধনী-দরিদ্র, উচুঁ-নীচু আপন-পর, শত্রু-মিত্র কোন ভেদাভেদ নেই। সমগ্র বিশ্ব মুসলিম যেন সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়,রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর মুসলমানদের দ্বারে আনন্দের সওগাত নিয়ে আগত রোযা ভাঙ্গার উৎসব ঈদুল ফিতরকে স্বাগত জানিয়ে কবি নজরুল ইসলাম বেশকিছু সংখ্যক ঈদের গান রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত রোযার ঈদের গান দিয়ে নজরুল ইসলাম ইসলামী সঙ্গীতের সূচনা করেন। কবির ভাষায়ঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ্।
তোর সোনাদানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত , মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ্।
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ॥
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশ্মন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর্ বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ ॥ [৬৫]

হজ্জ

হজ্জ পালন ইসলামের অন্যতম রোকন। হজ্জব্রত পালন শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত। পবিত্র কা'বাগৃহ এবং এর সংলগ্ন কয়েকটি পবিত্র স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশানুসারে অবস্থান করা, যিয়ারত করা ও অনুষ্ঠান পালন করার নামই হজ্জ। সকল মুসলমানের পক্ষে হজ্জ পালন করা ফরজ নয়। প্রত্যেক সুস্থ, মস্তিষ্ক, বালিগ, স্বাধীন মুসলমান যার ভ্রমণ করার ক্ষমতা আছে এবং যিনি হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ করা ফরজ। এক কথায় শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে যাদের সামর্থ আছে তাদের পক্ষেই হজ্জ করা

৬৪. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৮৭, কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যপালনীয়। কবি নজরুল ইসলাম সমাজের বিত্তশালী সামর্থবান মুসলমানদের হজ্জ ও যিয়ারত করার তাগিদ তুলে ধরে 'চল্‌রে কাবার জেয়ারতে' শীর্ষক ইসলামী গান রচনা করেছেন;

চল্‌রে কা'বার জেয়ারতে, চল নবীজির দেশ
দুনিয়াদারির লেবাস্ খুলে পররে হাজির বেশ।
আওকাতে তোর থাকে যদি আরাফাতের ময়দান
চল্ আরাফাতের ময়দান,
এক জামাত হয় সেখানে ভাই নিখিল মুসলমান-
মুসলিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ্। ...
করে হিজরত কায়েম হলেন মদিনায় হজরত-
যে মদিনায় হজরত,
সেই মদিনা দেখ্‌বি রে চল মিটবে তোর প্রাণের হশরত,
সেথা নবীজির ঐ রওজাতে তোর আরজী করবি পেশ ॥[৬৬]

হজ্জ সারা বিশ্বের মুসলমানদের এক মহা সম্মেলন। হজ্জের মূল বিষয়ের মধ্যে কা'বা ঘরে তাওয়াফ ও হাজরে আস্‌ওয়াদ বা কৃষ্ণপাথর চুম্বন না করলে হজ্জ পালন সিদ্ধ হয় না। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী গানে হজ্জের সময় কা'বা ঘরকে নিজের বুকে আর নবী করীম (সা.) কে চোখে নিয়ে মহান আল্লাহর আরশকে মাথায় তুলে খোদার প্রেমে মশ্‌গুল হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করে রচনা করেছেন;

বক্ষে আমার কা'বার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রাসূল
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ-বেভুল ॥
আমার মনের মস্‌জিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা
রূহ পড়ে তা রাত্রিদিন ॥
খাতুনে-জান্নাত আমার মা,
হাসান, হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ কেয়ামত,
পুল সিরাতের কঠিন পুল ॥[৬৭]

কবি নজরুল ইসলাম হজ্জকে অবশ্য পালনীয় ও ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম ভিত্তি বলে মনে করতেন। তাই কবি আরব ভূমি সফর করার আকাঙ্খায় এতই উদ্বেলিত হয়েছেন যে, তিনি স্বপ্নে আরবভূমিতে বিচরণ করার ধ্যানে সদা মগ্ন। কিন্ত মদীনা মুনাওওয়ারা সফর তো ইচ্ছা করলেই সম্ভব নয়। এর জন্য আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ প্রয়োজন। কিন্তু কবি এ ব্যাপারে অপারগ। সেজন্য কবি তাঁর পক্ষ থেকে দু'আ, দরুদ ও সালাম নবীজির রওজা মুবারকে পৌঁছে দেয়ার তীব্র আকাঙ্খা ব্যক্ত করে হজ্জযাত্রীদের অনুরোধ করে রচনা করেছেন;

---

৬৬. কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতাঞ্জলি, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২২১; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, পৃ. ২০৬।

৬৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৩; কাজী নজরুল ইসলাম, 'গানের মালা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬০।

Dhaka University Institutional Repository

কা'বার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদীনায় ?
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজির রওজায় ॥
হাজীদের ঐ যাত্রা-পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হ'তে
কেঁদে বলি, কেউ যদি মোর
সালাম নিয়ে যায় ॥
পঙ্গু আমি, আরব সাগর লঙ্ঘি কেমন করে,
তাই নিশিদিন কা'বা যাওয়ার পথে থাকি পড়ে ॥[৬৮]

যাকাত

যাকাত প্রদান ইসলামের অন্যতম রোকন। 'যাকাত' زكوة আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধিকরণ। যাকাত দিলে অর্থ সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইসলামের পরিভাষায় যাকাত মানে নিজের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীব, মিসকীন ও অভাবী মানুষকে বন্টন করা। যাকাত আর্থিক ইবাদাত। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। যার উপর যাকাত ফরজ হয়েছে তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ এই মর্মে ইরশাদ করেছেন,[৬৯]

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ "তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।"

ধনীগণ গরীবদেরকে যাকাত প্রদানের ফলে সমাজের নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তিরা দারিদ্রের নির্মম কষাঘাত থেকে অনেকটা রেহাই পায় এবং সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। তাই কবি নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত ইসলামী গানে যাকাত আদায়ের জোরালো তাগিদ দিয়ে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন;

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুল্‌বে পরে-ওরে আগে খুলুক হাত ॥
দেখ পাক কোরআন, শোন নবীজির ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ার মুসলমান ॥
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত্ ॥
তোর দর দালানে কাঁদে ভূখা হাজারো মুসলিম
আছে দৌলতে তোর তাদেরো ভাগ-বলেছেন রহীম ।
বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রসূলে করীম ।
সঞ্চয় তোর সফল হবে পাবি রে নাজাত ॥
এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেবরাতে।
এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তী সওগাত ॥[৭০]

---

৬৮. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, পৃ. ২১১; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২১৭।

৬৯. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিলঃ ৭৩, আয়াতঃ ২০।

৭০. কাজী নজরুল ইসলাম 'নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২২৯; কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দরবারে মুনাজাত

নজরুল ইসলামের কবিতা, ইসলামী সঙ্গীত ও গজলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নতি স্বীকারের এক বাস্তব চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। কবির স্বতন্ত্র কিছু হাম্‌দ রয়েছে, যার বিষয়বস্তু প্রার্থনামূলক। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি সকল মানুষের অনেক কিছু চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন থাকে। মহাসংকটে নিপতিত হলে মানুষ পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নিকট দু'হাত তুলে মুনাজাত করেন। কবি নজরুল ইসলাম আল্লাহর দরবারে মুনাজাত সংক্রান্ত বেশ কিছু 'হাম্‌দ' রচনা করে মানবজাতিকে খোদার নিকট তাদের মনের আশা-আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করার জন্য কবিতার ভাষা দিয়েছেন। এমনি প্রাঞ্জল ভাষায় কবি নজরুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করে রচনা করেছেন;

শোনো শোনো য়্যা ইলাহী
আমার মুনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবস রাত ॥
যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু
কোরানের আয়াত ॥[৭১]

সত্যিই পরম করুণাময় আল্লাহর দয়া ছাড়া পৃথিবীর একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না। প্রতি মুহূর্তে এই অপার রহমতের আধার সর্ব শক্তিমান প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কবি নজরুল ইসলাম মহান আল্লাহকে 'রাজ্জাক' জেনে তাঁর কাছে রিয্‌কের জন্য আকুল হয়ে মুনাজাত পেশ করেছেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বক্ষণ যেন আমরা আল্লাহর নাম জপ করতে পারি। কবির এহেন প্রার্থনায় যেন খোদার আব-হায়াতে আমরা মুক্তি পাই। তাই দু'হাত তুলে কায়মনোবাক্যে নজরুল ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অনেক কিছু চাওয়ার ভঙ্গিতে রচনা করেছেন;

খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মুনাজাত
দিও তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি, ক্ষুধা পেলে লবণ-ভাত ॥
মাঠে সোনার ফসল দিও
গৃহ ভরা বন্ধু প্রিয়
আমার হৃদয়-ভরা শান্তি দিও
সেই তো আমার আব্‌-হায়াত ॥[৭২]

মহান আল্লাহর দরবারে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর দীদার কামনায় সব সময় প্রার্থনায় নত হয়েছেন। তীক্ষ্ণধার লেখনীতে কবি নজরুল ইসলাম মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, যখন জীবন সায়াহ্নে তিনি উপস্থিত হবেন, যখন তাঁর চলার পথ ফুরিয়ে যাবে তখন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন মহিমায় তাঁকে তাঁর বন্ধুর মত বরণ করে নেন। কবি তাই মহান আল্লাহর কাছে এহেন মিনতি জানিয়ে বলেছেন:

---

৭১. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৩৬; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২৪৫; নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫।

৭২. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ'; পৃ. ৩৭; কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমার যখন পথ ফুরাবে
আসবে গহীন রাতি
তখন তুমি হাত ধরে মোর
হয়ো পথের সাথী ॥
তুমি যেথা থাকো প্রিয়
সেথায় যেন যাই (খোদা)
সখা ব'লে ডেকো আমায়
দীদার যেন পাই (খোদা)।[৭৩]

আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করা এবং সুদৃঢ় করার জন্য নজরুল ইসলাম বিভিন্ন রকম ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন যা ছিল একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ এবং হৃদয়কে আন্দোলিত করে। পরম করুণাময়ের প্রতি ঈমান রক্ষা করা ছিল কবি নজরুল ইসলামের দৃঢ় প্রত্যয়। তাই তো তাঁর প্রতি ঈমান ও 'আকীদাই নয়, বিশ্বের সকল মুসলমানদের রক্ষা করা ছিল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কবির আকুল আবেদন। তাইতো তিনি প্রার্থনা মূলক গান গেয়েছেন;

ইয়া আল্লাহ তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দ্বীন।
শান শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমিন
আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ॥
খোদা, মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে
তোমার নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল দুনিয়াকে জয় করে
খোদা, দাও সে ঈমান সেই তরক্কী দাও সে একিন্।
আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। [৭৪]

আমরা অসহায় মানবকুল সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ও নি'আমতরাজীর পানে চেয়ে থাকি। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আমরা অযথা এত ব্যস্ত থাকি যে, সঠিক সময়ে সেই পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে পর্যন্ত ভুলে যাই। বৃথা সময় নষ্ট করে দিবা-রাত্রি যাপন করি। তাই এ দুঃখ-যাতনাময় সংসারে আমাদের মত আপনভোলা বিপথগামী মুসলমানদের কবি নজরুল ইসলাম প্রার্থনার ভঙ্গিতে ইসলামী সঙ্গীতের সুরের ঝংকারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন;

আল্লাজী, আল্লাজী রহম কর, তুমি যে রহমান।
দুনিয়াদারীর ফাঁদে পড়ে কাঁদে আমার প্রাণ ॥
পাইনা সময় ডাকতে তোমায়
বৃথা কাজে দিন বয়ে যায়,
চলতে নারি মেনে আমার নবীর ফরমান ॥
দুনিয়াদারীর চিন্তা এসে, মনকে ভোলায় সদা,
তাইতো মনেও তোমায় স্মরণ করতে নারি খোদা ॥
দাও অবসর তোমায় ডাকার
এই বেদনা সহেনা আর
সংসারের এই দোজখ হতে কর মোরে ত্রাণ। [৭৫]

---

৭৩. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৪৪।

৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২০৯।

৭৫. নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরুত্থান

প্রত্যেক বস্তুর শেষ আছে। জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং মহাবিশ্বেরও শেষ আছে। একদিন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর বিচারের জন্য জীবের পুনরুত্থান হবে। ইসলামের পরিভাষায় যেদিন আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বজগত এবং এর ভিতরের সমস্ত সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে দিবেন এবং একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব থাকবেন। অতঃপর সকল মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বিচারে জন্য দন্ডায়মান হবে সেই মহাপ্রলয়ের দিনটির নাম 'কিয়ামত' اَلْقِيَامَةُ যার অর্থ উঠা বা পুনরুত্থান । একে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানও বলা হয়ে থাকে। নির্ভীক কবি কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানের পর প্রেমময় আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ এবং তাঁর সান্নিধ্যে নিত্য সন্তোষ ও পরম প্রশান্তিতে চিরকাল বসবাস করার তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করে চিরসত্য ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ

পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারেনা মৃত্যুর হাত হতে
মরিতে হয় তা মরিব আমরা এক আল্লাহর পথে।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত সে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লাহর কাছে।
আমাদের কিবা ভয়-
আমাদের চির চাওয়া-পাওয়া এক আল্লাহ প্রেমময় ![৭৬]

হাশর

আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার সকলকে পুনর্জীবিত করা হবে, একত্রিত করা হবে, একে 'হাশর' اَلْحَشْرُ বা মহাসমাবেশ বলা হয়। আল্লাহ পাক প্রত্যেকের ভাল মন্দ কাজের হিসাব নেবেন। আল্লাহ পাক রাহমানুর রাহীম। তিনি হাশরের ময়দানে মানুষের স্ব স্ব কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের পুরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। দুনিয়াতে সকলের মান-সম্মান, ধন-দৌলত আর আখিরাতে নাজাত বা পরিত্রাণ যাই প্রয়োজন হোক না কেন সব কিছু দেয়ার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কবি নজরুল ইসলাম তাই হাশরের ময়দানে তথা বিচার দিবসে গুনাহগার বান্দা হিসেবে করুণাময় আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করে রচনা করেছেন;

রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার
বিচার চাহি না , তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার ॥
আমি জেনে শুনে জীবন-ভরে
দোষ করেছি ঘরে পরে,
আশা নাই যে যাব ত'রে বিচারে তোমার ॥
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে ।
ঐ নামের গুণেই ত'রে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে ![৭৭]

বিচার দিবসে আল্লাহ পাক তাঁর 'রাহমানুর রাহীম' নামের বদৌলতে যাতে নজরুল ইসলামকে শূণ্যহাতে ফিরিয়ে না দেন তার জন্য কবি এখানে আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা কামনা করেছেন। তিনি মহান আল্লাহকে শান্তি দাতা মেনে তাঁর কাছে শান্তি কামনা করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম

---

৭৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ডুবিবে না এ আশাতরী', 'শেষ সওগাত, নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮২৬।
৭৭. নজরুল ইসলাম, ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাশরের ময়দানে বিচার দিবসে আল্লাহ পাকের দীদার লাভের প্রত্যাশা করে মহান আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করেছেন;

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী
সেদিন তোমার দীদার আমি
পাব কি আল্লাজী।
সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্হার -রূপ দেখে
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে ইয়া নাফ্সি ডেকে,
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ যেতে রাজি ॥[৭৮]

কাজী নজরুল ইসলাম একান্তরূপেই ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর পথে সমর্পিত চিত্ত। নজরুল ইসলাম 'আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কিছু কামনা আমার নাই।... ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ- আল্লাহ তা'লায় সেই পরম আত্মসমর্পণ কার হয়েছে? আল্লাহর প্রতি যার পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়েছে, তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন।... আমি সর্ব বন্ধনমুক্ত, সর্ব সংস্কারমুক্ত, সর্ব ভেদাভেদ মুক্ত না হলে সেই পরম নিরাবরণ, পরম মুক্ত আল্লাহকে পাব না আমার শক্তিতে।"[৭৯]

নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী কবিতা ও গান দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েছেন। কবি মানবতার শিক্ষা নিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইসলামের চিরন্তন আদর্শ থেকে। তাঁর অনেক রচনায়, ভাষণে ও অভিভাষণে এবং উক্তিতে এমনকি কবিতা ও গানেও এর স্বপক্ষে বক্তব্য রয়েছে। নজরুল ইসলাম শুধু কবি-সুলভ আবেগ এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইসলামী গজল, গান-কবিতা রচনা করেননি, জগতের ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্তর্নিহিত সমানাধিকারের বাণীতেও তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞান-ভান্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে।...সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার নিশ্চয়ই দাবী আছে-এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্মে এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য আসেনি।"[৮০]

এমনিভাবেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অসংখ্য কবিতা, ইসলামী গান, গজল ও আল্লাহ পাকের প্রশংসাসূচক 'হাম্দ' এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার গুণগান, তাঁর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর করুণার আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর ইসলামী চিন্তাধারা সম্বলিত সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য উদ্দীপনার ফসল হয়ে রয়েছে নিঃসন্দেহে। এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন রচনাশৈলীতে, তেমনি এর বিষয়বস্তুতে। বস্তুতঃ এমন মর্মস্পর্শী আত্মনিবেদিত কবিতা, ইসলামী গজল, গান ও হাম্দগুলোর কোন তুলনা নাই। এগুলোতে মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর একান্ত নির্ভরশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে। নজরুল ইসলামের লেখা 'রোজ হাশরে আল্লাহ আমায় করোনা বিচার', 'যে পেয়েছে আল্লাহর নাম' ,'অন্তরে তুমি আছো চিরদিন', 'তুমি অনেক দিলে খোদা', 'কারো ভরসা করিসনে তুই এক আল্লাহ ভরসা ছাড়া', 'মাগো আমায় শিখাইলি কেন আল্লাহর নাম, জপিলে আর হুঁশ থাকে না ভুলি সকল কাম' প্রভৃতি হাম্দগুলো যখন আমরা শুনি, তখন পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের আকুলতায় মন-প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

---

৭৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।

৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম, আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ, নজরুল রচনাসম্ভার, পৃ. ২৯১।

৮০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'স্বাধীন চিন্তার জাগরণ', নজরুল রচনাসম্ভার, পৃ. ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

২. পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা'

কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'কাব্য আমপারা' শীর্ষক পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ মুসলিম বাংলা সাহিত্যে একটি অতি মূল্যবান সংযোজন। ১৯৩৩ সালে নজরুল ইসলাম কুরআন শরীফের 'আমপারা' অংশের কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। দোভাষী বাংলায় পর 'আমপারা' তথা কুরআনুল কারীমের কাব্যানুবাদে নজরুল ইসলামই প্রথম পথিকৃৎ নন, ইতোপূর্বেও নজরুল ইসলামের পূর্বসূরীগণ কর্তৃক পবিত্র কুরআনের 'আমপারা' অংশের একাধিক কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মীর ফজলে আলী কৃত 'কোরান কণিকা' (বরিশাল, ফাল্গুন, ১৩৩৭ বাং/১৯৩১ খ্রি.), মাওলানা আবুল ফজল আবদুল করীম কৃত 'পদ্যে আমপারা' (১৯৩১ খ্রি.), মরহুম আবদুর রশীদ সিদ্দীকী কৃত 'মহা কুরআন কাব্য' (১৯২৮ খ্রি.), শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ কৃত 'কোরাণ শরিফ আমপারা' (প্রথম সংস্করণ, ১৯০৮ খ্রি., পরবর্তী নতুন সংস্করণ, ১৯২৪ খ্রি.), আমীরুদ্দীন বসুনিয়া কৃত 'আমপারার কাব্যানুবাদ', গোলাম আকবর আলী কৃত 'পয়ার ছন্দে আমপারার তরজমা' (১৮৬৮ খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নিঃসন্দেহে কলকাতার মির্জাপুর নিবাসী কবি গোলাম আকবর আলীকে পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ বলা যায়।[৮১]

রচনার প্রেক্ষাপট

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা পদ্যানুবাদ করার একটা বড় সাধ ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামের। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০/মে, ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কাব্য আমপারা' এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নজরুল ইসলাম অকপটে সে কথা স্বীকার করেছেন। 'ভূমিকা' শব্দটি তিনি অবশ্য ব্যবহার করেননি, বরং অত্যন্ত সচেতনভাবে নজরুল ইসলাম লিখেছেন আরবী-ইসলামী পরিভাষায় 'আরজ'। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ 'কাব্য আমপারা' রচনার উদ্দেশ্য ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ পটভূমির উল্লেখ করে বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র-পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা বাঙালী মুসলমানরা কেবল অন্ধ ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষা যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি। আর আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন তাহলে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্বমুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক অভিযানের সহযাত্রী করায়

---

৮১. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, "নজরুল অনূদিত কাব্যে আমপারা", (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ১০ সংকলন, বসন্ত, ১৩৯৬), পৃ. ৬২-৬৩; বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআন শরীফের গদ্যানুবাদ করেন কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০ খ্রি.), তাঁর অনূদিত 'কোরআন শরীফ-এর চতুর্থ সংস্করণে (১৯৩৬ খ্রি.) সংস্করণ-পরিচয়ে লেখা হয়েছে, "প্রথম সংস্করণ একহাজার কপি অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড শেরপুরে 'চারুযন্ত্রে 'মুদ্রিত হয়। পরবর্তী দুই খণ্ড কলকাতায় 'বিধানযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। প্রায় পাঁচ বৎসরে ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়। অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। ১৮৮১ সালে গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হলেও ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮২, ১৮৮৪, ও ১৮৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণে 'কোরান শরিফ' এর স্থলে 'কোরআন শরীফ' বানানের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। যাহোক, অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের উপদেশানুসারে সর্বসাধারণের হিতার্থে কুরআন শরীফ বা তার অংশ-বিশেষের কাব্যানুবাদের মধ্যে কিরণ গোপাল সিংহের 'কোরান-শরিফ আমপারা' পদ্যানুবাদ পয়ার ছন্দে কৃত। অনূদিত সূরার সংখ্যা ৩৮ এবং সমস্ত সূরার প্রথমে 'দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি' আছে। কয়েকটি সূরার অনুবাদ দীর্ঘ হলেও মোটামুটিভাবে তা প্রাঞ্জলই বটে। দ্রঃ ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত-মানস, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দারিত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।" [৮২]

সমগ্র কুরআন শরীফের বাংলা পদ্যানুবাদ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমপারা ব্যতীত অন্য কোন অংশের অনুবাদ করে উঠতে পারেননি। ইসলামী চিন্তা-ধারাসম্পন্ন কবি কাজী নজরুল ইসলামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পবিত্র কুরআন শরীফ যদি সহজ-সরল ও সাবলীল বাংলা ভাষায় পদ্যানুবাদ হয়, তবে তা মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েসহ অধিকাংশ মুসলমানই সহজভাবে কণ্ঠস্থ করে ফেলতে পারবে। এ লক্ষ্যেই তিনি যতদূর সম্ভব স্বল্প শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য সরল বাংলা পদ্যে আরবী থেকে অনুবাদ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কবির অনুবাদ কর্মটি আক্ষরিক কিন্তু শব্দ ব্যবহারে, ছন্দে ধ্বনিতে তা কাব্য সৌন্দর্য লাভ করেছে। যদিও কুরআনুল কারীমের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতার ছন্দে সঠিক অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং কবি একদিকে কুরআন শরীফের আক্ষরিক অনুবাদের মত দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, অন্যদিকে তা শিল্প সার্থকতাও লাভ করেছে। [৮৩]

নজরুল ইসলাম 'কাব্য আমপারা' এর অনুবাদের জন্য যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন তন্মধ্যে রয়েছে আরবী, ফারসী ভাষার বহু তাফসীর এবং অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাদি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল ইসলাম পবিত্র কুরআনের কাব্যানুবাদ করার জন্য কি পরিমাণ প্রচন্ড পরিশ্রম করেছিলেন এবং বহু বৎসর জ্ঞান সাধনার পর আল্লাহ পাকের অপার রহমতে অন্ততঃ পড়ে বুঝবার মত আরবী ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে নিজেকে যোগ্য করে তুলেছিলেন। প্রয়োজনীয় আরবী, ফারসী গ্রন্থ ছাড়াও তিনি আল-কুরআনের 'আমপারা' অংশের পদ্যানুবাদ করার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন বাংলা, ইংরেজী গ্রন্থও। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়:

"আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি নীচে তার তালিকা দিলাম:

Sale's Quran, Moulana Ali's Quran, Tofsir-i- Hosainy, Tofsir-i- Baizabi, Tofsir-i-Kabir, Tofsir-i-Azizi, Tofsir-i-Moulana Abdul Haque Dehlavi, Tofsir-i-Jalalain etc. এবং মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আমপারা।" [৮৪]

প্রকাশের পটভূমি

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন যে, মেসার্স করিম বক্স ব্রাদার্সের স্বত্ত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় তিনি 'আমপারা' শরীফ অনুবাদ করতে পেরেছেন। কলকাতার 'করিম বক্স ব্রাদার্স' এর অন্যতম মালিক ও প্রধান পরিচালক মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবই কাজী নজরুল ইসলামের পবিত্র কুরআন শরীফের কাব্যানুবাদ গ্রন্থ 'কাব্য আমপারা' প্রকাশ করেছিলেন। [৮৫] তবে ছাপার আগে তিনি তার মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ বাড়ীতে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রধান প্রধান মোদাররেস এবং কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদেরকে এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করে দেখতে কবির সাথে এক জলসায় বসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের সব

---

৮২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, 'আয়জ', পৃ. ২৮৫।

৮৩. মনোয়ারা হোসেন, নজরুলের কাব্য আমপারা, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০৭/ ফেব্রুয়ারী, ২০০১), পৃ. ১১-১২।

৮৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড,'আয়জ', পৃ. ২৮৬।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য তাফসীরসহ আরবী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের বিভিন্ন অনুবাদ দেখে 'কাব্য আমপারা' এর পান্ডুলিপি অনুমোদন ও বিবেচনার কাজে বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মেসার্স করিম বক্স ব্রাদার্সের স্বত্ত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের সুযোগ্য পুত্র বেঙ্গল কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মৌলভী রেজাউর রহমান খান (এম. এ.; বি. এল), কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার আরবী ভাষার প্রধান মোদাররেস মাওলানা মোহাম্মদ মোমতাজউদ্দীন ফখরুল মোহাদ্দেসীন, মাওলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাবনবী), আবদুল মজিদ রেজাউর রহমান খান, মিঃ ইসকান্দার গজনভী (বি.এ.), মৌলবী কে. এম. হেলাল সহ সেই সময়কার বিখ্যাত আলেম ও ওলামায়ে কিরাম, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও জানা-অজানা বহু লোক।[৮৬] সেই অধিবেশনে অন্যতম অংশগ্রহণকারী জনাব মাহফুজুর রহমান খান 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র ৫ম বর্ষ, গ্রীষ্ম, ১৩৮০, বিশেষ নজরুল জয়ন্তী সংখ্যায় 'নজরুলের কাব্য আমপারার অন্তরালে' শীর্ষক স্মৃতিকথায় কাব্য আমপারার প্রকাশ ইতিহাসে লিখেছেন;

"প্রকান্ড কক্ষে পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি টেবিল সজ্জিত। টেবিলের দুই দিকে চেয়ার। প্রত্যেক চেয়ারের বরাবর টেবিলের উপর একখানা করিয়া বিভিন্ন ভাষার আমপারা বা কুরআনের অনুবাদ সুরক্ষিত।... আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের বহু দুস্প্রাপ্য তরজমা সমাবেশ। যথাঃ তফ্‌সীরে জালালাইন, তফ্‌সীরে কাশ্‌শাফী, তফ্‌সীরে বয়জাবী, তফ্‌সীরে কবীর, তফ্‌সীরে হাক্কানী, তফ্‌সীরে হুসাইনী, তফ্‌সীরে আশ্‌রাফী । ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, আল্লামা ইউসুফ আলী, মার্মাডিউক পিকথল, পামার, আরভিং ও সেল্ প্রমুখের কুরআন। বাংলা ভাষায় মাওলানা আকরম খাঁর আমপারা, মাওলানা রুহুল আমীনের আমপারা, ভাই গিরীশ চন্দ্রের আমপারা, জনাব আব্বাস আলীর আমপারা ও জনাব আবদুল করিম সাহেবের আমপারা।"[৮৭]

পান্ডুলিপি সংশোধন

নজরুল ইসলাম অনূদিত 'কাব্য আমপারা'য় প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ, অনুবাদ প্রভৃতি সঠিক ও যথার্থ হয়েছে কিনা সে সব বিবেচনার জন্য মোট বার দিনে বারটি অধিবেশন বসেছিল। সে সময় সকলের অনুরোধে কবি নজরুল ইসলাম স্বরচিত ইসলামী গানও পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেক সূরার বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদের সাথে যাচাই করে কাব্য আমপারার প্রত্যেকটি পান্ডুলিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধনী বৈঠকে সকলের অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য আমপারার পান্ডুলিপির কিছু শব্দের পরিবর্তনও করেছেন। কাব্য আমপারার পটভূমি হিসেবে এ সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মাহফুজুর রহমান খান তাঁর স্মৃতিকথায়, যাতে সংশোধনী বৈঠকে প্রদত্ত নজরুল ইসলামের বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল;

"কবি আমপারার বংগানুবাদ নিয়া আলোচনার প্রারম্ভেই ভূমিকাস্বরূপ উপস্থিত সবাইকে সম্বোধনপূর্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, "হাজিরানে মজলিস! আরবী ভাষা আমাদের মাতৃজবান নয়। অথচ আরবী ভাষার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের মহাবাণী ধরায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআন শরীফের অন্যতম প্রধান অংশই আমপারা। কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন তফ্‌সীরে দেখা যায়, তফ্‌সীরকারকগণ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুবাদ করেছেন। কেউ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, কেউ দার্শনিক ভিত্তিতে, কেউ ধর্মীয় ভিত্তিতে, কেউ সাহিত্যিক ভিত্তিতে। অবশ্য সকলেই মূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

---

৮৬. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম , ইসলামী কবিতা, 'কাব্য আমপারা প্রকাশ ইতিহাস' (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮২/ ৩য় প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪০৪/জুন, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৩-১৩৯।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমার অনুবাদেও আমি মূলের দিকে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রেখে হাত দিয়েছি, অনুবাদ যাতে সর্বজনগ্রাহ্য, সুন্দর, স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়-এটাই কাম্য। ... আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমার এই প্রচেষ্টায় আরবী শব্দের ব্যতিক্রম ঘটছে কি না। অনুবাদ ঠিকমত হয়ে গেলে তাকে বাংলা কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে কোন অসুবিধে নেই।"[৮৮]

আরবী অনেক শব্দ বিভিন্ন অর্থবোধক। প্রয়োগভেদে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এছাড়া বাংলা কবিতায় একই অর্থে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। কাব্যের রচনাশৈলীর একটি বিশেষ রীতি আছে, এর প্রতিও নজরুল ইসলামকে সজাগ থাকতে হয়েছে। তা না হলে কাব্যের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। সীমিত কাঠামোর মধ্যে নজরুল ইসলামকে অগ্রসর হ'তে হয়েছে এখানে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম জলসায় উপস্থিত সকলের প্রতি একান্ত আরজ পেশ করে বলেছেন, "বিভিন্ন ভাষাবিদ পন্ডিত ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আপনারা।...আপনাদের পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে আরবী ভাষার বাংলা অনুবাদ আমার 'কাব্য আমপারা'র যেখানে যেখানে আপনারা সংশোধন করার দরকার বলে সর্বসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি আনন্দের সংগে নিশ্চয়ই মেনে নেব। উদ্দেশ্য আমাদের সকলেরই মহৎ।" [৮৯]

নজরুল ইসলামের এহেন নির্ভীক অথচ সরলতাপূর্ণ যুক্তিযুক্ত বক্তব্য শুনে জলসায় উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম ও সাহিত্যরস পিপাসু লেখক-বুদ্ধিজীবি সকলেই বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর কাব্যানুবাদ

কাজী নজরুল ইসলাম পবিত্র কুরআনের মোট ৩৮ টি সূরার কাব্যানুবাদ করেছেন। এ ৩৮ টি সূরার প্রত্যেকটির শিরোভাগে অবস্থিত মূল আরবী বাক্য আয়াতে কারীমা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ "পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে"- কে এত বিচিত্রভাবে মাত্র দুই পংক্তিতে কাব্যানুবাদ করেছেন যে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।[৯০]

মূলের প্রতি আনুগত্য শিথিল না করেও যে কতখানি সাবলীল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করা যেতে পারে তা 'কাব্য আমপারা'র 'বিসমিল্লাহ'-এর অনুবাদের প্রতি লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নজরুল ইসলাম বিভিন্নভাবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর কাব্যানুবাদ করলেও কথাটির উদ্দেশ্য ও অর্থ কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। অনুবাদ বিষয়ের যথার্থ অর্থের গভীরতা উপলব্ধি ব্যতিরেকে যে এ ধরনের অনুবাদ সম্ভবপর নয় তা বলাই বাহুল্য। কাব্য আমপারায় বিধৃত বিভিন্ন সূরার জন্য ইসলাম ধর্মের মূলকথা ও সমগ্র কুরআনের উত্তমাংশ কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর কাব্যময় বৈচিত্রপূর্ণ কয়েকটি অনুবাদ চয়ন করা যেতে পারে।

কবির ভাষায়:

১. শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।[৯১]

২. শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার ।[৯২]

---

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৯০. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, 'অনুবাদ সাহিত্যে নজরুল', নজরুল সমীক্ষা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: নজরুল গবেষণাকেন্দ্র, ১৯৯২), পৃ. ১২৯-১৩০।

৯১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাব্য আমপারা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সূরা ফাতেহা, পৃ. ২৮৯।

৯২. 'কাব্য আমপারা', সূরা ইখলাস, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শুরু করিলাম নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার। [৯৩]

৪. শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার। [৯৪]

৫. আরম্ভ করি ল'য়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার। [৯৫]

৬. শুরু করিলাম পুত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার। [৯৬]

৭. শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার,
করুণা দয়ার যার নাই শেষ পার। [৯৭]

৮. শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার
রহীম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার। [৯৮]

৯. শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার
করুণা নিধান যিনি কৃপা পারাবার। [৯৯]

১০. শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার। [১০০]

১১. শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার,
করুণা আধার যিনি কৃপা-পারাবার। [১০১]

১২. শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
নাহি আদি নাহি অন্ত যার করুণার। [১০২]

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে প্রতিভাত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর নানা রকম সার্থক সুন্দর কাব্যানুবাদে কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণ অনুবাদ ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মূল ভাব থেকে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট না হয়েও অনুবাদগুলো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পেরেছে নিঃসন্দেহে।

সূরা আল ফাতিহা

'সূরা আল-ফাতিহা' سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ হচ্ছে সমগ্র কুরআনের মূল ও নির্যাস। এই সূরার মাধ্যমে মানবজীবনের চিরন্তন সকল সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এতে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী বিধৃত হয়েছে এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মূল সারাংশ ও মর্মকথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অথচ বাকভঙ্গীর সরল মাধুর্যে এই সূরা 'আল-ফাতিহা' সমগ্র কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ। এজন্য এই সূরাটি উম্মুল কিতাব أُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআনের জননী

---

৯৩. 'কাব্য আমপারা', সূরা লহব, পৃ. ২৯১।
৯৪. 'কাব্য আমপারা', সূরা নসর, পৃ. ২৯১।
৯৫. 'কাব্য আমপারা', সূরা কাফেরুন, পৃ. ২৯২।
৯৬. 'কাব্য আমপারা', সূরা কাওসার, পৃ. ২৯২।
৯৭. 'কাব্য আমপারা', সূরা মাউন, পৃ. ২৯৩।
৯৮. 'কাব্য আমপারা', সূরা কোরায়শ, পৃ. ২৯৩।
৯৯. 'কাব্য আমপারা', সূরা ফীল, পৃ. ২৯৪।
১০০. 'কাব্য আমপারা', সূরা হুমাজাত, পৃ.২৯৪।
১০১. 'কাব্য আমপারা', সূরা আসর, পৃ. ২৯৫।
১০২. 'কাব্য আমপারা', সূরা তাকসুর, পৃ.২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

বলে অভিহিত হয়েছে। এই সূরা সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "ফাতেহা-উদঘাটিকা। এই 'সূরা' দিয়াই পবিত্র কোরআন শরীফের আরম্ভ। এই জন্য এই সূরার নাম "ফাতেহা"। ইহা কোরআনের শেষ খন্ড আমপারায় নাই, ইহা কোরআন শরীফের প্রথম খন্ডের প্রথম "সূরা"। নামাজ, বন্দেগী, প্রার্থনা, প্রভৃতি সকল পবিত্র কাজেই সূরা ফাতেহার প্রয়োজন হয় বলিয়া আমপারার সঙ্গে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল।"[১০৩] কবির ভাষায়:

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।[১০৪]

সূরা আল-ফাতিহার অনুবাদে কবি নজরুল ইসলাম অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। সঠিক অনুবাদ হয়েও এটিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। মূলের প্রতি আনুগত্য অটল রেখেও সূরা আল-ফাতিহার এরূপ যে ভাষান্তরিত করা চলে তা শুধু কাজী নজরুল ইসলামের তরজমা পড়েই প্রকৃত উপলব্ধি করা সম্ভব।

কুরআনুল কারীমের সূরা আল-ফাতিহার প্রথম বাক্যটি 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ' اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা প্রশংসার স্থলে তিনি 'মহিমা' আরোপ করেছেন। এরপর নজরুল ইসলাম আল্লাহর সিফাত পরম করুণাময় অতি দয়ালুর জায়গায় অপরিসীম করুণা কৃপার উল্লেখ করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমা পরিস্ফুট হয়েছে। যা কবির ঐকান্তিক নিবেদিত চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। অর্থ বিকৃত না করেও শাব্দিক ব্যবহারে নজরুল ইসলাম দারুণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[১০৫]

নজরুল ইসলামের এই আক্ষরিক অনুবাদ যে কতখানি সার্থক ও সুন্দর হয়েছে, সে সম্পর্কে ভাষাবিদ বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই মন্তব্য করা সম্ভব। কিন্তু এ কাজটা যে খুব দুরূহ, তা যে কোন সুধী ব্যক্তিই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবেন। নজরুল ইসলাম স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়: "আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়।"[১০৬]

এহেন সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর নজরুল ইসলামের কাব্যানুবাদে সর্বত্র একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতি আশা করলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।

সূরা আল-নাস

পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ 'সূরা আল-নাস' سُوْرَةُ النَّاسِ অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে ভাব ও ভাষার এর কাব্যানুবাদ করে কবি নজরুল ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার ভঙ্গীতে লিখেছেন;

---

১০৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাব্য আমপারা', শানে-নুযুল, পৃ. ৩২৭।

১০৪. 'কাব্য আমপারা', সূরা ফাতেহা, পৃ. ২৮৯।

১০৫. নওয়ারা হোসেন, নজরুলের 'কাব্য আমপারা', পৃ. ১৫।

১০৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাব্য-আমপারা', 'আরজ', পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে, ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণা দানকারী 'খান্নাস' শয়তান,
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।[১০৭]

কাজী নজরুল ইসলাম 'সূরা আল-নাস' এর প্রথম তিনটি বাক্য সম্প্রসারণ করে 'মানুষের অধিপতি' এবং 'মানুষের ইলাহ' এর স্থানে 'রাজ-অধিরাজ-যিনি ত্রিভবন মাঝে সবার উপাস্য' লিখেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন; অন্যদিকে এতে সৌন্দর্যের দীপ্তি আনয়ন করেছেন। পরিশেষে কবি এ সূরার কাব্যানুবাদে কুমন্ত্রণাদাতার সাথে 'খান্নাস শয়তান' এর উল্লেখ করেন এবং জিন বা মানুষের স্থলে 'মানব-দানব' বলে অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন।[১০৮]

সূরা আল-ইখ্‌লাস

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা সম্বলিত 'সূরা আল-ইখ্‌লাস' سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ এ অংশীবাদী ও পৌত্তলিকদের মতবাদকে খন্ডন করা হয়েছে। অনুবাদক কবি নজরুল ইসলামের লেখনীতে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত মহান আল্লাহর একত্ববাদের বাণী সরল, সুন্দর ও অত্যন্ত প্রাঞ্জল বর্ণনায় চমৎকারভাবে 'কাব্য আমপারা' তে অনূদিত হয়েছে। কবির ভাষায়:

বল আল্লাহ এক! প্রভু ইচ্ছাময়
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর ।[১০৯]

কবি নজরুল ইসলাম 'সূরা আল-ইখ্‌লাসের' প্রথম চরণে 'প্রভু ইচ্ছাময়' শব্দ দুটি অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। এরপর মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রসঙ্গটি বর্জন করে 'নিষ্কাম নিরপেক্ষ অন্য কেহ নয়' অনুবাদ করেছেন। নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'সামাদ' অর্থ যিনি পান, আহার করেন না। কবি এই শব্দটির অন্যান্য অর্থের উল্লেখ করেছেন: অভাব রহিত, শ্রেষ্ঠতম অনাদি, নিষ্কাম, অনন্ত প্রভৃতি। আল্লাহ যে কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলে তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী এই সূরায় তাই বলা হয়েছে।[১১০]

সূরা আল-নাসর

আল-কুরআন আল-কারীমের 'সূরা আল-নাসর' سُوْرَةُ النَّصْرِ এ বর্ণিত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যে ইসলাম ধর্মের বিজয় অর্জন সম্পর্কিত বিষয়টিকে কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যানুবাদ করে লিখেছেন;

আসিয়াছে আল্লাহর শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে-আল্লাহর ধর্মে এ জগতময়

---

১০৭. কাব্য আমপারা, সূরা নাস, পৃ. ২৮৯।

১০৮. মানোয়ারা হোসেন, নজরুলের কাব্য আমপারা, পৃ. ১৭।

১০৯. 'কাব্য আমপারা', সূরা ইখলাস, পৃ. ২৯০।

১১০. মনোয়ারা হোসেন, নজরুলের 'কাব্য আমপারা', পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ
এ যে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
কর ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচঞা সঠিক।[১১১]

নজরুল ইসলাম 'সূরা আল-নাসর' এর আক্ষরিক অনুবাদে দু'একটি বিশেষণ যুক্ত করেছেন। যেমন- প্রথম চরণে শুধু 'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নয়' লিখেছেন 'শুভ সাহায্য বিজয়'। এতদ্ব্যতীত প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার স্থলে তিনি কেবল 'প্রশংসা' প্রচারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞ অন্তরে শব্দ দু'টি সংযুক্ত করায় তা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ হয়েছে।[১১২]

সূরা আল-কাওসার

কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে 'সূরা আল-কাওসার' سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ এর কাব্যানুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদটি আক্ষরিক তবে নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলোর শুরুতে তিনি কাওসার শব্দটির বাংলা অর্থ অনন্ত কল্যাণ ব্যবহার করেছেন;

অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়,
অতএব, তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড় ও দাও কোরবানী তাঁরেই
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।[১১৩]

সূরা আল-কাদর

আল্লাহর কালাম 'আল-কুরআন' রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণ সূত্রে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "কোন কথা প্রসঙ্গে এক সময় হজরত উল্লেখ করেন যে, ইসরাইল বংশীয় হজরত সমউন সহস্র মাস কাল দিবসে রোজা রাখিতেন ও জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতেন আর রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার আসহাবগণ বলিলেন-সাধারণতঃ আমরা ৬০/৭০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি। তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়, কতকাংশ পীড়িত ও শৈথিল্যাবস্থায় এবং কতকাংশ জীবিকা সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয়। অবশিষ্টাংশে আমরা কতটুক সৎকাজ করিতে সক্ষম হইব। উহাতে হজরত দুঃখিত হন। তখন এই সূরা নাজেল হয়।"[১১৪]

কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান এ কারণেই একে 'লাইলাতুল কদর' অর্থৎ মহিমান্বিত রজনী বলা হয়। নজরুল ইসলাম অনূদিত 'সূরা আল-কাদর' سُوْرَةُ الْقَدْرِ এ আল্লাহ তা'আলার সুমহান বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে;

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরআন পুণ্য 'শবে কদরে',
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে ? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,

---

১১১. 'কাব্য আমপারা', সূরা নসর, পৃ. ২৯১।

১১২. মনোয়ারা হোসেন, নজরুলের 'কাব্য আমপারা', পৃ. ২৩।

১১৩. 'কাব্য আমপারা', সূরা কাওসার, পৃ. ২৯২।

১১৪. 'কাব্য আমপারা', সূরা কদর', শানে নুজুল, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিব্‌রাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরনী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।[১১৫]

সূরা আল-'আলাক

৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে সর্বপ্রথম অহী নাযিল হয়। হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে এক রজনীতে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট 'সূরা আল-'আলাক' سُوْرَةُ الْعَلَقِ এর প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। কবি নজরুল ইসলামের কাব্যানুবাদ হতে সূরা আল-'আলাকের প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল;

পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে , স্রষ্টা যে জন
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।
পাঠ কর, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
- সে জানিত না যাহা,
মানুষেরে তিনি দি'ছেন শিক্ষা তাহা ।...[১১৬]

'সূরা আল-আলাক' এর মূল বিষয় হচ্ছে এই সূরায় মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মানব সৃষ্টির পর তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়। নজরুল ইসলাম এই সূরাটির শানে নুযূলে উল্লেখ করেছেন যে, "মক্কার অদূরে হেরা গুহায় হজরত ইবাদতে মশগুল হইতেন। জিব্রাইল হজরতের নিকট সর্ব প্রথম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন-"আপনি পাঠ করুন! হযরত বলিলেন, 'আমি নিরক্ষর এবং পাঠ করিতে সক্ষম নহি।' এই রূপ তিন প্রশ্নোত্তরের পর জিব্রাইল বলিলেন- 'আপনি সেই মহান খোদার নামে পাঠ করুন' ইত্যাদি। (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)।" [১১৭]

এই সূরা আল-আলাকের কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম ধ্বনি সচেতনতা ও ছন্দবোধের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সূরার শুরুতে 'প্রতিপালকের স্থলে 'প্রভু'; 'আলাক', এর স্থলে 'ঘন শোণিত', শব্দটি সংযুক্ত হয়ে একটি ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। এরপর কলমের পরিবর্তে 'লেখনী' শব্দ প্রয়োগও অত্যন্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক হয়েছে নিঃসন্দেহে।[১১৮]

শানে নুযূল

কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'কাব্য আমপারা'য় পবিত্র কুরআনের 'সূরা আল-ফাতিহা' থেকে নিয়ে 'সূরা আল-নাবা' পর্যন্ত যথাক্রমে মোট ৩৮ টি সূরা স্থান লাভ করেছে। 'আরজ' (ভূমিকা), 'খোলাসা' (সূচিপত্র) ও সূরার কাব্যানুবাদের পর শেষাংশে প্রতিটি সূরার পৃথক পৃথক 'শানে নুযূল' বা অবতরণ-উপলক্ষ খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের একজন মুমিন অনুবাদকই নন, বরং কিছুটা ভাষ্যকার ও টীকাকারের ভূমিকাও তিনি নিঃসংকোচে ও নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেছেন। নজরুল ইসলাম তাঁর এই 'কাব্য আমপারা'র ভূমিকাংশ 'আরজ'-এর শেষে ইতি না লিখে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'খাদেমুল ইসলাম'[১১৯]

---

১১৫. 'কাব্য আমপারা', সূরা কদর, পৃ. ২৯৯।

১১৬. 'কাব্য আমপারা', সূরা আলাক, পৃ. ২৯৯-৩০০।

১১৭. 'কাব্য আমপারা', সূরা আলাক', শানে নুজুল, পৃ. ৩৩৫।

১১৮. মনোয়ারা হোসেন, নজরুলের 'কাব্য আমপারা', পৃ. ৫০।

১১৯. 'কাব্য আমপারা', আরজ, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

(ইসলামের সেবক) বলে। আর এটাকে তিনি এক বাক্যে উৎসর্গ করেন- "বাঙলার নায়েবে-নবী মৌলবী সাহেবানদের দস্ত-মোবারকে-"[১২০]

উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'কাব্য আমপারা' এর পরিশিষ্টে শানে নুযূলের মত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টিকে সাধ্যানুসারে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। এহেন শানে নুযূলগুলো অতি সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার জন্য বোধগম্য। 'শানে-নুযূল' লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম আমপারার প্রত্যেক সূরার নাম, একাধিক নাম থাকলে তার উল্লেখ, সূরাগুলো নাযিল হওয়ার স্থান অর্থাৎ মাক্কী না মাদানী, প্রত্যেকটি সূরার সর্বমোট আয়াত, রুকু', শব্দ এমনকি প্রতিটি সূরার অক্ষর বা বর্ণ পর্যন্তও সঠিকভাবে গণনা করে বিস্তারিত তথ্যের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে 'শানে নুযূল' অংশে নজরুল ইসলাম সূরাগুলোর পরিচয়সূত্রে যে টীকা দিয়েছেন তাতে তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও জিজ্ঞাসু মনের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কাব্যানুবাদ ও শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল মূল আরবী ও উর্দু গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন সেগুলোর নাম ও তিনি বিবরণের শেষে বন্ধনীর মাঝে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন- ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম রাজী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে কাশ্শাফ, তাফসীরে বায়জাবী, সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম শরীফ, তাফসীরে আযিযী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে হাক্কানী, হুসাইনী ও মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের তাফসীরুল কুরআন প্রভৃতি।[১২১]

সুতরাং পবিত্র কুরআন মজীদের 'আমপারা' অংশের কাব্যানুবাদে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', সূরা আল-ফাতিহাসহ নজরুল ইসলাম অনূদিত কাব্য আমপারার বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূরার অনুবাদ উদ্ধৃত করে আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস চালিয়েছি যে নজরুল ইসলামের অনুবাদ আক্ষরিক অথচ কাব্য মাধুর্যমুক্ত নিঃসন্দেহে। যদিও অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে কবি শিল্পের দিকে সদা সচেতন হতে পারেননি। তথাপি সার্বিক বিবেচনায় নজরুল ইসলামের কিছু অনুবাদ মূলতঃ শেষের দিকে পূর্ণাঙ্গ শিল্পসম্মত না হলেও অধিকাংশ সূরাই সার্থকতার দাবীদার। কুরআনুল কারীমের গাম্ভীর্যপূর্ণ, মানব জীবনের করণীয় উপদেশ সম্পর্কিত যে পর্যালোচনা রয়েছে তা ভাবানুবাদ করা যায়, কিন্তু শিল্পিতভাবে আক্ষরিক অনুবাদ বিশেষতঃ কুরআন শরীফের মত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের কাব্যরূপ দেয়া ততটা সহজ ব্যাপার নয়। বলাবাহুল্য যে, এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধর্মীয় দিকটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রক্ষা করতে গিয়ে যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করতে দারুণভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। এতে ধর্মীয় দিক কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। উপরন্তু নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারা কাব্যে সঞ্চারিত হয়ে এর ধর্মীয় মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কবির কাব্যবোধের অত্যন্ত চমৎকার স্বাক্ষর পাওয়া গেছে।

---

১২০. 'কাব্য আমপারা', উৎসর্গ, পৃ. ২৮৮।

১২১. 'কাব্য আমপারা', শানে নুজুল, পৃ. ৩২৭-৩৪০।।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক 'না'ত' ও 'মরু-ভাস্কর'

১. না'ত-ই-রাসূল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আদর্শ জীবন-চরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম অসংখ্য কবিতা ও ইসলামী গান বিশেষতঃ নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক না'ত রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালবাসা, হৃদয়ের আর্তি ও পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে কবি নজরুল ইসলামের না'ত-ই-রাসূল রচনায়। এসব ইসলামী কবিতা, গান ও না'ত নবী প্রেমিক কবি-মনের এক অনুপম ভক্তিরস স্নাত আলেখ্য।

নজরুল ইসলামের পূর্বে দু'একজন মরমী কবি না'ত রচনা করলেও রূপগত এবং গুণগত দিক দিয়ে এতটা সাফল্য অর্জন করেননি। কিন্তু নজরুল ইসলাম না'ত সাহিত্যে এক নতুন উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি অভিনব রূপ-বৈচিত্র্যে, সুর-ছন্দে হিল্লোলিত করে সমগ্র বাঙালী মুসলিম চিত্তকে স্পন্দিত করে মহা বিপ্লবাত্মক অবদান রাখতে সক্ষম হন।[১২২]

ইসলামে যেমন এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আবশ্যক, তেমনি রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও অবশ্যই প্রয়োজন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন তাঁর সৃষ্ট জীবজগতের অনন্ত প্রশংসার হকদার তেমনি তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠও মুমিন মুসলমানদের একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে তাই তাঁর রাসূলে করীম (সা.) এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দরুদ পাঠের জন্য আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন :[১২৩] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুলাহ (সা.) এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম চরিত্রের আদর্শ।"

সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম এ কাজটি অত্যন্ত যোগ্যতা ও সৃষ্টি কুশলতার সাথে সুসম্পন্ন করেছেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাওহীদের শিক্ষার আলোকে মানব সমাজে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশিত পথই মানুষের মুক্তির পথ, নবীজির মানবতাবোধই মানব জাতির আদর্শ; একথাই কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক ও মহিমা প্রচারক না'ত, ইসলামী গান ও কবিতায় নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এতদ্ব্যতীত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বিভিন্নরূপে কল্পনা করেছেন। কখনও তিনি নবী করীম (সা:) কে কল্পনা করেছেন সাকী রূপে,-যিনি দুনিয়ার মানুষকে তাওহীদের সুরা পরিবেশন করেছেন। কখনো নবীজিকে কল্পনা করেছেন জগতের সকল পাপী-তাপীদের প্রেমিকরূপে, আবার কখনো ধনী-দরিদ্র সব মানুষের মুক্তিদাতারূপে এবং এরূপ ভেবেই অকুণ্ঠচিত্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম, মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তণ করেছেন।

আবার কখনো মহানবী (সা.) এর জননীরূপে পৃথিবীকে কল্পনা করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা.)কে কল্পনা করেছেন মানবতার মূর্ত প্রতীকরূপে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। নজরুল ইসলাম বিভিন্নভাবে মহানবী (সা.) এর কল্পচিত্র এঁকেছেন, কিন্তু কবি হৃদয়ের পরিতৃপ্তি যেন পূর্ণতা পাচ্ছেনা।

---

১২২. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, পৃ. ১৬৫।

১২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব: ৩৩, আয়াত: ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাই নজরুল ইসলাম বিরচিত নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক না'ত, গান ও কবিতা এত রসসমৃদ্ধ হতে পেরেছে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে এরূপ ভক্তিপূর্ণ না'তিয়া আর কেউ রচনা করতে পারেনি। বাঙালী মুসলমানগণ এসব না'ত শুনে কেবল নির্মল আনন্দই লাভ করেনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যও বলীয়ান হয়েছে।[১২৪]

নজরুল ইসলামের ইসলামী গানের মধ্যে নবী-রাসূল প্রশস্তিমূলক না'তের সংখ্যাই বেশী। নজরুল ইসলাম বিরচিত না'তগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে মহানবী (সা.) এর জীবন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। নজরুল ইসলাম 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত তথা একখানি সীরাতুন্নবী রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত লেখার পর কবি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৫০ সালে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই প্রকাশিত হয়। তথাপি নজরুল ইসলামের নবী-প্রশস্তির চূড়া স্পর্শ করেছে তাঁর রচিত শতাধিক না'ত-ই-রাসূল-এ। এর প্রত্যেকটি এক একটি হীরক খণ্ড। কয়েক শ' বছর ধরে লেখা হলেও বাংলা কাব্যে না'ত-ই-রাসূলে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় নজরুল ইসলাম যে বিশেষ আঙ্গিক ও মাধুর্যের সৃষ্টি করেছেন আর কারো দ্বারা তা সম্ভবপর হয়নি। না'ত রচনায় এক অনুপম মাত্রার সংযোগ করে ইসলামী সাহিত্যকে নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের আবশ্যিক অংশ করে তুলেছেন। এটি নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি কবির অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জগতের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রাণাধিক প্রিয়। মানবতার মুক্তিদূত এই মহাপুরুষ কবি নজরুল ইসলামেরও অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে নজরুল ইসলাম যেমন বহু কবিতা ও ইসলামী গান রচনা করেছেন, তেমনি নবী করীম (সা.) এর প্রশস্তিমূলক বহু না'ত-ই-রাসূল রচনা করেছেন। বিশ্বনবী (সা.) এর প্রতি এক অনাবিল ভক্তি ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত আনন্দ-উল্লাস এসব রচনার উপজীব্য।

আবির্ভাব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আবির্ভাবে দুনিয়ার সকলেরই মন-প্রাণ আনন্দে ভরপুর, খুশীতে বাগবাগ। আবির্ভাব প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ইসলামী সঙ্গীতে শিশু নবীকে 'শিশু ইসলাম' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শুভাগমনে আনন্দ-উল্লাসে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণায় সর্বত্রই আলোড়ন ছন্দ-দোলা ছাপানো অভিব্যক্তির ভাবলোকের মনোরম পরিবেশ বর্ণনা করে কবি গাইলেনঃ

ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয় ॥
ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ;
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায় ॥
দেখ্ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইস্‌লাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায় ॥[১২৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনে জড়-চেতন সব কিছুর মধ্যেই আজ চরম পাওয়ার পরম আনন্দের উল্লাস। কবি নজরুল ইসলামও এ আনন্দ উল্লাসের সাথে তাল মিলিয়ে যে অপূর্ব না'ত-ই-

---

১২৪. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, পৃ. ৫৫।

১২৫. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতি অখণ্ড, পৃ.২২৭; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'না'ত' , পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল রচনা করেছেন তার শেষ চরণগুলোর অন্ত্যমিলে আরবী শব্দ যোজনায় অভিনবত্ব মানুষের হৃদয় মনকে মুহূর্তেই বিস্ময়াভিভূত করে তোলে যেমন-

নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে ও নাম
'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম';
জীন-পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায় ॥ [১২৬]

নামের মাহাত্ম্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ও মাতা আমিনা খাতুনের দেওয়া নাম যথাক্রমে 'মুহাম্মদ' ও 'আহমাদ' কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছেন। বিচিত্রভাবে ঐশ্বর্যে মহান দু'টি নাম প্রতীর্তিত হয়েছে কবির অসংখ্য কবিতা ও ইসলামী গজল-গানে। যার কোন কোনটিতে সূফীতত্ত্ব ও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সব কিছু ছাপিয়ে মহানবী হযরত মুস্তফা (সা.) এর নামের মাহাত্ম্যই এখানে মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহমদ বোল্
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সিতারা আস্‌মানে খায় দোল ॥
পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা, ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসীন্ উষার রাঙে রে কপোল ॥
যে নাম গেয়ে ধায়রে নদী, যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নাম বহে নিরবধি পবন-হিল্লোল ॥
যে নাম বাজে মরু সাহারায়, যে নাম বাজে শ্রাবণ-ধারায়,
যে নাম চাহে কা'বার মস্‌জিদ, মা আমিনায় কোল॥ [১২৭]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নামের ঐ মাহাত্ম্য কেবল সাধকরাই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। বিচিত্র অনুভবের ভক্তিরস ও চিত্তের নিবেদনের সুর এই ইসলামী সঙ্গীত তথা না'ত-ই-রাসূল' কে অসামান্যতা দান করেছে। রাসূলে করীম (সা.) এর নামের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, গৌরব-মহিমা এমনভাবে বাংলা না'ত-ই-রাসূলে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। নবী প্রেমিক কবি নজরুল ইসলাম তাই দিওয়ানা হয়ে মুর্শিদের নাম ধরে গাইলেনঃ

তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লার পথে,
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লৌহ আরশ-ধাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥ [১২৮]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে একাধারে কবিতা, ইসলামী সঙ্গীতে গানের পাখী বুলবুলি হিসেবে দেখা, অনুগামীদের ভ্রমর কল্পনা করার পাশাপাশি 'সাহারার দগ্ধ বুকে' গুলিস্তান রচনার চমকপ্রদ চিত্রকল্প এবং অতুলনীয় সজীবতা ও স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে। এ ছাড়াও নবী করীম (সা.) এর কদম

১২৬. প্রাগুক্ত।
১২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকারঃ দ্বিতীয় খণ্ড', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩।
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

মোবারক, বসরার গোলাপ, বুলবুলি, চন্দ্র, সূর্য, নূরের জ্যোতি প্রভৃতির সাথে প্রকৃতির স্নেহ-কোমল কমনীয়রূপে আকাশমন্ডলী শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভরে অবনমিত হয়ে মূর্ত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কি রে তোর কন্ঠের গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাব নিরিবিলি, বুঝি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
তাই তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোর আতরে জাগে।
মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে, তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ, রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে।
ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম চুমেছিলি নবীর কদম,
আজও গুণগুনিয়ে সেই খুশী কি জানাস্‌ রে গুলবাগে ॥ [১২৯]

আশেকে রাসূল তথা নবী-প্রেমিক কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রাণপ্রিয় নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম জপে মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জ্বালা নিবারণ করতেন। নবী প্রেম সম্পর্কিত 'মোহাম্মদ নাম যতই জপি' শীর্ষক না'ত-ই-রাসূলে কবির এহেন ভালবাসার উচ্ছ্বাসিত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি বলেছেনঃ

মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে
নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে ॥
ঐ নামেরই মধু চাহি, মন ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি, ঐ নামের অনুরাগে ॥ [১৩০]

আহমাদ ও মুহাম্মদ নামকরণ

মহানবী (সা.) এর 'আহমাদ' أَحْمَدُ নামটি নিয়ে যত রকমের তত্ত্বকথা এ পর্যন্ত শোনা গিয়েছে 'মুহাম্মদ' مُحَمَّدٌ নামটি নিয়ে ততটা নয়। আরবী অভিধানে 'মুহাম্মদ' শব্দটি থাকলেও নাম হিসেবে এতদিন কোন গোত্র, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য তালিকাভুক্তি করেননি। হযরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথমে আরবের তৎকালীন প্রথাবদ্ধ রীতিকে অগ্রাহ্য করে প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের নাম রেখেছিলেন 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ চির প্রশংসিত। আর মা আমিনা খাতুন স্বর্গীয় ফেরেশতাদের নিকট থেকে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হয়ে শিশুপুত্রের নাম রাখেন 'আহমাদ'। কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্যাপী নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.) নামেই সমধিক খ্যাত। উপরন্তু পবিত্র কলেমার শেষে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ যুক্ত হওয়ায় সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে উঠেছে এ অসাধারণ নাম। ফেরেশ্‌তাগণ 'আহমাদ' এর কথা বললেও আল্লাহ পাক জনগণের রায় বা সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

যুগে যুগে সূফীতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিকতাবাদীগণ 'আল্লাহ' ও আহমাদ' এর মধ্যে যোগসূত্রিতা আবিষ্কারের প্রয়াস চালিয়েছেন। তত্ত্ববাদীগণের ধারণা মূলতঃ 'আহাদ' 'আহমাদ' (চরম প্রশংসাকারী) এরই অংশবিশেষ। সূফীদের মত অনুযায়ী যে আহমাদ সেই আহাদ।[১৩১] মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ও আত্মপরিচয় সূচক নামের মধ্যে 'আল-আহাদ' অন্যতম-যার অর্থ এক বা অদ্বিতীয়।

---

১২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বনগীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সংযোজন, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২২০।

১৩১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, পৃ ৩৩; লাল মোহাম্মদ দিদার, 'নজরুল সঙ্গীতে মহানবীঃ বিচিত্র অনুভবে', কাজারী ইঁশিয়ার, নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারক, (ঢাকাঃ নজরুল জন্মশত বার্ষিকী জাতীয় কমিটি, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬/২৫ মে, ১৯৯৯), পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত একটি ইসলামী সঙ্গীতে এ নিগূঢ় সূফীতত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে 'আহমাদ' নাম সম্পর্কে কবি লিখেছেন;

মিম্ হরফ না থাকলে যে আহাদ
নামে মাখা যার শিরিণ শহদ,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজালা ॥ ১৩২

উদ্ধৃত অংশে 'আহাদ' ও 'আহমাদ' এর মধ্যে কবি শুধু 'মিম' হরফটিকে অতিরিক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে আল্লাহ পাকের অসীম নূরের একটি অংশ হিসেবে দেখেছেন। কেননা সমগ্র বিশ্বজগত তো মহান আল্লাহর নূরের তরঙ্গে প্রতিনিয়ত দোদুল্যমান বলে সূফী-সাধকগণ মনে করেন। কবি-কল্পনায় সেই দর্শন তত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সূফীতত্ত্বের উঁচুস্তরে আপন সাধনাবলে যারা আরোহণ করতে পারেন, তারাই কেবল আল্লাহ পাকের ঐ অসীম নূরের তরঙ্গ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। যে সাধন-মার্গে বিচরণ করতে গিয়ে সূফী সাধক মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ তা'আলার ঐ রূপ বা অসীম উজ্জ্বল নূরের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং এতদর্শনে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন প্রকৃত অবস্থা এরচেয়েও দু' ধাপ উপরে বলে সতর্ক সূফীবাদীগণ অনেকেই মনে করে থাকেন। নজরুল ইসলামের অনুরূপ আর একটি ইসলামী গানে সূফীবাদের অন্যতম প্রবক্তা মনসুর হাল্লাজের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে;

আহ্‌মদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ্ মন
আহাদ্ সেথা বিরাজ করেন হেরে গুণীজন।
যে চিন্‌তে পারে রয় না ঘরে হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যজি ভজে শুধু নবীজির চরণ ॥
ঐ রূপ দেখেরে পাগল হ'ল মন্‌সুর হাল্লাজ্
সে 'আনাল হক' 'আনাল হক' বলে ত্যজিল জীবন ॥১৩৩

উপরোক্ত সূফীতত্ত্ব মিশ্রিত দু'টি ইসলামী সঙ্গীতেই কবির আধ্যাত্মিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম যে কেন এত মর্যাদার এবং স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর নামের সঙ্গে কেন তাঁর নাম (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বিজড়িত সে সম্পর্কে উক্ত গানে তার সমর্থন মেলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসিত ও গৌরবসূচক ব্যঞ্জনাধর্মী নাম কত ব্যাপক, বিচিত্র অর্থ ও অভিধায় কাজী নজরুল ইসলাম চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং তাঁর কবিতায় চিত্রণ করেছেন তা রীতিমত অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার। নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দুনিয়াতে মানবতার ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভাবের চিত্রকল্পে কবি অভিনন্দন জ্ঞাপন করে গেয়েছেন:

মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী
বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী ॥
ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমাদ হ'য়ে
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ লয়ে;
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে;
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি গো বেহেশ্‌তী ছবি ॥ ১৩৪

---

১৩২. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, না'ত' পৃ. ১৭৪।

১৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিক্কার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত গানেও মহানবী (সা.) এর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্যে ও মহামানবের আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি আল্লাহ পাকের মহৎ উদ্দেশ্যও ব্যক্ত হয়েছে। এখানেও 'আহাদ' এরই বিশেষ অংশ যে 'আহমাদ' তা-ও বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নবী করীম (সা.) এর গরিমাদীপ্ত যে সকল প্রশংসাসূচক ও ব্যঞ্জনাধর্মী নাম ও নামের সাথে গুণবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা নবীজিকে উপলব্ধির জন্য অতিসামান্যই বটে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে যে সব বিচিত্র সম্বোধনে তাঁর পিয়ারা হাবীবকে সম্মানিত করেছেন তন্মধ্যে আহমাদ, মুহাম্মদ, রাসূল, হাবীব, দোস্ত এবং বিশেষ করে কম্বলধারী (কম্‌লিওয়ালা) বা 'বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। না'ত-ই-রাসূল, কবিতা ও ইসলামী সঙ্গীতে এমনি প্রয়োগে বৈচিত্র্য প্রত্যাশী শব্দভাণ্ডারী কবি নজরুল ইসলাম যেন আরবী-ফারসী ও ইসলামী পরিভাষার শব্দ কোষ ও ঐতিহ্য উজাড় করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন-চরিতের সুকুমার গুণাবলীর সকল স্তর বিনয় ও ভক্তি শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবির ভাষায়:

মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
তুমি বাদশার ও বাদশাহ কমলীওয়ালা ॥
পাপে-তাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হ'ল পূণ্য বেহেশ্‌তী নূরে উজালা ॥
'য়্যা উম্মাতি, য়্যা উম্মাতি' বেলা তুমি
কাঁদিবে খোদার পাক আরশ চুমি-'
পাপি উম্মত-ত্রাণ তব জপমালা ॥
করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারি ধ্যান,
তব গুণ গাহিল নিজে আল্লাহ তা'লা ॥[১৩৫]

নবী করীম (সা.) এর পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমাদ' এবং অনুষঙ্গ হিসেবে দোয়েল, কোয়েল, ভ্রমর, সূর্য, চন্দ্র, বুলবুলি, গোবি, সাহারা প্রভৃতি অসংখ্য কবিতা ও ইসলামী সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাইতো নজরুল ইসলামের উপমায় ভাবে ও ভাষায় এবং অতলস্পর্শী ভাবানুভূতি সমন্বিত চিত্রকল্পে প্রায় অধিকাংশ না'ত-ই-রাসূল অসাধারণ সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পারস্যের অতি প্রিয় পাখী বুলবুলির সাথে তুলনা করে কবি গেয়েছেন;

হে মদীনার বুলবুলি গো গাইলে তুমি কোন গজল,
মরুর বুকে উঠল ফুটে প্রেমের রঙিন গোলাপ দল ॥...
সাহারার দগ্ধ বুকে রচলে তুমি গুলিস্তান,
সেথা আসহাব সব ভ্রমর হয়ে শাহাদাতের গাইল গান ॥
দোয়েল কোকিল দলে দলে আল্লা-রসূল উঠল বলে,
আল-কোরআনের পাতার কোলে খোদার নামের বইল ঢল ॥ [১৩৬]

---

১৩৪. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২৩২: কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১-৪০২।

১৩৫. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২৩৩: কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২।

১৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বনগীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৭৩: ইরানী কবি হাফিজের দীওয়ান ও ওমর খৈয়ামের রুবাই-তে শরাব-সাকীর সঙ্গে পাখী হিসেবে বুলবুলির একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। উক্ত দু'জন বিশ্বখ্যাত ফারসী কবি বাঙালী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। যাদের অসাধারণ প্রভাব নজরুল ইসলামের গজল গানে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত বসরার গোলাপও কবি অনেক গানে অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মূলতঃ বুলবুল পাখীর প্রতি নজরুল ইসলামের আবাল্য একটি

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে উপরোক্ত ইসলামী সঙ্গীতে, গানের পাখী বুলবুলি হিসেবে দেখা, অনুরাগীদের ভ্রমর কল্পনা করার এবং 'সাহারার দগ্ধ বুকে' গুলিস্তান রচনার চিত্রকল্প এক অতুলনীয় সজীবতা ও স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে।

সাহারার ফুল

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সাহারায় ফুটন্ত ফুল 'রঙিন গুলে লালা' হিসেবে চিত্রায়িত করে ১২ পংক্তিবিশিষ্ট একটি ছোট অথচ অনন্য সাধারণ ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন। কবির সুরারোপিত ও শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ (১৮৭১-১৯৫৯ খ্রি.) এর কণ্ঠে গীত এই দুরূহ শিল্পকর্মটি যারা সঙ্গীতাকারে রেকর্ড শুনেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, না'তটির বাণীর সারল্য, উপমা ও আদিগন্ত ত্রিভূবন স্পর্শী জ্যোতির্দীপ্ত চিত্রকল্প এবং এর ভাবসম্পদ ও আন্তরিক আবেদন-আকুলতার ব্যাপ্তি ও গভীরতার প্রকৃত তাৎপর্য। এ অসাধারণ গরীমাদীপ্ত না'ত-ই-রাসূলখানি সূফীবাদ ও ভক্তিমার্গের জন্ম দিয়েছে। কবি 'সাহারার ফুল' শিরোনামে মহানবী (সা.) সম্পর্কে লিখেছেন;

সাহারাতে ফুটল রে ফুল রঙিন গুলে-লালা ।
সেই ফুলেরই খোশ্‌বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা ॥ ....
সেই ফুলেরই রওশ্‌নীতে আরশ কুর্শী রওশন ,
সেই ফুলেরই রঙ লেগে আজ ত্রিভূবন উজালা ॥
চাহে সে ফুল জিন্‌ ও ইন্‌সান্‌ হুর-পরী ফেরেশতায়,
ফকীর দরবেশ বাদশাহ চাহে করতে গলার মালা ॥
চেনে রসিক ভোম্‌রা বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা,
কেউ বলে হযরত মুহাম্মদ কেউ বা কম্‌লীওয়ালা ॥ [১৩৭]

ধূসর মরুভূমি প্রভাবিত আরব জাহানের পবিত্র মক্কা নগরীর অভিজাত কুরাইশ বংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবে যে অবিস্মরণীয় পরিবর্তন এলো কবি তারই সার্থক চিত্রকল্প অসংখ্য কবিতা ও ইসলামী সঙ্গীতে অংকন করেছেন। সাহারা মরুভূমি, শুকনো গাছ, বিরান মুলুকের উল্লেখের পাশাপাশি বান, গুলিস্তান, ছোঁওয়ায়, আবাদ, মুঞ্জরিল, প্রাণ, গুল, গুলজার এবং একটি অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ 'মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান' নিঃসন্দেহে নব-জীবনের পরিচয়বাহী। আরব ভূমির প্রকৃতি-পরিবেশে কবির ইসলামী গজল-গানে এসব প্রসঙ্গ বিচিত্র বিশ্বাসে ও বিন্যাস-নৈপুণ্যে, কল্পনা চিত্রে, ভাবে ও ভাষার সারল্যে, অর্থ দ্যোতনায় এবং এক পরিচ্ছন্ন রূপ-মাধুর্যে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হিসেবে অভিনন্দিত হবেন, তাঁর আগমনে সর্বত্রই একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের ছোঁওয়া বা ছায়া পড়বে; কবির এমন কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত নয়। তাই বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত না'ত-ই-রাসূল এ কবির সানন্দ আহ্বান :

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা।
মরুভূমি হ'ল গুলিস্তান, দেখে যা।

দুর্বার আকর্ষণ ছিল। এগার/বার বছর বয়সের সময় আরবী-ফারসী-উর্দু মিশ্রিত কবির গানেও এই বুলবুলি পাখীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কবি তাঁর মধ্যম পুত্রের নাম রেখেছিলেন 'বুলবুল'-যার নামে উৎসর্গীত হয়েছে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'। কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিগ্রন্থের নামও 'বুলবুল'। অতএব, হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কবিতা তাঁকে যেমন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল তেমনি তাদের কবিতার অনুষঙ্গ হিসেবে শরাব, সাকী, বুলবুলিকেও তিনি তাঁর জীবনের সর্বস্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হল দুনিয়া,
শুক্‌নো গাছ মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা ॥...
কান্ডারী তার বন্ধু খোদার হজরত মোহাম্মদ
যাত্রী যারা এনেছে ঈমান, দেখে যা।
সেই বানে কে ভাসবি রে আয়, যাবি রে কে ফিরদৌস্,
খেয়াঘাটে ডাকিছে আজান, দেখে যা ॥[১৩৮]

মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবে মরু সাহারায় আনন্দের প্রতিক্রিয়া এ গানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে একে এককথায় অসাধারণ বলা যায়। আবির্ভাব অঙ্গের অসংখ্য গানে কবি-কল্পনার স্ফুরণ ঘটেছে। নজরুল ইসলামের এরূপ আরেকটি ইসলামী সঙ্গীতের উদাহরণ নেয়া যেতে পারে। কবির ভাষায়:

মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা
হলেন নাজেল তাহার দেশে খোদার রসুল।
যাহাঁর নামে যাহাঁর ধ্যানে
সারা দুনিয়া দীওয়ানা, প্রেমে মশগুল ॥ ....
ছিল ত্রিভূবন যাহাঁর পথ চাহি
এল রে সে নবী 'ইয়া উম্মাতি' গাহি'
যতেক গোম্‌রাহে নিতে খোদার রাহে'
এল ফোটাতে দুনিয়াতে ইসলামী ফুল ॥[১৩৯]

মহানবী (সা.) এর নুরের জ্যোতি

কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট রাসূল প্রশস্তিমূলক ইসলামী সঙ্গীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্বতঃস্ফূর্ত নূরের জ্যোতির আভা যেন সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। এসব গানে বিচিত্র প্রাণবন্ত এবং গতিশীল দ্যুতিমান উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে জন্য প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক লেখক ও নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম -১৯৪০ খ্রি.) নজরুল ইসলামকে 'চিত্রকল্পের সম্রাট' বলে যে আখ্যায়িত করেছেন তা আদৌ অত্যুক্তি নয়।[১৪০]

নিম্নোদ্ধৃত না'ত-ই-রাসূলে মহানবী (সা.)কে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্যের সাথে বিশেষভাবে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু নবীজির পুতঃপবিত্র চরিত্র ও ব্যক্তি মানসকে আকাশে উদিত চাঁদের সাথে তুলনা করে তাঁর উজ্জ্বলতা, স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তাকে যে অসাধারণ মর্যাদায় ও গৌরবে বিভূষিত করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অনুপম। আসলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপমা তিনি নিজেই। উপরন্তু যে সকল জাগতিক, অপার্থিব দৃষ্টিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, দৃশ্য ও রূপের সঙ্গে নবীজিকে তুলনা করা হয়েছে; সেক্ষেত্রে উপমেয়র চেয়ে উপমানের ধর্ম ও অর্থগৌরব এবং ভাব সুষমাই হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা উপমেয় স্বয়ং সর্বগৌরবে ও আন্তঃধর্মে গৌরবান্বিত ও গুণান্বিত। যেমনটি চন্দ্র, সূর্য, আসমান, তারা, ধূলি-গোলাব বুলবুলির অনুষঙ্গে নবী করীম (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব নজরুল ইসলামের গানের পংক্তিতে পংক্তিতে ফুটে উঠেছে;

ওরে ও চাঁদ উদয় হলি কোন জোছনা দিতে
দেয় অনেক বেশী আলো আমার নবীর পেশানীতে ॥
ওরে রবি! আলোক দিস যত তুই দগ্ধ করিস তত,

---

১৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

১৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, ' সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০১।

১৪০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা, (ঢাকা: নজরুল একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৮৪/ আগষ্ট, ১৯৭৭), পৃ. ২৫১-২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আমার নবী স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মত,
সে নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে ॥
ওরে আসমান! তুই সুনীল হলি জানি কেমন করে,
আমার নবীর কালো চোখের একটুকু নীল হ'রে।
ওরে তারা তোরা জ্যোতি পেলি নবীর চাউনিতে ॥ [১৪১]

অতঃপর আরেকটি গজল-গানে কবি নজরুল ইসলাম প্রাণপ্রিয় নবীজিকে সোনার চাঁদের অনুষঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি পথভ্রষ্ট মানুষের দুর্গত অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য মক্কার অনতিদূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন, সাধনারত। এই গানটির অসাধারণ কল্পচিত্রে লক্ষ কোটি চন্দ্রের 'অপরূপ জ্যোতিধারা' ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং নবীজির অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মিতে অন্ধকার পৃথিবী বিচিত্র শোভায় দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। যেমনটি কবি গেয়েছেন:

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে হেরা গিরি পরে,
শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি চাঁদের আলো ঝরে॥
কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হ'তে,
নামে বিপুল স্রোতে,
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে,-
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজি ঝলমল করে॥ [১৪২]

এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পবিত্র ঈদের চাঁদের অনুষঙ্গে কম্‌লিওয়ালা বা কম্বলধারী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে নবীকুল শিরোমণির ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাস আবেগের গভীর আন্তরিকতা লক্ষণীয়। ঈদের চাঁদের পবিত্রতা, প্রশংসা ও রহমতের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামের মাহাত্ম্য এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) এর উদ্দেশ্যে বাগিচায় গোলাপ ফুলের মাল্য রচনার মধ্যে দিয়ে কবির আত্মনিবেদনে যে পরম প্রাপ্তির আনন্দ তা সত্যিই বিস্ময়কর। কবির ভাষায়:

আমার প্রিয় হজরত নবী কম্‌লিওয়ালা
যাঁহার রওশনীতে দ্বীন-দুনিয়া উজালা ॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ-তারা,
ঈদের চাঁদে যাঁহার নামের ইশারা,
বাগিচায় গোলাব গুল গাঁথে যার মালা ॥[১৪৩]

মা আমিনার কোলে শিশুনবী

সমগ্র বিশ্ব যখন তিমির আঁধারে নিমগ্ন তখন সেই ঘনীভূত অন্ধকারকে বিদূরিত করার জন্য তিমির বিনাশী জ্যোতিপ্রাপ্ত আদর্শ মহাপুরুষের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। সেই জ্যোতিস্নাত মহামানবকে কবি নজরুল ইসলাম তুলনা করেছেন 'ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন আসমানের কোলে রাঙা-চাঁদ দোলে'। নূরের সমুদ্রে স্নান করে কে এই নতুন অতিথি, কে এই বেহেশ্‌তের নূর, যার আবির্ভাবে আজ ভূলোক-দ্যুলোকে এমন পুলক শিহরণ জেগে উঠল কবির হৃদয় রাজ্যে। আর তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পবিত্র নূর তথা জ্যোতি বা আলোক প্রাপ্ত হিসেবে অভিহিত করে ইসলামী সঙ্গীতে কবির সানন্দ আহ্বান;

---

১৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার: দ্বিতীয় খণ্ড,' নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

১৪৩. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এল মক্কায় আমিনার কোলে।
জান্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশতা আম্বিয়া এসেছে ধেয়ে,
তহরীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে ॥
এল রে চির চাওয়া, এল আখেরে নবী
সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী,
নাজেল হয়ে সে-যে ইয়াকুত রাঙা ঠোঁটে
শাহাদাতের বাণী আধো আধো বোলে ॥[১৪৪]

মা জননী আমিনার কোলে শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে কত সুন্দর নজরুল ইসলামের অসংখ্য ইসলামী গানে তা প্রমাণিত হয়েছে। মায়ের কোলের এই অসাধারণ শিশুকে বিচিত্র অনুভবে কবি তাঁর আরেকটি গানে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। স্বর্গ-মর্ত্য-মথিত গানটির উপমা, রূপকার্য, চিত্রকলা, ভাবের গভীরতা ও কথামালার সারল্য মুহূর্তেই পাঠক চিত্তকে নিঃসন্দেহে এক অপার্থিব আনন্দে অভিভূত করে তোলে। এই গানটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে এমন অসাধারণ উক্তি করা হয়েছে, যা উচ্চ ভাব, মহৎ কবি-কল্পনা ও সার্থক শিল্প-কর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। নজরুল সঙ্গীতে বিশেষতঃ না'ত-ই-রাসূলের মধ্যে এ গানটিকে সেই অর্থে অনবদ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ করে এর শেষ স্তবকটি 'এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী / ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি' চরণদ্বয় পরশমণিতুল্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-আদর্শ এবং সমগ্র কর্মজীবন নির্যাতিত ব্যথিত মানবমন্ডলীর জন্য যেন এবং মহাকাব্যিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত গানটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল,

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে,
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥
কুল মাখলুকে আজি ধ্বনি উঠে, কে এল ঐ ,
কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশে গ্রহ-তারা পড়ে লুটে, কে এল ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেশ্‌তা, বেহেশতে সব দুয়ার খোলে ॥
মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
"এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই" কহিল যে জন,...
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্বনিখিল মুক্তি কলরোলে ॥ [১৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কিত প্রশস্তিমূলক বা গুণকীর্তণমূলক এ সকল ইসলামী কবিতা ও গানে মহানবী (সা.) কে বিচিত্রভাবে দেখা, অনুভব ও উপলব্ধি করার গভীর আন্তরিক প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হয়েছে। কবির ইসলামী চিন্তাধারা ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নবী করীম (সা.) এর বিচিত্র জীবন, উপদেশ-নির্দেশ, কখনো তাঁর চেহারা মোবারক, নবীর চোখ, হাসি, পদ যুগল, স্কন্ধের মোহর, মস্তকের

---

১৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বনগীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১।

১৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম, ' জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

চাদর, কেশগুচ্ছ, এবং সর্বোপরি তাঁর নামের মাহাত্ম্য এসব ভক্তিপূর্ণ রচনায় অজস্রবার উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলে করীম (সা.) এর সুমহান জীবন-চরিত ও রূপ-ঐশ্বর্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে নজরুল ইসলাম প্রায়শঃই জ্যোতি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজি, নৈসর্গিক প্রকৃতি, মরুভূমি বিশেষতঃ গোবি ও সাহারা , জীব-জন্তু (উট, মেষ) পাহাড়-পর্বত (বিশেষতঃ কোহ-ই-তুর ও হেরা), নদ-নদী (দজলা-ফোরাত তথা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস), সমুদ্র (লোহিত সাগর), বায়ু (লু' হাওয়া), পাখি (বিশেষতঃ বুলবুল), ফুল (বসরার গোলাপ), ধূলি-বালি (বিশেষতঃ মক্কা-মদীনার), বন্যা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ সকল প্রতীক, উপমা, রূপক ও সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং ভাব-ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবি নজরুল ইসলাম অসামান্য ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।[১৪৬] যেমনিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবসূচক একটি না'ত-ই-রাসূলে নবীজির জন্মলগ্নে তৎকালীন আরবের কা'বা গৃহের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং এই আনন্দঘন মুহূর্তে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ, স্বর্গ-মর্ত্যের আনন্দ উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মানুষের মনের কালিমা দূর করার মানসে হৃদয়কে অধিকতর উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব ঘটেছে-যার মুখ নিঃসৃত বাণীতে রয়েছে পবিত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাকবীর ধ্বনি। কবির ভাষায়ঃ

খোদার হাবীব হলেন নাজিল-খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে
ঝুকে পড়ে আর্শ-কুর্শী, চাঁদ-সুরুয্‌ তাঁর দেখতে আসে ॥
ভেঙে পড়ে পুরুত মন্দির, 'লাত-মানাত্‌' শয়তানী তখ্‌ত,
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উঠেছে তক্‌বির আকাশে।
খুশীর মউজ তুফান তোরা দেখে যা মরুভূমে ,
কোহ-ই-তূরের পাথরে আজ বেহেশ্‌তী ফুল ফুটে হাসে ॥
সূর্য ওঠে, উঠেরে চাঁদ, মনের আঁধার যায় না তায়।
হৃদ-গগনে যে করল রওশন, সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে ॥[১৪৭]

নবী করীম (সা.) এর আগমনে উচ্ছলতা

নবী প্রেমিক কবি নজরুল ইসলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পৃথিবীতে শুভাগমন উপলক্ষে উদ্বেলিত হৃদয়ে না'ত রচনা করেছেন। আল্লাহর রাসূলের আগমনে পাপিত-তাপিত দুনিয়ায় যে শান্তির পরশ এসেছিল, পৃথিবী যেমন উতলা হয়ে পড়েছিল, তেমনি আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সুরুয, গ্রহ-তারা, তরু-লতা, ফুল-ফল, পশু-পাখিসহ সমগ্র সৃষ্টিকুল আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল কবির লেখনীতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে;

আসিছেন হাবীবে খোদা, আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর,
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর।
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে
তেমনি করে হরষিত ফেরেশ্‌তা সব উঠলো গেয়ে,
"হের আজ আরশে আসেন মোদের নবী কম্‌লীওয়ালা
দেখ সেই খুশীতে চাঁদ সুরয আজ হল দ্বিগুণ আলা ॥ [১৪৮]

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তথা তাওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতি আসমানী কিতাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনীবার্তা ঘোষিত হয়েছিল। কবির ভাষায়ঃ

আজি আল-কোরায়সী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম

---

১৪৬. লাল মোহাম্মদ দিদার, 'নজরুল সঙ্গীতে মহানবীঃ বিচিত্র অনুভবে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯।

১৪৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা' , নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১।

১৪৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯২-৪৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজার সালাম ॥
তাওরাত, ইঞ্জিলে মুসা ঈসা পয়গম্বর
বলেছিলেন আগাম যাঁহার আসার খবর
সেই আহমদ মোর্ত্তজা আজি এলেন আরব-ধাম ॥
আদমেরি পেশানিতে জ্যোতি ছিল যাঁর
যাঁর গুণে নূহ তরে গেল তুফান পাথার,
যাঁর নূরে নমরুদের আগুন হ'ল ফুলহার
সেই মোহাম্মদ মোস্তফা এলেন নিয়ে দীন-ইস্লাম ॥[১৪৯]

নবীন সওদাগর হযরত মুহাম্মদ (সা.)

কবি নজরুল ইসলাম গুনাহ্ করে যারা পাপী-তাপী বদ নসীব হয়েছে তাদের নতুন করে নসীবের খোশ-খবরীর জন্য আবার সওদা করতে বলেছেন, যারা জীবন ভরে কিয়ামতের পাথেয় সংগ্রহে শুধু গাফলতির মধ্যেই শামিল থাকলো তাদেরকে এ ভুলের পথ পরিহার করে আবার সত্যের সেনানী হয়ে বেহেশ্তকে ক্রয় করতে বলেছেন। আর এ বেহেশ্ত ক্রয় করতে যে মুনাফা দরকার তা একমাত্র আল-কুরআনেই পাওয়া সম্ভব; আর সেই পবিত্র কুরআনের ধারক-বাহক স্বয়ং বাস্তব আল-কুরআনের জীবন্তরূপই হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। তাঁর পুতঃপবিত্র জীবনের অনুসারী হয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে শাফা'আতের সনদপত্র সংগ্রহ করে নিতে যেন দেরী না করা হয়। 'জুলফিকার' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবির একটি ইসলামী সঙ্গীতে ও নবীন সওদাগর হিসেবে বাণিজ্যের রূপকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের বাস্তব চিত্রকল্প নবীন সওদাগর হিসেবে চমৎকারভাবে অংকিত হয়েছে;

ইসলামের ঐ সওদা ল'য়ে এল নবীন সওদাগর
বদ নসীব আয়, গুনাহ্গার , নতুন করে সওদা কর ॥...
কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে
লুটে নেরে লুটে নে সব ভ'রে তোল তোর শূন্য ঘর ॥
কলেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়াতের সাত রাজার ধন কে নিবি আয়, ত্বরা কর ॥...
আরশ হ'তে পথ ভুলে কে এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর' ॥[১৫০]

এখানে মহানবী (সা.) কে আরব তথা বিশ্ববণিকদের রূপকার্থে সকল নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক হিসেবে চিত্রণ করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনকে সম্পদ বোঝাই জাহাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং বিনিময় মাধ্যম গুরুত্ব পেয়েছে ইসলাম ধর্মের চিরশাশ্বত আদি বাণী কালেমায়ে তাইয়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল।"

হেরা পর্বতের গুহায় মহানবী (সা.)

হেরা পর্বতের গুহায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেছিলেন ফলে বিশ্বজগতে প্রচারিত হয়েছিল পবিত্র ইসলাম ধর্ম। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হেরা পর্বতের গুহা থেকে পৃথিবীতে যে সুসংবাদ উচ্চারিত হয়েছিল কবির বাস্তবিক কল্পনা আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যায়। হেরা গিরিগুহা

---

১৪৯. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ১৭৫।

১৫০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনকারী রাসূলুল্লাহ (সা.) চলার পথে তাঁকে যে চিত্রকল্পে মহীয়ান করে তোলা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। হেরা পর্বতের গুহায় প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহানবী (সা.) এর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কবি-কল্পনায় না'ত-ই-রাসূলে চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে;

হেরা হ'তে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে, হায়!
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে খুলে যায়-
সে যে আমার কমলীওয়ালা। কমলীওয়ালা ॥
তাঁর ভাবে বিভোল রাঙা পায়ের তলে,
পর্বত জঙ্গল টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরাণী ফুল ঝরে ঝরে যায়।
সে যে আমার কমলীওয়ালা। কমলীওয়ালা ॥[১৫১]

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ বা আখেরী নবী হলেও সকল নবী-রাসূলের মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা তাঁর সীরাত-জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থের 'অনাগত' কবিতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশ্বজগত সৃষ্টির কৌতুহল বা মনের আকুলতা এবং আদি মানব হযরত আদম (আ.) এর সাথে কথোপকথন ছলে এহেন রহস্যময়তার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আদিতেই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরিকল্পনা। কেননা মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বা মূল লক্ষ্য। কাজেই সর্বাগ্রে সে জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহর ধ্যানে জন্মলাভ করবে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল। এ অর্থেই বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জন্মের আগেই জন্মেছিলেন। আল্লাহর ধ্যানের জ্যোতির্মূর্তিই 'নূরে মুহাম্মদী'। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নূরকেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে না ভালবাসলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না বলে কবি নজরুল ইসলাম ঘোষণা করেছেন;

আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে
আরশ কুর্সী লওহ্ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে ॥
রাসূল নামের রশি যেতে হবে খোদার ঘরে,
নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেশে ॥ [১৫২]

কাজেই আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে সমস্ত সৃষ্টি শুধু তাঁরই জন্য। তাই আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নবীর পূর্ব পর্যন্ত সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। নবী করীম (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদার আপন নূরের গরিমা ও তেজোদীপ্ত রূপ নজরুল ইসলামের নিম্নোদ্ধৃত গানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে যাতে সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ বিদ্যমান। কবির ভাষায়ঃ

আদম নূহ ইবরাহিম দাউদ সোলেমান মূসা আর ঈসা
সাক্ষ্য দিল আমার নবীর, তাদের কালাম হল রদ ॥
যাহার মাঝে দেখলে জগৎ ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ায় আসেল যে রে পূণ্য বেহেশ্‌তী সনদ ॥...
ছিল নবীর নূর পেশানীতে তাই ডুবল না কিশ্‌তী নূহের,
পুড়ল না আগুনে হজরত ইবরাহিম সে নমরুদের

১৫১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
১৫২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০২।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ করে নবীর পদ,
দোযখ আমার হারাম হ'ল পিয়ে কোরানের শিরীন শহদ ॥[১৫৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাব বিষয়ক কবিতা, গান সর্বত্রই নজরুল ইসলাম জগত, জীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আকাশমন্ডলী থেকে উপমা, প্রতীক, রূপক কিংবা সাদৃশ্য, কল্পনা ও সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে নবীজির আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়াকে অর্থবোধক করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' (আবির্ভাব) শীর্ষক একটি না'ত-ই-রাসুলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে বেহেশ্‌তের রৌশনী, নূর বা জ্যোতি হিসেবে অংকন করা হয়েছে। যার আগমনে আসমান-জমীন আলোকিত হয়ে উঠেছে, ফেরেশতা ও হুর-পরী-গেলেমানসহ সমগ্র দুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে দুলে উঠার চিত্রে মহানবী (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব, অসাধারণত্ব ও মাহাত্ম্যই ফুঠে উঠেছে। কবির ভাষায়ঃ

নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান
শুনি সে তকবীরের ধ্বনি আকুল হ'ল মন প্রাণ
বাহিরে হেরিনু আসি' বেহেশতী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমীন ও আসমান;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশতা হুর গেলেমান;
এল কে, কে এল ভূলোকে
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে ॥[১৫৪]

মধ্যম স্তবকে রাসূলুল্লাহ (সা.) 'তাপীর বন্ধু' 'পাপীর ত্রাতা', ভীত-সন্ত্রস্ত পীড়িতের আশ্রয়দাতা, দুর্বলের মুখে অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষাস্বরূপ, হতাশাগ্রস্তের আশা, ব্যাথাতুরের শান্তি ও শোকাহত মানুষের শোকের সান্ত্বনা বাণীর মধ্যে মহামানবের অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ পরিচয় ফুটে উঠেছে। পরিশেষে নবীজিকে খোদার সাথী হিসেবে চিত্রণ করা হয়েছে;

হেরে আমিনার কোলে
খোদার সাথী দোলে দোলে রে।
দরুদ পড়ে সবে : সাল্লে আলা
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লো আলা।
কেহ বলে, এল মোর কম্‌লীওয়ালা
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
কেউ বলে আহমদ নাম মধু-ঢালা
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা। [১৫৫]

এতদ্ব্যতীত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' উপলক্ষ করে রচিত 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' নামক এ কবিতাদ্বয় 'বিষের বাশী' কাব্যগ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে বিশ্বনবী (সা.) এর আবির্ভাব ও তিরোভাবের তাৎপর্য অনুযায়ী কবি ভাবনার উত্থান-পতনের দোলা সঞ্চারিত হয়েছে। এই মহামানবের প্রেরণা নজরুল ইসলামের চেতনা ও কবি-কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছে তাই তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি সালাম জানিয়েছেন, প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং সর্বোপরি সত্যের সংগ্রামে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রণে তাঁর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

---

১৫৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৬।

১৫৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১০।

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম (আবির্ভাব)

নজরুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য রচনা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' (আবির্ভাব) কবিতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভ জন্মলগ্নের আবির্ভাব চিত্র অংকিত হয়েছে। কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকশিত এবং 'বিষের বাশী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। এক পরম আনন্দময় ও শুভলগ্নরূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব বা জন্মলগ্ন নজরুল ইসলামের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। মাটির পৃথিবী ও বেহেশ্‌ত উভয় স্থানই যে মুহূর্তকে পরম আনন্দে স্বাগত জানিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মভূমি আরব দেশের ভৌগলিক ও তৎকালীন অবস্থা এ কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। সমকালীন মুসলিম মানসের হীনমন্যতাকে উপেক্ষা করে আপন ঐতিহ্যে বলীয়ান হতে কবি এহেন জন্ম উৎসবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে যোগদানের জন্য সুসজ্জিত হতে আহবান করেছেন;

নাই তা-জ
নাই লা-জ,
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ
শোন্ কোন মুঝ্দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা- মাঝ ![১৫৬]

নজরুল ইসলাম এ কবিতায় বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীতে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাতা নিপীড়িত মানবাতার মুক্তিদাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভ জন্মলগ্ন বিশ্ববাসীর জন্য পূণ্যময় ও আনন্দের দিন। এই পবিত্র দিনে পার্থিব জগত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। মরুচারী আরব বেদুঈন থেকে আরম্ভ করে বেহেশতের হুর পরীরা পর্যন্ত হাতে সুধাভান্ডার নিয়ে এ আনন্দ উৎসব-আয়োজনে মেতে উঠেছে। এই চমকপ্রদ চিত্রকল্পটি কবির লেখনীতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে;

চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম !
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে 'আব-জম্ জম-জম !
শোন দামাল কামাল তামাম সামান
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম"!
আজ বেদুঈন তার, ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া,
ছুঁড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"[১৫৭]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আবির্ভাবে স্বর্গীয় দূতদের আনন্দ-উল্লাস বর্ণনায় কবি নজরুল ইসলাম কয়েকজন বিশিষ্ট ফেরেশতা যেমন- হযরত জিব্‌রাঈল (আ.), হযরত আজরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.) এবং হযরত ইসরাফিল (আ.) এর নাম উল্লেখ করে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। আজরাঈল ফেরেশতা প্রাণীকুলের জীবন সংহারক, অন্যদিকে শিঙা হাতে হযরত ইস্রাফিল (আ.) রোজ কিয়ামতে পৃথিবীর বিনাশ ঘোষণাকারী প্রলয়-বিষাণের দূত। কিন্তু সর্বশেষ ও

---

১৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম (আবির্ভাব), 'বিষের বাঁশী', নজরুলের কবিতাসমগ্র, পৃ. ১০১।

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী (সা.) এর আগমনে তাঁরাও আনন্দে উদ্বেলিত। অন্যতম ফেরেশতা হযরত মিকাঈল (আ.) প্রবল বর্ষণের সাহায্যে উষর মরুময় আরবকে যেন সরসা করে তুলেছেন। কবির ভাষায়:

আনি জিব্‌রাঈল, আজ হরদম দানে গওহর
টানি 'মালিক উল-মৌত' জিঞ্জির বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
হানি বরষা সহসা 'মিকাঈল' করে উষর আরবে ভিঙা।,
বাজে নব সৃষ্টি উল্লাসে ঘন 'ইসরাফিল' এর শিঙা।[১৫৮]

পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতা বিবি আমিনা, পিতা আবদুল্লাহ ও পিতামহ আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ আত্মীয় পরিজনদের উল্লেখ তাৎপর্যময় ও অর্থপূর্ণ। মহানবী (সা.) এর জন্মের কয়েকদিন পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্ম থেকেই পিতৃহীন। হযরতের জন্মক্ষণে পিতা আবদুল্লাহর অবর্তমানে পরিবারে চরম আনন্দের মুহূর্তেও যেন বিষাদের কালো ছায়া পড়েছিল, কবিতার শেষ স্তবকে মাতা আমিনার সে বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে;

"কোন যাদুমণি এলি ওরে" বলি রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই।
দূরে আবদুল্লাহর রূহ কাঁদে, "ওরে আমিনারে গমি নাই,
দেখ সতী তব কোলে কোন চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"
'এয় ফরজন্দ-'
হায় হরদম
ধায় দাদা মোত্তালেব কাঁদি,- গায়ে ধূলা কর্দ্দম!
"ভাই! কোথা তুই?" বলি, বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে হামজা দুর্দম।[১৫৯]

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌-দহম (তিরোভাব)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর 'তিরোধান' সম্পর্কিত নজরুল ইসলামের ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌-দহম (তিরোভাব) শীর্ষক কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। এ ধরনীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাব ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে আগষ্ট। আর তিরোধান ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ই জুন মোতাবেক ১১ হিজরী, ১২ই রবিউল আউয়াল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'(আবির্ভাব) কবিতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনে পৃথিবী ও প্রকৃতি, আরব ভূমি ও কুরাইশ বংশের আনন্দ-উল্লাস বর্ণিত হয়েছিল; আর 'তিরোভাব' কবিতাটিতে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর ইন্তেকালে হৃদয়ের বেদনা ও বিষাদের চিত্র অংকনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কবিতার শুরুতেই প্রথম স্তবকে রাসূলে করীম (সা.) এর ইন্তেকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বর্গীয় দূত ফেরেশতাকূলের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুদূত ফেরেশতা হযরত আজরাইল (আ.) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে নির্বিবেই পার্থিব জগতের সকল জীবের প্রাণ সংহার করে থাকেন কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রূহ কবচে তাঁরও চোখে জল! রাসূলে করীম (সা.) এর কাছে আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রেরিত ওহী বা বাণী বাহক ফেরেশেতা হযরত জিব্‌রাইল (আ.) ও আজ দিশেহারা, মেঘ-বৃষ্টি বর্ষণকারী ফেরেশতা হযরত মিকাইল (আ.) আজ শোকে-দুঃখে মুহ্যমান অবস্থায় ক্রমাগত অশ্রু-বিসর্জনরত এমনকি হযরত মুহাম্মদ(সা.) এর তিরোধানের মুহূর্তে প্রকৃতিও শংকিত। রবিউল আউয়াল যেন দ্বাদশীর চাঁদ; পৃথিবীর ধ্বংসের ডাকে ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল (আ.) এর প্রলয় বিষাণ যেন আজ

---

১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌- দহম (আবির্ভাব), পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

কাৎরাচ্ছে। কবির ভাষায় কলজে পেষানো বজ্র গুমরে যেন কাঁদছে। ফেরেশতাকুলের এহেন অবস্থার অভিনব চিত্রকল্পের ভাবটি কবি কতইনা চমৎকারভাবে ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন;

একি বিস্ময় আজরাইলেরও জলে ভর ভর চোখ ।
বে-দরদ দিল কাঁপে থরথর যেন জ্বর-জ্বর-শোক ।...
জিবরাইলের আতশী পাখা সে ভেঙ্গে যেন খান্ খান্,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্ -চান্ !
মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল ...
ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা পিষাণো বাজ ![১৬০]

মহানবী (সা.) এর ওফাতে মাটির পৃথিবী তাঁর পদস্পর্শে বঞ্চিত হয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ক্রন্দনরত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহাপ্রয়াণের দিন রোজ-হাশর তথা রোজ কিয়ামত বা সৃষ্টির অবসানের সাথে কবি তুলনা করে বলেছেন,

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন তাই বহে ঘন নাভিশ্বাস
পাতাল-গহ্বরে কাঁদে জিন্, পুনঃ ম'লো কি রে সোলেমান ?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান !
ফুলপাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর চিরা বায়ু,
ধরনীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা স্নায়ু ।...
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে !
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে ![১৬১]

রাসূলে করীম (সা.) এর ইন্তেকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরামসহ খুলাফায়ে রাশেদীনের উন্মাদপ্রায় অবস্থার করুণ দৃশ্যাবলীর চিত্র কবিতাটিতে অংকিত হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) এর দু'চোখ বেয়ে দরদর অশ্রু দরিয়ার মতো ঝরে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর ক্রন্দনে আকাশের তারকারাজি মূর্ছিত। আপনজন হারানোর বেদনা-বিষাদ আবহের প্রতীক এই ধ্বনিরূপ চিত্রকল্পগুলো মুসলমান সমাজের পরিচিত ধর্মীয় জীবন থেকে উৎসারিত, অপরদিকে রাসূল-দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা.) এবং নবী-পৌত্রদ্বয় ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) এর শোকাবহ চিত্র বাঙ্গালী মুসলমান ঘরের স্বজনের মৃত্যু পরবর্তী দৃশ্যাবলীর অনুরণণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায়ঃ

আবু বকরের দরদর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েশার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ভয়ে!...
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙ্গে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী-ছেড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে !
উসমানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আহা রাসূল দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতিমা ঐ কাঁদে
"কোথা বাবাজান!" বলি মাথা কুটে এলো কেশ নাহি বাঁধে! [১৬২]

---

১৬০. কাজী নজরুল ইসলাম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম, (তিরোভাব), 'বিষের বাঁশী', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ১০৪-১০৫।

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতায় নজরুল ইসলাম দু'টি চিত্র অংকন করেছেন, একদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তিরোভাবে মর্ত্যলোকের শোক কাতরতা, অপরদিকে বেহেশ্‌ত জগতের আনন্দ উদ্বেলতা। যাতে কবির স্বচ্ছ কল্পনা কুশলতা অনিন্দ্যরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে। কবিতাটির শেষ স্তবকে ধরনী থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বেহেশ্‌তের বুকে ফিরে পাবার আশায় উল্লাসিত বেহেশতের আনন্দমুখর প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়েছে। হুর-পরীদের দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে জান্নাতের পরিবেশ সৃজন করে পরিশেষে স্বর্গের প্রতিক্রিয়ার চিত্র কল্পনা করা হয়েছে। কবির ভাষায়:

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুরপরী যত, "সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম।"
আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল- "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"[১৬৩]

নবীজির ওফাত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব উপলক্ষে অথবা তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত না'ত, ইসলামী গান ও কবিতার সংখ্যা অসংখ্য হলেও নবীজির ওফাত তথা তিরোভাব পর্যায়ে কবির রচিত কবিতা ও গানের সংখ্যা অতি নগণ্য। 'বিষের বাশী' কাব্যগ্রন্থের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' (তিরোভাব) অংশের কবিতাটি ছাড়া নজরুল ইসলামের কবিতায় আর কোন তিরোভাবসূচক কবিতা পাওয়া যায় না। কবির লেখা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ও আবির্ভাব সম্পর্কিত রচনাসমূহে যেমন দুনিয়া জুড়ে এক অনাবিল আনন্দ-উল্লাসের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভবে নবীজির তিরোভাব সংক্রান্ত লেখাগুলোর মধ্যেও বেদনাবিধুর পৃথিবীর এক অতি করুণ প্রতিকৃতি চিত্রিত হয়েছে। নজরুল ইসলামের ভক্তিরস মিশ্রিত অন্তর বেদনার স্ফূরণ যেভাবে ঘটেছে এহেন প্রাণস্পর্শী লেখাগুলোর মধ্যে তা দেখে ও পড়ে যে কোন বিদগ্ধ লোকই মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ মহানবী (সা.) এর 'তিরোভাব' সম্পর্কিত কবির কয়েকটি গানের আলোচনা করা যাক। যেমন- কবি বলতে চেয়েছেন যে নবীজিকে পেয়ে দুনিয়ার তমসা বিদূরিত হয়েছিল, পৃথিবীর মানুষ জীব-জন্তু, পশু-পাখী, গাছ-পালা, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত আনন্দ-বিভোর হয়ে ভাবের আবেগে আবিষ্ট হয়েছিল, আজ সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে হারিয়ে এরা সবাই অশ্রুপাত করছে। নবীজির ওফাতে আজ দুনিয়ার আকাশে বাতাসে শোকের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায়:

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়
"নবীজি নাই" উঠলো মাতম মদীনায়
দ্বীনের রবি মোদের নবী চায় বিদায়,
সইলো না রে বেহেশ্‌তী দান দুনিয়ায় ॥
তুর ও হেরা পাহাড় কেটে অশ্রু-নির্ঝর বয়ে যায়
ধরার জ্যোতি হরণ করে উজল হ'ল ফের বেহেশত,
কাঁদে পশু-পাখী ও তরুলতায়,
সেই কাঁদনের স্মৃতি দোলে দরিয়ায় ॥[১৬৪]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর শুধু মদীনায় কিংবা মক্কায় নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের যে কালোছায়া পড়েছিল তারই অতলস্পর্শী ও মর্মবিদারী অবস্থাকে পরিস্ফুটনের

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

১৬৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৬-১০৭: নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম (তিরোভাব), পৃ. ৬৪-৬৫।

১৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১১-৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য নজরুল ইসলাম সম্ভবত 'মাতম' শব্দটি ব্যবহার করে ঘনীভূত শোকের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। শব্দটি প্রয়োগে একই সঙ্গে কারবালার নৃশংস হৃদয়বিদারক ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞের নারকীয় চিত্র যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালে বেদনাহত মানুষের শোক বিহ্বলতার বিলাপধ্বনিও পাঠকচিত্তে গভীরতর হয়ে প্রতিভাত হয়। এ মনোভাবে নজরুল ইসলামের অপর একটি গানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তিরোধানে শোকে বিহ্বল নিখিল বিশ্ব প্রকৃতির বেদনা কাতর চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে;

হায় ! হায় ! উঠিছে মাতম
আকাশ পবন ভুবন ভরি;
আখেরী নবী দীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব-নিখিল আঁধার করি ॥
অসীম তিমিরে পূণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথায় লুকালো;
আকাশে ললাট হানি, কাঁদিছে মরুভূমি,
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি ॥[১৬৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালকে কবি এ গানটিতে অন্যভাবে রূপ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'আলার পরম বন্ধু। কবির দৃষ্টিতে প্রিয়তম বন্ধুর বিরহ যেন আল্লাহর আর সহ্য হয়না। তাই পিয়ারা হাবীবকে আল্লাহ পাক আপনার কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন। কবির ভাষায়:

বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লাহর
তাই তাঁরে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার;
হায় ! কান্ডারী গেল চ'লে
রাখিয়া পারের তরী ॥[১৬৬]

ইসলামী সন তথা হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেন। প্রতি বছরই এ তারিখ আমাদের সামনে সেই বেদনাবিধুর ধরনীর প্রতিচ্ছবি নিয়ে হাজির হয়। মহানবী (সা.) এর তিরোভাবে এদিনে কবি নজরুল ইসলাম রচনা করেন 'রবিউল আউয়ালের চাঁদ' শীর্ষক গানটি; যাতে কবি হৃদয়ের সকরুণ ভক্তি-রসের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে। গানটির প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণে মরু সাহারার শোক-বিহ্বলতার বেদনা বিধুর চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় :

সেই রবিউল আউয়ালেরই চাঁদ এসেছে ফিরে
ভেসে আকুল অশ্রু-নীরে,
আজ মদিনায় গোলাপ-বাগে বাতাস বহে ধীরে...
তপ্ত বুকে আজ সাহারার,
উঠেছে রে ঘোর হাহাকার,
মরুর দেশে এলো আঁধার-লোকের বাদল ঘিরে...
মা ফাতেমা লুটিয়ে প'ড়ে
কাঁদে নবীর বুকের পরে,
আজ দুনিয়া জাহান কাঁদে কর হানি' শিরে ।[১৬৭]

---

১৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫০১; 'মাতম': কারবালার হৃদয়-বিদারক শোকাবহ ঘটনাকে স্মরণ করে মোহররম মাসের ১০ তারিখে যে শোক-অনুষ্ঠান হয় (শিয়া মুসলমানরা এটি করে থাকে) সাধারনতঃ তাকেই 'মাতম' বা 'মর্সিয়া' (শোকগীতি) বলা হয়।

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১; নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলাম এমন ধারার আরো বহু গান ও কবিতা লিখেছেন। যে মহানবী (সা.) এর সত্যিকার মানবতার রূপ ও আদর্শ দেখে আরব জাতি তথা মক্কা-মদীনার দুরন্ত যাযাবর লোকেরা নবীজির প্রদর্শিত পথে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, ভক্তি গদগদ চিত্ত হয়ে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ নির্বিচারে মেনে চলতে শিখেছিল, সমগ্র আরব জাহানে সর্বপ্রথম সাম্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহায়ক হয়েছিল, সেই মহানবী (সা.) এর তিরোধানে তথায় আজ শোকের ঝড় বয়ে চলছে। মহানবী (সা.) এর তিরোভাব উপলক্ষে নজরুল ইসলামের নিম্নোক্ত গানটির অন্তরা অংশটিতে তৎকালীন মদীনাবাসীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের এক সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে;

অসীম বেদনায় কাঁপে মদিনাবাসী
নিভিয়া গেল চাঁদের মুখের হাসি ॥
শোকের বাদল আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে মরুর বুকের পরে,
ব্যথার তুফানে আরব গেল ভাসি ॥[১৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতে নবী-প্রেমিক কবি নজরুল ইসলাম পারস্যের প্রখ্যাত মরমী কবি শেখ সা'দী (১২১৩-১২৯২ খ্রি.) এর না'তিয়ার অপূর্ব সংযোজন সমন্বয়ে 'কুল মাখলুক গাহে হজরত' শীর্ষক অতুলনীয় ইসলামী গান রচনা করে নিখিল জাহানের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করেছেন। কবির ভাষায়:

কুল মাখলুক গাহে হজরত
        বালাগাল উলা বেকামালিহি
আঁধার ধরায় এলে আফতাব
        কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি ॥
রৌশনীতে আজো ধরা মশ্‌গুল,
তাই তো ওফাতে করি না কবুল,
হাসনাতে আজো উজালা জাহান
        সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি ॥[১৬৯]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' সম্পর্কিত বিষয়টি কবি যেভাবে না'ত, গান ও কবিতায় রূপ দিয়েছেন তা বাংলা কাব্য সাহিত্যে অতুলনীয় সংযোজন নিঃসন্দেহে। এ সব না'ত-ই-রাসূলে নজরুল ইসলামের লেখনীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বিচিত্র ও গভীরভাবে অনুভব করার আন্তরিক প্রয়াস ও ইসলামী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

২. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনীকাব্য 'মরু-ভাস্কর'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর জীবনীকাব্য 'মরু-ভাস্কর' কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থের অবতরণিকা অংশটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.) সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে এবং কিছু অংশ ১৩৩৭ সালের আষাঢ়ের 'জয়তী' পত্রিকায় 'অভিবন্দনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'বুলবুল' পত্রিকায় 'মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী' শিরোনামে জয়তী হতে পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল। 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে 'অবতরণিকা'

---

১৬৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বন্দনীতি', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭২।

১৬৮. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ১১৬।

১৬৯. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, 'না'ত', পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

অংশটির পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় সওগাত সম্পাদক লিখেন, "কবি হযরত মোহাম্মদের (সা.) জীবনী কাব্যে লিখিতেছেন, এই কবিতাটি তাহার পূর্বাংশ।"[১৭০]

তবে কাব্যটির বেশীর ভাগ অংশ কবির জীবদ্দশায় দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত অবস্থায়ই পড়ে থাকে। পরে কবির সহধর্মিনীর একান্ত প্রচেষ্টায় 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থখানি ১৩৫৭ বাং/১৯৫১ ইং সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির প্রাণপ্রিয় পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম 'মরু-ভাস্কর' -এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কাব্যগ্রন্থটি রচনার সঠিক সময়ের কথা উল্লেখ না করলেও পুস্তকখানা রচনায় কবির একাগ্রচিত্তে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়টি আলোকপাত করে লিখেছেন, "অনেক আগে দার্জিলিং-এ বসে কবি এই কাব্য গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে তিনি বইখানি শেষ করেন।"[১৭১]

মরু-ভাস্করের প্রকাশক শাহজাহান তার 'আরজ'-এ বলেন যে, "মরু-ভাস্কর বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনী কাব্য। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এই অমর কাব্যের অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল।... যদিও শেষনবীর সম্পূর্ণ জীবনী ইহাতে নাই- জীবনী শেষ হইবার পূর্বেই কবির লেখনী নীরব হইয়া গিয়াছে- তবুও এখানে যতটুকু আছে, তাহাই আমি ত্রুটিহীনভাবে পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইলাম। সবশেষে এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি যাহার সৌজন্যে আমার হস্তগত হইয়াছিল...তিনি সুগায়ক বন্ধুবর আব্বাসউদ্দীন আহমদ।"[১৭২]

উল্লেখ্য যে, 'মরু-ভাস্কর' নামক কাব্যগ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আবির্ভাবকালীন সময় থেকে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মাক্কী জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কাব্যরূপ বর্ণনা চমৎকারভাবে উল্লেখিত হয়েছে। মূলতঃ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে রচিত 'মরু-ভাস্কর' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি চারটি সর্গে বিভক্ত। প্রতিটি সর্গ বা অধ্যায়ই কতগুলো খন্ড কবিতার সমষ্টি। বইখানিতে এমন কবিতার সংখ্যা মোট ১৮টি। প্রথম সর্গে- 'অবতরণিকা', 'অনাগত', 'অভ্যুদয়', 'স্বপ্ন', 'আলো-আঁধারি', 'দাদা', 'পরভৃত'; দ্বিতীয় সর্গে- 'শৈশব-লীলা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শাক্কুস সাদ্‌র' {হৃদয়-উন্মোচন} 'সর্বহারা'; তৃতীয় সর্গে- 'কৈশোর', 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ' এবং চতুর্থ সর্গে-'শাদী মোবারক', 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নও কাবা' ও 'সাম্যবাদী' শিরোনাম সম্বলিত কবিতাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[১৭৩]

মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবে ধরাধামে আনন্দ-উল্লাস

'অবতরণিকা' পর্বে কবি নজরুল ইসলাম 'মরু-ভাস্কর' মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর দুনিয়াতে আবির্ভাবের আনন্দ সংবাদ বিবৃত করেছেন। সূর্যোদয়ের সাথে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজর নামাযের আযানের ধ্বনিরূপ চিত্রকল্পে নবী করীম (সা.) এর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বনবীর শুভাগমন উপলক্ষে সমগ্র জগত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনে যেন নিখিল বিশ্বে অনাবিল আনন্দের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এহেন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দিয়ে কাব্যের সূচনাতেই কবির আবাহনঃ

জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখী নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব রবি।

---

১৭০. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী , ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৭১৪-৭১৫।

১৭১. কাজী নজরুল ইসলাম, মরু-ভাস্কর, (ঢাকাঃ প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো লিঃ,প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৭/১৯৫১), পৃ. ৭।

১৭২. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪২৫।

১৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম, মরু-ভাস্কর, নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৭১৩-৭৭৬।,

Dhaka University Institutional Repository

ওরে ওঠ তুই, নতুন করিয়া বেধেঁ তোল তোর বীণ!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুৎকারে আজান মুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি "খায়রুন্ মিনান্নৌম !"[১৭৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত মহাপুরুষ সারওয়ারে কায়িনাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর শুভ আগমনে সারা বিশ্বধরণীতে বিপুল আনন্দ-উল্লাসের সাড়া পড়েছিল কবির ভাষায় তার অনুপম চিত্র অংকিত হয়েছে। চতুর্দিকে মহাসমারোহে অনাবিল আনন্দ উৎসব চলেছে, মরুময় আরব প্রকৃতিতে আনন্দের বান ছুটছে। আরব ভূমি সাগর ও প্রকৃতির সাথে তরঙ্গায়িত হয়ে কবির স্বদেশী ভারত সাগরেও যুক্ত হয়েছে,

রবি-শশী- গ্রহ-তারা-ঝলমল গগনাঙ্গন তলে
সাগর-উর্ম্মি-মঞ্জীর পায়ে ধরা নেচে নেচে চলে।
রঙ্গে ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে ইরানী দরিয়া ছুটে,
পূর্ব-সীমায়,-সালাম জানায় আরব-চরণ লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে শঙ্খ,আরতি ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য্য- মানব-মুকুট মণি।[১৭৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মসর্গে এমনি স্তবক আরো আছে। সেইসাথে রয়েছে মুখর কবি কর্তৃক শিশুনবীর অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা। নজরুল ইসলাম শিশু নবীকে 'আলোক-শিশু', 'আলোর দূত', 'জ্যোতিস্মান' 'বেহেশ্‌তী সুধার প্রস্রবণ' রূপে উল্লেখ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভেতর ও বাইরের রূপ-সৌন্দর্যে রবি-শশীর আলো-উজ্জ্বলতা পর্যন্ত হার মেনেছে। অন্তরের দিক থেকে যিনি বিশ্বের সুন্দরতম মহামানব, বহিঃসৌন্দর্যেও কবি তাঁকে সুন্দরতম করে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অপরূপ সৌন্দর্য চিত্রণ করে কবি নজরুল ইসলাম নবীন সূর্যের আলোর সাথে শিশু নবীর তুলনা করে বলেছেন যে, এমনি এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের যেদিন সত্যি সত্যিই আবির্ভাব হল সেদিন যেন ধরণীতে ঈদ-উৎসব এসে গেল। আর তাইতো আলোক শিশু-নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবে এ পৃথিবীর সমস্ত আঁধার বিদূরিত হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

পুরাতন রবি উঠিল না আর সেদিন লজ্জা পেয়ে
নবীন রবির আলোকে সেদিন বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।...
"ঈদ" উৎসব আসিল রে যেন দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত "দুশ্‌মনী" ছিল যথা নিল "দোস্‌তী" আসিয়া জিনে।[১৭৬]

এ আরব রবি বা নবীন সূর্য বলতে কবি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বুঝিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবকাল তথা শুভ জন্মদিনকে শুধু আরবের নয়, কেবল এশিয়ার নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই স্মরণীয় দিন বলা হয়েছে। যেদিন আনন্দ উল্লাসে সবাই মুখর । কারণ যার আগমনের আশায় এ বিশ্ব-চরাচর তপস্যারত চিরদিন; তাঁর সেদিন শুভ জন্ম হল। সেই পরম আকাঙ্খিত মুহূর্তের আবির্ভাবক্ষণটিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেনঃ

নহে আরবের, নহে এশিয়ার,- বিশ্বে যে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল গো বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন!
ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ কোটি-দল কোকনদ,
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ- "আসিল মোহাম্মদ !"[১৭৭]

---

১৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম, মরু-ভাস্কর, 'অবতরণিকা', পৃ. ৯।

১৭৫. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৯-১১।

১৭৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনবার্তা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আগমনবার্তা তাওরাত, ইঞ্জীলসহ একেশ্বরবাদী পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে ইতোপূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ইহুদী, নাসারা সকলে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী আদর্শ মহামানবের আবির্ভাবের বিষয়টি অবগত হলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল। একেশ্বরবাদ প্রচারক হযরত ঈসা (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এর পরে আবির্ভূত হন প্রতিশ্রুত সর্বশেষ পয়গম্বর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর আবির্ভাবে ধরাধামের বিস্ময় বিমুগ্ধ চমৎকার বাস্তবরূপ কবির কল্পনায় চিত্রিত হয়েছে,

অভিনব নাম শুনিল রে-   ধরা সেদিন-"মুহাম্মদ!"
এতদিন পরে এল ধরায়   "প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ!"
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়   ইহুদী আর ঈসাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে   সেই মসীহ্ মহামানব ?
"তওরাত", "ইঞ্জিল" ভরি   ভনিল যাঁর আগমনী,
"ঈসা" "মুসা" আর "দাউদ" যাঁর   শুনেছিল পা'র ধ্বনি...
আঁধার নিখিলে এল আবার   আদি প্রাতের সে সম্পদ
নূতন সূর্য্য উঠিল ঐ   মোহাম্মদ ! মোহাম্মদ ![১৭৮]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নুর

মরু-ভাস্কর কাব্যের প্রথম সর্গের 'অনাগত' অংশে কবি নজরুল ইসলাম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক প্রথমতঃ বিশ্বজগত সৃষ্টি, তারপর বিশ্বের আদি মানব সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টি এবং তাঁর ভেতরে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর নূরের জ্যোতি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন,

আদিম মানব "আদমে" সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, যাও কর খেলা ঐ ধরায় আঙনে গিয়া ! ...
কহিলেন প্রভু, "ভয় নাই , দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে-জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।
আমা হ'তে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো
মোহাম্মদ সে, দিনু তাহাঁরেই তোমারে বাসিয়া ভালো।"[১৭৯]

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব ও তিরোধান

অতঃপর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের পূর্বে ঘূর্ণায়মান এ মহাবিশ্বের আবর্তন, নিরবধি কালস্রোত এবং সময়ের গতিশীলতার আবর্তে যুগে যুগে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রচারক বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব ও তিরোধানের বিষয়টি কবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। তন্মধ্যে আদি মানব-মানবী হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.)সহ মহাপুরুষ হযরত শিশ্ (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত ইউনূস (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত

---

১৭৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১২।

১৭৮. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১৩।

১৭৯. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসহাক (আ.), হযরত ইয়া'কুব (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রমুখ নবী-রাসূলগণের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে;

শত শতাব্দী যুগ যুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে-নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চ'লে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ' ও 'নূহ' নবি-
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি।
চলে গেল 'ঈসা', 'মুসা' ও 'দাউদ' 'ইব্‌রাহিম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম।
গেল 'সুলেমান', গেল 'ইউনুস', গেল 'ইউসুফ', রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইসহাক', 'ইয়া'কুব', গেল 'জবীহুল্লাহ্ ইসমাইল'
খোদার আদেশ করি' হাসিল।[১৮০]

ত্রাণকর্তা আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যুগ যুগ ধরে আলোর সন্ধানী। প্রাক-ইসলামী যুগে পাপাচার, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতা যখন পথের দিশা খুঁজে ফিরছিল, তখন আরবভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মত মহান পরিত্রাণকারী আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একজন সুমহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। বিশ্ব যেন তপস্যারত একটি বিশেষ দিনের জন্য; এরূপ পরিস্থিতিতে খোদায়ী হস্তক্ষেপ ছাড়া ঐ ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থা থেকে বিশ্ব মানবকুলের বিশেষ করে আরববাসীকে উদ্ধারের আর কোন পথই ছিল না। ঠিক সেই সময় দিগন্তব্যাপী এই ঘন তমসার বুকে তাওহীদের আলো জ্বালাবার মহান্‌ব্রত নিয়ে আরববাসীর তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়ায় আগমন করলেন। ত্রাণকর্তার আবির্ভাবে শুধু আরব দেশই আলোকিত হল না, সমগ্র বিশ্বভূবনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মহামানবের আবির্ভাবের পূর্বাভাসকালে অনাগতের আগমনের আকাঙ্খায় আরবভূমির তপস্যা, প্রতীক্ষা ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় দৈত্য, দানব, জ্বিন, পরী, হুর, ফেরেশ্‌তাসহ মহাকাশ ও পৃথিবীর চিত্রকল্প নিপুণভাবে রূপায়িত হয়েছে,

আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো উষায় পূর্ব-গগন প্রায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আধাঁর, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ,তারা তা'রে খুঁজিছে, হায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জ্বিন', পরী হুর পাগল প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়?
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশ্‌তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়![১৮১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মকালে সারাবিশ্বের অবস্থা ছিল চরম বিপদসংকুল, মানবতার আর্তনাদ তখন সর্বত্র। বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মা কোন একজন মুক্তিদাতা মহামানবের আবির্ভাবের কামনায়

১৮০. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১৮।

১৮১. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় যেন ছিল চঞ্চল। অতঃপর মুক্তিকামী পৃথিবীবাসীর ত্রাণকর্তা আগমনের অধীর অপেক্ষা ও ব্যাকুলতা কাব্যরূপ লাভ করেছে। কবি নজরুল ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসেবে দেখলেও সেখানেই তাঁর দেখা শেষ হয়নি। কবি প্রধানতঃ মহানবী (সা.) কে দেখেছেন মানব প্রেমিক, উৎপীড়িতের মুক্তিদাতা ও ন্যায়-সাম্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে এই নতুন দৃষ্টিতে দেখাই কবি নজরুল ইসলামের বৈশিষ্ট্য। তাই উদ্ধৃত অংশটি সমগ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠতম অংশগুলোর একটি। কবির ভাষায়:

উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃংখলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায় !
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদল শিলা বক্ষে নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়![১৮২]

মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের অবস্থা

'মরু-ভাস্কর'-এর প্রথম সর্গে 'অভ্যুদয়' অংশে কবি প্রাক-ইসলামী যুগে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ও চরম অবক্ষয়ে অধঃপতিত আরবের লোক সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রকৃতি চিত্রণ করছেন। নীতিবোধ ও মানবতাবোধের অভাবে তাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। আভিজাত্যের দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি জাহেলিয়া যুগে আরব চরিত্রকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। পাপাচার, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার আরবের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে কলুষিত করেছিল। যেমনটি কবি বলেছেন:

মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ; নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম!
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু ![১৮৩]

পৃথিবীর সর্বত্রই অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-জুলুম বিস্তার লাভ করেছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশ অবধি পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, এমনকি আরব উপদ্বীপ তথা মক্কানগরীর নর-নারীরা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অসারতায় নিমজ্জিত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত ছিল। সামাজিক অসাম্য, মদ্যপান, জুয়াখেলা, কলহ-বিবাদ, খুন-জখম, লুণ্ঠন, নরবলি ইত্যাদি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাত্রা এবং সুশৃংখল ও সুসংহত শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পাপাচার, ব্যভিচারে নিমজ্জিত মানবতা তখন স্বভাবতই নৈতিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। গোত্রীয় সমাজে শিশু হত্যার প্রথা বিশ্বের অন্যত্রও বিদ্যমান ছিল। প্রায় সাত শতাব্দী পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের আগে যে অবস্থা ছিল এ সময়ের পাপাচারের অবস্থা তার চেয়েও মারাত্মক ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর

---

১৮২. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২০।

১৮৩. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাবের পূর্বকালীন আরব তথা বিশ্বজগতের এহেন চিত্র কাজী নজরুল ইসলাম সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়:

এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা-এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ।
এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জাজিরাতুল আরবে'।
পাপের বাজারে করিতে বেসাতি সমান পুরুষ-নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল না কো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যভিচার-লীলা নির্লাজ নির্ব্বেদ।[১৮৪]

হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং দীর্ঘ যুগ পরে হযরত ঈসা (আ.) মানব সমাজে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করে প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) এর উর্ধ্বারোহণের পর আরব জাহান ঘোর পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়। তাদের ধর্মীয় জীবন ঘন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মূর্তি উপাসক ও প্রকৃতি পূজারী আরববাসীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কল্পিত দেব-দেবী প্রস্তুত করে সেগুলোর অর্চনা করতো। লোকেরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ , তারকা, নক্ষত্র, প্রস্তর খণ্ড এবং বৃক্ষরাজিকেও পূজা করতো। ভূত-প্রেতাদি এবং অশরীরী প্রাণীর উপরও তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। যে পূতঃপবিত্র কা'বাগৃহ হযরত ইবরাহীম (আ.) একমাত্র নিরাকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, সেই খোদ কা'বাগৃহে পৌত্তলিক আরববাসী কালক্রমে ৩৬০ টি দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং বিবি মরিয়ম (আ.) এর প্রতিমাও কা'বাগৃহে স্থাপন করেছিল। প্রতিবৎসর তারা এ সব দেব-দেবীকে অর্ঘ্য দিতে আসত এবং দেবতার মনতুষ্টির জন্য নরবলি দিত। তারা এত বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে, তারা কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তাঁদের সাহায্যে দেব-দেবীর সাথে পরামর্শ করতো। দেব-দেবী পূজা অর্চনার জন্য আরব দেশে অসংখ্য মন্দির ছিল। কিন্তু আরবরা কা'বাগৃহেকে তাদের পবিত্র উপাসনা মন্দির বলে মনে করত। এমনিভাবে প্রাক-ইসলামী যুগের মানব সমাজ তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ ত্যাগ করে কল্পিত দেব-দেবী, প্রতিমা-মূর্তিপূজা ও ভূত-প্রেত সাধনারত ছিল। আইয়্যামে জাহেলিয়্যার এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপের চিত্র কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার উপমায় অংকন করে বলেছেন,

চরণে দলিত কর্দ্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর।
আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত!
শয়তান ছিল বাদশাহ্ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা।
বিনি সুদে সেথা হ'তে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা।...
এমনি আঁধার গ্রাসিয়াছে যার পৃথ্বী নিবিড়তম-
উর্দ্ধে উঠিল সঙ্গীত, "হ'ল আসার সময় মম!"[১৮৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের ধর্মবিশ্বাস ছিল আদিম প্রকৃতির এবং তারা ছিল জড়বাদী। আরবদের তথা সমগ্র বিশ্বের নৈরাশ্যজনক ধর্মীয় অবস্থা কোন এক ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচনা করছিল। ইতোপূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে কখনো একজন মহান ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের সময় ও প্রয়োজন এত অধিক অনুভূত হয়নি। অবশেষে আরব জাহান তথা পৃথিবীর এহেন চরম দুর্দিনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে আগষ্ট, ১২ই রবিউল আউয়াল,

---

১৮৪. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২৩।

১৮৫. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

সোমবার, প্রত্যূষে ঘন তমসাচ্ছন্ন বিশ্বের বুকে অমানিশা বিদূরিত করে আলোর বার্তা নিয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বমানবতার মহান মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। ধরনীকেন্দ্র পবিত্র মক্কানগরীতে বিবি আমিনার গর্ভে জন্ম নিলেন নবজাত শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এসময় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব, পিতা আবদুল্লাহ ও মাতা আমিনার জয়গানে পৃথিবী মুখরিত হয়ে উঠলো। কবির ভাষায়:

ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল শশী
নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিলো গো উচ্ছ্বসি!
ছুটিয়া আসিল গ্রহ তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশু চাঁদেরে পুলক লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে, পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় ক'রে এল নিতে সুধার প্রসাদ! ...
পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কা'বা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনী, "মার্হাবা ! মার্হাবা!!"[১৮৬]

মা আমিনার স্বপ্ন

গর্ভবতী মা আমিনার চোখে অনাগত দিনের স্বপ্ন ; একদা রাত্রিকালে তিনি দেখলেন যেন এক অপরূপ জ্যোতি তাঁর সূতিকাগৃহ থেকে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। সেই নূরের জ্যোতির প্রভাবে সুদূর বসরা নগরী আলোকিত হল। পারস্যের অধিপতি নওশেরোয়ার প্রাসাদের শীর্ষচূড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ল। রোমান সম্রাট কায়সার খসরু পারভেজের হাত থেকে তরবারী খসে পড়লো। নিখিল বিশ্বের মূর্তি পূজার প্রতিমা ঠাকুর যেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি গেল। স্বপ্নভঙ্গের পর মা আমিনা তাঁর কোলের মাঝে পেলেন এক নূরের জ্যোতির্মন্ডিত নবজাত শিশু।

টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরী নাই, আগমনী গায় গুলবাগে বুল্‌বুল্।
কি এক জ্যোতি শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব চেতনা ল'য়ে
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি' যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্য্যের মিহির লহর তোলে!
শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।[১৮৭]

সারা পার্থিব জগত ব্যথিত হয়ে তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। সাগর, পর্বত, মরুভূমি, উদ্যান তাঁর জন্য তপস্যা করেছে। অবশেষে ধরাধামে তাঁর শুভ আগমনে আরব বিশ্বে প্রবাহিত হল অজস্র ধারায় খুশী ও আনন্দের অশেষ জোয়ার। তাই কবি অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক বলেছেন:

"মার্হাবা	সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী।"
গাহিতে	নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হ'ল বিশ্ব-কবি।
আসিল	বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল	অন্ধ গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল	বন্যাধারায় 'দজলা' 'ফোরাত' কন্যা মরুর,
সাহারায়	নৌবতেরি বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।[১৮৮]

---

১৮৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২৪।

১৮৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃহীন শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্যজীবন অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তাই এ নশ্বর জগতে জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহীন হয়েছেন। আর তাঁর মাতা আমিনা বিধবা হয়ে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) এর বাল্যজীবনের এই বেদনাদায়ক বিয়োগান্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটকে নিয়ে মরু-ভাস্করের 'আলো-আঁধারি' অংশটুকু রচিত। কবির ভাষায়:

শু'নে হাসি পায় এত শোকে হায়! বিশ্বের পিতা যার
"হাবিব" বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার !
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময়-
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে-বার বার
ঘোষিল সে যেন, আমি তাই সাথী পিতাহীন সবাকার![১৮৯]

কবি এখানে বলেন যে, স্বজনহারার বেদনা ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে খোদার পিয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন হয়েছে সুন্দর ও মহৎ। নবী করীম (সা.) এর জীবনের এ বাস্তব রূপটিকে কবি মেঘ মুক্ত সূর্য, বর্ষা বিধৌত পুষ্প ও কন্টকিত মৃণালের সাথে তুলনা করেছেন। উৎপীড়িত মানুষের মুক্তিদাতা আবির্ভূত হলেন। অবশেষে দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে তাই চতুর্দিকে শোকের ছায়ায় মানবতার ক্রন্দনধ্বনি নিভৃতে অনুরণিত হল। আর চিরদুঃখী হয়ে নবীজি পৃথিবীর সকল মানুষের সমব্যথী হয়েছেন। পিতৃহীন শিশুকে আপন বুকে চেপে ধরে অকাল প্রয়াত স্বামী বিয়োগ-বিধুরা নবী জননী বিবি আমিনার চোখ হয়েছিল অবিরাম-অশ্রুসজল। কিন্তু বিশ্ব মানবতার পরিত্রাণকারী মহান বন্ধু কোন বিশেষ মানুষের ভালবাসায় আবদ্ধ হতে পারেন না। কবির লেখনীতে এ অবস্থাটির বর্ণনাও অপূর্বরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে;

কাঁদিছে আমিনা, হাসিছেন খোদা, "ওরে ও অবুঝ মেয়ে
ডুবিয়াছে চাঁদ উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখ্ না চেয়ে,
ভুবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে,
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি, ওরে !
ঘর সে কি ধরে বিশ্ব আলোকে উঠিবে ছেয়ে ?
নিখিল যাহার আত্মীয়-ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে? [১৯০]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের এই পরিনাম ভাল-মন্দ সবকিছুই ছিল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাকৃত। তাই মা আমিনা তাঁর প্রাণপ্রিয় স্নেহের মরু দুলালকে বিশ্বমানবের কাছে উপহার দিলেন;

কহিল জননী আপনার মনে মনে,-
"আমার দুলালে দিলাম সর্বজনে!"[১৯১]

---

১৮৮. মরু-ভাস্কর, পৃ. ২৭।

১৮৯. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩০।

১৯০. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩১।

১৯১. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নামকরণ

'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থের 'দাদা' অংশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ও নামকরণের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর অকাল মৃত্যু-শোক রাত-দিন নবীজির দাদা আবদুল মুত্তালিবকে পীড়িত ও ব্যথিত করে। বিধবা পুত্র-বধু আমিনার দিকে তাকালে দুঃখ-বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বিবি আমিনাকে মনে হয় শোকের শুভ্র শিখা । তাই মা আমিনার গর্ভজাত শিশু পুত্রের দিকে দাদা আবদুল মুত্তালিব গভীর প্রত্যাশা নিয়ে উন্মুক্ত হয়ে আছেন;

ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি' যায় যেন-ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ঐ আমিনার মনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে সে অধিষ্ঠান।
দিন গোণে মনে মনে আর কয়, "বাকী আর কতদিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন! [১৯২]

অবশেষে দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশা বাস্তবে রূপ লাভ করল। পিতৃহীন শিশুনবী ভূমিষ্ট হওয়ার রাত্রিকালে দাদা আবদুল মুত্তালিব অপূর্ব দৃশ্য স্বপ্নে দেখলেন-যেন শত স্বর্গের পাখী চন্দ্রালোকের ন্যায় বিবি আমিনার ঘর আলোকে জ্যোতির্ময় করছে। দাদা নবজাত শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পবিত্র কা'বাগৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করলেন। আবদুল মুত্তালিবের সাথে মক্কার কুরাইশ গোত্রের সর্দাররাও বিবি আমিনার পুত্রের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করলেন। সাতদিন পর আরবের অভিজাত গোত্রীয় প্রথানুযায়ী 'আকীকা উৎসবে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব নবজাতক শিশু পৌত্রের নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ' (প্রশংসিত)। কবির ভাষায়:

কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি' নিখিলের সম্পদ-
"নয়নাভিরাম! এ শিশুর নাম রাখিনু !মোহাম্মদ' ।"[১৯৩]

এ অভিনব বিস্ময়কর তাৎপর্যপূর্ণ নাম শুনে সকলেই বিশেষতঃ আরবের কুরাইশরা চমকে উঠলো। বনী হাশিমের গোষ্ঠীতে ইতোপূর্বে তারা এ নাম কখনো শুনেনি। তাই তারা হতবাক হয়ে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কাছে এই নাম রাখার যথার্থ কারণ জানতে চাইল। এ বিষয়টি আলোকপাত করে কবি বলেছেন:

আঁখিজল মুছি' চুমিয়া শিশুরে কহিল পিতামহ-
"এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি 'মোহাম্মদ' যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ।"[১৯৪]

হযরতের গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতা আমিনা নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন 'আহমাদ' (চরম প্রশংসাকারী)। নবী জননী স্বপ্নে শিশু পুত্রের এ নামে নামকরণের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কবি লিখেছেন;

নাম শুনি' কহে আমিনা-"স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
'আহমদ' নাম রাখি যেন ওর।" "জননী, ক্ষতি কি তাতে,"
হাসিয়া কহিল পিতামহ, "এই যুগল নামের ফাঁদে

---

১৯২. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৩।

১৯৩. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৫।

১৯৪ . মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধিয়া রাখিনু কুটীরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে
একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দু'টি সে নামের ফুল,
একটি নদী মাঝে বয়ে যায়, দুই ধারে দুই কূল![১৯৫]

ধাত্রীমাতা হালিমার গৃহে নবজাত শিশু মুহাম্মদ (সা.)

মহানবী হযরত (সা.) বাল্যকালে ধাত্রীগৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। শিশু নবীর ধাত্রীগৃহে লালন-পালনের বিষয়টি নিয়ে 'পরভৃত' অংশটি রচিত হয়েছে। সে যুগে সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার বেদুঈন ধাত্রীর কাছে অর্পিত হতো এবং কয়েক বছর মরুভূমির মুক্ত প্রান্তরে ও স্বাধীন পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার পর স্বগৃহে ফিরিয়ে আনা হতো। তাই প্রাচীন আরবের অভিজাত সম্প্রদায় সমূহের গোত্রীয় প্রথানুসারে নবী জননী বিবি আমিনা তার দু' সপ্তাহের নবজাত শিশুপুত্রকে নির্ভয়ে বেদুঈন ধাত্রী মাতা বিবি হালিমার ক্রোড়ে সোপর্দ করলেন। কবির ভাষায়:

আরবের যত "খান্দানী" ঘরে বহুকাল হ'তে ছিল রেওয়াজ,
নব-জাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ;
ধাত্রীর কোলে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লীতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রী মায়।[১৯৬]

তৎকালীন আরবদেশে ধাত্রীরা সাধারণতঃ মরু অঞ্চলের বেদুঈন পল্লীতে বসবাস করত। এই পল্লীগুলো ছিল শহরের কোলাহলময় স্থান থেকে অনেক দূরে। যেখানে ছিল শান্ত, শ্যামল, নির্জন, স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই গ্রাম্য পল্লীর বেদুঈন গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মু'আল্লাকা রচয়িতা প্রাক-ইসলামী যুগের আরব কবিগুরু ইমরুউল কায়স (৫০০-৫৪০ খ্রি.), আমর বিন কুলসুম (৫৫৪-৬৬৮ খ্রি.) এর মত বিখ্যাত কবি। সে যুগে শহরের ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে প্রায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। শহরের কাব্যকলারও তেমন চর্চা ছিলনা। আরব মরুদ্যানের বেদুঈনরাই কেবল বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কাব্যকলার সাধনা করত। এই বেদুঈন গোষ্ঠীতে অবস্থান করেই শিশু মুহাম্মদ (সা.) সুমিষ্ট আরবী ভাষা সম্পদ শিক্ষালাভ করেন। কবির ভাষায়:

আরবের যত গানের কবিরা 'কুলসুম' 'ইমরুল কায়েস'
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ।...
আরবের প্রাণ, আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।[১৯৭]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের বছরে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরব দেশের মরু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আকাল দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধাতুর মরুভূমির পল্লীবাসীরা অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান আর কর্মসংস্থানের আশায় ছুটে এল মক্কানগরীতে। ইত্যবসরে বনী সা'দ নামক আরব বেদুঈন গোষ্ঠীর ভাগ্যবতী ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা মক্কায় এসে নবজাতক শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সানন্দে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। শিশুপুত্রের বিদায়বেলায় মাতা আমিনা আর দাদা আবদুল মুত্তালিব বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। পক্ষান্তরে ধৈর্যশীলা ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার ঘরে তখন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। এ সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

যে বছর হ'ল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়...
শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লী দূর,

১৯৫. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৬।

১৯৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৮।

১৯৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছায়া করে চলে সাথে সাথে তার উর্ধ্বে আকাশে মেঘ-মেদুর।
নতুন করিয়া আমিনা জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে দলিজে মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল।[১৯৮]

শিশুনবীর শৈশবকালীন ধ্যানমগ্নতা

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে নবীজির শৈশব-লীলার কল্প-চিত্র এঁকেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বিস্তৃত দিগন্তের লীলাভূমির মাঝে শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শৈশব আরবের মরুচারী বেদুঈন পল্লীতে কাটতে থাকে। দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর ঘুরে আসে। মরু অঞ্চলের চারণভূমির অদূরে স্তব্ধগিরি, সবুজ অরণ্যের সাথে গায়ে তার পুষ্প তনুকন্যা, যেন পর্বত উপত্যকার পাশেই ঝর্ণা বয়ে যায়। তার খুশবু জলধারার কলগুঞ্জনের কিসমিস বল্লরীতে পাখীরা সব কলকাকলীতে মুখর। কবি কল্পনায় তারই মাঝে পাহাড়তলীর প্রান্তরে উর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েলের গানে শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বড় হতে লাগলেন। ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার কুটিরে তার ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলাধূলা করে বেদুঈন জীবনধারার সাথে পরিচিত হচ্ছেন। তাদের সাথে ঘোরাফেরা করে হেসে-খেলে দিন কাটিয়ে তিনি আরব মরুদ্যানের মুক্তমাঠে, খোলা প্রকৃতির উন্মুক্ত কাননে যেন শুক্লা তিথির জ্যোৎস্না চাঁদের মত অপূর্ব হয়ে উঠছেন। 'শৈশব-লীলা' অংশের প্রারম্ভিক পর্বে কবি তাই বলেছেন:

খেলে গো　　ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়ে গো　　উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
　　সে বেড়ায়,　　হীরক নড়ে
　　আলো তার　　ঠিক্‌রে পড়ে!
ঘোরে সে　　মুক্ত মাঠে পল্লী বাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায়-　　শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দশী।[১৯৯]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখন পাঁচ বৎসরের বালক। এখনও তিনি দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহ ও অন্যান্য বেদুঈন বালকদের সাথে চারণভূমির অদূরে স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন পর্বতমালার পাদদেশে খেলে বেড়ান, কখনো বা তাদের সাথে রাখাল বেশে মেষ চড়াতে মাঠে যান। কিন্তু এটাই তাঁর পরিচয় নয়, মরুভূমির মেষ চালক রাখাল রাজা হয়েও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। পারবেন কি করে? তিনি যে ধরণীতে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করতে, নিখিল বিশ্ব-মানবতাকে মুক্তি দিতে এসেছেন। তাই সুন্দর মধুময় প্রাণবন্ত পরিবেশে 'রাখাল নবী' মেষ চড়াতে গিয়ে কি জানি কি ভেবে আনমনা হয়ে পড়েন। কখনো বা এই মনোরম প্রকৃতির দিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। খেলাধূলা বা কোন কিছুতেই তার মন বসে না। কোন সুদূরের বাণী যেন তিনি অদৃশ্য থেকে শুনতে পান। কে যেন তাঁকে ডেকে ডেকে কিসের সন্ধান দিয়ে যায়। নিখিল প্রকৃতির দিকে চেয়ে উদাস ভঙ্গীতে প্রায়শঃ তিনি ভাবতে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে যান। কবির ভাষায়:

অচপল মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় ব'সে সে
খেলাতে মন বসে না যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে,
　　অসীম এই বিশাল ভূবন
　　ও গো তার স্রষ্টা কেমন!
কে সে জন করল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা?
মেষেরা যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।[২০০]

---

১৯৮. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৪০।

১৯৯. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সা.) এর অবিচল ধ্যান-মৌনীরূপ মুক্তির আভাসও এই পর্বেই পাওয়া যায়। তাঁর শৈশবের আচরণে কতগুলো অদ্ভুত অলৌকিক মু'জিযার প্রকাশ পায়। শৈশব-লীলায় খেলাধূলার মাঝে ও তাঁকে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়। বালক মুহাম্মদ (সা.) এর এহেন ধ্যানমগ্নতা, মৌন-গম্ভীর গতি-প্রকৃতি দেখে ধাত্রীমাতা বিবি হালিমাও ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁর এই আনমনা উদাস ভাবভঙ্গী ধ্যান-মৌন গম্ভীর অবয়ব দেখে অনেকের মনে কৌতূহলী প্রশ্ন জেগে উঠেছে;

হালিমা ভয়-চকিতা রয় চে'য়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন পূর্ণজ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে, কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে, কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়!
কভু সে শিশুর মত
কভু সে ধেয়ান-রত!
একি গো পাগল তবে, কিম্বা ভূতে ধরল এরে,
এনে হায় পরের ছেলে পড়ল কি কু-গ্রহের ফেরে ![২০১]

ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা ভাবেন ছেলেটিকে হয়তো সত্যিই ভূতে ধরেছে। নানা দুর্ভাবনায় চিন্তা গ্রস্ত ও পীড়িত হয়ে অবশেষে তিনি স্বামীর কথামত শিশু মুহাম্মদ (সা.) কে বিবি আমিনার মাতৃক্রোড়ে ফেরত দিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে মক্কা নগরীতে নানা প্রকার রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় দাদা আবদুল মুত্তালিব পুনরায় শিশুনবী মুহাম্মদ (সা.) কে বিবি হালিমার কাছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠালেন। বিবি হালিমার পুত্র-কন্যারা দুগ্ধভ্রাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ফিরে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠল;

কহিলেন দাদা মুত্তালিব, "গো হালিমা শুন,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন !...
হালিমার বুকে খুশী ধরে না কো, নীলাঞ্চলে
হারানো মাণিক পুনঃ পেল তার ভাগ্যবলে !
হালিমার দুই কন্যা "আনিসা" "হাজিফা" ছুটি'
চুমিল খুশীতে মোহাম্মদের নয়ন দু'টি !
মোহাম্মদ সে আবদুল্লাহর কণ্ঠ ধরি
বলে "আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি!"[২০২]

ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক শিশুনবীর হৃদয়-উন্মোচন

শৈশবপর্বে শিশু মুহাম্মদ (সা.) রাখাল-নবী হয়ে কবি নজরুল ইসলামকে বিমুগ্ধ করেছেন। এখানে ভক্তিরসের চেয়ে বাৎসল্যরসই প্রবল হয়ে উঠেছে। আপন ভোলা শিশুনবী মেষ চড়িয়ে বেড়ান আরব মরুভূমির পথে-প্রান্তরে, তাঁর ক্রীড়া-চাঞ্চল্যে চারণভূমি মুখর হয়ে উঠে। বালক মুহাম্মদ (সা.) পল্লীর রাখাল ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করেন, কিন্তু ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার স্নেহ কাতর মন উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর পথের পানে চেয়ে থাকে। এমনিভাবে হঠাৎ একদিন কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তিনি সাথীদের সঙ্গ ছেড়ে পলকে কোথায় যেন অন্তর্হিত হলেন। কেউ তাঁর সন্ধান বলে দিতে পারল না। তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে পাগলিনীর বেশে উদ্বিগ্ন বিবি হালিমা বালক মুহাম্মদ (সা.) এর খোঁজে মরু প্রান্তরে

---

২০০. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৪৬।

২০১. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৪৬।

২০২. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছুটে গেলেন। অনেক তল্লাশীর পর একটি গাছের তলায় তাঁকে বেহুশ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেল। চমক বিস্ময়াকুল আত্মহারা যেন কার ডাকে বালক মুহাম্মদ (সা.) মরুপ্রান্তরে অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। এই সময় শিশুনবীর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়। মাঠে মেষ চড়াবার কালে ফেরেশ্‌তা এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বক্ষ বিদীর্ণ করে অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পুতঃপবিত্র করে যান। বক্ষ বিদীর্ণ করার সময় বালক মুহাম্মদ (সা.) সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়েন। সহসা তাঁর চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছিল। দিবা স্বপ্নে তিনি এক জ্যোতির্দীপ্ত আলোর অঙ্গ দেখতে পেলেন। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর মরুভাস্করের 'শাক্‌কুস সাদর' অংশে শিশুনবীর বক্ষ বিদীর্ণকরণ তথা হৃদয় উন্মোচনের ঘটনা চিত্রণপূর্বক ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে বেহেশ্‌তের পানিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তনু, মন ও দিল ধৌত করার দৃশ্যরূপ নবীজির জবানীতে এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ নিজেকে ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলে ঘোষণা দিলেনঃ

ঐশী বাণীর আমিই বাহক, আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল
বেহেশ্‌ত হ'তে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্! ....
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির ! হ'ল না আমার কোন যন্ত্রণা কোনো সে ভয়।
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনা রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে জমাট মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র "আব -জমজম্" দিয়ে জিব্রাইল,
বলিল, "আবার হল পবিত্র জ্যোতির্ময়ান তোমার দিল।[২০৩]

নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে রাখাল বালক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখ-নিঃসৃত এই অলৌকিক কথায় কেউ এর মর্মার্থ বুঝতে পারল না। পাড়া-প্রতিবেশী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে ভাবল নিশ্চয়ই তিনি পর্বত গুহায় জ্বিন-পরী বা ভূতগ্রস্ত হয়েছেন। বিস্ময়াকুল বিবি হালিমার মন তখন আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।তিনি এর কি অর্থ হতে পারে উপলব্ধি করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন। তার মনে ভয়-ভীতির শিহরণ লাগলো। অবশ্য ক্রমে ক্রমে শিশুনবীর উজ্জ্বল অদৃষ্ট যেন ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার দিব্যদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হল। তখন তিনি ধারণা করলেন যে, এই বালক তো সাধারণ কোন ছেলে নয়, ভবিষ্যতে এই বালক দুনিয়ার বুকে অসাধারণ হয়ে জগতের মুখ উজ্জ্বল করবে তাই তিনি অশেষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে শিশুনবীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন দিয়ে প্রাণভরে দু'আ ও আশীর্বাদ করলেন। কবির ভাষায়ঃ

বারে বারে চায় বালকের চোখে-ও যেন অতল সাগর-জল,
কত সে রত্ন মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল!
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, "যদি হস্ বাদশা তুই?
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে ? পড়িবে মনে এ পল্লী ভূঁই?"
"মাগো মনে র'বে!" হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা'র;
ভবিষ্যতের দফ্‌তরে লেখা রহিল সে কথা
ও বাণী যেন খোদ খোদার ![২০৪]

---

২০৩. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫২।

২০৪. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ধাত্রীগৃহ থেকে মাতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন

ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার গৃহে শিশুনবীর পাঁচ বছর যেন দ্রুত অতিবাহিত হয়ে গেল। সহসা একদিন মরু প্রান্তরে আকস্মিক একটি মেঘের ছায়া দেখে বালক মুহাম্মদ(সা.) আপন জননী আমিনার কাছে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। এদিকে শিশুপুত্রের জন্য বিবি আমিনার মাতৃহৃদয়ও কেঁদে উঠল। তিনি পুত্রকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। বিবি হালিমাও তখন বালক মুহাম্মদ (সা.) এর উতলা ভাব দেখে তাঁকে সুদূর মক্কায় জননীর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনন্তর মাত্র ছয় বছর বয়সে বালক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধাত্রীগৃহ থেকে মাতৃগৃহে বিবি আমিনার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। আরব বেদুঈনগোষ্ঠী থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায়ক্ষণের দৃশ্যরূপ কবি কল্পনায় চিত্রিত হয়েছে এভাবে;

কাঁদিতে লাগিল মরু-পল্লীর মাঠ ও বাট,
ভাঙ্গিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালী নাট।...
আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন,
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্ঠি-যখের ধন।[২০৫]

শিশুপৌত্র মুহাম্মদ (সা.) কে ফিরে পেয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিবের আনন্দের আর সীমা নেই। তিনি বালক নবীকে কাঁধে তুলে নিয়ে খোদার আশীষ লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বাগৃহে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বংশধরের নিরাপত্তার জন্য প্রাণভরে প্রার্থনা করলেন। এ সময় দীর্ঘদিন পরে গর্ভজাত সন্তানকে কাছে পেয়ে মা আমিনার মনে প্রাণপ্রিয় স্বামী আবদুল্লাহর অকাল প্রয়াণের বিয়োগ-ব্যথার স্মৃতি ডুকরে কেঁদে উঠে। বিধবা আমিনার স্বামী হারানোর দুঃসহ বেদনার কথা কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ করেছেন;

কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙিনায়,
আমিনার মনে স্বামী স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।...
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,
যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায় "দিদার"।
যে কবর-তলে আছে সে লুকায়ে সেই কবর
জিয়ারত করি' পুছিবে স্বামীরে তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্বার?[২০৬]

পিতার কবর যিয়ারতে মদীনাগমন

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আপন পুত্রকে স্বামীর কবর যিয়ারত করার এক দুর্বার সাধ মাতা আমিনার মনের গহীনে জেগে ওঠে। তাই স্বামী আবদুল্লাহর মৃত্যুর মাসে শিশুপুত্র মুহাম্মদ (সা.) কে সাথে নিয়ে মা আমিনা তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দশ্যে মদীনা মুনাওওয়ারায় সফরে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসালেন। বালক মুহাম্মদ (সা.) শুধু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আর মা আমিনা পিতৃহীন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আরো অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেন এবং তাঁর স্বামীর স্মৃতি দ্বিগুণ বেগে জেগে ওঠে তাঁকে আকস্মিক ব্যাকুল করে তুলে। মা তাঁর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বামীর কবরে চুম্বন করে আবারো কেঁদে উঠেন। মায়ের মর্মভেদী কান্না দেখে বালক মুহাম্মদ (সা.) এর পিতৃশোকে ক্রন্দন করার বাস্তব চিত্রকল্পটি কবির লেখনীতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে,

---

২০৫. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫৫।

২০৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌মদে ল'য়ে আমিনা মা চলে মদিনা ধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম!...
কতশত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে !
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী, হায়
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী প্রায়!...
মা'র দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে- "মাগো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর?"[২০৭]

৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কবর যিয়ারত করে চোখের পানি মুছতে মুছতে মদীনা হতে সুদূর মক্কা নগরীতে ফেরার পথে সহসা মা আমিনা মরুভূমির মধ্যে 'আব্‌ওয়া' নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বুকে দারুণ ব্যথা অনুভব করলেন। মুহূর্তে বুকে যন্ত্রণা নিয়ে তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরপারে চলে গেলেন। কি করুণ হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা! পিতা নেই, মাতাও নেই। পথিমধ্যে সঙ্গে কোন আত্মীয়স্বজনও নেই। পরিচারিকা উম্মে আয়মন ও একটি উট কেবল সাথে আছে। বালক নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এহেন দুরাবস্থা দেখে পাষাণও বুঝি গলে যায়। এই দারুণ দুঃসময়ে মাতা আমিনার আকস্মিক ইন্তেকালের পর ইয়াতীম বালক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরম অসহায়ত্বের দৃশ্যটি 'সর্বহারা' অংশটিতে যথার্থভাবে চিত্রায়িত হয়েছে;

আবদুল্লাহ্‌ গিয়াছিল, গেল আমিনা আজ
মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন।
দরদ মুলুকে বাদশাহ্‌ শিরে বেদনা আজ
উন্নত শির বীর প্রাচীন।....
ব্যাধ ভয়াতুর শিশুপাখী সব তবু বালক
জড়াইয়া পিতামহেরে তার,
জননীর চ'লে যাওয়ার পথে চাহে নিস্পলক-
ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার ! [২০৮]

সর্বহারা ইয়াতীম বালক মুহাম্মদ (সা.)

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর বিবি আমিনার অকাল মৃত্যুতে একশ আট বয়সে বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মুত্তালিব বালক মুহাম্মদ (সা.) কে বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে করতে গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহর অনাথ ইয়াতীম এবং একমাত্র স্মারক এই পুত্র সন্তানের প্রতি এমনিতেই পিতামহের স্নেহ-মমতা ছিল অপরিসীম উপরন্তু পৌত্রের সদগুণ, সদাচার ও বুদ্ধিমত্তা তাঁকে তার প্রতি আরো অধিক আকৃষ্ট করে তুলেছিল। শুধুমাত্র পরিবারের অকৃত্রিম পরিবেশই নয়, বরং বাইরের গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানাদিতেও তিনি প্রায়ই পিতামহের পাশে থাকতেন। কিন্তু পিতামহের স্নেহক্রোড়ে কোনমতে দু'টি বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তিনিও চিরতরে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করলেন। মাত্র আট বছর বয়সে মনমানসিকতায় কঠোর আঘাত হেনে তাঁর জীবনকে একেবারে গোড়া থেকে মজবুত করে তোলাই ছিল যেন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় একে একে সকল বন্ধনই কেটে গেল। এমনিভাবে বালক নবীর দুঃখের পেয়ালাও বুঝি কান্নায় কান্নায় পরিপূর্ণ হল। পিতা-মাতা, পিতামহ প্রিয়জন সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব ইয়াতীম বালক মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বহারা। ফলে ভাগ্য

---

২০৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫৭।

২০৮. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয় ও দুঃখ-দৈন্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনকে সংবেদনশীল করে তুলেছিল। কবি নজরুল ইসলাম এহেন দুরাবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেনঃ

মাতৃগর্ভে শিশু যবে- হ'ল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়
ষষ্ঠ বয়সে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন
জীবন কেবলি যাত কঠোর।
পুনঃ অষ্টম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয় ....
এমনি করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবী
ভাবে তারি কথা, এই রহস্য যার সৃজন-
আঁধার যাহার-যার রবি ![২০৯]

পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে শামদেশে বাণিজ্য যাত্রা

পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হযরত মুহাম্মদ (সা.) কৈশোর জীবনে পদার্পণ করলেন। সবার মধ্যে থেকে তিনি উদাসীন, আনমনা। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় সব হারিয়ে সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে বেদনার পর বেদনা পেয়ে কিশোর নবী সত্যসন্ধানী হয়ে উঠেছেন। কোন কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন না। ঘরবাড়ীর মায়ামমতা ও আর তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারছে না। মরুময় আরব প্রকৃতিতে তিনি সত্য সুন্দরের অনুসন্ধানে কেবলি হেরা পর্বতের গুহায় সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ধ্যান মৌনীরূপ দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন এক জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়াস চালাচ্ছেন । তিনি যে ভাবী নবী তাই তাঁর বুকে অসীম অনন্তের বুঝি ডাক এসেছে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যে নিমগ্ন হওয়ার কাহিনী ধরা পড়েছে, চোখে তাঁর অপরূপকে দেখার দুর্বার আসক্তি জেগেছে। তাই সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বারো বছর বয়সে চাচা আবূ তালিবের সাথে বাণিজ্য কাফেলায় যাত্রা করলেন। শামদেশ তথা সিরিয়া যাওয়ার সাথে সাথে সেখানে সাড়া পড়ে গেল। কিশোর-নবী তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিবের সাথে দু'বার শামদেশে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়েছিলেন। কিশোর নবীর মরু পথে চাচার সাথে উটের পিঠে বাণিজ্য যাত্রা কবি কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ঐকান্তিক আগ্রহে এই বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের তৃতীয় সর্গ 'কৈশোর' পর্বে লিখেছেন;

রূপ দেখেছে অনেক তা'রা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক!
আসল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল
"মোহন" ধ্যানে দেখলে যারে, রূপ ধরে কি সেই মাণিক ?
আসল মানব-ত্রাণের তরে কিশোর ছেলে এই বণিক?[২১০]

ধর্ম যাজক 'বোহায়রা' কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনবার্তা

হিজায প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরকালীন সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাস ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থান বসরা নগরীতে 'বোহায়রা' নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে নয় বছরের

---

২০৯. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৬১-৬২।

২১০. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বালক মুহাম্মদ (সা.) এর সাক্ষাত হয়। কথিত আছে, খ্রিষ্ট ধর্ম যাজক 'বোহায়রা' ধ্যানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন লক্ষণ দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন। তারপর তিনিই আরব কাফেলাকে জানালেন আখেরী নবীর শুভাগমন বার্তা। তাই যখন শামদেশে বাণিজ্য কাফেলায় 'অপরূপ এক রূপের কিশোর এর অলৌকিক রূপ দেখে সিরিয়াবাসী বিমুগ্ধ হয়েছিল তখন এ রূপের কিশোর দেখেই ঈসাই পুরোহিত বোহায়রা শেষ নবীকে চিনতে পেরেছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম সেই দৃশ্যটির চমৎকার চিত্রকল্প অংকন করেছেন;

কিশোর নবীর দন্ত চুমি 'বোহায়রা' কয়, "এই ত সেই-
শেষের নবী-বিশ্ব-নিখিল ঘুরছে যাহার উদ্দেশ্যেই
আল্লার এই বিশেষ 'রাসূল'
পাপের ধরায় পূণ্য ফুল,
দীন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত রূপ, নিখিল খুজে পায় না যেই।"[২১১]

ভবিষ্যতবক্তা জ্যোতির্বিদ খ্রিষ্টান পাদ্রী বোহায়রা ধ্যান-মগ্নতা শেষে জানালেন, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন সংবাদ অনেকের মনে হিংসা-বিদ্বেষের উদ্রেক করবে এবং তারা ঈর্ষাবশতঃ হয়তো তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে। বিশেষতঃ পৌত্তলিক ইয়াহুদীদের কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য খ্রিস্টান সাধু পিতৃব্য আবু তালিবকে উপদেশ দেন। তাই ধর্মযাজক বোহায়রার কথামত বণিকবেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সিরিয়া ত্যাগ করে মক্কা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। খ্রিষ্টান পুরোহিত বোহায়রার ধ্যান-ফিক্‌রের ফলশ্রুতির কথা কবি লিখলেন;

দেখেছি এর পিঠের পরে নবুয়তের মোহর সিল
চক্ষে ইহার পলক বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।
নবী ছাড়া কারেও গড়
করে নাকো পাষাণ জড় !
'নজুম' সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল-
এই সে মাসে, আমার ধ্যানে তাদের গোণায় আছে মিল।[২১২]

সত্যাগ্রহী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সন্ধি স্থাপন

তরুণ কিশোর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা নগরীতে ফিরে এসে পুনরায় রাখাল রাজা হলেন, তিনি পার্শ্ববর্তী পর্বতমালা ও উপত্যকায় মেষ ও উট চরিয়ে বেড়াতেন। প্রকৃতির সাথে একাত্মতা তাঁর হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত করেছিল। শৈশবকাল থেকেই হযরতের চিন্তাশীল মন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি বিশেষভাবে সজাগ ছিল। তিনি প্রায়ই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন এবং নীরবতা অধিক পছন্দ করতেন। কোমল স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলে তাঁকে খুব ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি সৎ গুণাবলীর জন্য তিনি 'আল-আমীন' اَلأَمِيْـنُ তথা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত হন। একদা উকাজ মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে নিয়ে একটি মামুলী ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবে শুরু হল ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী 'হারবুল ফিজার' حَرْبُ الْفِجَارِ তথা 'ফিজার যুদ্ধ বা অন্যায় সমর (Sacrilegiour War)। আরবের প্রায় সব গোত্র নেমে গেল সেই ভয়াবহ রণ-সংগ্রামে। ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ দেখে শান্তিকামী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, স্বগোত্র বনী হাশিমীর সাথে রণাঙ্গনে গেলেও তিনি শত্রু-

২১১. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৭১।
২১২. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মিত্র সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তিনি যুদ্ধে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধকালে শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর সংগ্রহ করা ও তা পিতৃব্যের হাতে পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁর কর্তব্য। তিনি যুদ্ধের বীভৎসলীলা ও নৃশংসতা লক্ষ্য করে ব্যথিত হলেন। যুদ্ধ ভূমিতে গিয়ে তরুণ নবী যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু এই আত্মঘাতী যুদ্ধে বহুলোক প্রাণ হারাচ্ছে দেখে তাঁর কোমল হৃদয় বিগলিত হত। মানবতার এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এর প্রতিকারের লক্ষ্যে তিনি গরীব, দুর্বল, অসহায় এবং মাজলুম জনগণকে জালিম ও সবল ধনীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ও আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্য তাঁর পিতৃব্য যুবাইর ও অন্য কয়েকজন উৎসাহী যুবককে নিয়ে ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি শান্তিসংঘ গঠন করলেন। এ সমিতির অন্তর্গত 'ফজল', 'কাজেল', 'ফাজায়েল' ও 'মুফাজ্জাল'- এই চারজন বিশিষ্ট সভ্যের নামানুসারে এটা 'হিলফুল ফুযুল' حِلْفُ الْفُضُوْل বা 'শান্তি সংঘ' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[২১৩] এমনিভাবে শত্রু-মিত্র সবার মাঝে নবীজির মধ্যস্থতায় সন্ধির মাধ্যমে বিবাদ-বিরোধের অবসান ঘটলো। কবির ভাষায় দৃশ্যটির রূপ চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে;

মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজী
সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেব-বাজী!
আল্লাহর নামে শপথ করিল হাজির সবে-
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম রবে।[২১৪]

দল-মত-গোত্র নির্বিশেষে আরবের জাতি ধর্ম, বর্ণ সকল নেতা এক বাক্যে শপথ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, নগর সীমার অভ্যন্তরে কারো উপর অন্যায়-অত্যাচার করতে দেয়া হবে না এবং সকলের সম্মিলিত সাহায্যের মাধ্যমে অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। হাতিয়ার ফেলে হাতে হাত রেখে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সবার মাঝে চারটি প্রধান শর্তে সন্ধি স্থির হল। কবির ভাষায় সেই চারটি শর্ত ছিল নিম্নরূপঃ

১. আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি'
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনা-ভাগী।
২. বিদেশীর মান সম্ভ্রম ধনপ্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নীচু।
৩. অকুণ্ঠচিত্তে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ-ফেরে।
৪. করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।[২১৫]

'শান্তি সংঘ' তথা 'হিলফুল ফুজুল' সন্ধির শর্ত মোতাবেক পরবর্তী দু'/চার বছরে আরবের মরুভূমিতে আর দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হল না। আরবের ইতিহাসে 'হিলফুল ফুজুল' প্রথম কল্যাণ সংস্থা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যত জীবনে যে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এহেন সাংগঠনিক তৎপরতাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যব্রতী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্ধির শর্তগুলো আজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে যথাযথভাবে পালন করেছেন। এমনকি দ্বিতীয় হিজরী সালে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের ময়দানেও তিনি চরম শত্রুদের পর্যন্ত নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করলেনঃ

---

২১৩. কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬, দশম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২-৩৩; হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯), পৃ. ৫৪-৫৫।

২১৪. মরু-ভাস্কর, পৃ.৭৫।

২১৫. মরু-ভাস্কর, পৃ.৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বহুকাল পরে পেয়ে পয়গম্বরী নবুয়ত
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।
ভীষণ 'বদর' সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন, "মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোন রে সবে,
যুদ্ধে বন্দী শত্রুরা আজ মুক্ত হবে![২১৬]

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুপম চরিত্র-মাধুর্য ও সত্যনিষ্ঠার কথা আরবের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। কবি সত্যাশ্রয়ী মুহাম্মদ (সা.) কে ধর্মপ্রচারক হিসেবে দেখলেও সেখানেই নজরুল ইসলামের দেখা শেষ হয়নি। কবি তাঁকে দেখেছেন প্রধানতঃ মানব প্রেমিক ন্যায়-সাম্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে। ধর্মগুরু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে এই নতুন দৃষ্টিতে দেখাই কবি নজরুল ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ধর্ম ন্যায় আর সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যএসেছে। কবির ভাষায়ঃ

অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হয়ে
বাঁচাতে এসেছে "ইসলাম" নিজে পীড়ন সয়ে।
ন্যায়ের বসাব সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার
মুসলিম সেই এই ন্যায়-নীতি ধেয়ান যাহার।[২১৭]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিবি খাদিজার সাক্ষাত

আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে বিবি খাদিজা আল-কুবরা (রা.) (৫৫৫-৬২০ খ্রি.) বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওয়াযা ইবনে কুসাই ইবনে মুররাহ্। মাতার নাম ফাতিমা বিন্‌তে যায়েদা। পিতা খুওয়াইলিদের মৃত্যুর পর তিনি পিতার বৃহৎ ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সাফল্যের ক্ষেত্রে নগরীতে মহিলা কেন, কোন পুরুষই তার সমকক্ষ ছিল না। তাঁকে 'মহিলা বণিক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। বিবি খাদিজা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সন্ধান করছিলেন। পরপর দু'জন স্বামীকে হারিয়ে তিনি বিধবার জীবন যাপন করছিলেন। এমনি এক সময় সন্ধিক্ষণে বিশ্বস্ত তরুণ ব্যবসায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরম বিশ্বস্ততা, সততা ও সত্যবাদিতার সুখ্যাতিতে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 'সাদিক' صادق তথা সত্যবাদী এবং 'আল-আমীন' الأمين বা বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে বিবি খাদিজা নিষ্কলুস ও পুতঃচরিত্রের জন্য সমগ্র মক্কায় 'তাহিরা' طاهرة বা সতী-সাধ্বী শুদ্ধাচারিণী নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কবির ভাষায়ঃ

পঁচিশ বছরী যুবক তখন নবী আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ-কুলের নয়ন-মণি।
"সাদিক" সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবীরে ভক্তিভরে,
যুবক নবীরে "আমীন" বলিয়া ডাকিত তখন আদর করে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি'
মোহাম্মদের আর সব নাম; কায়েম হইল "আমীন" বুলি।
"আমীন" "তাহিরা" সাধু ও সাধ্বী ইঙ্গিত ওগো খোদারই যেন,

---

২১৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৭৬।
২১৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদের হেন ![২১৮]

বিবি খাদিজা (রা.)এর আহ্বানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যথাসময় তাঁর পিতৃব্যের অনুমতি নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। বিবি খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে তাঁর বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। ব্যবসা সম্ভার ও বাণিজ্য সফরের সাফল্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধুর স্বভাবই সম্ভবতঃ বিবি খাদিজা (রা.) কে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রথম দর্শন করার পর খাদিজা (রা.) এর মনে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। বিবি খাদিজা (রা.) এর বয়স ৪০ বৎসর পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তরুণ। তবু বিবি খাদিজা (রা.) এর চিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হল। ২৫ বছরের যুবকের সাথে ৪০ বৎসর বয়স্কা মহিয়সী নারীর অনুরাগ কবির দৃষ্টিতে অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। তাই বিবি খাদিজা (রা.)কে নজরুল ইসলাম 'জুলেখা' এবং তরুণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে হযরত ইউসূফ (আ.) এর উপমায় চিত্রিত করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিবি খাদিজা (রা.) এর মানসিক বিহ্বলতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন;

বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায়
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে ওঠে, কোন মায়ায়!
"জুলেখা"র মত অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ "য়ুসোফ" যেন !...
নুতন বসনে নুতন ভূষণে সাজিয়া তা রে
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।[২১৯]

বিবি খাদিজা (রা.) কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব

পিতৃব্য আবূ তালিবের সম্মতিক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিবি খাদিজা (রা.) এর বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নতুন বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে শাম, ইয়ামন, মরুভূমি পার হয়ে হোবাশা, জোরশ কত পরদেশে বিদেশে সওদাগরি করেছেন, আর বিবি খাদিজা (রা.) নিশ্চিন্ত মনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তত্ত্বাবধানে বিপুল পণ্য সামগ্রী পাঠিয়েছেন আর অধীর আগ্রহে ঐ নবীন সওদাগরের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সততা, ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে বিবি খাদিজা (রা.) ঐ বাণিজ্য অভিযানে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। তাই হযরতকে তিনি পুরস্কার স্বরূপ সম্পাদিত চুক্তির দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করেন। এ সময় বিবি খাদিজা (রা.) এর হৃদয়ে অনুরাগের স্রোতধারায় জীবনের স্বপ্নসাধ আবার জেগে উঠল। তিনি ভাবী জীবনের এক নতুন পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিশ্বস্ততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও অন্যান্য সদগুণাবলীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট ও বিমোহিত হয়ে স্বেচ্ছায় সানন্দে তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সহচরী নাফিসা বিনতে উমাইয়া মারফত শাদী মোবারকের জন্য সাদর প্রস্তাব পাঠালেন;

কে রেখেছে সখি শহ্দ-শিরীন হেন মধুনাম- মোহাম্মদ !
হেজাজের নয়-ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ !
সব ব্যবধান যায় ঘুচে
বয়সের লেখা যায় মুছে
যত দেখি তত মনে হয় সখি আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দী করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদী-মোবারক-বাদী-সনদ।"
দূতী হ'য়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রাণী যারে চায় বুলন্দ-নসীব বলি তা'রে।[২২০]

---

২১৮. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৭৮।

২১৯. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচুর্যের অধিকারিণী বিবি খাদিজা (রা.) এর বিবাহের প্রস্তাবের কথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সানন্দে গ্রহণ করে পিতৃব্য আবু তালিবকে অবহিত করলেন। বিবি খাদিজা (রা.) এর বিবাহ প্রস্তাবে আবু তালিব অত্যন্ত আনন্দের সাথে এতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বিবি খাদিজা (রা.) এর পিতৃব্য আমর ইবনে আসাদ শুভ বিবাহের ইন্তেজামের জন্য পয়গাম পাঠালেন । বিবি খাদিজা (রা.) এর আনন্দিত রূপ অংকনে নজরুল ইসলামের চিত্রকল্পে বিবাহ স্থির হওয়ার পর বিবি খাদিজা (রা.) এর পুলকিত মনোভাব চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে;

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজার মনে সদা উচাটন বেপথু সলজ প্রেম-বিধুর।
প্রণয়-সূর্য্য হ'ল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ধ্যান ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর।[২২১]

শাদী মোবারক

অতঃপর বিপুল উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চল্লিশ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজা আল-কুব্‌রা (রা.) এর সাথে পঁচিশ বছর বয়সী তরুণ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভ বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হল। এভাবে 'আল-আমীন' ও 'তাহিরা'র সত্য ও পবিত্রতার শুভ মিলন ঘটল । উভয়ের বয়সের এহেন পার্থক্য তাদের আদর্শ দাম্পত্য জীবনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু বিবি খাদিজা (রা.) এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত মধুর ও সুখময় ছিল। বিবাহের পরে উভয়ের মিলন দৃশ্যকে প্রেম ও প্রকৃতির উপমা এবং চিত্রকল্পের প্রকাশ করে সম্প্রদান অংশে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন,

উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইয়া দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধরা দিল রাহু-মুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।[২২২]

এ বিবাহের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আর্থিক দুর্গতির অবসান ঘটে। অতঃপর তিনি পারলৌকিক চিন্তায় এবং আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত রাখার সুযোগ পেলেন। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে বিবি খাদিজা (রা.) স্বামীর মহৎ প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেন। নিদারুণ হতাশা ও দুঃখ-বেদনার সময় বিবি খাদিজা (রা.) ছিলেন নবীজির সান্তনার একমাত্র উৎস। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেছেন। দাম্পত্য জীবনেও ঘর সংসারের প্রতি তাঁর তেমন আসক্তি ছিল না। সর্বদাই তিনি চিন্তিত ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন। সমাজ সংসারের দুঃখ-বেদনা, পাপাচার, অনাচার তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করে। তিনি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান চিন্তায় সব সময়ই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এভাবে দিন যতই অতিক্রান্ত হতে থাকে নবীজির মন পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি ততই অনীহ হয়ে উঠতে থাকে এবং তিনি এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এবং একজন মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য যে স্তরের পুতঃপবিত্র হৃদয়ের প্রয়োজন, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পূর্ব থেকেই তিনি তা লাভ করেছিলেন। যদ্দরুণ তাঁর পবিত্র সত্তা সর্বদা সবাইকে যাবতীয় অন্যায় অসত্য প্রতিরোধে

---

২২০. মরু-ভাস্কর, পৃ.৮৭।

২২১. মরু-ভাস্কর, পৃ.৯০।

২২২. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করত। আর এ ধরনের পুতঃপবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই একজন সত্যিকার পথপ্রদর্শক ও সংস্কারক না হয়ে পারেন না। পৃথিবীর বেদনার্ত মরুভীর, অনন্ত দুঃখ, শোক, ত্যাগ-তিতিক্ষার অসীম অশ্রুজলের চেতনাই মানবকে মহামানবে রূপান্তরিত করে, মানুষের এহেন অপরিসীম দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করার জন্যই পয়গম্বরের আবির্ভাব। দুনিয়ার যে বিরাট বেদনা তরুণ মুহাম্মদ (সা.) কে পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.) এ পরিণত করেছিল, কবি নজরুল ইসলাম বিরাট অক্ষয় বটবৃক্ষের মধ্যে সেই যন্ত্রণার উপমা অনুসন্ধান করেছেন;

বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গ বেয়ে।
শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনা-ধাম।[২২৩]

কা'বাগৃহে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ সংস্থাপন

ইতোমধ্যে আরবের প্রাচীনতম কা'বাগৃহের মন্দির সংস্কার সাধন করা হল। ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার কাজের পর ঐ মন্দিরে 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' তথা কৃষ্ণ প্রস্তর সংস্থাপন নিয়ে আরবের কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ বেধে গেল। প্রাচীরের নির্মাণ কাজে নগরীর সকলেই পাথর বহন এবং তা স্থাপনের কাজে অংশ নিতে থাকে। প্রাচীরের নির্মাণের কাজ উচ্চতায় দেড় গজ পর্যন্ত পৌঁছুলে 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ'কে এমন একটি জায়গায় স্থাপনের প্রয়োজন অনুমিত হয় সেখান থেকে তা তাওয়াফকারীদের নজরে পড়ে এবং তারা সেটিকে সহজে চুম্বন করতে পারে। 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' ছিল একটি পবিত্র পাথর; একে যথাস্থানে স্থাপন করা ছিল একটি অতি সম্মানীয় কাজ। তাই 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' স্থাপন করে সবাই সম্মান ও গৌরবের ভাগীদার হতে চায়। শেষপর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে কা'বা মন্দিরের গৃহে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই সময় 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' টিকে একখানা চাদরের উপর রাখেন এবং প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিদেরকে সেই চাদরের এক এক কোণা ধরে পাথরটি সম্মিলিতভাবে উঠানোর আহ্বান জানান। এভাবে সকলে নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হলে তিনি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ'কে নিজ হাতে চাদর থেকে উঠিয়ে নিয়ে প্রাচীর গাত্রে স্থাপন করেন। এমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেদিন একটি অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধকে অতি সহজে প্রতিরোধ করেছিলেন। কবির ভাষায় :

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কা'বা-মন্দিরে
সর্বপ্রথম পশে উপাসনা-লাগি' আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চীৎকারি'-
"সম্মতি এরে মানিতে সালিশ-আমীন এ ব্রত-চারী!"
সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমীন, হেজাজে ধন্য!
তুমি রাখ এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য।"[২২৪]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারে সবাই তখন অত্যন্ত বিমুগ্ধ হল। সকলেই তাঁকে 'সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) বলে অভিহিত করল। তাঁর প্রশংসা মহিমা-গানে মক্কা নগরী মুখরিত হল। শুধু আরব জাহানই কেবল নয়, বিশ্ব মানবতাকে জাগরণী চেতনার জন্য শান্তি, প্রেম ও প্রশান্তির আশ্বাস দেওয়ার জন্য সকল আসমানী কিতাব তথা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল প্রভৃতি ধর্মীয়গ্রন্থে যার আগমনীবার্তা যুগ-যুগান্তর পূর্বে ঘোষিত হয়েছিল; সকল গ্রন্থ, কিতাব, যোগী, ধ্যানী, মুনী, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ, মহাজ্ঞানী যার অবির্ভাবের খবর বিশ্বময় প্রচার

২২৩. মরু-ভাস্কর, পৃ. ৯৫।

২২৪. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল, বেদনা সিন্ধু রোমন্থন শেষে সেই আখেরী নবী মানবতার ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কবি নজরুল ইসলাম 'সাম্যবাদী' আখ্যা দিয়ে তাঁর আগমনীবার্তা ঘোষণা করেছেন;

সকল কালের সকল গ্রন্থ কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর-আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবী অমৃতেশ !
হেরিল প্রাচীন ধরণী আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্তা আসিল, ভয় নাই , গাহ জয়!
যে সিদ্দিক ও আমীনে খুঁজেছে বাইবেল আর ঈশা,
তওরাত্ দিল বারে বারে যেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যাঁর অনাগত গীতি
যে "মহামর্দ্দে" অথর্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি।[২২৫]

কা'বাগৃহে মূর্তিপূজার অসারতা ঘোষণা

মানবতার অবমাননা, সত্যের অপলাপ, পাশবিকতার উন্মত্ত প্রকাশ এবং আরব সমাজের নানাবিধ পাপাচার হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হৃদয়কে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি এর সমাধানের পথ খুঁজতে লাগলেন। এজন্য তিনি প্রায়ই মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আদি উপাসনালয় সংস্কারের পর বায়তুল্লাহ তথা কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ও অঙ্গন-প্রাঙ্গণে মন্দিরে মহাসমারোহে সমগ্র গোত্রের অধিষ্ঠিত ৩৬০ টি দেবতার মূর্তি-প্রতিমা প্রতিকৃতি পূজিত হতে লাগল। এহেন মূর্তিপূজা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে অসহ্য ব্যাপার বলে মনে হল। তারপর শুরু হল হেরা পর্বতের গুহায় তাঁর নিবিড় ধ্যানমগ্নতা। আশা-নিরাশায় দীর্ঘ সময়কাল কেটে যায়, তবু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু ধ্যানী অটল, সুন্দরের তপস্যা তাঁর ফুরায় না তবু। এমনিভাবে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ১৫টি বৎসর কেটে গেল। অবশেষে একদিন তাঁর জয় হলই। মুক্তির মূলমন্ত্র এসে পৌঁছুল তাঁর হৃদয়-বন্দরে। প্রিয়তমা পত্নী বিবি খাদিজা (রা.) কে শোনালেন সেই মন্ত্র। কবির ভাষায়ঃ

খদিজারে কন-"আল্লা তা'লার কসম, কা'বার ঐ
লাৎ 'ওজ্জার' করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া।
কোন্ নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া।"[২২৬]

সতী-সাধ্বী স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন বিবি খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এহেন চিন্তাধারাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন প্রদান করলেন। যখন কেউই তাঁকে বিশ্বাস করেনি তখন তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। যখন কেউই তাঁকে সাহায্য করেনি তখন তিনিই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে কুরাইশরা জানতে পারল যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কা'বাগৃহের মূর্তি-প্রতিমাদের ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন না। উভয়ে তখন দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ

দূর কর ঐ লাত্ মানাতেরে, পূজে যাহা সব-জনে
তব-শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।"
ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল- মোহাম্মদ আমীন

২২৫. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১০২-১০৩।

২২৬. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

করে না কো পূজা কা'বার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।[২২৭]

এখানে 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের সমাপ্তি, বেশ খানিকটা নাটকীয় পরিসমাপ্তিই; কিন্তু পুরোপুরি নয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন পৃথিবীর প্রতি পূর্ণ আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিলেন তখনকার বর্ণনাও আর পাওয়া গেল না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখনী শক্তি এর আগেই নীরব হয়ে গেছে।[২২৮]

জীবনীকাব্য রচনা বিশেষতঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মত পয়গম্বরের জীবন চরিত অতি সহজ নয়। কারণ সেখানে কবি-কল্পনার অবকাশ কম নয়। কবি নজরুল ইসলাম তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের ইতিহাসকে অনুসরণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাক্কী ও মাদানী জীবন ঘটনাবহুল এবং সে সব সত্যিকার ঘটনায় কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্যজীবন খুবই বেদনাদায়ক। তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যু ঘটে, মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মা আমিনাকে হারান, আট বয়সে তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবও পরলোকগমন করেন। একটি কোমল প্রাণ বালকের জীবনে এসব বিয়োগান্ত ঘটনার গভীর ছাপ একে দেবে তা খুবই স্বাভাবিক। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্যজীবন নিয়ে রচিত 'আলো-আঁধারি' অংশটুকুতে কবি দারুণ সাফল্য অর্জন করেছেন।[২২৯]

'মরু-ভাস্কর' কাব্যের 'অবতরণিকা' অধ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যগুণমণ্ডিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব মুহূর্তটি পৃথিবীর জড়-অজড় জগতে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে তার দৃশ্য বর্ণনা গতিময় ভাষায় চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'অনাগত' অধ্যায়টি রসোত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব দাবী করতে পারে। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী, বন্ধ ছেদন, কমল-বিহারী, পয়গম্বর বলেছেন। নবী করীম (সা.) এর আদর্শ জীবনের যে সকল ঘটনায় কল্পনা সঞ্চারিত হতে পারে সেই সব দৃশ্যগুলির সাবলীল চিত্রায়ণ কবিত্বগুণে সার্থকরূপে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

একটি মহৎ জীবনীকাব্য সৃষ্টির পরিকল্পনা 'মরু-ভাস্করে' লক্ষ্য করা যায়। একজন যুগান্তকারী আদর্শ মহাপুরুষের জীবন চরিত রচনার জন্য যে বিরাট পরিসর প্রয়োজন নজরুল ইসলামের কাব্যশিল্পের পরিকল্পনায় এর বিন্দুমাত্র অভাব নেই। এতদসত্ত্বেও কাব্যটি সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ গতি লাভ করেনি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান চরিত্রকে কবি কেবল কাব্য সৌখিনতার জন্য গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াসে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত কাব্যে কবি নজরুল ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের অবতারণা দ্বারা বক্তব্যের একঘেয়েমি দূর করতে চেষ্টা করেছেন। ভাষা ও ছন্দের চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব বহু ক্ষেত্রে পাঠক মনকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। সেসবের মধ্যে নবী-চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুলের মতো পরিস্ফুটিত হয়েছে। আর যেখানে শুধু কেবল ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে সেখানে ভাষা ও ভঙ্গি প্রাণবন্তরূপে ফুটে উঠেনি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ জীবন পরিক্রমা যে বহু জায়গায় নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন কবি-কল্পনাকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করেছে তার পরিচয় 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বিদ্যমান রয়েছে।[২৩০] যদিও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি শেষের কয়েকটি অধ্যায়ের পরম্পরায় ঘটনার ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে চতুর্থ সর্গে 'শাদী মোবারক', 'খদিজা', 'সম্প্রদান' ও 'নওকাবা' শিরোনামে কবিতা রয়েছে;

---

২২৭. মরু-ভাস্কর, পৃ. ১০৪।

২২৮. আতোয়ার রহমান, 'নজরুল কাব্যে হযরত মোহাম্মদ', 'নজরুল সাহিত্য', মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত, (ঢাকা : রওনক পাবলিকেশান্স, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ /মে, ১৯৬০), পৃ. ৯৬।

২২৯. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্যসমীক্ষা, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৭),পৃ.২৫০
.

২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু শেষ সর্গে যথাক্রমে 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'শাদী মোবারক' ও 'নওকাবা' স্থানান্তরিত হলে সামগ্রিক বর্ণনা ও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকত।[২৩১]

উল্লেখ্য যে, 'মরু-ভাস্কর' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একটি অসমাপ্ত সীরাত বা জীবনীকাব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাম্যবাদী রূপ ও মানবতাবাদী আদর্শ এবং ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন বাণী নজরুল ইসলামকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিল 'মরু-ভাস্কর' এরই ফলশ্রুতি। নবী করীম (সা.) এর 'সাম্যবাদী' রূপকে কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হননি। কবি তাঁর জীবদ্দশায় 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের চতুর্থ সর্গ তথা সর্বশেষ অধ্যায়ের 'সাম্যবাদী' কবিতাটির মাত্র ১৬ টি চরণ পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। অথচ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ সীরাত কাব্যগ্রন্থ লেখা সম্পন্ন করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। বিভিন্ন কারণে কাব্য জীবনের মধ্য পর্যায়ে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রচারক আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু 'মরু-ভাস্কর' শীর্ষক রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ১৯৩২ সালে কবির লেখনী নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলা কবিতার জন্য তা এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে রইল। কারণ নবী করীম (সা.) এর জীবনী কাব্যই নজরুল ইসলামের একটি অখণ্ড কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রথম ও শেষপ্রয়াস। আর জীবন কাহিনী বা আখ্যায়িকা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এটিই নিঃসন্দেহে কবির একমাত্র মূল্যবান প্রচেষ্টা।

---

২৩১. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদের জাগরণ

কাজী নজরুল ইসলাম মূলতঃ বিদ্রোহী ও সমাজসচেতন কবি। তথাপি ইসলামের সাম্য, মৈত্রীর বাণী তাঁর হাতেই বাংলা কাব্যে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। বাঙালী মুসলমানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণী এবং মুসলিম ইতিহাসের উজ্জ্বল অংশ ও গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যেমন পরিচিত করেছিলেন তেমনটি আর কেউ পারেননি। তাঁর ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম, আর এই মানবধর্মের দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের প্রতিভা সাহিত্যের সে অংশকেই স্পর্শ করেছে সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ইসলামের অতীত গৌরব স্মরণ করে কাজী নজরুল ইসলাম সমকালীন মুসলমানদের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদের উদ্দীপনামূলক কবিতাগুলোর মধ্যে 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'শহিদী ঈদ', 'সুবৃহ-উম্মেদ', 'ঈদ মোবারক', 'আনোয়ার পাশা', 'কামাল পাশা', 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের ইসলামী চিন্তাধারার কবিতাগুলোতে শুধু ইসলামী এতিহ্য চেতনা বা ইসলামের অতীত স্মৃতিচারণ কবির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর মুসলিম জাগরণমূলক ঐতিহ্য সমসাময়িক সমাজচেতনার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ ও স্বজাতির ইসলামী উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ইসলামী জীবনবোধ ও মুসলিম জাগরণের চিত্র অংকন করেছেন।[২৩২]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটা অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল ইসলাম,তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শও ছিল ইসলাম। নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদের জাগরণের চিত্র পাওয়া মোটামুটি এভাবে যে,

১. তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণের জীবন-চরিত অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।

২. যাঁরা ইসলামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে ও অক্ষুন্ন রাখতে জিহাদে ব্রতী হয়েছেন;যেমন-খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.), মহাবীর খালেদ (রা.) প্রমুখ কবি নজরুল ইসলামের কাব্যের উপজীব্য হয়েছেন।

৩. ইসলামের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা, পর্ব ও ধর্মীয় বিষয়বস্তু কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। যেমন- কারবালা, মোহররম, আযান, বা ঈদ।

৪. আধুনিককালে যে সকল মুসলিম রাষ্ট্রনেতা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হয়েছেন; যেমন-কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, সা'দ জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ , রীফ সর্দার প্রমুখ তাঁদেরকে নজরুল ইসলাম কবিতার মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

---

২৩২. ড. মাহবুবা সিদ্দিকী, আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১/ মে, ১৯৯৪), পৃ. ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শুধু বিষয়বস্তু নির্বাচনে নয়, শব্দচয়ন ও প্রতীক প্রয়োগেও তিনি ইসলামী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেছেন এবং এক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহৃত কাব্য তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আর এজন্যই তাঁকে নির্দ্বিধায় 'মুসলিম নবজাগরণের কবি' বলা যায়।[২৩৩]

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে নবজাগরণ ঘটে নজরুল ইসলামের কবিতায় তার সার্থক রূপায়ন পরিদৃষ্ট হয় নিঃসন্দেহে। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে-প্রাণে এহেন নবজাগরণের প্রেরণা যুগিয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় ও যুগচেতনা। আর এই পরিচয়ের ভিত্তিতে বাঙালী বা ভারতীয় মুসলমান আপনার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হতে চেয়েছে এবং আপনার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের অপরাপর মুসলিম জাতিসমূহের সাথে বিশেষতঃ আরব, ইরান ও তুরস্ক যেখান থেকে ইসলামী সংস্কৃতি উদ্ভূত হয়ে এক আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছে। নজরুল ইসলামের কবিতায় বাঙালী বা ভারতীয় মুসলমানদের এই ঐতিহ্যবোধের সফল রূপায়ন ঘটেছে।[২৩৪]

ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলিম সমাজের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আজহার উদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থে সে তত্ত্বকথা লিখেছেন, "নজরুলই প্রথম কবি যিনি কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক প্রণয়নের জন্য অজস্র পৌরাণিক হিন্দু কাহিনী যেমন নিয়েছেন তেমনি অজস্রবার ইসলামী ঐতিহ্যকে রূপায়ন করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্য একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,তার ঐতিহ্য সারা পৃথিবী জুড়ে। কারণ ধর্ম বন্ধনের দিক দিয়ে ইসলামের কাঠামো আন্তর্জাতিক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই।' তাই ইসলামী ঐতিহ্য দেশ-কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। হিন্দু কবিরা মুসলিম ঐতিহ্যের এই বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি বলে বাংলা কাব্যধারায় মুসলিম ঐতিহ্য একটি বিস্মৃত প্রায় উপাদানরূপে তারা গণ্য করতেন। অধিকাংশ মুসলিম সমাজের এমন এক পর্যায়ে ছিলেন যেখানে ঐতিহ্যের বিরাটত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই সচেতন ছিলেন না। নজরুল ইসলামই প্রথম কবি যিনি ভাষা ব্যবহারে অলংকার নির্মাণে মুসলিম ঐতিহ্যের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার ঘটিয়েছেন।"[২৩৫]

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এবং ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও তিনি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশসূত্রেই অর্জন করেছিলেন এবং পারিবারিক ধর্মীয় দিক থেকে আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর ইসলামী আবেগ-অনুভূতি গড়ে উঠেছিল। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী গান ও গজল রচনার অনেক আগে শৈশব ও কৈশোরেই মক্তবে ইসলামী ভাবাদর্শে ও ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। মক্তবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও তাঁর ঘটেছিল এবং বাল্যকালেই মাজারের খাদেম, মসজিদের ইমামতি করে ইসলামী আদর্শ ঐতিহ্যে ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনেক কবিতা, গান প্রভৃতি রচনায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য তাঁর রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম রচিত যে কয়টি ইসলামী চিন্তাধারার কবিতা পাঠক ও সমালোচক মহলে দারুণভাবে সাড়া জাগায় তার অধিকাংশই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে নির্ভর এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্বের নবজাগরণ উত্থান ও সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত। 'খেয়াপারের তরণী, 'মোহররম', 'কোরবানী', 'শাত-ইল-আরব', 'কামাল পাশা', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম' ইত্যাদি কবিতা রচিত হয়েছিল নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্বে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে অসংখ্য হাম্‌দ, না'ত, গজল ও ইসলামী গান রচনারও বহুকাল আগে। ইসলামের

---

২৩৩. মোবাশ্বের আলী, নজরুল প্রতিভা, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ৩য় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯৫/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯), পৃ.৫৯-৬০

২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৩৫. আজহার উদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৪১০-৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে এবং সমকালীন মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলাম এ সকল কবিতায় সংস্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্বের ও স্বদেশের রাজনীতি, পরাধীনতা, শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন ও সংগ্রাম সাধনার কথা এসব কবিতা রচনাকালে কবি নজরুল ইসলামের মনে যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল তা আর বলার আপেক্ষা রাখেনা। তাই ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নির্ভর 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতাটির বিষয়বস্তু, ভাষা, আঙ্গিক ও রূপনীতি এবং সামগ্রিক শিল্পই কবি ও যোদ্ধা সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[২৩৬]

খেয়াপারের তরণী

নজরুল ইসলাম বিরচিত 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় নজরুল ইসলাম 'খেয়া','খেয়াপার','খেয়াপারের তরণী' প্রভৃতি প্রতিকী শব্দ আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার তাৎপর্যবহনকারী অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শেষ বিচারের দিন রোজ কিয়ামতে পূণ্যবান লোকেরা সহজেই 'পুলসিরাত' বা বেহেশতের বৈতরণী পার হয়ে যাবে আর পাপীরা তা করতে সক্ষম হবে না; উপরন্তু তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। এহেন বদ্ধমূল ধারণা মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এই ধর্মীয় লোক বিশ্বাসের অভিজ্ঞাতার চিত্ররূপ ঢাকার নওয়াবজাদী মেহেরবানু অংকিত একটি চিত্র, পুণ্যের তরী ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পাপের সাগর অবলীলাক্রমে পাড়ি দিচ্ছে। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার ঐ চিত্ররূপকে অবলম্বন করে নজরুল ইসলাম 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন।[২৩৭] কবিতাটির প্রারম্ভিক চরণগুলোতে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মাধ্যমে কিয়ামত রাত্রির ভয়াবহতা এক ভয়াল ভীষণ চিত্রে দৃশ্যমান করা হয়েছে,

> যাত্রিরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়াপার,
> বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার?
> প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে ?
> ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে !...
> তমসাবৃত ঘোর 'কিয়ামত' রাত্রি,
> খেয়াপারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী।
> দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী,
> শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী![২৩৮]

এ কবিতায় নজরুল ইসলাম অবলীলাক্রমে ইসলামী ঐতিহ্যগত অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। পূণ্যের তরীর কান্ডারীরূপে আহমাদ বা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উল্লেখ মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুভূতি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রিয় উম্মাতের শাফা'আতের মাধ্যমে পরিত্রাণ করবেন। এখানে তরণীর দাঁড়ীরূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকার খুলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) ইসলামের এই মহান চারজন খলীফার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ

---

২৩৬. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'নজরুলের ইসলামী গান ও মুসলিম সমাজ', তিতাশ চৌধুরী, এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫।

২৩৭. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৬৩-২৬৪; নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৭।

২৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিকুলতাকে পরাস্ত করে পূণ্যের যাত্রীদলের খেয়াপারের নিশ্চয়তায় চিত্রকল্পটি কবি চমৎকার উপমার দ্বারা রূপায়ন করেছেন;

পূণ্য পথের এ যে যাত্রিরা নিস্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে- সু-রক্ষিত দিল্ সাফ।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কান্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয়।
আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাড়ি যে এ তরণীর,নাই ওরে নাই ডর।
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লাহ্ ![২৩৯]

এখানে পূণ্যবানদের নিশ্চিত নির্ভাবনার কারণরূপে উল্লিখিত কবিতার শেষ দু'টি চরণ পুনরায় গ্রাম বাংলার নদ-নদীতে ভাসমান নৌকা ও মাঝি-মাল্লাদের চির পরিচিত দৃশ্যাবলী থেকে গৃহীত হলেও কবি নজরুল ইসলাম অভিনবত্ব এনেছেন সারি গানের বৈশিষ্ট্যে, বিশেষতঃ 'লা-শারীক আল্লাহ' বা আল্লাহর কোন শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এই মূল তত্ত্বকথাটি অত্যন্ত সার্থকভাবে এ কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও খেয়া পারের তরণীর অভিজ্ঞতা মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে উৎসারিত তথাপি কবিতাটি বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ষা, ঝঞ্ঝা, তরণী ও মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি পরিচিত দৃশ্যাবলীর সাহায্যে ইসলামী ঐতিহ্যের সম্পৃক্ততায় রচিত নিঃসন্দেহে।

শাত-ইল-আরব

নজরুল ইসলামের 'শাত্-ইল-আরব' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্য 'মেসোপটেমিয়া' নামক ইংরেজী গ্রন্থ থেকে গৃহীত। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর চিত্র পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন নদী ইতিহাসখ্যাত 'শাত-ইল-আরব' নিয়ে রচিত। যে নদী সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী, যে নদী পারস্য সভ্যতার প্রাচীনতম সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছে, যে নদীর তীরে তীরে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম সভ্যতার গৌরবদীপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অতিবাহিত হয়েছে এবং দজ্‌লা ও ফোরাত তীরবর্তী স্থানে কারবালার শোকাবহ ও করুণ বেদনাবিধুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে,/সে নদী অতীত স্মৃতির জন্য কেবল নয়, বরং নজরুল ইসলামের সমসাময়িককালীন প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনাবলীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউফ্রেটিস তীরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শাত-ইল-আরব মোহনায় তুরস্ক ও ইংরেজদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে, সে লড়াইয়ে ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সেনাসদস্যও ছিল। ঐ যুদ্ধে তুরস্কের সুলতান তথা মুসলিম খলীফার পরাজয় ঘটে এবং মেসোপটেমিয়া ইংরেজদের দখলে চলে যায়। তথাপি কবি নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে মেসোপটেমিয়া বা দজ্‌লা ও ফোরাত তীরবর্তী ইরাক দেশ বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ বাঙালী পল্টনের সৈনিক হিসেবে ঐ অঞ্চলের রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। যদিও দৈহিকভাবে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি কিন্তু মানসভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছিল।[২৪০] ইরাকের পরাধীনতার সাথে সৈনিক কবির মাতৃভূমির পরাধীনতার বেদনা একত্রীভূত হয়ে 'শাত-ইল-আরব' কবিতাটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায়:

শাতিল-আরব! শাতিল আরব! পুত যুগে তোমার তীর!
ইরাক-বাহিনী এ যে গো কাহিনী-,
কে জানিত কবে বঙ্গ বাহিনী

---

২৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

২৪০. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

তোমারও দুঃখে 'জননী আমার!' বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর
পরাধীনা ! একই ব্যাথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোটা ভক্ত-বীর ।
শহীদের দেশ ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির ।[২৪১]

ইসলামী ঐতিহ্যে বীরত্বের প্রতীক খলীফা হযরত আলী (রা.) এর হায়দারী হাক আর তাঁর বিখ্যাত দু'ধারী তরবারী 'জুলফিকার' নজরুল ইসলামের কবিতায় শৌর্য-বীর্যের প্রতীকরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস খ্যাত 'শাত-ইল-আরব' নদীর তীরে তীরে কবি একালেও শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর 'হায়দারী হাক' অর্থাৎ 'আল্লাহু আক্‌বার' ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পান। ইসলামের অতীত ও বর্তমান নিম্নের চরণে এক সূত্রে গাঁথা। একে আমরা নির্দ্বিধায় অতীতের বর্তমান বা ইসলামী ঐতিহ্যের জাগরণ বলতে পারি। কবি নজরুল ইসলামের মুসলিম ঐতিহ্যের চেতনাবোধের এহেন রূপায়ণ ঘটেছে বার বার। সেইসাথে শাত-ইল-আরবের ভৌগলিক অবস্থান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যরূপ বসরার গোলাপ ফুল আর মরুদ্যানের খেজুর ফল নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত রূপক ও উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে । যেমন-

'জুলফিকার' আর 'হায়দারী হাঁক' হেথা আজো হযরত আলীর-
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লেখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির![২৪২]

ঈদ মোবারক

১৩৩৩ সালের ১৯ শে চৈত্র নজরুল ইসলাম বিরচিত 'ঈদ মোবারক' কবিতাটি সওগাত পত্রিকায় বৈশাখ, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ববৃহৎ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব যা তাদের একত্ববাদের মৌলিক নীতিমালার স্মারক হিসেবে কাজ করে থাকে এবং মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা, কার্যাবলী ও সামাজিক জীবনধারার প্রেরণা যোগায়।

'ঈদ' আরবী শব্দ; এর অর্থ খুশী ও আনন্দ। আরবী ঈদ পরিভাষাটি 'আউদ' ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত; যার অর্থ ফিরে আসা, আনন্দের পুনরাবর্তন। পবিত্র রমজান মাসে উপবাস ও সিয়াম সাধনায় ঈদ-উল-ফিতর আর কোরবানীর আত্মত্যাগের তাৎপর্যমন্ডিত ঈদ-উল আজহা, উভয় ঈদ উৎসবের ধর্মীয় তাৎপর্যের আসল দিক হচ্ছে মুসলামানদের সমবেত প্রার্থনা। এ দিন দু'টিতে মুসলমানগণ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় মহাখুশীতে দুই রাকা'আত ওয়াজিব নামায অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় করে একে 'সালাতুল ঈদ' বা ঈদের নামায বলা হয়।[২৪৩] ঈদের জামাতে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুশৃংখল সারিবদ্ধভাবে নামায আদায় এবং ঈদের নামাযান্তে সকল শ্রেণীর লোকের পারস্পরিক কোলাকুলি ও আলিঙ্গনে এবং ধনীদের পক্ষ থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের ফিত্‌রা, সাদকা প্রদান প্রভৃতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

---

২৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শাত-ইল-আরব', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতাসমগ্র, পৃ. ৩৭।

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

২৪৩. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও কুরবান আলী, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক ষ্টাডিজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বোধের ও সাম্য-মৈত্রীর মহান বাণী আছে তা এই পবিত্র ধর্মীয় দুটিকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করেছে।

নজরুল ইসলামের 'ঈদ মোবারক' শীর্ষক কবিতাটি ঈদ-উল-ফিত্‌র উৎসব সম্পর্কিত। ঈদ-উল-ফিতর বিশ্ব মুসলিমের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সুদীর্ঘ একমাস রমজানুল মোবারকের সিয়াম সাধনার শেষে উপবাস ভাঙ্গার আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর এদিনটি উদযাপিত হয়। মুসলিম জাতির এ আনন্দঘন দিবস ঈদ-উল-ফিত্‌র অনন্য ভাবধারা ও পৃথক জৌলুস নিয়ে আসে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য এবং পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও সুমধুর আচরণে মুসলিম মিল্লাতের এ আনন্দউৎসব আলাদা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। ক্লেদমুক্ত, পুতঃপবিত্র স্বর্গীয় পরিবেশে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম উম্মাহর ঈদ। এতে থাকেনা কোনরূপ পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও ভেদাভেদ। তাই ঈদ-উল-ফিতরের রয়েছে অপরিসীম মাহাত্ম্য ও ফজীলত। ঈদ মুসলমানদের জাতীয় উৎসব। যে ঈদ আরব দেশ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় থেকে মুসলমান সমাজে চলে এসেছে, যে ঈদ সবার ঘরে ঘরে খুশীর সওগাত ও আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। কাজী নজরুল ইসলামের 'ঈদ-মোবারক' কবিতার প্রারম্ভিক শ্লোকগুলোতে ইসলামী ঐতিহ্যেরই সেই স্মৃতির অনুরণণ প্রকাশিত হয়েছে,

> শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
> কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
> বরষের পরে আসিলে ঈদ!
> ভূখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
> কন্টক বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের
> সাকীরে 'জামের' দিলে তাগিদ।[২৪৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অফুরান সিয়ামের সওগাত এবং ত্যাগ ও সংযমের শিক্ষা নিয়ে প্রতিবছর আসে পবিত্র মাহে রমজান। আর তার বিদায়লগ্নে রোযাব্রত পালনকারীদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির আনন্দবার্তা নিয়ে আসে ঈদ-উল-ফিতর। তাক্‌ওয়ার গুণাবলী অর্জন ও চারিদিকে এর উৎকর্ষ সাধনের মহাপ্রশিক্ষণ শেষে পশ্চিম আকাশে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে ঘোষণা করে ঈদের পরম আনন্দবার্তা। যেহেতু রমজান শেষে রূপালী চাঁদ ঈদের খুশীর খবর নিয়ে আসে তাই সে চাঁদ মুসলমানদের বড়ই প্রিয়, আর সেজন্য এক ফালি রূপালী চাঁদের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে আনাবিল এবং অনাড়ম্বর এক আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে উঠে গোটা মুসলিম জাহান। তাই ঈদ-উল-ফিতর একই সঙ্গে সিয়াম সাধনার সাফল্যের প্রতীক এবং নির্মল আনন্দের দ্যোতক। আর সুগন্ধি আতর ঈদের সুবাস ছড়ায় এবং আতরের গন্ধে ঈদ মাতোয়ারা হয়ে উঠে। কবির ভাষায়ঃ

> ওগো কা'ল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন,
> মুজ্‌দা এনেছে, মুখে ডগমগ মুকুলী মন।
> আশাবরী-সুরে ঝুরে সানাই।
> আতর-সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর-দিল,
> দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা-নাই - দলিল
> কবুলিয়তের নাই-বালাই।[২৪৫]

ঈদ-উল-ফিতরের উৎসবের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল রয়েছে। আনন্দের এ দিনে প্রতিটি মুসলমান তার সামাজিক অবস্থান ভুলে যায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরম তৃপ্তিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত, সবল-দুর্বল এবং উঁচু-নীচুর মধ্যকার পার্থক্য

---

২৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ঈদ-মোবারক', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.১৬৮।

২৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। বংশগৌরব, কৌলিন্য, মান-মর্যাদা এবং জাতীয়তার বিবেচনা ব্যতিরেকে সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকে সমান বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু ঈদের দিনে ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ থাকে না। সকলেই সকলের সাথে সমানভাবে মিলিত হয়,তাই সেই মহামিলনের দৃশ্য বর্ণনায় নজরুল ইসলাম তাঁর 'ঈদ মোবারক' কবিতায় এজিদে ও হাসান-হোসেনে গলাগলি, শিরী-ফরহাদে জড়াজড়ি, লায়লি-কায়সে মিলনের অসম্ভব দৃশ্যকেও সম্ভব করে চিত্রকল্প তৈরী করেছেন। কবির কল্পনায় ঈদের খুশীতে শয়তানও বেহেশ্‌তে শরাব-জাম বিতরণ করে, দুশমন-দোস্ত আজ এক জামাত, বাদশা-ফকির ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি করে;

আজিকে এজিদে-হাসানে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেশ্‌তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
শিরী ফরহাদে জড়াজড়ি।...
আজি আরফাত্ ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকীরে ভায়ে ভায়ে
কা'বা ধরে নাচে, 'লাত্-মানাত' ।[২৪৬]

প্রকৃতপক্ষে ঈদ-উল-ফিতর শিক্ষা দেয় যে, ইসলামের রীতি-নীতি অনুযায়ী ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে। ঈদ-উল-ফিতর মুসলমানদেরকে ব্যবহারিকভাবে সাম্য, মৈত্রী এবং এমন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নামায ও অনুষ্ঠানাদিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এমনিভাবে ঈদ উৎসব ইসলামী জীবনপদ্ধতির ভিত্তিতে একটি বিশ্বজনীন নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বস্তুতঃ ঈদ উৎসবের মধ্যে যে সাম্যের প্রতিফলন সেটিই নজরুল ইসলামকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সামান। বড়-ছোট রাজা-প্রজা সকলেই সমান। ইসলামের নবাব-বাদশাহকে বালাখানায় আরাম-আয়েশে থাকতে বলা হয়নি।

আজি ইসলাম ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান,
রাজা-প্রজা নয় কারো কেহ!
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়,
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥[২৪৭]

ইসলাম বলে সকলের তরে সমান আমরা সকলের সুখ-দুঃখ সমভাবে ভাগ করে নিব। একজন ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়বে, আর অন্যজান না খেয়ে থাকবে এটা তো ইসলামের বিধান নয়। ধনীর ঐশ্বর্য-সম্পদে গরীবেরও হক রয়েছে। গরীবের হক ন্যায্য অধিকার বা হক আদায় করার পর ধনী লোক তার ঐশ্বর্য ভোগ করবে সেজন্য ধনবানকে যাকাত বা উদ্বৃত্ত থেকে দান-খয়রাত করতে হবে। এক্ষেত্রে ঈদ-উল-ফিতরের দিন নামাযের পূর্বে ধনীদের পক্ষ থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি ফিত্‌রা-সাদকা প্রদানের আবশ্যকতা একদিকে আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে। অপরদিকে অন্যদের সকলের প্রতি ঈদের আনন্দ উৎসবে সমান সুযোগ সৃষ্টির মহান ইসলামী দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ-দুঃখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের। ...
ঈদ-উল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,

---

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯ ও ৪৫৯।

২৪৭. প্রাগুক্ত: নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'ঈদ-মোবারক', পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান ...
বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,
করে না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত ![২৪৮]

বস্তুতঃ ঈদ-উল-ফিতর হচ্ছে আত্মোপলব্ধি, আত্মবিশ্লেষণের দিন। এ দিন প্রতিটি মুসলমান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, দয়া, ক্ষমা ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সফলতা ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করে থাকে। কেবল ঈদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশে এ কবিতা নয়, বরং এর মুখ্য আবেগ ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের আদর্শ তবে বাঙালী মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ঈদ উৎসবের এমন অনুপম চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল, সত্যিই এটি বিশেষ উৎসব মুখর পরিবেশ সৃজন করেছে;

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু,
ঈদ মোবারক! আস্ সালাম !
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরণী ফুল-কালাম! [২৪৯]

কোরবানী

কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যবহ 'কোরবানী' কবিতাটি মোসলেম ভারত পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩২৭ সালে প্রকাশিত এবং অগ্নিবীণায় সংকলিত। 'কোরবানী' বা 'কুরবানী' আরবী 'কুরবান' শব্দের সঙ্গে ফারসী 'ই' যোগ করা হয়েছে। যার অর্থ উৎসর্গ করা বা ত্যাগ করা। যদ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে যাওয়া যায় তাই হল 'কুরবান'। আর বিশ্ব মুসলিমের জন্য 'কোরবানী' ত্যাগের মহান উৎসব। 'কোরবানী' সাধারণ মানুষ কর্তৃক স্বাভাবিক অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন বিষয় নয়। এটি উম্মতে মুসলিমার প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ নির্দেশ, যার শুভ সূচনা হয়েছিল আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কে স্বহস্তে আল্লাহর রাহে কোরবানী দিয়ে ত্যাগের মহান পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার যে দৃঢ় মানসিকতা দেখিয়েছিলেন সেখান থেকেই আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর খুশী হয়ে তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) এর পরিবর্তে পশু কুরবানীর নিয়ম চালু করলেন। তাই বছরে একবার 'কোরবানী' সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে ত্যাগ তথা কোরবানীর মানসিকতা সৃষ্টিতে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। তাছাড়া প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের জন্য কোরবানী করা ওয়াজিব। আজকাল সেই মহান দৃষ্টান্ত স্মরণে কোরবানীর ঈদ কিন্তু নিতান্ত আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। যে পশু কোরবানী দেওয়া হয় তার মাংস ভক্ষণই আজকের দিনে উৎসবের প্রধান লক্ষ্য হয়ে গেছে। নজরুল ইসলাম তাঁর 'কোরবানী' শীর্ষক কবিতায় ছয় মাত্রায় চালে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুসলমানদের ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবির ভাষায়ঃ

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর বাণীর,-
আজিকার এ খুন কোরবানীর!
দুম্বা-শির-রুম্-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি! রহমান কি রুদ্র নন ?
ব্যস্ ! চুপ খামোশ রোদন্![২৫০]

---

২৪৮. নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৫৯।

২৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০।

২৫০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কোরবানী', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোরবানীর যবেহ্ করা জীবের রক্তের আদলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জাগরণের এক রক্তিম সম্ভাবনাকে কবি নজরুল এক অভিনব দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্পের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই সমকালীন মুসলিম বিশ্বের নবজাগরণের প্রয়াসকে ইসলামের ইতিহাসের বীরশ্রেষ্ঠ শেরে খোদা খলীফা হযরত আলী (রা.) এর বিশ্বত্রাস তরবারী 'জুলফিকার' হাতে কল্পনা করা হয়েছে;

চড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার।
'জুলফেকার' খুলবে তার
দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে পূত-বদন!
খুনে আজকে রুধবো মন।[২৫১]

প্রকৃতপক্ষে 'কোরবানী' কবিতাটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর অমর ত্যাগের তাৎপর্যময় মহিমা বর্ণনা মাত্র নয়, বরং তা সমকালীন বিশ্বের একটি রূপকও বটে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রতি পুত্রধন কোরবানীর আহ্বান এসেছিল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে সেই প্রাচীনকালে, আর আজ তারই রূপকে স্বাধীনতার জন্য শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দান করার আহ্বান এসেছে দেশ মাতৃকার কাছ থেকে। সুতরাং 'কোরবানী' কবিতায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কে কোরবানীর পৌরাণিক কাহিনী একদিকে সমকালীন স্বাধীনতার স্পৃহাকে বেগবান করেছে অপরদিকে মুসলিম জাহানের নবজাগরণকে উজ্জীবিত করেছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে স্বদেশের ও মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতার আকাঙ্খা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবি বলেছেন:

মুসলিম রণ-ডঙ্কা সে,
খুন দেখে করে শঙ্কা কে?
টঙ্কারে অসি ঝঙ্কারে,
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি গড়া ভীম কারা, লড়াবো-রণ-মরণ।
ঢালে বাজবে ঝন্-ঝনন্।
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন মোচন![২৫২]

কবি নজরুল ইসলাম দেখেছেন মুসলিম জাতি আজ শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মাঝেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ কবি বিশ্বাস করেন যে, ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে তার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করা এবং তার অনুসারী হওয়ার মধ্যে প্রকৃত ধর্মকে লাভ করা সম্ভব। অথচ মুসলিম জাতি আজ ধর্মের এই মহৎ এবং উদার তত্ত্বকে বিস্মরিত হয়েছে এবং তারা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মাঝেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাই কোরবানীর মহান আত্মত্যাগের আদর্শ ভুলে তারা কেবল পশু কোরবানী নিয়ে ব্যস্ত।

'কোরবানী' কবিতায় কবি কেবল মুসলিম ঐতিহ্যের কথাই বর্ণনা করেননি, বরং সমকালীন পরাধীন জাতি সুদিনের জন্য কোরবানীর মহান ত্যাগের মতো আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন এবং অতীতের ধর্মীয় রীতিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত করেছেন। অতীতে যে জাতির গৌরব ছিল সর্বজনবিদিত সেই জাতি আজ পরাধীনতার শৃংখলে শৃংখলিত, নিরাশায় নিমজ্জিত। এই অবসাদক্লিষ্ট হতাশাগ্রস্ত জাতিকে পুনর্জাগরিত করার জন্য প্রয়োজন আঘাত এবং ত্যাগ। এই ত্যাগ শুধু পশু কোরবানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, স্বাধীনতার জন্য নিজের সর্বস্ব, এমনকি প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। এ উৎসর্গ হত্যা নয়, বরং নবজীবনের দিগন্ত উম্মোচন। আর এহেন উৎসর্গের মাধ্যমেই জাতির কলংক মোচন সম্ভব। কবির ভাষায়:

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,

২৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'কোরবানী', পৃ. ৮১।
২৫২. নজরুলের কবিতাসমগ্র, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।[২৫৩]

শহীদি ঈদ

১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসে (আগষ্ট, ১৯২৪ খ্রি.) প্রকাশিত 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'শহীদি ঈদ' শীর্ষক ইসলামী ঐতিহ্যমূলক কবিতায় ঈদের এক নতুন তাৎপর্য উদঘাটিত হয়েছে। কবির মতে, এ ঈদ গতানুগতিক ঐশ্বর্যের অঞ্জলি চায় না, চায় প্রাণের কোরবানী। এই কোরবানী ছাড়া ইসলামের ইজ্জত যেমন রক্ষা পেতে পারে না, তেমনি বোধ হয় জাতির স্বাধীনতা আসতে পারে না। কবি নজরুল ইসলামের ধারণা এরূপই। স্বাদেশিকতার রক্ত রঙিন স্বপ্নে ডুবে থেকে এর চেয়ে ঈদের মহত্ত্বের কোন তাৎপর্য কবি খুঁজে পাননি। কবির ভাষায়:

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিত তাজ ,
আল্লাহর রাহে চাহে সে ভিখ্
জিয়ারার চেয়ে পিয়ার যে
আল্লাহর রাহে তাহারে দে,
চাহিনা ফাঁকির মণি মানিক।[২৫৪]

'শহীদি ঈদ' কবিতাটি আবেগের দিক থেকে 'কোরবানী' কবিতার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রকৃত অর্থে কোরবানীর ঈদকেই নজরুল ইসলাম শহীদের ঈদ বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোরবানীর ঈদে প্রচলিত রীতি অনুসারে গরু, ছাগল, উট, দুম্বা কোরবানী দেওয়া হয়। এতে কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, কোরবানীর পশু কোরবানীদাতাকে পুলসিরাত পার করে বেহেশ্‌তলোকে পৌঁছে দেবে। 'শহীদি ঈদ' কবিতাটিতে এহেন লোকবিশ্বাসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে কোরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটন করা হয়েছে:

চাহি না ক' গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান ? ও দান ঝুট।
চাই কোরবানী, চাই-না দান।
রাখিতে ইজ্জত্ ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি? কে আছ মুসলমান ?[২৫৫]

যে সকল ফাঁকিবাজ মুসলমান নামধারী লোক গরু-ছাগল কোরবানী দিয়ে সওয়াব বা পূণ্য লাভ করতে চায়, যারা মনে করে যে, গরুর সাথে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে তাদের পয়গম্বর হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেদের সন্তানদের সত্যের সংগ্রামে উৎসর্গ করার জন্য কবি নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) একদা রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় আল্লাহ পাক কর্তৃক স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয়বস্তুকে আল্লাহর রাহে কোরবানী দানের জন্য। আজ প্রকাশ্য দিবালোকে দ্বীন ইসলামের দুর্গতি দৃশ্যমান, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সন্তানদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আর তাই ইসলামের তরে নিজেদের প্রিয়বস্তু তথা জান-মাল এমনকি সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে কবি বলেছেন:

---

২৫৩. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

২৫৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শহীদি ঈদ', 'ভাঙার গান', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ১৭০।

২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার
ইব্‌রাহিমের মত আবার
কোরবানী দাও প্রিয় বিভব!
"জবীহুল্লাহ্" ছেলেরা হোক
যাক সব কিছু-সত্য রোক!
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।[২৫৬]

কবি নজরুল ইসলামের মতে, মানুষ যতদিন ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ মেষসদৃশ হয়ে থাকবে, মাতৃভুমি যতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলার রাহে পশু কোরবানী দেওয়া বিফল এজন্য যে, লোকেরা নিজেরাই তো পশুর চেয়ে অধম। কোরবানীর মহান আত্মত্যাগের দিনে মনের পশুকে যবেহ করতে হবে তাহলে সকলেই বাঁচবে । কবি আরো বলেছেন যে, যারা পশু যবেহ করে তারা তো কসাই। আর যারা নিজেরাই কসাই বা হত্যাকারী তাদের আবার কোরবানী কি? ঈদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে তাদের জন্য যারা বীরপুত্র, যারা শহীদ। সকল মুসলমান যেদিন আজাদ হতে পারবে, যেদিন দ্বীন ইসলাম জুলুমমুক্ত হতে পারবে কেবল সেদিনই কোরবানী সার্থক হবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নামে জালিম বা অত্যাচারীর বিনাশ সাধনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন:

পশু কোরবানী দিস্ তখন
আজাদ মুক্ত হবি যখন
জুলুম-মুক্ত হবে রে দ্বীন।-
কোরবানীর আজ এই যে খুন্
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
জালিমের যেন রাখে না চিন্॥
আমিন্ রাব্বিল আলামীন!
আমিন্ রাব্বিল আলামীন !![২৫৭]

মোহররম

নজরুল ইসলামের কবিতায় মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী ঐতিহ্য ভাস্বররূপে উপস্থিত। কারবালার মর্মান্তিক ট্রাজেডি বিষয়ক তাঁর 'মোহর্‌রম' কবিতাটি এ ধারার এক উজ্জ্বল বাণীচিত্র। কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের উপস্থাপনা অধিকতর সংবেদনশীল; সেই কারণেই অধিকতর আবেদনময় ও হৃদয়গ্রাহী। এখানেও নজরুল ইসলাম কাব্যের বিষয়বস্তু রূপায়ণে ও আঙ্গিক বিনির্মাণে সর্বত্রই শক্তিমত্তায় পরিচয় দিয়েছেন। 'মোহর্‌রম' কবিতাটি ১৩২৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে গ্রথিত ৬১ হিজরী সালের ১০ ই মোহর্‌রম সংঘটিত কারবালার বিষাদান্ত কাহিনীকে উপজীব্য করে এই কবিতাটি রচিত। ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে কারবালা নামক মরুময় স্থানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণপ্রিয় পৌত্র হযরত আলী (রা.) ও খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতিমা আয-যাহ্‌রা (রা.) এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) সহ তাঁর পরিবারের সকল বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ শিশু সদস্যরা একে একে বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী শাসক ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর সাথে অন্যায় যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এমনকি হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর ভ্রাতুষ্পুত্ররা যুদ্ধে এবং শিশুপুত্র তাঁর কোলেই শত্রুর নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের আঘাতে প্রাণ হারায়। পরিশেষে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) আহত অবস্থায় একাকীই শত্রু সৈন্যবাহিনীর উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দুঃসাহসিকতার

২৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শহীদি ঈদ', 'জিঞ্জীর গান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

২৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮; নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। কারাবালার এ শোকাবহ বিয়োগান্ত কাহিনী মুসলিম সমাজকে যুগ যুগ ধরে শোকগাঁথা মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কবি নজরুল ইসলামের 'মোহর্‌রম' কবিতায় কারবালার নিষ্ঠুর শোকাবহ ঘটনায় প্রকৃতির দৃশ্য ও ধ্বনি রূপময়তায় প্রকাশিত হয়েছে। কারবালার রণাঙ্গনে বিধবাদের ক্রন্দন ধ্বনির রেশ যেন আজও শ্রুত হয়। আর ঘাতক সীমারের ছোরাতে ইমাম হুসাইন (রা.) এর অশ্রুর আভাস একটি সার্থক চিত্রকল্পে অঙ্কিত হয়েছে;

কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে-
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
"হায় হায় হোসেনা" ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো প৷ঞ্জায়'!
উন্মাদ দুল দুল ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায়![২৫৮]

উপরোক্ত চরণগুলোতে স্থানবাচক ও নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহারের কৌশলে কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ নিষ্ঠুর ঘটনার ঐতিহাসিকতাকে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে দামেশ্‌ক, মদিনা প্রভৃতি আরবীয় স্থান এবং জয়নাল, এজিদ, আলি-জাদা হোসেন প্রভৃতি নামের সাথে হোসেনের দ্রুতসামী অশ্ব 'দুলদুল'- এর উল্লেখ মুহূর্তে আমাদের কারবালার ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুদূর অতীত ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। অনন্তর দামেশ্‌করূপ দুনিয়ায় রুদ্র মাতম্ এবং 'হায় হায় হোসেনা' ধ্বনির মাধ্যমে শোক ও বেদনা-বিষাদের যে প্রকাশ অতীত থেকে বর্তমান অবধি প্রসারিত তার সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত করে তোলে। মোহর্‌রম মাসের ১০ তারিখে 'হায় হাসান' ও 'হায় হোসেন' প্রভৃতি ধ্বনি সম্বলিত যে শোক শোভাযাত্রা বের হয় এর মধ্য দিয়ে যেমনি অতীতের শোকাবহতা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। নজরুল ইসলামের 'মোহর্‌রম' কবিতায় ও তেমনি ইতিহাস ঐতিহ্যের বর্তমানতা খুঁজে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনা বিষাদান্ত হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ তপ্ত মরুভূমির বালুকা প্রান্তরে শত্রু সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর শিবিরে পানির অভাব, শত্রুবেষ্টিত ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর পানি শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের আঘাতে নিষিদ্ধ। প্রখর আরব মরুময় স্থানে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর শিবির পানির অভাবে তৃষ্ণার জ্বালা-যন্ত্রণায় মর্মান্তিক দৃশ্যাবলীর অবতারণা ঘটেছিল নজরুল ইসলামের কবিতায় তার চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অংকিত হয়েছে। কবির ভাষায়:

গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা! "
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার![২৫৯]

কারবালা প্রান্তরে জ্বলন্ত সূর্যের নীচে তপ্ত মরুভূমিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কাতর নর-নারী, শিশুদের অসহায় ক্রন্দনরোল বর্ণনায় নজরুল ইসলাম অব্যর্থ উপমার সাহায্যে স্পর্শকাতর দৃশ্যাবলীর একটি অভিনব চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন এমনভাবে যে, সমস্ত কারবালা যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। কারবালা মরু প্রান্তরের বিবরণ দিতে গিয়ে কবি যেন জাহান্নামের নরকাগ্নি বা দোজখের চিত্র অংকন করেছেন;

---

২৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা, 'মোহর্‌রম', পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জ্জুর!
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়পায়,
জিভ চুষে' কচি জান থাকে কিরে ধড়টায়?
দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,
কাঁদে বানু- "পানি দাও, মরে জাদু আস্গর!"[২৬০]

'মোহর্‌রম' শীর্ষক কবিতায় নজরুল ইসলাম কারবালার মর্মান্তিক ও বিষাদান্ত ঘটনাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জীবন্তরূপে উপস্থাপন করেছেন। কবির বর্ণনায় কারবালার কাহিনী শুধু বেদনা-বিষাদ, বা ক্রন্দনের নয়, এই ঘটনা শৌর্য ও বীর্যের, এহেন দৃশ্যাবলী ইসলামের ইতিহাসের এক বিশেষ যুগ সন্ধিক্ষণের অত্যন্ত তাৎপর্যময় কাহিনী। কারবালা প্রান্তরের অসম যুদ্ধে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) চরম ধৈর্য, অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক অতি উজ্জ্বল মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন, যা যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। শেরেখোদা হযরত আলী তনয় হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর সেই বলিষ্ঠ চিত্ররূপ নজরুল ইসলামের কবিতার চরণগুলোতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে;

দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!"...
হাইদরী হাঁক হাকি' দুলদুল্ আসওয়ার
শমশের চম্‌কায় দুশমনে ত্রাসবার।
খসে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।[২৬১]

নজরুল ইসলামের 'মোহর্‌রম' কবিতাটি শুধু কারবালার করুণ কাহিনীর বৃত্তান্ত নয়, কারবালার ঘটনার তাৎপর্য কবি বর্তমানে আরোপ করেছেন। মোহর্‌রম মাসের ১০ তারিখে কারবালা স্মরণে 'হায় হোসেনা ওয়া হোসেনা' ক্রন্দন রোল যে অনুরণিত হয়ে ওঠে কবি নজরুল ইসলাম তার অর্থহীনতা প্রকাশ করে বর্তমানে মোহররমের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তাই কবির দৃষ্টিতে মোহররমের শিক্ষা 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া, ক্রন্দন চাহিনা'। আর সেই আলোকেই তিনি কবিতার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম নবজাগরণের চিত্র প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। কবির ভাষায়ঃ

কত মোহররম এলো, গেল চ'লে বহু কাল-
ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল!
মুসলিম তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন',
'ওয়া হোসেনা-ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,-
ত্যাগ চাই , মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।[২৬২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মুসলিম জাহানে জাগরণের যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল 'মোহররম' কবিতায় সে প্রেক্ষাপটে অতীতের মহিমা বর্তমানকে তেজোদ্দীপ্ত করার জন্য আরোপিত। কবি সাধারণতঃ অতীতের মহিমা প্রচারের জন্যেই অতীতকে স্মরণ করেন না বরং বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার জন্যেই অতীত ইতিহাসকে ব্যবহার করেন। তাই ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক 'মোহররম' কবিতাটির ঐতিহাসিক অথবা ধর্মীয় মূল্য যেমন রয়েছে, তেমনিভাবে নবজাগরণের চেতনা বা উদ্দীপনাও আছে। যেমন- কবিতাটির উপসংহারে কবির আবাহন ও সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে;

---

২৬০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতাসমগ্র, পৃ.৪৩।

২৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

২৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম', অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দারী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক।...
হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের;
আসগর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান!....
মোহররম! কারবালা! কাঁদে "হায় হোসে না!"!
দেখো মরু সূর্য্য এ খুন যেন শোষে না![২৬৩]

মোহররম ও কারবালার বেদনা-বিষাদময় করুণ কাহিনী নিয়ে নজরুল ইসলাম একাধিক কবিতা ও গান রচনা করেছেন, যাতে কারবালার শোক বিহ্বল ঘটনা কবির মনের গভীরে যে কি কি বিরাট আবেগ-অনুভূতি প্রবণতা রেখাপাত করে তার অনন্য বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে। কবির ভাষায়:

ওরে বাঙলার মুসলিম তোরা কাঁদ!
এনেছে এজিদী বিদ্বেষ পুনঃ মোহররমের চাঁদ
এক ধর্ম্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সব্বনেশে
তখ্তের লোভে এসেছে এজিদ কমবখ্তের বেশে![২৬৪]

এবার মোহররম ও কারবালা বিষয়ক নজরুল ইসলামের কয়েকটি ইসলামী গজল গানের মর্মস্পর্শী চরণের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো;

মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়
ওয়া হোসেনা, ওয়া হোসেনা তারি মাত্ম শোনা যায়।
কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহোঁশ হল কারবালায়
বেহেশতে লুটিয়া কাঁদে আলী ও মা ফাতেমায়।[২৬৫]

অথবা,

খাতুনে জান্নত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী-নন্দিনী
মদিনা-বাসিনী পাপ-তাপ-নাশিনী
উম্মত-তারিণী আনন্দিনী।...
হাসান-হোসেন তব উম্মত তরে, মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিল বলিদান ॥[২৬৬]

অথবা,

ওগো মা- ফাতেমা ছুটে আয়,
তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দীনের শেষে বাতি নিভিয়া যায় মাগো
বুঝি আঁধার হলো মদিনা-পুরী ॥[২৬৭]

---

২৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০: নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, মোহররম, পৃ. ৫৪।

২৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম', 'মোহররম', শেষ সওগাত, নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮১৭।

২৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।

২৬৬. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ১১১।

২৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা,

ফোরাতে পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে
অঝোর নয়নে রে।
দু'হাতে তুলিয়া পানি, ফেলিয়া দিলেন অমনি
পড়িল কি মনে রে![২৬৮]

সুবহ-উম্মেদ { পূর্বাশা }

কবি নজরুল ইসলাম হুগলীতে অবস্থানকালে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'সুবহ- উম্মেদ' বা 'পূর্বাশা' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। এটি দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সুবহ-উম্মেদ'(পূর্বাশা) কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি তথা সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে নবজাগরণের যে সাড়া পড়েছিল তার বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে। সেই সাথে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নির্জীবতার বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে ইসলামের এহেন বিপ্লবাত্মক নবজাগরণকে কতিপয় উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্পের দ্বারা রূপায়িত করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইসলামের নবজাগরণকে সর্বনাশের অব্যবহিত পর পৌষমাসের, মন্বন্তরের পর ধরনীর ধন-ধান্যে প্রাচুর্যের ও ভুখারীর রোজাব্রত পালনের রমজান শেষে ঈদের নওরোজের সাথে তুল্যরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাসের উন্মেষকাল থেকেও চিত্রকল্প গৃহীত হয়েছে। কবির ভাষায়:

হিজরত করে হজরত কিরে
এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের?
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দ বীর!
গারত হইল করদ হোসেন,
উঁচু হইল পুনঃ শির নবীর![২৬৯]

মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নবজাগরণের চিত্র অংকন করতে যেয়ে কবি নজরুল ইসলাম সে সকল দৃশ্যাবালীর কল্পনা করছেন তা অতীত ইতিহাসের গৌরবময়তা ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় দেদীপ্যমান। দ্বীন ইসলামের এই ঔজ্জ্বল্যে কবি বর্তমানকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সুবহ-উম্মেদ' কবিতায় অত্যন্ত নিপুণতার সাথে আরব মরুভূমি থেকে দ্বীন ইসলামের আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচারের ধ্বনিময়তায় চিত্রাংকন করা হয়েছে;

আরব আবার হ'ল আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরূদ।
পড়ে শুকরানা 'আরবা রেকাত'
আরাফাতে যত স্বর্গ-দূত।
ঘোষিল ওহুদ, "আল্লা আহাদ"!
ফুকারে তূর্য্য তুর পাহাড়।
মন্দ্রে বিশ্ব রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লাহ্ আকবার।[২৭০]

---

২৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

২৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সুবহ-উম্মেদ', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নজরুল ইসলামের উদ্দীপনার সার্থক রূপায়ণ 'সুবহ-উম্মেদ'। প্রকৃতপক্ষে কবির কাছে মুসলমানদের এ জাগরণ ইসলামের নবীন মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.) প্রভাতী আজানের উৎপ্রেক্ষায় বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। অনন্তর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থানে মুসলিম জাগরণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের মুসলমানদের নবজাগরণ তথা 'নব্য তুর্কী' বা 'তরুণ তুর্কী' (Yong Turks) নামক দলের উত্থান রণাঙ্গনের বীর শহীদের তাজা রক্ত আর বিপ্লবের রক্তিম আভা হয়ে এক অভিনব চিত্রকল্পে নজরুল ইসলামের কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে;

জেগেছে তখন তরুণ তুরান
গোর চিরে মন আঙ্গোরায়।
গ্রীসের গর্ব্বী গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়!
রংরেজ যেন শমশের মত
লাল ফেজ শিরে তুর্কিদের।
লালে লাল করে কৃষ্ণ সাগর
রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।[২৭১]

ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে বিরান মুলুক ইরানের সহসা জাগরণের চিত্র অংকন করতে যেয়ে কবি নজরুল ইসলাম ফারসী সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিকথার ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন। যেমন- লায়লী-মজনু, শিরী-ফরহাদ, পেশ্তা-আপেল, আনার-আঙ্গুর, সাকী-শরাব, দীওয়ান-ই-হাফিজ, নার্গিস-লালা, ফেরদৌসীর শাহনামার সোহরাব-রুস্তমের যোদ্ধার সাজে সজ্জিত হওয়ার কল্পনারূপকে কবি নির্দ্বিধায় অবলম্বন করে চিত্রকল্প তৈরী করেছেন;

বিরান মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিদ।
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কসম করিছে হবে শহীদ!
লায়লির প্রেমে মজনুন আজি
"লা-এলা"র তরে ধরেছে তেগ।
শিরীণ শিরীরে ভুলে ফরহাদ
সারা ইসলাম পরে আশেক![২৭২]

কবি ইরানের এ নবজাগরণকে 'নৌ-রুস্তম' আর শ্বেত ঔপনিবেশিক পরাশক্তিকে 'সফেদ দানব' এর প্রতীকরূপে উল্লেখ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে মরক্কোর মরণপণ সংগ্রামে রীফ সর্দার গাজী আব্দুল করীমের বীরত্বগাঁথায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'দ্বিতীয় কামাল' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। সেইসাথে নজরুল ইসলাম 'সুবহ-উম্মেদ' কবিতায় তরুণ তুরান, বিরান ইরান, মরা মরক্কোর মত মেষসম জাতিগুলোর পুনর্জাগরণকে নীল দরিয়ায় যন জোয়ারের চিত্রকল্পে প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির ভাষায়:

নীল দরিয়ায় জেগেছে জোয়ার
'মুসা'র উষার টুটেছে ঘুম।

---

২৭০. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২।

২৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২৭২. নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা, 'সুবহ উম্মেদ' (পূর্বাশা), পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অভিশাপ 'আসা' গর্জিয়া আসে
গ্রাসিবে যন্ত্রী-যাদু-জুলুন।
ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া ?
দেরী নাই চর ডুবিবে কাল।
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল।[২৭৩]

বস্তুতঃ ভারতীয় মুসলমানদের পরাধীনতা কবি-চিত্তকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছে। অত্যন্ত দুঃখ-বেদনার সাথে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী তাদের স্বজাতি নবজাগরণের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত; কাবুলও নতুন দীক্ষা নিয়েছে, আফগান দেশেও বুলবুলের মধুর গান শোনা যাচ্ছে। পামীর ছেড়ে আমীর পথের ধূলায় মণি খুঁজছেন। দিকে দিকে ইসলামের লাল মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমতাবস্থায় কবির স্বদেশবাসী সাত কোটি ভারতবর্ষীয় মুসলমান নির্জীব নিস্প্রাণ, ঘুমন্ত, পরাধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত। তাদের নিক্রিয় ও সুপ্ত অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেই কবি তাদের মেষের সঙ্গে তুলনা করে 'সুবৃহ-উম্মেদ' কবিতার উপসংহারে স্বজাতির নিদ্রা ভঙ্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন:

কসাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদের শুধু নাই কি ত্রাণ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা ! এই জাগরণ-রোলে
এ মেষের দেশও জাগাও ফের![২৭৪]

আলোচ্য 'সুবৃহ-উম্মেদ' (পূর্বাশা) কবিতাটিতে নজরুল ইসলামের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় লাভ করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের বা মুসলিম বিশ্বের জাগরণের চিত্র অংকনের মাধ্যমে স্বদেশে জাতির মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানরা ঐতিহ্যগতভাবে অনুপ্রেরণা লাভের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুখাপেক্ষী থাকার দরুণ কবি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশ ও রাষ্ট্রের নবজাগরণের কাহিনী উল্লেখ করে মনে-প্রাণে ভারতবর্ষের পরাধীন মুসলমানদের জাগরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া কামনা করেছেন।

রণ-ভেরী

নজরুল ইসলামের 'রণভেরী' কবিতাটিও মুসলিম জাতির আবেগ-উদ্দীপনার উপর ভিত্তি করে রচিত। যদিও কবিতাটি মূলতঃ গ্রীসের বিরুদ্ধে অঙ্গোরা-তুর্ক সরকার যে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন, সেই লড়াইতে তুর্কীবীর মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রি.) এর সাহায্যার্থে ভারতবর্ষ থেকে দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব উপলক্ষে লিখিত। তথাপি এ কবিতায় মূল আবেগ ভীরুতা ও নির্জীবতাকে পরিত্যাগ করে পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ হয়ে ওঠা এবং স্বাধীনতার আবাহন। তাই 'রণ-ভেরী' কবিতার শুরুতেই কবির আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে;

ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়-

---

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫; নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

২৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সুবৃহ-উম্মেদ', জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ.৪৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়![২৭৫]

এই কবিতাটিতে কবি মুসলিম সমাজের বর্তমান দৈন্যদশা, কাপুরুষতা ও ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে বিষাণ বাজিয়ে নিশান ওড়িয়ে শমশের হাতে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। ইসলামের ত্যাগ, শৌর্য-বীর্য ও আধ্যাত্ম মূল্যবোধের আলোকে সমকালীন মুসলিম জাতিকে 'ঝণ-নন-নন-রণ-ঝম-ঝন-ঝঞ্ঝনা' শুনিয়ে নতুন করে সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন;

কর কোরবান আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই!
ঐ দীন্ দীন- রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!
শোর- গর্জ্জন
করি তর্জ্জন
হাঁকে, 'বর্জ্জন নয় অর্জন' আজ, শির তোর চায় মা'য়!![২৭৬]

নজরুল ইসলাম যে বিদ্রোহী হয়েও ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে আস্থাবান, এ কবিতাটিতে যেমন তার প্রমাণ মেলে তেমনি কবি যে পুরাতন ঐতিহ্যকে নবমূল্যে উদ্ভাসিত কতে সমানভাবে উৎসুক তাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাই কবি সত্য-ন্যায়ের সৈনিক হিসেবে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের দামামা বাজিয়ে আমামা বেধে হাতিয়ার পাঞ্জায় নিয়ে পৌরুষের জয়গানে মুখর হয়ে পড়েছেন;

মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজহ্ দামামা, বাঁধহ্ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়!
মোরা সত্য-ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গা'য়
ওরে আয়!
ঐ কড়ু কড়ু বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়![২৭৭]

উমর ফারুক

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) (৫৮৬-৬৪৪ খ্রি.) মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এবং অসাধারণ গুণাবলীর আধার খলীফা হযরত উমর (রা.) একাধারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা, প্রথিতযশা প্রশাসক, প্রজাবৎসল ও ন্যায়-পরায়ণ শাসক ছিলেন। ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার মহত্তম যোগ্যতার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'ফারুক' খেতাবে আখ্যায়িত করেন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.) ইন্তেকালে পূর্বেই চারিত্রিক দৃঢ়তা, ন্যায়-নীতি, সাহস ও বিচক্ষণতার দরুণ হযরত উমর (রা.) কে খলীফা মনোনীত করে যান, এটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) শক্তিশালী পারস্য, রোমান সাম্রাজ্যসহ পবিত্র শহর জেরুজালেম পর্যন্ত সমগ্র প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং দক্ষিণে আবিসিনিয়া ও পশ্চিমে লিবিয়া পর্যন্ত সমগ্র মিসর অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার বিস্তৃত হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আরব অন্যান্য বিজিত অঞ্চলে শাসন ও সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামী ন্যায়-নীতি ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু অধিকার এলাকায় শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ সৃষ্টির অগ্রনায়ক রূপে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়।

২৭৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রণভেরী', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩৪।

২৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

২৭৭. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইসলামী শক্তি একে একে পারস্য, রোম ও খ্রিষ্টান পরাশক্তিসমূহকে ধরাশায়ী এবং তদস্থলে ইসলামী শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী শুধু একটি ধর্মমাত্র নয়, বরং একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বটে, ইসলাম একটি জীবন পদ্ধতি। খলীফা হযরত উমর (রা.) বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন অথচ সরল ও অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। তিনি যতদিন খলীফা ছিলেন ততদিন ন্যায়ের মানদন্ডকে কখনও অন্যায়ের দিকে ঝুঁকতে দেননি। ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা, সুবিচার ও ত্যাগের কাহিনী বিশ্বপ্রশংসিত। অতঃপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা, প্রচারে এবং মুসলিম শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টিতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। খলীফা হযরত উমর (রা.) কে মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'উমর ফারুক' শীর্ষক কবিতা রচনা করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁর নির্দেশে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে আযান বা প্রার্থনার আহ্বান প্রচলিত হয় এবং তিনি মুসলমানদের সাথে কা'বাগৃহে সালাত আদায় করেন। তাই ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৬ ই পৌষ রাত্রিকালে এশার নামাজে সমধুর সুরধ্বনি নজরুল ইসলামের কবি-কল্পনায় ইসলামের প্রারম্ভিক কালকে সদাজাগ্রত ও জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। সুদূর মসজিদ থেকে ভেসে আসা মুয়াজ্জিনের কণ্ঠের আযানের ধ্বনিতে নজরুল ইসলামের চেতনায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) এর কথা স্মৃতিপটে জেগে ওঠে, তিনি রচনা করেন;

তিমির রাত্রি-"এশা"র আজান শুনি দূর মসজিদে,
প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির উল-মু'মিনীন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি-জানেনা মুয়াজ্জিন !
তক্‌বীর শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই - উঠিয়াছে কিরে গগনে মরুর শশী ।
ও আজান ওকি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ওকি তোমারি সে আহ্বান ? [২৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনাদর্শ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তব রূপদানকারী খলীফা হযরত উমর (রা.) কবির দৃষ্টিতে একজন মহান সাধক পুরুষ ও আদর্শ মানব। তাই রাত্রিকালে এশার আজানের সুরধ্বনি স্বজনহারা ক্রন্দনের উপমায় 'আমীরুল মু'মিনীন' বা 'বিশ্বাসীদের নেতা' উপাধি প্রাপ্ত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ দক্ষিণ হস্তরূপী খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর স্মৃতি এবং বর্তমানে তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠা, আদর্শ ও দৃঢ়তার অভাবে যেন অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) কে নজরুল ইসলাম কবি-কল্পনায় পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন;

উমর ফারুক ! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহ্বান নয়-রূপ ধরে এস ! গ্রাসে অন্ধতা রাহু।
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজি দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ।[২৭৯]

হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁর ইসলামী শাসনব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দিগ্বিজয়ে অভিযান ও অসীম বীরত্বগাঁথা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। অথচ প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোরতর শত্রুরূপী হযরত উমর (রা.) তরবারী হাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবননাশের পরিকল্পনা নিয়ে বেরিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে পবিত্র কুরআনের

২৭৮. কাজী নজরুল ইসলাম , 'উমর ফারুক', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৭০।
২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০।

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছিল রবি আমাদের নবী, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে![২৮২]

নজরুল ইসলাম তাঁর 'উমর ফারুক' কবিতায় হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তি এবং আলোক রশ্মির বন্যার চিত্রকল্পে বিশ্বময় সে অপরূপ নূরের জ্যোতির বিচ্ছুরণের প্রকৃতি বিষয়টি উল্লেখ করেছেন;

আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভূবন জুড়ি'
"হেরা" গুহা হতে ঠিকরিয়া ছুটে মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি।
প্রতীক্ষমান-তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতে ছিল গো কোরানের সাম-গাথা ! ...
খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব মিতা,
পূণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।[২৮৩]

প্রকৃতপক্ষে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মানব। যিনি মানবতার সেবায় নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি তো মহামানবই বটে। নজরুল ইসলামও খলীফা উমর (রা.) কে একজন আদর্শ মানবরূপে দেখেছেন। কবির দৃষ্টিতে পয়গম্বর, নবী ও রাসূল মহান আল্লাহর দান, কিন্তু হযরত উমর (রা.) রেখেছেন মানুষের সম্মান। হযরত উমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) এর খিলাফতকালে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কুরআন মজীদের অংশগুলো একত্রে সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ 'আল-কুরআন' গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং হযরত উমর (রা.) পবিত্র কুরআনের বাণীকে সত্য রূপদান করেছেন। ইসলামের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। খলীফা হযরত উমর (রা.) নবুওয়্যাত লাভ করেননি বা ওহীপ্রাপ্ত হননি, কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল 'রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সবগুলো গুণে গুনান্বিত। তাই খলীফা হযরত উমর (রা.) এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর বাণী হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে কবি বলেছেন:

পয়গম্বর নবী ও রাসূল এঁরা তো খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ-তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরনীরে,
কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবীরে....
আজ বুঝি কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গাম্বর-
"মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর!"[২৮৪]

খেজুর পাতার জীর্ণ কুটিরে ও ধূলির আসনে বসে যিনি পৃথিবীর শাসন করে গেছেন, সেই মহাপুরুষের মানব প্রেমের এক অনুপম দৃষ্টান্ত 'উমর ফারুক' কবিতাটি যেমন স্মরণীয় তেমনি সব শাসকের প্রেরণার উৎস। হযরত উমর (রা.) এর স্থান মানব জাতির বুকে, তিনি উর্ধ্বলোকের নন। তাই শাসক হয়েও তিনি মাটির মানুষের নিকটবর্তী ছিলেন। অপরাধীকে তিনি কখনো শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করেননি। তিনি ছিলেন আইনের শাসক, সত্যের সাধক, তাঁর তুলনাহীন মানব প্রেমের কোমল অনুভূতিতে বিশ্বজনের সমগ্র বেদনা মুহূর্তে বিদায় নেয়। তেমনি কঠোরতম ন্যায়-বিচার ও সাহসিকতা দেখলে বিশ্বের পরাক্রমশালী ব্যক্তির হৃদয়ও চমকে উঠে। কবির ভাষায়:

---

২৮২. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'উমর ফারুক', 'জিঞ্জীর', পৃ. ২৯৬।

২৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

২৮৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছ ধূলার তখ্‌তে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'।
সাইমুম ঝড়ে পড়েছে কুটীর, তুমি পড়নি ক' নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া হয়ে।...
সবারে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নীচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি' পার, আপনি রহিলে পিছে![২৮৫]

'উমর ফারুক' কবিতায় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে কবি খলীফার সুমহান চরিত্রের মাহাত্ম্য উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালের প্রারম্ভিক সময়ে প্যালেষ্টাইন বিজয়ী আরব সৈন্যবাহিনী পবিত্র নগরী জেরুজালেমের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। ইত্যবসরে জেরুজালেমের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী অধিপতি পেট্রিয়ার্ক কেবল মাত্র খলীফা উমর (রা.) এর কাছেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে রাজী হলো। এ খবর শুনে আমীরুল মু'মিনীন প্রহরী বিহীন অবস্থায় মাত্র একজন সাথী নিয়ে বিশাল সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে জেরুজালেমের পথে বিরামহীন সফর শুরু করলেন। হযরত উমর (রা.) যখন ভৃত্যকে নিয়ে মরুপ্রান্তরের বালুকাময় পথে জেরুজালেম যাচ্ছিলেন তখন স্বয়ং খলীফা ও তাঁর ভৃত্য পালা করে উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করছিলেন। অনন্তর জেরুজালেমে পৌঁছুনো অবস্থায় ভৃত্য ছিল উটের পিঠে আসীন আর মানবদরদী খলীফা হযরত উমর (রা.) তখন উটের রশি ধরে পদব্রজে নগরীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কবির ভাষায়ঃ

জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি',
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে-
উমর যদি গো সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মু'মিনীন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন।...
আসিলে প্যালেষ্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি"..
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর না কি?"
খুলিল রুদ্ধ দুর্গ দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল "খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালেমে!"[২৮৬]

অতঃপর খ্রিষ্টধর্মপ্রধান পেট্রিয়ার্ক ও ইসলাম ধর্মপ্রধান খলীফা হযরত উমর (রা.) একত্রে পবিত্র জেরুজালেম শহরে প্রবেশ করলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কালে হযরত উমর (রা.) খ্রিষ্টানদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। ইত্যবসরে নামাযের সময় উপনীত হলে হযরত উমর (রা.) গীর্জার অভ্যন্তরে প্রার্থনা না করে উপাসনালয়ের সিঁড়িতে সালাত আদায় করলেন। তখন বিস্ময়াভিভূত হয়ে জেরুজালেমের খ্রিষ্টান অধিপতি পেট্রিয়ার্ক এর কারণ অনুসন্ধান করলে খলীফা হযরত উমর (রা.) এই আশংকা প্রকাশ করে বললেন যে, আজ যদি তিনি কোন গীর্জার মধ্যে নামায পড়েন তাহলে পরবর্তীকালে মুসলমানগণ তাঁর স্বাক্ষরিত সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করে ঐ গীর্জা তথা উপাসনালয়কে মসজিদে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। এই ঘটনাটি 'উমর ফারুক' কবিতায় রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে কবি

---

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪-৪৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলাম সমকালীন মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের সাম্য, মৈত্রীর বিধান এবং মহান উদারতা ও সহনশীলতার বাণী শুনিয়ে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত কতে প্রয়াস চালিয়েছেন;

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করি' শক্র-গির্জা-ঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে!"
কহে পুরোহিত, "আমাদের এই আঙ্গিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায়?"
হাসিয়া বলিলে, "তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ
ভাবিবে-খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি'
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মস্‌জিদ করি।
ইসলামের এ নহে ক' ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জারে করে মসজিদ মুসলমান!"[২৮৭]

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে মুসলিম সেনাপতি মহাবীর খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিশাল সেনবাহিনীকে পরাজিত করে মুসলিমগণ দক্ষিণ সিরিয়ায় ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলন করেন। কিন্তু নির্ভীক হযরত উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সিপাহসালার পদ থেকে হযরত খালেদ (রা.) কে অপসারণ করেন এই আশংকায় যে, ইসলামে বীর অর্চনার নামে না জানি মানুষ পূজার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। সেই ঘটনার মহিমাও নজরুল ইসলামের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে;

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতো সবে উদ্ধত কয়!
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরই অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ-সালারে ঈঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না ![২৮৮]

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন মানবদরদী শাসক। তাই জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্য খলীফা হযরত উমর (রা.) নগর পরিভ্রমণের জন্য বের হতেন। একদা রাত্রিকালে সুদূরে একটি কুটিরে দু'টি ক্ষুধাতুর শিশুর বক্ষবিদারক আর্তনাদ খলীফার কানে বেজে উঠলো। তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক দরিদ্র মাতা সন্তানদের খাদ্য রান্নার আশ্বাস দিয়ে শূন্য হাঁড়ি উনুনে চড়িয়ে আপন মনে কাঁদছেন। এহেন দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা.) এর কোমল মন বেদনায় ছেয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁদতে কাঁদতে মদীনায় ছুটে গেলেন এবং বায়তুল মাল থেকে নিজ হাতে আটা, ঘি নিয়ে বললেন:

"এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে!"[২৮৯]

তখন অনেকেই সেই বোঝা বহন করতে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু খলীফা সেই বোঝা নিজেই বহন করলেন। কেননা প্রজা-সাধারণের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার খলীফার নিজের। তাই অনাহারক্লিষ্ট নারী ও শিশুদের জন্য ঐ বোঝা বহন করার দায়িত্বও তাঁর নিজের। অপরে তা বহন করলে তিনি

---

২৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৬।

২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধী হবেন এবং রোজ কিয়ামতে তাঁকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন কেউ তো তাঁর পাপের শাস্তি বহন করতে আসবে না। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, খলীফা হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তাঁর রাজ্যে প্রজারা উপবাসী ছিল। সুতরাং তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকেই করতে হবে। অবশেষে স্বয়ং খলীফা সেই খাদ্যসামগ্রী নিজের পিঠে বহন করে দরিদ্র মাতার গৃহে পৌঁছে দিয়ে মানবপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়ও খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মত অটল। আইনের চোখে সবাই সমান- এ সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখতেন তিনি। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি আপন সন্তান আবূ শাহমাকেও কঠোরতম শাস্তি প্রদানে দ্বিধা করেননি। মদ্যপানের অপরাধে নিজের ঔরসজাত সন্তানকেও তিনি নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেন। ক্ষমা চেয়েও মাফ পায়নি খলীফা-পুত্র আবূ শাহমা। আইনের কঠোর দণ্ডাঘাতে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে। ন্যায়ের শাসক পিতা হযরত উমর (রা.) বক্ষে নির্মম পাষাণ বেঁধে পুত্রের যন্ত্রণার শোকাবহতা সহ্য করেছেন। কবির দৃষ্টিতে এইতো ন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার, জগতের ইতিহাসে তা সত্যিই এক বিরল ঘটনা হয়ে রইল। কবির ভাষায় :

মদ্য পানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছে দোর্‌রা মরেছে পুত্র তোমার চোখের 'পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি',-
"অপরাধ ক'রে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী!"[২৯০]

এ কবিতায় ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর মহান উদারতা ও মহানুভবতার কিংবদন্তিমূলক আরো কতিপয় ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমনিভাবে খলীফা হযরত উমর (রা.) এর অতি সাধারণ আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন:

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
"কোথায় খলীফা" কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে।
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে'
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙ্গিনা-তলে!
... হে খলিফাতুল-মুসলেমিন ! হে চীর ধারী সম্রাট ![২৯১]

আলোচ্য 'উমর ফারুক' কবিতায় বিবৃত মানবপ্রেম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথিকৃত খলীফা হযরত উমর (রা.) ইসলামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে চিরভাস্বর। হযরত উমর (রা.) এর আদর্শ যে নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ ইসলামের দ্বিতীয় খলীফাকে নিয়ে রচিত এই কবিতাটি। ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর স্মৃতিচারণ অথবা সেই আদর্শে সমকালীন মুসলমানদের উজ্জীবিত করাও ছিল কবির অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের ক্রান্তি লগ্নে কবি তাই নিজের জীবনে হযরত উমর (রা.) এর মত মানব প্রেমিক ও আইনের শাসকের জীবনাদর্শ, ত্যাগ ও পরিণতির পুনরাবৃত্তি কামনা করেছেন;

হে শহীদ ! বীর ! এই দোয়া করো আরশের পায়া ধরি',-
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি' !
মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহিনা, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে ![২৯২]

---

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।

২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদ

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'খালেদ' নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক একটি বিখ্যাত কবিতা। কৃষ্ণনগরে থাকাকালে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ, ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম 'খালেদ' কবিতাটি রচনা করেন। এটি 'বার্ষিক সওগাত' পত্রিকায় পৌষ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এক শৌর্য-বীর্যময় স্বর্ণালী অধ্যায়ের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে 'খালেদ' কবিতায় নজরুল ইসলাম মুসলিম জাহানে বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনে তীব্র ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামের সুমহান অতীত গৌরবের আলোকে বর্তমানকে মহিমান্বিত করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন।

মুসলিম বীরশ্রেষ্ঠ সমরবিদদের ইতিহাসে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) (মৃ. ২১ হি./ ৬৪২ খ্রি.) অবিস্মরণীয় একটি নাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী, শ্রেষ্ঠ সমরনীতি কুশলী, অপরাজেয় সিপাহসালার হযরত খালেদ (রা.) প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধে বিশেষভাবে তাঁরই তৎপরতায় পেছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণে গণীমত বন্টনরত অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৬ষ্ঠ হিজরী সালে ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালেদ (রা.) তাঁর শক্তি ও প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে তথা প্রচার প্রসারে নিয়োজিত করেন। শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে মুসলিম বাহিনীর বিশ্বব্যাপী সামরিক অভিযানে তাঁর দুঃসাহসিক নেতৃত্ব ও অবদান অসামান্য। মক্কা বিজয়ে তাঁর অসীম বীরত্ব ও চির অপরাজেয় ভূমিকার জন্য নবী করীম (সা.) হযরত খালেদ (রা.) কে 'সায়ফুল্লাহ' বা 'আল্লাহ তরবারী' খেতাবে ভূষিত করেন। হযরত খালেদ (রা.) এর জীবনে শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠার সাথে খিলাফত তথা সত্য শাসনের প্রতি অপরিসীম আনুগত্য দারুণভাবে সমন্বিত হয়েছে।[২৯৩]

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর খিলাফতকালে (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) আরবে উপজাতীয় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তারা মদীনার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিরোধিতা শুরু করে। বিচক্ষণ খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এহেন বিদ্রোহ দমনের দায়িত্বভার বীরযোদ্ধা ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি খালেদ (রা.) এর উপর ন্যস্ত করেন। তিনি মধ্য আরেবর ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যবাহিনীর বানু হানিফা গোত্রের ভন্ডনবী মুসায়লামাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত ও নিহত করে উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন করেন। এতে বনু হানিফা গোত্রের লোকজন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে খলীফার আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর ৬৩৩ সালে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার লক্ষ্যে খলীফা মহাবীর খালেদের নেতৃত্বে দশহাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ সেনাপতি মুসান্নার সাহায্যার্থে পারস্য অভিযানে প্রেরণ করেন। পারস্যবাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলে উলিসের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে বীরযোদ্ধা খালেদ আরবের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হীরা অঞ্চল দখল করে নিলে তথায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তর ইসলামী রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে রোমানরা আরব বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তারা বালকাতে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আরব বাহিনীর পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বদানের জন্য দূরদর্শী খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তখন মহাবীর খালেদকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। সেনাপতি খালেদ মরুভূমি অতিক্রম করে আরব বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। ৬৩৪ সালের ৩০ শে জুলাই সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী আজনাদাইন নামক রণপ্রান্তরে বাইজানটাইন বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করে। এ যুদ্ধে বিশাল রোমান সৈন্যবাহিনী মুসলিম সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ খালেদের নেতৃত্বে আরব বাহিনীর কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়ায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের পরপরই ৬৩৪ সালের ২৩শে আগষ্ট মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২২শে জমাদিউস্ সানীতে খলীফা হযরত আবূ বকর

---

২৯৩. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) ইন্তেকাল করেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উমর (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হলেন। নতুন খলীফা দূরদর্শী হযরত উমর (রা.) সেনাপতি খালেদের নৃশংস রণনীতি অনুমোদন করেননি বরং তিনি ঐ যুদ্ধের পর আবূ উবায়দা আল-ছাকাফী (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি.) কে আরব বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। অনন্তর খালেদ প্রথমতঃ আবূ উবায়দা পরবর্তীতে মুসান্না বিন হারিস আল-শায়বানী (মৃ. ১৩ হি./ ৬৩৫ খ্রি.) এর নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং একে একে পারস্য ও সিরিয়ার শহরগুলোতে মুসলিম বাহিনীর বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। অবশেষে ৬৩৬ সালের ২০শে আগষ্ট মহাবীর খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বাধীন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করলে সিরিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়।[২৯৪]

প্রকৃতপক্ষে খলীফার প্রতি সেনাপাতি খালেদের এহেন বিশ্বস্ততা, অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন ইসলামী শৌর্য-বীর্যের প্রতীকরূপে যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং খালেদের বীরত্বগাঁথা মুসলিম সমাজে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। একই চরিত্রের দু'টি দিক শ্রেষ্ঠতম বীরদের ইতিহাসের অনুপম। তাই কবি নজরুল ইসলাম মুসলিম ঐতিহ্য থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর কবিতায় রূপায়িত করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত 'খালেদ' কবিতার শুরুতেই মহাবীর মুসলিম সেনাপতি খালেদের জন্য মরুভূমির অশ্রু বিসর্জনের, মরুদ্যানের মরীচিকার অনুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপের, মরু হাওয়ার প্রতীক্ষার খর্জুর বীথির জয়ধ্বজা উড্ডয়নের, বেদুঈন বালার উপবাসে উটের কাফেলার পথচলার বর্ণনার মাধ্যমে খালেদের সমকালীন মরুময় আরব ভূমির পরিবেশ সৃজন করেছেন। পারস্য-সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 'হীরা' দখল করার পর সেনাপতি খালেদের বীরবিক্রমে বিশাল মরুদেশ অতিক্রম করে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য সিরিয়ায় গমন এবং ইয়ারমুকের তুমুল যুদ্ধে তাদের পরাস্ত ও ধ্বংস করার গৌরবময় স্মৃতি সেই মরুপ্রান্তর আজও বিস্মৃত হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে সমকালীন মুসলমানদের নির্জীবতার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে কবি চিত্রণ করেছেন একদিন যে উটের কাফেলা মুসলিম বীর খলীফাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে বহন করে ধূসর আরব মরুভূমি অতিক্রম করতো আজ তা সওদাগরী কাফেলায় পরিণত হয়েছে। এহেন দৃশ্য সত্যিই হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন:

খালেদ ! খালেদ ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহাজারি?
কত "ওয়েসিস" রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি ।...
"মোতাকারিব"-এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে
দু'চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মত জ্বলে।
"খালেদ ! খালেদ" পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
"বণিকের বোঝা বহাত মোদের চিরকেলে পেশা নহে।"...
খুন দেখিয়াছে তুন বহিয়াছে,নুন বহেনি ক কভু।
খালেদ ! তোমার সুতুর বাহিনীর সদাগর তার প্রভু ![২৯৫]

কবিতাটিতে বিশ্বের মজলুমের বা অত্যাচারিতদের আশার প্রতীকরূপে খালেদকে চিত্রণ করা হয়েছে। বীর সৈনিক খালেদ মৃত এ নির্মম সত্য মেনে নিতে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। 'মালেকুল মউত' তথা যমরাজ ফেরেশতা হযরত আজরাঈল (আ.) কে উদ্দেশ্য করে তিনি উৎপীড়িতের ইতিহাস

২৯৪. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী, ডিগ্রী ইসলামিক ষ্টাডিজ, ৩য় পত্র(গ), ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৩৮-৪৬।

২৯৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', 'জিঞ্জীর' নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরে প্রশ্ন করেছেন খালেদ যদি মৃত তবে শত শতাব্দী যুগ যুগান্তের জালিম রাজাদের কেন জান কবজ করা হয়নি? তাই সেনাপতি খালেদকে তাঁর সমস্ত বীর্যসত্তা নিয়ে পুনঃ জাগরিত হওয়ার জন্য কবি আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

খালেদ ! খালেদ ! ভাঙ্গিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!-
শহীদ হয়েছে ? ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত ! আলবৎ !
খালেদের জান্ কব্জ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ ?...
উৎপীড়িতের লোনা আঁসু-জলে গলে গেল কত কাবা,
কত উজ্জ তাতে ডুবে ম'ল হায়, কত নূহ্ হ'ল তাবা!...
বেছে বেছে ঐ "সংগ্-দিল" দের কব্জ করেনি জান?
মালেকুল-মৌত সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফরমান![২৯৬]

অতঃপর কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবি কল্পনায় ইসলামী শৌর্য-বীর্যের চিত্র অংকন করে মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আরব বাহিনীর বীর সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদের রুদ্রমূর্তি ধারণের অবয়ব রূপায়ণ করেছেন;

এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাতিয়ার,
খর্জ্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তাঁর !...
বাজুতে তাঁহার বাঁধা কোরআন, বুকে দুর্ম্মদ বেগ,
আল-বোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দাস্তে দারুণ তেগ !...
ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে ওঠে ঢলে পড়ে সাকী-পাশে !...
রোম-সম্রাট শরাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে !
মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয়,"এয় খোদা,
খালেদের বাজু শম্‌শের রেখো সহি-সালামতে সদা!"[২৯৭]

ইসলামের বিরোধী শক্তিশালী যেসব জালিম রাজা-বাদশাহকে খালেদ বধ করেছেন তাদের দেহের মাটিতে তায়াম্মুম বা অজু করে রণ-ইমাম খালেদকে এহেন জামাতের বা জাগরণের ইমামতি তথা নেতৃত্ব দানের জন্য আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন যে, সারা ইসলাম জগত আজ বিনা ইমামে নামায আদায় করছে। সমকালীন মুসলিম জাহানের নেতৃত্বহীন অবস্থা ও যোগ্য বীর নেতার অভাবে জামাতের নামাযের চিত্রকল্প এই কবিতায় চমৎকারভাবে অংকিত হয়েছে। আর শুধু অজু, জামাত বা ইমামতিকেই কবি 'খালেদ' কবিতায় প্রতীকরূপে ব্যবহার করেননি, বরং বিভিন্ন সময়ের নামায বা প্রার্থনার নির্দিষ্ট নাম তথা প্রাতঃকালের 'ফজর'; দ্বিপ্রহরের 'যোহর', অপরাহ্নের 'আসর', বেলাশেষের 'মাগরিব' ও রাত্রিকালীন 'এশা' এই পাঁচ ওয়াক্তসহ মানুষের মৃতদেহের আচ্ছাদন কাফনকেও নজরুল ইসলাম সার্থকভাবে এ কবিতায় মুসলমানদের দুরাবস্থার রূপক হিসেবে চিত্রণ করেছেন। তাই কবির আহ্বান:

বাহিরিয়া এস, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি !
আব-জম্ জম্ উথলি উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে।

২৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫।
২৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদ ! খালেদ ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্‌রিমা বেঁধে ।...
হটিতে হটিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোর স্তানে,
মগ্‌রেব বাদে এশার নামাজ পাব কিনা কে সে জানে।
খালেদ ! খালেদ ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে
হাতিয়ার হারা দাঁড়ায়েছি তাই তহ্‌রিমা বেঁধে এসে।[২৯৮]

অতঃপর খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) কর্তৃক মহাবীর খালেদকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদ থেকে অপসারণ ও ইরাকের সামরিক অধিপতি সা'দের অধীনস্থ করার ঘটনার বিবরণে কবি পুঁথি সাহিত্যের উপমা, শব্দ ও বর্ণনারীতি অনুসরণ করেছেন। যদিও খালেদের শৌর্য-বীর্যগাঁথার নবরূপায়ণ এ কবিতার মুখ্য আবেগ নয়, বরং ইসলামের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের আলোকে বর্তমানের অবক্ষয়কে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। মহাবীর খালেদের পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা স্মৃতিচারণ করে কবি একদিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেছেন, অপরদিকে অতীতের মহিমা বিস্মৃত, পরাজিত পলায়নপর মুসলিম জাতির কলংক ও ভীরুতাকে উপহাস করেছেন। খালেদের বীরমূর্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চেয়ে কবির মনে তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সমাজের জন্য বেদনা বা অস্থিরতা প্রবলতর। তাই তিনি অনুভব করেছেন যে, সমগ্র মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা। নিজের দুর্বলতা ও গ্লানি ঢাকতে গিয়ে তারা আজ কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এই দুর্বলতা উপলব্ধি করেই কবি 'খালেদ' কবিতায় লিখেছেন;

দামামা ত আজ ফাঁসিয়া গিয়েছে লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি!
খালেদ ! খালেদ ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি!
রীশ-ই-বুলন্দ, শেরওয়ানী, চোগা, তস্‌বী ও টুপী ছাড়া
পড়ে না ক' কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া।[২৯৯]

দ্বীন ইসলামে যখন নামায-রোযা, পোশাক-পরিচ্ছেদেরে আনুষ্ঠানিকতা তথা বৃক্ষের মতো স্থবিরতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তখন ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষতঃ কবির স্বদেশভূমিতে একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল আধিপত্য বিস্তার এবং অন্য দিকে মুসলিম জাতির ব্যক্তিত্বহীন ভীরুতা নজরুল ইসলামকে ভীষণ ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল বলেই কবি আক্ষেপ করে লিখলেন;

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্তানী
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি।....
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি'
সিজ্‌দা করিতে "বাবা গো" ! বলিয়া ধুলি তলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া নাই কেহ নাই!"
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা ![৩০০]

---

২৯৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৩৩।

২৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৩০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অন্যান্য অসঙ্গতিও নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতার মতো বিষয়গুলো এবং এর কুফল তাঁর কবিতায় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ পুঁথিগত ঠুনকো জাতিভেদ, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস এবং মোল্লা-পুরুতদের ফতোয়া দেয়া জাতিভেদ প্রথার প্রতি কবির প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষণীয়। তাই নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমানদের সমাজের সমকালীন অধঃপতন লক্ষ্য করে 'খালেদ' কবিতায় তাদের অবক্ষয়ের চিত্র অংকন করেছেন;

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে!
হান্‌ফী ওহাবী 'লা মজ্‌হাজাবীর তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল, "তলপি তোল্‌"!"[৩০১]

কবি মহাবীর খালেদের বিখ্যাত দু'ধারী তলোয়ার তথা জুলফিকারের কথা স্মরণ করে তাঁর অস্ত্রের কিংবদন্তিকে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অভিনব চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করেছেন। পরিসমাপ্তিতে দুনিয়াতে ফের হযরত ঈসা (আ.) বা ইমাম মেহদী (আ.) নয়, বরং শমশের হাতে নিয়ে বীরযোদ্ধা খালেদের পুনরাবির্ভাব কামনা করা হয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

খালেদ ! খালেদ ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার! ...
জুলফিকার সে দুখান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু !
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারি ও কি তব?
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না, মেহদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের![৩০২]

আনোয়ার

মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিষয়ক কবিতাগুলোর মধ্যেও পরাধীনতার বেদনা, গ্লানি ও সেই সাথে কবির ক্ষুদ্ধ অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবীর আনোয়ার পাশা (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.) ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রি.) এর 'নব্য তুর্কী' (Yong Turks) এর নেতৃস্থানীয় সাথী। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে মিত্রপক্ষের সাথে তুরস্কের সন্ধিশর্ত মোতাবেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তুরস্কের সমর নায়কদের অন্যতম আনোয়ার পাশা একটি জার্মান যুদ্ধ জাহাজে দেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে পরাজিত জার্মানীর সহায়তা লাভের আশা ছেড়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গমন করেন ও মস্কোয় আশ্রয় লাভ করেন। বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণে তাঁর প্রচন্ড ইচ্ছা ছিল। তিনি ছিলেন তুর্কী প্যান-ইসলামী আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা ও নেতা। মস্কো থেকে তিনি মধ্য এশিয়ায় তাসখন্দে যান এবং একটি স্বাধীন তুর্কী রাষ্ট্র গঠন করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ১৯২০ সালে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে তিনি সমরখন্দে শাহাদাত বরণ করেন।[৩০৩]

রুশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত আনোয়ার পাশার মৃত্যু কবিকে দারুণভাবে বিচলিত করে। আনোয়ার পাশার বৃটিশ বিরোধী মনোভাব, তুরস্কে ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলিম বিশ্বের অধঃপতন ও নিষ্ক্রিয়তা নজরুল ইসলামকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই 'আনোয়ার পাশা' নামক কবিতায় তরুণ বন্দী সৈনিকের জবানবন্দীতে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্মীদের নিষ্ক্রিয়, ঘুমন্ত, অধঃপতিত অবস্থায় তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'আনোয়ার পাশা' কবিতাটি ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা

৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪৪০।

৩০৩. কায়দীনান ভূতাল, আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম, পৃ. ৮৪; আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুধু তুরস্ক নয়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজের অধঃপতন বিশেষতঃ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের পশ্চাদমুখি দৃষ্টিভঙ্গী কবিকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করে তুলেছিল। সমকালীন মুসলমান জাতি ও মুসলিম জাহানের এহেন অধঃপতন, ভীরুতা ও স্থবিরতার চিত্রটি 'আনোয়ার পাশা' কবিতাটিতে বিমূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতার শুরুতেই দুঃসাহসী তুর্কী সমর নায়ক আনোয়ার পাশাকে জোর তলোয়ার হেনে সব 'জানোয়ার'কে নাস্তানাবুদ করে মারার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সমকালীন বিশ্বের মুসলমানদের এই কবিতাটিতে পুনঃ পুনঃ 'জানোয়ার' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। কবির আহ্বানঃ

আনোয়ার! আনোয়ার !
সব যদি সুনসান , তুমি কেন কাঁদ আর ?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার ![৩০৪]

বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দুনিয়ার সব মুসলিম রাষ্ট্র বিভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তির উপনিবেশ বা তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্র শক্তির অবনতি এবং সামন্ততান্ত্রিক অভিশাপ থেকে নিস্কৃতি লাভে মুসলিম দেশগুলোর অপারগতা ও স্থবিরতা নজরুল ইসলামের খেদের কারণ। এতদ্ব্যতীত স্বদেশের পরাধীনতা, ধর্মীয় অবক্ষয় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী বীর যোদ্ধাদের জাতি মুসলমানদের দুর্বলতায় কবির বেদনা, ক্ষোভ এবং তিক্ততার যুগপৎ প্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য কবিতায় বন্দী সেনার আর্তনাদ যেমন অন্ধ কারাগারের বদ্ধ রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তেমনি কবিরও প্রচন্ড ক্ষোভ পরাধীন দেশের দিকে দিকে অনুরণিত হয়েছে। আনোয়ার পাশা উপলক্ষ মাত্র। কবির ভাষায়ঃ

আনোয়ার ! আনোয়ার !
যে বলে সে মুসলিম জিভ্ ধরে টানো তার !
বে ঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার।
আনোয়ার ! ধিক্কার !
কাধে ঝুলি ভিক্ষার
তল্‌ওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার !
যারা ছিল দুর্দ্দম আজ তারা দিক্‌দার ![৩০৫]

কবিতাটির পরিসমাপ্তিতে বিশ্বব্যাপী স্বধর্মীয় অবনতিতে কবির অসহনীয় দুঃখ-বেদনা ও প্রখর তিক্ততা অত্যন্ত চমৎকারভাবে মাত্র দুঁটি পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে;

ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই !
তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারীর বেশও তাই ! [৩০৬]

চিরঞ্জীব জগলুল

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৬ ই ভাদ্র / ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে রচিত নজরুল ইসলামের মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিষয়ক 'চিরঞ্জীব জগলুল' শীর্ষক কবিতাটি নওরোজ পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ও 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। সা'দ জগলুল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রি.) নব্য মিসরের জনপ্রিয় মহান নেতা। ১৮৮২ সালে মিসরের শাসন কর্তৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় তারা মিসরকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে। মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর জগলুল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী 'ওয়াফ্দ পার্টির' আন্দোলনে মিসরে স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যাপক রূপ নেয় এবং শেষপর্যন্ত বৃটিশ সরকার ১৯২২ সালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানের

---

৩০৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আনোয়ার', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৩০৫. প্রাগুক্ত , পৃ . ৩৬।

৩০৬. নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌম দেশ হিসেবে মিসরকে স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়। ঝিমিয়ে পড়া মিসরের বুকে অবিসংবাদিত নেতা সা'দ জগলুল পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মুসলিম জাহানের একটি জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটায়। ইসলামী জীবনবোধের মৌলিকতার সাথে নবযুগের গতিশীলতার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় তিনি মুসলিম বিশ্বে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন।[৩০৭]

১৯২৭ সালের ২৩ শে আগষ্ট তারিখে মিসরের জাতরীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা সা'দ জগলুল পাশা আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'চিরঞ্জীব জগলুল' শীর্ষক কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম জগলুল পাশাকে মিসরের শের, শির, শমশেররূপে আখ্যায়িত করে তাঁর তিরোধানে মিসর ভূমির শোকাবহতার কারণ চিত্রায়ণ করে বলেছেন:

প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে,
মেসেরের শের, শির, শমশের-সব গেল এক সাথে।...
মরু-'সাইমুম' তাঞ্জামে চড়ি' কোন্ পরীবানু আসে ?
'লু' হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে।...
ও বুঝি মিসর বিজয় লক্ষ্মী মুরছিতা তাঞ্জামে !
ওঠে হাহাকার ভগ্ন-মিনার আঁধার দীওয়ান-ই-আমে' ![৩০৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন তুর্কী বীর মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রি.) এর মত মিসরে সা'দ জগলুল পাশার স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব কবির মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। ১৯২৪ সালে মিসরের অবিসংবাদিত নেতা সা'দ জগলুল পাশা বিজয়ীর বেশে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে মন্ত্রীসভা গঠন এবং সুদানকে মিসরের একত্রীভূত ঘোষণা করেন। এ সময় সুদান সম্পর্কিত মিসর-বৃটিশ আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ১৯২৪ সালের ১৯ শে নভেম্বর সুদানের ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তখন বৃটিশ সরকার সুদান থেকে মিসরীয় বাহিনী ও কর্মচারীদের প্রত্যাহার করতে বললে মিসর এতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনিভাবে সুদান নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর সাথে মিসরের বিবাদে সা'দ জগলুল পাশা যে অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন তা নজরুল ইসলামের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সুদান প্রসঙ্গটি এই কবিতায় যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, কবি নজরুল ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। অত্র কবিতায় নজরুল ইসলামের সমসাময়িক কালের ঘটনাপ্রবাহে ইসলামী ঐতিহ্যময় ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় লাভ করা যায়। কবির ভাষায়:

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান হারার শোক।....
রহিল মিসর, চলে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিস্প্রভ কায় খসরু সিংহাসন।...
মিসরের চোখে বহিল নতুন সুয়েজ খালের বান,
সুদান গিয়াছে- গেল আজ তার বিধাতার মহাদান।
'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মূসা,
প্রাচীর রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রঙিন উষা ?[৩০৯]

'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সাথে প্রাচীন সভ্যতা এবং হযরত মূসা (আ.) ও ফির'আউনের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মিসরের প্রাচীন ফির'আউনের রাজত্বকালে জীবন্ত শিশু কবরস্থ করণের নির্মম পাষণ্ডতার মাঝে আল্লাহ পাকের

---

৩০৭. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৬৫।

৩০৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

৩০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

রহমতে হযরত মূসা (আ.) এর জন্ম ও ফির'আউনের প্রাসাদে তাঁর লালন-পালনের ঘটনাটি চমকপ্রদ ভাবে চিত্রাংকন করে কবি বলেছেন:

শুনিয়াছি ছিল মমির মিসরে সম্রাট ফেরাউন,
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন।
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।...
জনমিল মূসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এল শিশু রাণীরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারি বুকে চড়ে' নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে![৩১০]

মিসর ও নব্য মিসরের স্রষ্টা সা'দ জগলুল পাশা বিষয়ক এই কবিতায় পুনঃ পুনঃ হযরত মূসা (আ.) ও ফির'আউনের প্রসঙ্গটি প্রাচীন সংগ্রামের রূপকে আধুনিক সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে প্রচলিত আলৌকিক কাহিনীর উল্লেখের মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম আধুনিক মিসরে সা'দ জগলুল পাশার ইংরেজে বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন;

মূসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিসর মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।...
পয়গম্বর মূসার তবু ত ছিল আশা অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত-ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত।
পয়গম্বর ছিলে না ক' তুমি-পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিলে না দোসর ছিলে না শাস্ত্র পানি,...
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্ব শক্তিমান।
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের-রণে বিজয়ী হইবে তা'রা।[৩১১]

মিসরের সংগ্রামে সা'দ জগলুল পাশার অতুলনীয় দেশপ্রেম ও মহান নেতৃত্ব পরাধীন উপনিবেশ এশিয়া ও আফ্রিকার এক অভিন্ন সংগ্রামী সত্তায় মুসলিম জাতিগুলোকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল; কিন্তু বীরোচিত সংগ্রামের প্রেক্ষিতে নজরুল ইসলাম স্বদেশবাসীর দুর্বল ভীরু আচরণ ও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক কলহে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাই এ চিরঞ্জীব মুসলিম মহাবীর ব্যক্তিত্বের অকাল মৃত্যু এশিয়া ও আফ্রিকা এ দু'টি মহাদেশ বিশেষতঃ ভারতের জন্য যে বিশেষ বেদনার কারণ নজরুল ইসলামের কবিতায় সেই আবেগময়তা অতি শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়েছে;

তাই মিসরের নহে এই শোক এই দুর্দিনে আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি'।...
হে বনি ইসরাঈলের দেশের অগনায়ক বীর
'অঞ্জলি দিনু' নীলের সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব 'ফাতেমা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দু'টো বাঁধা বুলি?[৩১২]

---

৩১০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৬৪।

৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫।

৩১২. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য কবিতার শেষ স্তবকে নজরুল ইসলাম পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.) এর ইন্তেকালে ফির'আউনী জুলুম-অত্যাচারের অবসানের রূপকে মাঝে সা'দ জগলুল পাশার মৃত্যুতে নীলনদের আধুনিক ফির'আউন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সলিল সমাধি প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির ভাষায়:

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিসর হইতে বিদায় লইল মূসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে যারে পথ করে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিসরের নর-নারী।
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মূসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হতে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয় তো দেখিব কাল,
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দাজ্জাল।[৩১৩]

আমানুল্লাহ

আধুনিক আফগানিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টাকে নিয়ে নজরুল ইসলাম বিরচিত 'আমানুল্লাহ' কবিতাটি সওগাত পত্রিকায় জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রি./মাঘ, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতের প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের জাগরণ হয়েছিল 'আফগান শের' আমানুল্লাহ খানের নেতৃত্বে। বৃটিশ ভারতের সাথে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সংঘাত ও সংঘর্ষের পরে ১৯১৯ সালের ৮ ই আগষ্ট বৃটিশ সরকার আমানুল্লাহর শাসন কর্তৃত্বে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯২১ সালে বৃটিশ সরকার ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে নতুন চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সুসংহত হয়। তা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে ১৯২২ সালে পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উত্তেজনা, অস্থিরতা ও গোলযোগ অব্যাহত থাকে। ১৯২৬ সালে আমানুল্লাহ আফগানিস্তানের 'বাদশাহ' উপাধি নিয়ে দেশে বহুবিধ আধুনিক শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার বিষয়ে বেশ কিছু আইনগত সংস্কার করা হয়। এতে রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘটলে তা দমন করা হয়। আফগানিস্তানের জন্য রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারত, ইউরোপ, রাশিয়া ও তুরস্ক সফর করে নতুন সংবিধান জারী ও সমাজিক শিক্ষা সংস্কারমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন।[৩১৪]

উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী রাজ্য আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ খানের ঐ ভারত সফরের সময়ই নজরুল ইসলাম 'আমানুল্লাহ' কবিতাটি রচনা করেন। মুসলিম জাহানে আধুনিকতার অন্যতম অগ্রদূত স্বাধীন আফগান অধিপতি আমানুল্লাহ খানকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও ভারতবর্ষে খোশ আমদেদ তথা স্বাগত অভিবাদন জানাতে গিয়ে স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা নজরুল ইসলামের কবিতার প্রারম্ভিক চরণেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে;

খোশ আমদেদ আফগান-শের! অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ-
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিয়ে তাহারা, শাহানশাহ্!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতল্-গা!...
ভুলিয়া য়ুরোপ-'জোহরা'র রূপে আজিকে 'হারুত-মারুত' প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়।...

---

৩১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৩১৪. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাবুল-লক্ষী দেহে মনে এই পরাধীনদের দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোর্‌কায় তার মুখ ঢাকি' ?[৩১৫]

আমানুল্লাহ খানকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কবি ইতিহাস স্মরণ করে উল্লেখ করেন যে, যুগ যুগান্তে উত্তর পশ্চিমের সীমান্তের যে গিরিপথ দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে বীর বিজয়ীরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল যে পথ দিয়েই বাদশাহ আমানুল্লাহ আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এদেশ জয় করতে বা লুণ্ঠন কতে আসেননি, বরং তিনি স্বদেশভূমি আফগানিস্তানকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মহান্‌ব্রত সাধনায় প্রস্তুতির লক্ষ্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই আমানুল্লাহর বাদশাহী রূপ নয়, তাঁর পরিব্রাজক, সাধক, সাগ্নিকরূপ নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এক নতুন জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা আমানুল্লাহর বিশ্বপরিক্রমা ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের জাগরণের দৃশ্যাবলীর চিত্ররূপ কবি-কল্পনায় দারুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে;

সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি' ভাঙ্গি কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফগান, চলেছে ছুটিয়া দিশাহারা।
সুলেমান সম উড়ন-তখ্‌তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়ময়।
শমসের হ'তে কমজোর নয় শিরীণ জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি।' [৩১৬]

আলোচ্য কবিতায় আমানুল্লাহকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে কিন্তু আফগানিস্তানের বাদশাহ বা কাবুলের রাজাকে নয় অর্থাৎ আমীর বা বাদশাহ নয় সংস্কারক আধুনিকতার অগ্রনায়ক আমানুল্লাহ খান কবির অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ অভিবাদন লাভ করেছিলেন। অবশ্য আমানুল্লাহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন বা আফগানিস্তানের ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য বর্ণনাই এ কবিতার একমাত্র উপজীব্য নয়, বরং স্বাধীন প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রের জাগরণের পার্শ্বে স্বদেশ ও স্বজাতির পরাধীনতার বেদনা কবি-প্রাণকে ব্যথিত করেছিল। তাই সমকালীন বিশ্বে মুসলিম জাগরণের প্রেক্ষিতে বাদশাহী সম্পর্কে নজরুল ইসলামের সুস্পষ্ট উক্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে;

'আমানুল্লাহ'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতি অসম্মান।
ঐ বাদশাহী তখ্‌তের নীচে দীন-ই- ইসলাম শরমে হায়,
এজিদ হতে শুরু ক'রে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়।
বুকের খুশীর বাদশাহ তুমি,- শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই-তাই করি বরণ।[৩১৭]

জামালউদ্দীন

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানে 'বিশ্ব-ইসলামী বাদ' (Pan-Islamism) তথা খিলাফত আন্দোলনের অগ্রনায়ক 'সৈয়দ জামালউদ্দীন আল-আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.) এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'জামালউদ্দীন' শীর্ষক কবিতাটি 'বুলবুল' পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক নেতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আফগানিস্তানের অধিবাসী জামালউদ্দীন বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অগ্রগতি এবং মুসলিম

---

৩১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

৩১৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমানুল্লাহ', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮।

৩১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রগুলোতে মুসলমানদের দুর্দশা লক্ষ্য করে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় জাগরণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার দ্বারা ঐক্য বন্ধনের মাধ্যমে ইসলামের অতীত গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী প্রাধান্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মুসলমানদের আর কোন গত্যন্তর নেই, তাই মুসলিম পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তা হিসেবে তিনি 'বিশ্ব-ইসলামীবাদ' বা 'প্যান-ইসলামিক' আন্দোলনের জন্ম দেন এবং বিশ্বের মুসলমানদের সংহতি ও রাজনৈতিক ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁর এহেন উদাত্ত আহ্বান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দেশের মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁকে সুনজরে দেখেনি।[৩১৮]

১৮৭১ সালে জামালউদ্দীন তুরস্ক থেকে বহিষ্কৃত হন, পরবর্তী আট বৎসর তিনি মিসরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থানকালে অধ্যাপনা ও জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার মতবাদ প্রচার করেন। অনৈসলামী জালিম বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি বিপ্লব ঘোষণা করেন। ফলে ইংরেজ অধীনস্থ মিসর থেকেও তিনি বিতাড়িত হন। অতঃপর জামালউদ্দীন আল-আফগানী ভারতবর্ষে আগমন করে প্যান-ইসলামিক মতবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য পরিচালনা করায় ইংরেজ সরকার তাঁকে নজরবন্দী করে রাখে। ১৮৮০ সালে তাঁকে ভারত ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়। অনন্তর সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি আজীবন কঠোর সংগ্রাম করে গিয়েছেন এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অকাতরে বিসর্জন দিয়েছেন। যদিও তার স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল হয়নি, তথাপি তিনি মৃত্যুপ্রায় মুসলিম জাতির প্রাণে যে নতলন স্পন্দন ও সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি করেছেন এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁর বিশ্ব-ইসলামীবাদ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও অদ্যাবধি বিশ্বের সকল মুসলমানের অনুভূতিতে এটা জীবন্ত হয়ে রয়েছে। এ আন্দোলনকে মুসলিম বিশ্বে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ হিসেবেও গণ্য করা যায়। মুসলিম জাহানে আজ যে জাগরণ দেখা দিয়েছে তার মূলে বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব জামালউদ্দীন আল-আফগানীর অবদান ছিল অপরিসীম। এজন্য তাঁকে মুসলিম রেনেঁসার অগ্রদূত বলা হয়।[৩১৯] নজরুল ইসলামের উপর সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে 'জামাল উদ্দীন' শীর্ষক কবিতায়,যাতে কবি মুসলিম মুজাহিদ আফগান বীর জামালউদ্দীন আল-আফগানীকে কেবল 'এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য' বা 'পুরুষ মহামহিম' রূপেই তস্‌লিম জানাননি, উপরন্তু ইসলামের শৌর্য-বীর্য, আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতর সম্মানে তাঁকে ভূষিত করে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছেনঃ

> সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম,
> এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য, পুরুষ মহামহিম ॥
> সাম্য উমর ফারুকের তুমি, আলীর জুল্‌ফিকার,
> অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
> নিরাশার কারবালা-প্রান্তরে দুল্‌দুল্ আস্‌ওয়ার,
> জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম।[৩২০]

জামালউদ্দীন আল-আফগানী তাঁর রচনা ও বাণীর মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী মুসলিম জাহানকে দিয়েছেন তা প্রাচ্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে; তিনি আফগানী হলেও শুধু আফগানিস্তানের কথা চিন্তা করতেন না, সমস্ত জাহান ছিল তাঁর দেশ এবং মুসলিম বিশ্বের উন্নতির

---

৩১৮. কে . আলী, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 'আধুনিক যুগে ইসলাম,' পৃ. ২২৩; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

৩১৯. কে . আলী, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, 'মধ্যযুগে ইসলাম', পৃ. ১৭০-১৭২।

৩২০. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, 'জামাল উদ্দীন', 'চিরঞ্জীব', পৃ. ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান। নিজে চিরকুমার থেকে, সরকারী চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে, জুলুম নির্যাতন সয়ে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ, নির্বাসন, বিতাড়ণ ও কারারুদ্ধ হয়েও তিনি মুসলিম কওমের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জামালউদ্দীন আল-আফগানীর কার্যক্ষেত্র কাবুল, মিসর, ইরান, তুরস্ক, ভারতবর্ষ এবং আরব বিশ্বে সম্প্রসারিত ছিল। তিনি নিজে একজন সূফী ও সুন্নী মুসলমান ছিলেন কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে মুসলিম বিশ্বে তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল। ভারতের খিলাফত, ইরানের কাশানি, আরবের ইখ্ওয়ান এবং ইন্দোনেশিয়ার দারুল ইসলাম আন্দোলন জামালউদ্দীন আল-আফগানীর প্যান-ইসলামীবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি। এই আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা আনয়ন করে, ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করে তাদের জাতীয় রাজনৈতিক পুনর্জন্মের পথ উন্মুক্ত হয়। ইউরোপীয় পরাশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুভূতি তথা অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামী চেতনা এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছিল। এজন্য পরবর্তীকালে বহু মুসলিম দেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়েছিল। মিসর, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন বিশ্ব-ইসলামীবাদ অনুভূতিরই পরোক্ষ ফল। এই আন্দোলন বিশ্বের সকল নির্যাতিত ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর প্রতি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করেছে নিঃসন্দেহে। দেশ-কাল ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে পারস্পরিক মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই অধুনা ঘানা, সুদান, আলজেরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।[৩২১]

তাই আদর্শ মুসলিম বীর নেতা জামালউদ্দীন আল-আফগানী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত। বিশ্বের ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য আজীবন তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস তুষার সাগরে চাঁদের আগমনে জোয়ারের আবির্ভাবের চিত্রকল্পে উল্লিখিত হয়েছে। কেবল মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্রগুলোর রেনেঁসা বা পুনর্জাগরণ নয়, বরং বিশ্বের পরাক্রমশালী নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের আবির্ভাবকে কবি নজরুল ইসলাম বিপ্লবী শহীদ জামালউদ্দীন আল-আফগানীর ইসলামী মতবাদের ফলশ্রুতিরূপে বর্ণনা করেছেন;

জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ,
তুষার সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ার ভীম।।
সউদ, কামাল, জগলুল পাশা, ইব্‌নে-করিম বীর
তোমার মানস-পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
প্রাচীর গর্ব সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম ।। [৩২২]

রীফ-সর্দার

নজরুল ইসলামের 'রীফ-সর্দার' নামক কবিতাটি মরক্কোর স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্দী রীফ নেতা আবদুল করীম আল-খাত্তাবী (১৮৮২-১৯৬৩ খ্রি.) এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপক । প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর উত্তর আফ্রিকার মরক্কো রাজ্যের অধিকারের দাবীতে পাশ্চাত্য ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা এবং স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় আবদুল করীম ১৯২০ সালে বন্দী হয়ে এগার মাস বন্দীজীবন কাটান। ১৯২১-১৯২৪ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯২৫ সালে রীফ উপজাতীয়দের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন রীফ সর্দার আবদুল করীম

৩২১. কে . আলী, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 'আধুনিক যুগে ইসলাম', পৃ. ২২৫।

৩২২. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'জামাল উদ্দীন', 'চিরঞ্জীব', পৃ. ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর মরক্কোর অধিকাংশ উপজাতীয়দের একতাবদ্ধ করেন এবং ঔপনিবেশিক স্পেনীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। অতঃপর তিনি মরক্কোর সুলতান হন এবং 'রীফ প্রজাতন্ত্র' সংগঠনে নিয়োজিত হন। অনন্তর আবদুল করীম স্পেনের অধিকারভুক্ত মরক্কো অতিক্রম করে ফরাসী অধিকারভুক্ত অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই অভিযানের সাফল্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফ্রান্স ও স্পেন সমবেতভাবে আবদুল করীমের উপজাতি যোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়। ফলে ১৯২৬ সালে ফরাসী-স্পেন সমবায়ে আক্রমণে আত্মসমর্পণ না করে তিনি 'রি-ইউনিয়ন' দ্বীপে নির্বাসিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে তিনি পালিয়ে মিসরে প্রবেশ করেন। ১৯৪৮ সালে উত্তর আফ্রিকা মুক্তি সংঘ গঠন করেন ও ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। ক্রমাগত সংগ্রামে ১৯৫৬ মরক্কো স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু তিনি আমৃত্যু মিসরেই অবস্থান করেন। ১৯৫৮ সালে মরক্কোর বাদশাহ ৫ম মুহাম্মদ তাঁকে 'জাতীয় বীর' খেতাবে ভূষিত করেন।[৩২৩]

মরক্কোর মুসলমানদের নবজাগরণের পথিকৃৎ আবদুল করীম আল-খাত্তাবীর অপরিসীম শৌর্য-বীর্য ও দুঃসাহসিকতার জন্য 'রীফ-সর্দ্দার' নামক কবিতায় নজরুল ইসলাম তাঁকে 'নবযুগের নেপোলিয়ান' বলে অভিহিত করে বলেছেন:

তোমার পুন্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব।
জানিনা আজিকে কোথা তুমি,
নয়ি দুনিয়ার মূসা তারিক,
আছে "দীন" নাই সিপা'-সালার
আছে শাহী তখ্‌ত নাই মালিক।[৩২৪]

কবি নজরুল ইসলাম মরক্কোর জাতীয় বীর রীফ-সর্দ্দার আবদুল করীমকে 'শাহানশাহ বন্দীদের', 'লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার', 'নয়ি দুনিয়ার মূসা তারিক' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইসলামের ইতিহাসের শোকাহত ঘটনার চিত্রকল্পে কারবালা রণাঙ্গনের এজিদ, জয়নাল আর আব্বাসের উপমা ব্যবহার করে রীফ-সর্দ্দার আবদুল করীমের একক বীরত্ব ও মরক্কোবাসীর দুর্ভাগ্যকে অংকন করেছেন। আলোচ্য কবিতায় ফোরাত নদীর তীরে কারবালার যুদ্ধের রূপকে মোহররমের যে বিষাদময় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে শুধু অতীত দুর্ভাগ্যের আলোকে উত্তর আফ্রিকা বা মরক্কোর মুসলমানদের পরাধীনতার হতাশাই প্রকাশিত হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে কবির স্বদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতাহীনতার বেদনাও ধ্বনিত হয়েছে। সেইসাথে মুসলমানদের উপর ইউরোপের আগ্রাসন ও দস্যুবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার জানানো হয়েছে। কবির ভাষায়:

আজিকে জীবন "ফোরাত"-তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ,
শিরে দুর্দ্দিন-রবি প্রখর,
পদতলে বালু ফোটার খই।...
তুমি এলে, সাথে এল না দত্ত,
করিল শত্রু বাজু শহীদ,
তব হাত হ'তে আব-হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।[৩২৫]

---

৩২৩. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৬।

৩২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রীফ সর্দার,' 'সন্ধ্যা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৫৬৬-৫৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মা মোহসিন

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত দানবীর হাজী মুহাম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.) এর নাম বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ঘরে ঘরে অত্যন্ত সুপরিচিত। দানশীলতা ও বদান্যতার কারণে মহাত্মা হিসেবে তিনি 'বঙ্গের হাতেম তাই' খ্যাতিতে বিভূষিত হয়ে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন বৈপিত্রেয় বোন মুন্নজানের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে চিরকুমার হাজী মুহাম্মদ মোহসিন বিভিন্ন সমাজসেবা ও শিক্ষা সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সম্পত্তির এক বিরাট অংশ মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির জন্য উইল করে দান করে যান। হুগলীর ইমামবাড়া, হাজী মুহাম্মদ মোহসিন কলেজ প্রভৃতি তাঁর অমর কীর্তি।[৩২৬] ১৩৩৮ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম হুগলীর এই প্রখ্যাত মুসলিম শিক্ষানুরাগী দানবীরকে মহাত্মারূপে সম্বোধনপূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে অভিবাদন জানিয়েছেন;

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহসীন।
ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়ে তব নাম চিরদিন।...
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আল্লার সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লার নিয়ামত,
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হযরত!...
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহসিন, লহ আমার সালাম।[৩২৭]

মাওলানা মোহাম্মদ আলি

ভারতবর্ষের খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলি (১৮৭৮-১৯৩১ খ্রি.) এর ইন্তেকালে রচিত নজরুল ইসলামের 'মাওলানা মোহাম্মদ আলি' শীর্ষক ইসলামী চেতনা সম্বলিত উদ্দীপনামূলক কবিতাটি ১৯৩১ খ্রি./ ১৩৩৮ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, অসাধারণ বাগ্মী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত মাওলানা মোহাম্মদ আলি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই মাওলানা শওকত আলি বিংশ শতাব্দীতে পরাধীন ভারত বর্ষের মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে তাদের মুসলিম জগতের অংশরূপে গৌরববোধ করতে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শিখিয়েছিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত প্রতিষ্ঠাকালে সর্বভারতীয় খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন ও নেতৃত্ব দেন। ভারতের আজাদী আন্দোলনে মাওলানা মোহম্মদ আলির অবদান বিপুল। ১৯৩০ সালে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিনি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এসময় অত্যধিক পরিশ্রম ও দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে স্ট্রেচারে করে বোম্বাইতে জাহাজে উঠানো হয়েছিল। ভারতের শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিলাতে আহুত গোলটেবিল বৈঠক দুই মাস স্থায়ী হয়, তাতে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও মাওলানা মোহাম্মদ আলি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ভারতের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন। গোলটেবিল বৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বেই ১৯৩১ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী এই মহান দেশপ্রেমিক মাওলানা মোহাম্মদ আলি লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওসীয়ত

---

৩২৫. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

৩২৬. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৬।

৩২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মহাত্মা মোহসিন', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯০১-৯০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে পরাধীন ভারতে তাঁর দাফন না করে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর ওমর মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।[৩২৮]

মাওলানা মোহাম্মদ আলির আকস্মিক মৃত্যুতে কবি নজরুল ইসলাম 'মাওলানা মোহাম্মদ আলি' শীর্ষক কবিতায় তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন প্রসঙ্গে নিজস্ব তেজোদীপ্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আধেক হিলাল বা অর্ধচন্দ্র ইসলামের প্রতীক চিহ্ন মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মাথার টুপীতে ঐ প্রতীক শোভা পেত তাই কবিতার শুরুতে স্বভাবতঃই তা রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসাথে বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও তাদের মহান রাষ্ট্রনায়কদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম জাহানের ভৌগলিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃজন করা হয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের পর তাঁর মৃত্যুতে কবি বেদনায় ভারাক্রান্ত পৃথিবীর চিত্রকল্প তৈরী করেছেন;

আধেক হিলাল ছিল আসমানে আধেক হিলাল দুনিয়ায়,
দুনিয়ার চাঁদ গেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে, ইরানে, তুরানে, ইরাকে, মেসেরে, সিরিয়ায়-
হিন্দুস্তানে ছিল যে রতন, হারাইয়া গেল সেও হায়!
উহাদের ছিল ইবনে করিম, সউদ, কামাল, জগলুল,
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলি-একাই সবার সমতুল।[৩২৯]

অতঃপর কবি নজরুল ইসলাম ভারতীয় মুসলমান ও ইসলামের ইতিহাস থেকে রূপক তৈরী করে ভারতের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক, স্বধর্ম, স্বজাতির মুক্তি সংগ্রামের, উৎসর্গীতপ্রাণ মাওলানা মোহাম্মদ আলির অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় দিয়ে মাওলানা সাহেবের দ্বীনি জোশ বা স্বধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরাগকে দিল্লীর মোগল সম্রাট মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) এর স্বধর্মপ্রিয়তা, তাঁর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রয়াস বা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সম্রাট আবুল ফাত্‌হ জালালউদ্দীন মুহাম্মদ আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) এর সমন্বয় প্রয়াসের, তাঁর 'কমরেড' শীর্ষক পত্রিকায় মাজলুমের প্রতি সহানুভূতি, তাঁর পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা ও সেই আজাদী সংগ্রামে দুঃসাহসিকতাকে ইসলামের চতুর্থ খলীফা মহাবীর হযরত আলী (রা.) এর শৌর্য-বীর্যের সাথে তুলনা, তাঁর গভীর ইসলাম প্রীতিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম প্রীতির উপমায় চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন;

ছিল আওরঙ্গজেবী দীনী জোশ, আকবরী দিল্ মিলনের,
ছিল "কমরেড" ছিল "হামদার্দ" দীন দরিদ্র সকলের।
'মোহাম্মদে'র ইসলাম প্রীতি 'আলি'র শৌর্য্য বাহুবল
ছিল গো যাহাতে আজি অসময়ে সে-ই ছেড়ে গেল ধরাতল।
নাই গো মক্কা মদীনায়ও আজ এমন নিশান-বর্দ্দার,
নাই ইসলাম জাহানে গো আজ এমন দ্বীনী সর্দ্দার।[৩৩০]

বাংলার 'আজীজ'

'মোহাম্মদী' পত্রিকার কার্তিক, ১৩৩৪ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের 'বাংলার আজীজ' শীর্ষক কবিতাটি জাগরণী কবিতাটি চট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজীজ (১৮৬৩-১৯২৬ খ্রি.) এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন

৩২৮. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৭।

৩২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মাওলানা মোহাম্মদ আলি', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৯৩৩।

৩৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহধন্যা মরহুম মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের মাতামহ। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে হাবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর মাতামহ আবদুল আজীজের তামাকুমন্ডিস্থ বাসভবনে বেশকিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। মরহুম আবদুল আজীজ বি. এ. চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর প্রথম উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। এজন্য তাঁর দুই লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যান। চট্রগ্রামে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি, ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল, কবিরুদ্দীন মেমোরিয়াল হল, লী ইসলামিয়া রিডিং-রুম প্রভৃতি তাঁর অমর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।[৩৩১]

'বাংলার আজীজ' নামক কবিতাটিতে শিক্ষা-দীক্ষাহীন ঘুমন্ত বাঙালী মুসলমান সমাজ জীবনে মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজীজের শিক্ষার আলো বিস্তারের মহান প্রয়াসকে নিদ্রিত মুসলমানদের প্রাতঃকালীন ইবাদাতে তথা ফজরের নামাযে যোগদানের জন্য মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজানের আহ্বানসূচক ধ্বনিতে জাগ্রত হওয়ার চিত্রকল্পে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সাথে বাংলার নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে ঘুমন্ত নির্জীব মুসলমান সমাজের একটি প্রকৃত চিত্র অংকন করে কবি বলেছেন:

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় তখন বঙ্গ-মুসলিমান।
সবার আগে জাগ্‌লে তুমি, গাইলে জাগার গান !
ফজর বেলায় নজর ওগো উঠ্‌লে মিনার পর,
ঘুম-টুটানো আজান দিলে-"আল্লাহু আক্‌বর"।[৩৩২]

খান বাহাদুর আবদুল আজীজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নবজাগ্রত বাঙালী মুসলমান নর-নারীর একটি সুন্দর চিত্রও এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। মরহুম আবদুল আজীজের দৌহিত্র হাবীবুল্লাহ বাহার ও দৌহিত্রী শামসুন নাহার নবজাগ্রত বাঙালী তরুণ মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। বাঙালী মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার অবরোধ ভেদ করে যে কয়েকজন তেজস্বী নারী প্রথম বেরিয়ে এসেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাদের অন্যতম। মুসলিম নারী জাগরণের তিনি ছিলেন এক পথিকৃৎ। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় বাঙালী মুসলমান সমাজে অন্যতম পথিকৃৎ হাবীবুল্লাহ বাহার। মাতামহ আবদুল আজীজের সহায়তায় তা সম্ভবপর হয়েছিল। তাই নজরুল ইসলামের স্নেহধন্য ঐ ভাই-বোনদের নাম এ কবিতায় স্বাভাবিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে;

কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা,
লেখার যত ইসলামী-জোশ্ তোমায় দিল দেখা!...
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠ্‌ল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখ্‌ল তারা আলোর অভিযান ।...
এলে নিশান্-বরদা্ বীর, দুনন পন্দার,
লায়লা চিরে আ্লে নাহার-রাতের তারা-হার!
সাম্যবাদী! নর-নারীতে করতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্তানে রচলে গুলিস্তান।[৩৩৩]

---

৩৩১. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, 'চিরঞ্জীব পরিচিতি', পৃ. ৩৬৮।

৩৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজীজ', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৫৬৮।

৩৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস এম. রহমান

'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের লেখিকা মোসাম্মাৎ মাসূদা খাতুন ওরফে মিসেস এম. রহমানের কাছ থেকে নজরুল ইসলাম মাতৃস্নেহ লাভ করেছিলেন। কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে এই মহীয়সী মহিলা বিশেষ উৎসাহ-প্রেরণা দান করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও নজরুল ইসলাম এই মহিলার দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবি তাঁকে 'নাগমাতা'রূপে চিত্রিত করে 'বিষের বাশী' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। ১৯২৬ সালের ২০ শে ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান হলে নজরুল ইসলাম শোকাহত হয়ে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে ১৩৩৩ সালের ১৫ই পৌষ তারিখে 'মিসেস এম. রহমান' নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি সওগাত পত্রিকায় মাঘ, ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। মাতৃসমা মিসেস এম. রহমানের শোকে কবির বিয়োগ ব্যথা ও তাঁর কৃষ্ণনগর জীবনের দুঃখ-বেদনা, দারিদ্র-যন্ত্রণা ও রোগের মর্মজ্বালা একাকার হয়ে এ কবিতায় কারবালা বিষাদের বিষাদময়তার রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ আলোচ্য কবিতাটি নজরুল ইসলামের জীবনের বেদনাবিধুর একটি অধ্যায়ের আলেখ্য। মিসেস এম. রহমানের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে কবির ক্রন্দনরোল ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনার ন্যায় কয়েকটি চিত্রকল্পে রূপ লাভ করেছে। কবির ভাষায়:

মোহররমের চাঁদ উঠার ত আজিও অনেক দেরী,
কোন কারবালা-মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি,
ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া উঠে কেন গো আমার চোখে?
নিখিল এতিম ভিড় করে কাঁদে আমার মানস লোকে।
মর্সিয়া-গান! গাসনে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্ব্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি।[৩৩৪]

৬১ হিজরীর ১০ ই মোহররম কারবালার মরু প্রান্তরে কুফার পথযাত্রী হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলী (রা.) কে যেমনিভাবে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া (রা.) এর সৈন্যবাহিনী ঘিরে রেখেছিল, এমতাবস্থায় ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর কূলে ইমাম হুসাইন (রা.) এর পরিবারের সকল পুরুষ সদস্য যেমন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একে একে শাহাদাত বরণ করছিল আর মুসলমানদের শিবিরে শত্রুসেনা ঘাতক সীমারের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে ইমাম হুসাইন (রা.) মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ফট করছিলেন, তেমনিভাবে দারিদ্রক্লিষ্ট কবি নজরুল ইসলাম রোগশয্যায় অসহায়ভাবে মাতৃশোকের বেদনায় জর্জরিত হয়ে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন;

আজ যবে হায় আমি
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কারবালা-মাঝে থামি,
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু-এজিদ সেনা,
ভায়েরা আমার দুশমন খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগশয্যায় বাজু কামড়িয়ে মরি।
দানা-পানি নাই পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি।[৩৩৫]

মাতৃসমা মিসেস এম. রহমানের সাথে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর সম্পর্ককে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর পুত্র জয়নাল আবেদীন ও তাঁর বন্দিনী মাতা সম্পর্কের রূপকে অংকন করেছেন। রোগশয্যা অবস্থায় ক্রন্দনরত কবির জন্য বুঝিবা শূণ্যে বসে মাতা অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন। অতিপ্রাকৃত এহেন অভিনব রূপ-কল্পের মাধ্যমে নজরুল ইসলাম তাঁর সেই বেদনার্ত মুহূর্তের অনুভূতিটি কারবালার সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবির ভাষায়:

---

৩৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম. রহমান', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এমন সময় এল 'দুলদুল' পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূণ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল-'জয়নাল আবেদীন'।
শীর্ণ-পাঞ্জা দীর্ণ-পাজর পর্ণকুটির ছাড়ি'....
বন্দিনী মা'র ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত-পারে,
"এজিদের বেড়া পাড়ায়ে এসেছি, যাদু তুই ফিরে যারে।"
কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা.-
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের দিশা?[৩৩৬]

মাতৃহারার বেদনা প্রকাশে ইসলামী ঐতিহ্যময় সাহারা মরুভূমির উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কবি নজরুল ইসলামের রিক্ত জীবনের শূন্যতা আর কারবালার রণাঙ্গনে মা ফাতিমার মৃত্যুতে ইমাম হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) এর বুকফাটা আর্তনাদের ক্রন্দনরোলের চিত্রকল্প বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে,

জীবন ঘিরিয়া ধুধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি।
আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙ্গা কাৎরানি।
মাতা ফাতিমার লাশের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে,
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে।[৩৩৭]

কবি মুসলিম নারী মুক্তির অন্যতম পথিকৃৎ মিসেস এম. রহমানের তেজস্বিনী রমণী মূর্তি চিত্রণ করতে গিয়ে তাঁকে হেরেমে বন্দিনী চির স্বাধীন বেদুঈন বালারূপে কল্পনা করে বলেছেন যে, মিসেস এম. রহমানের আলোর অভিযান ছিল বাঙালী মুসলমান নারীকুলকে পর্দাপ্রথার ন্যায্য অধিকারের দাবীতে অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে নিয়ে আসা। সেই সাথে হেরেমের বাঁদীখানা থেকে উদ্ধার করে পুরুষের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার কথা। তাই ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই মহিয়সী মহিলাকে সহ্য করতে পারেনি বরং হেরেম রক্ষী গোলামেরা তাঁর অনেক কুৎসা রটনা করেছে কিন্তু আলোর পিয়াসী মিসেস এম. রহমানের স্মৃতিগুলো চিরজীবি হয়ে থাকবে। কবির ভাষায়ঃ

সে ছিল আরব-বেদুঈনদের পথ-ভুলে আসা মেয়ে
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে।...
সে বলিত "ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে-বাঁদী খানা ঐ হেরেমের মোহে।...
বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,
চিরজীবি মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি'।[৩৩৮]

জাগরণী ইসলামী সঙ্গীত

বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলামের হাতেই সর্বপ্রথম ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণের সার্থক রূপায়ণ হয়। নজরুল ইসলাম যখন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভূত হন সমকালীন মুসলমানদের তখন চরম দুর্দিন। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দুঃখ-দারিদ্রে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, ব্যথিত-দুর্দশাগ্রস্ত ছিল মুসলিম সমাজ। বিশেষতঃ পাক-ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শ-নৈতিকতা হারিয়ে বিভ্রান্ত, দিশেহারা

---

৩৩৬. নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৩০।

৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০।

৩৩৮. নজরুল ইসলাম:ইসলামী কবিতা, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। উপরন্তু তখন দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল মুসলিম জাহানের উপর। এসময় বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলমানগণও ঘুমের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই ঘুমন্ত হতভাগ্য মুসলিমদের নবজাগরণের আহ্বান জানিয়ে তাদের সামনে দুনিয়ার মুসলিম রাজ্যসমূহের নবজাগরণের বার্তা ও ইসলামের সোনালী মশাল তুলে ধরলেন। নজরুল ইসলাম ভারতের তন্দ্রাভিভূত, নিষ্ক্রিয় মুসলমানদের জাগরণী ডংকায় আঘাত হেনে বজ্রকণ্ঠে যে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, এতে মুসলিম জাগরণের অংকিত চিত্রে জামালউদ্দীন আল-আফগানীর বিশ্ব-ইসলামীবাদ বা 'প্যান-ইসলামী চিন্তাধারা' প্রতিফলিত হয়েছে;

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বে-খবর তুইও ওঠ্ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ;
রেজা পাহ্‌লবী সাথে জাগিয়াছে বিরান মুলুক ইরানও আজ;
গোলামী বিসরি জেগেছে মিসরী, জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল॥
ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ নেজদ আরবে ইবনে সাউদ।
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আল-মাহ্‌মুদ
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ বন্দী করিম রীফ কামাল॥
জাগে ফয়সল ইরাক আজমে, জাগে নব হারুন- আল-রশীদ
জাগে বায়তুল মোকাদ্দস্ রে জেগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিঁদ,
জাগে নাকো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল ॥[৩৩৯]

মুসলিম জাতি আপন স্বকীয়তা হারিয়ে তাহ্‌জীব-তমুদ্দন বিসর্জন দিয়ে অন্যান্য জাতির সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। বরং আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উপমহাদেশে তথা দুনিয়ার কাব্যকাশে অন্যান্য জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পার্শ্বে শুকতারার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান থাকতে পারে এ আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েই কবি নজরুল ইসলাম লেখনী ধারণ করেন। ভারতের আযাদী তথা মুসলিম জাগতের জাগরণী মন্ত্রের উদ্যোক্তা হয়ে কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার প্রবল আকাঙ্খায় উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন:

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙ্গা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥
মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার, বুকে ইসলামী জোশ্ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক আল্লাহর চল আগে চল বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান ॥[৩৪০]

ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম দুনিয়ার অখণ্ড চিত্র নজরুল ইসলাম তাঁর জাগরণী কবিতায় সমুজ্জল করে তোলেন। একদা ইসলামের উজ্জ্বলতম আলোক-আভায় পার্থিব জগত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ইসলামের আবির্ভাব দুনিয়া-জাহানে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। ইসলামের গৌরবে দুনিয়া গৌরবান্বিত হয়েছিল। কিন্তু আজ যেন ইসলামী ঐতিহ্যের সেই উজ্জ্বল আলো আর নেই, সেই গৌরবও নেই। মুসলিম জগতের তমসা-রাহু যেন ইসলামকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে। তাই কবি নজরুল ইসলাম উপমহাদেশের মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে ইসলামী জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেন:

---

৩৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।
৩৪০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য্য
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক! [৩৪১]

যে মুসলমান এক সময় বিশ্বজয় করে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিল এবং যে মুসলমানগণ দুনিয়াতে সগৌরবে রাজত্ব করত, আজ তাদের সেই গৌরবময় বাদশাহী, তখ্‌ত-তাউস নেই! আজ তাদের সেই পূর্বেকার ইসলামী জোশ্‌ ও সঞ্জীবনী শক্তি কোথায়? সেই জগৎ জয়ী মুসলিম সিপাহীরা কোথায়? সেই বীর শহীদান আজ কোথায়? যে আল্লাহ তা'আলার মুখ চেয়ে মহান আল্লাহর পথে নিজেকে কোরবান করত। কেন আজ তাদের এ দুরাবস্থা? মুসলমানদের সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়েও ইসলামের সেই শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানদের সাড়া নেই কেন? মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে কবি নজরুল ইসলাম মুক্তিমন্ত্রের উদ্যোক্তা হয়ে দু' হাত তুলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রায় কেঁদে উঠে আকুল ফরিয়াদ করে বলেন:

কোথায় তখ্‌ত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী,
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ ইয়া এলাহী।
কোথায় সে বীর খালেদ, কোথায় তারেক, মুসা,
নাহি সে হযরত আলি, জুলফিকার নাহি॥
নাহি সে উমর খাত্তাব, নাহি সে ইসলামী জোশ,
করিল জয় যে দুনিয়া, আজ নাহি সে সিপাহী ॥[৩৪২]

সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার এহেন দুঃসময়ে কবি নজরুল ইসলামের সম্মুখে বিভিন্ন চিত্র আবর্তিত হয়ে থাকে, ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবময় যুগে যে মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে স্ত্রী-পুত্রকে আল্লাহ তা'আলার হাতে সপে দিয়ে নির্ভীক চিত্তে দুর্দিনে সত্য ও স্বাধীনতার জন্য জিহাদ করে নিজেকে কোরবানী দিত, আজ সেই মুসলমানগণ কোথায়? যে মুসলমান এই ত্রিভূবনে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করত না- যে মুসলমান সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব 'আল-কুরআন' সঙ্গে নিয়ে জাতির মুক্তির জন্য আজাদী সংগ্রামে অকুন্ঠ চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আজকের মুসলিম জগতের এমন দুর্দিনে সেই বলিষ্ঠ মুসলমান কোথায়? পরাধীনতার গ্লানি কবি-চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাই কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানদের জীবনে জাগরণী শক্তির জোয়ার আনতে অনুসন্ধিৎসু হয়ে চারণ কবির মতো গেয়ে উঠেন;

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান?
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁহার জীবন-মৃত্যু-জ্ঞান॥
যার মুখে শুনি তওহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম,
যার দ্বীন দ্বীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জ্বিন-পরী-ইনসান। [৩৪৩]

আমাদের ইসলাম ধর্মের প্রার্থনা ও ইবাদাতের সাথে মুসলমানদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য কবি নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত ধর্মীয় সঙ্গীতে ঈমানের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থের

---

৩৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম' , 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৪।

৩৪২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী , ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৩৪৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী , ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আজাদ' কবিতায় ইসলামের অতীত আদর্শ, মুসলিম ঐতিহ্য ও শৌর্য-বীর্যের পুনর্জাগরণের চিত্র উল্লেখের মাধ্যমে কবি স্বদেশের স্বজাতির নবজাগরণ কামনা করেছিলেন;

কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান ?
আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে 'আরিফ' কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁপে ত্রিভূবন থরথর।
কে পিয়েছে সে তৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায় ? [৩৪৪]

আজ আর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ন্যায় সত্যিকার উদার প্রাণ নেই, খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর ত্যাগ-তিতিক্ষা নেই, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা.) এর সেই ঈমানের দৃঢ়তা নেই, খলীফা হযরত আলী (রা.) এর সেই জুলফিকারও নেই! যে মুসলমানের কর্মশক্তি ও উদ্দীপনায় একদিন এই জগৎ গুলিস্তানে পরিণত হয়েছিল, আজ তাঁদের সেই কর্মশক্তি ও আত্মত্যাগের অভাবে এই গুলিস্তান হয়ে পড়েছে গোরস্তান। জগৎ বিজয়ী মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এহেন শোচনীয় কর্মবিমুখতা, পশ্চাদপদতা দেখে ইসলামের গৌরবময় অতীত স্মরণ করে কবি নজরুল ইসলাম আক্ষেপ করে বলেনঃ

জাগে না সে জোশ ল'য়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ ল'য়ে দুনিয়া জাহান।
যাহার তক্‌বীর ধ্বনি তক্‌দীর বদ্‌ললো দুনিয়ার,
না-ফরমানির জমানায় আনিল ফরমান খোদার,
পড়িয়া বিরাণ আজি সে বুলবুলিস্তান ॥
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের উমরের নাহি সে ত্যাগ আর;
নাহি সে বেলালের ঈমান, নাহি আলির জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহীদান ॥[৩৪৫]

নজরুল ইসলাম উপমহাদেশের মুসলমানদের বর্তমান অজ্ঞানতা ও অন্ধ কুসংস্কার দূরীভূত করে এক কালের বিশ্ববিজয়ী এই বীর মুজাহিদ মুসলিম জাতিকে পূর্ব শক্তিতে বলীয়ান করে তোলার জন্য 'খয়বর' যুদ্ধজয়ী হযরত আলী হায়দার (রা.) কে দৃপ্তকণ্ঠে আহবান করেছেন;

খয়বর-জয়ী আলী হায়দার
জাগো জাগো আরবার !
দাও দুশমন দুর্গ -বিদারী
দু'ধারী জুলফিকার ॥
এস শেরে-খোদা ফিরিয়া আরবে-
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে-
হায়দরী-হাঁকে তন্দ্রা মগনে
করো করো হুশিয়ার ॥[৩৪৬]

মুসলমানদের অধঃপতন দেখে কবি চিত্ত দারুণভাবে শোকাহত, বেদনাবহ ব্যথিত। ইসলামের এই অবমাননা নজরুল ইসলামের কাছে চরম শংকাজনক। তাই শংকিত ও ব্যথিত হৃদয়ে কবি নজরুল ইসলাম উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের প্রতি ঈমানের অভাবই মুসলমান সমাজকে

---

৩৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আজাদ','নতুন চাঁদ', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৭০৪।

৩৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।

৩৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৫; নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, 'জাগরণ', পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আজ দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু এহেন দুর্বলতার থেকে মুক্তির কি কোন পথ নেই? নজরুল ইসলাম নিজেই সেই সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে বলেছেন:

সোজা পথে চলরে ভাই, ঈমান থেকো ধরে,
খোদার রহম মেঘের মত ছায়া দেবে তোরে ॥
সকল সময় ধরে থেকো আল্লাহ নামের খুঁটি-
তিনি তোমার হেফাজতে দিবেন ক্ষুধার রুটি;
ইয়াকিন দীলে থেকো তুমি, নিবেন তোমায় তরে ॥ [৩৪৭]

কবি নজরুল ইসলাম ঘুমন্ত মানবতাকে তার অসার সত্তায় নাড়া দিয়ে বলেছেন, দ্বীন ইসলামী পুনঃ জাগরণের এই মুহূর্তে আর যেন মুসলমান দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে বেহুশ হয়ে না থাকে, এখন তাদের আত্মগঠন করে বদরী সাহাবায়ে কিরামগণের মত ঈমানী যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, এজন্য ফুলশয্যা বিছানো আরামদায়ক পার্থিব জিন্দেগী যাপন করলে হবে না; সোনালী দিনের সোনালী কাহিনী রোমন্থন করলে চলবে না। আবারো ন্যায় বিচারক খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.), খলীফা হযরত আলী (রা.) এদের যুগ ফিরিয়ে আনতে হবে। মুসলিম জাহান যাদের শাসনে বিমোহিত ছিল তার জন্য জীবন বাজী রেখে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, যদি শাহাদাতের অমিয় সুধাও পান করতে হয়। ইসলামের ইতিহাসের সেই গৌর বোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করতে আক্ষেপেরসুরে বলেছেন:

ভুবন জয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান
খোদার রাহে আন্‌ল যারা দুনিয়া না-ফরমান ॥
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তক্‌বীর
হুঙ্কারিল, উড়্‌ল যাদের বিজয়-নিশান ॥
যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান্ খান্ ॥
যাদের নবী কম্‌লিওয়ালা শাহান শাহ হয়ে
আজকে তারা বিলাস-ভোগের খুলেছে দোকান ॥[৩৪৮]

সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলাম ধর্ম জগতে অসুন্দরের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী বিপ্লব ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে, মানুষকে সকল প্রকার মিথ্যা ও পাপাচারে বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা জিহাদ করতে শিখিয়েছে। তাই স্বাধীনতার জন্য, পূর্ব গৌরব ফিরে পাবার জন্য মুসলিম জাহানের সর্বত্র জিহাদ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মুসলমানগণ আজ জিহাদ করে শহীদ হচ্ছে। ইরাক, ইরান, তুরান, হিজাজ, মিসর, মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশ হাতে হাত মিলিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নবশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে শরীক হচ্ছে। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার কবিতায় এহেন সত্য প্রকাশ করে দুনিয়ার এ শহীদি জামাতে শামিল হওয়ার জন্য উপমহাদেশের মুসলমানদের উদাত্ত আহ্বান করেছেন;

শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি ॥
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়ায়েছে সারি সারি ॥
ছিল বেহোঁশ যারা আঁসু ও আফসোস লয়ে

৩৪৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭।

৩৪৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯-৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

চাহে ফিরদৌস্ তারা জেগেছে নওজোশ্ লয়ে।
তুইও আয় এই জমাতে ভুলে যা দুনিয়াদারী॥[৩৪৯]

কোন বিশেষ গোষ্ঠী, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের জন্য দ্বীন ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি; কোন কালের আওতায় ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। তাওহীদ বা একত্ববাদ এসেছে মানব জাতিকে মহান আল্লাহর রবুবিয়্যাতের ছায়াতলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে আর মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছে মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। কবি নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব স্থাপনের আকাঙ্খায় পারস্যের মহাকবি আল-ফেরদৌসী (৯৩২-১০২০ খ্রি.) এবং মহাপন্ডিত আবূ রায়হান আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি) এর সার্বজনীন উদারতা ও ব্যাপকতার আদর্শের উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই দেখা যায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সাম্য-মৈত্রীর অগ্রদূত হয়ে কবি নজরুল ইসলাম দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন;

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি ॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া 'আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায়, আল্লায় মানে , মুসলিম তারি নাম
আমির ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি ॥ [৩৫০]

মুসলমানগণ একদিন ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। অনেক বড় বড় ত্যাগী মুসলিম বীর পুরুষের অতুলনীয় সাধনায় এহেন শ্রেষ্ঠত্ব এসেছিল। মুসলমানদের রয়েছে অনেক অনেক গর্বিত ইসলামী ঐতিহ্য। কাজী নজরুল ইসলাম উপলব্ধি করলেন আজকের অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সেইসব ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী মহাপুরুষদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে তাদের সামনে নতুন করে তুলে ধরা। তাই বজ্রকঠিন প্রত্যয়ে কবি লিখলেন 'খালেদ', 'উমর ফারুক', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আনোয়ার পাশা', 'শাত-ইল-আরব' প্রভৃতি ইসলামী উদ্দীপনাময়ী ও মুসলিম জাগরণমূলক কবিতাবলী। নজরুল ইসলামের এহেন প্রয়াস সার্থক হয়েছিল। এই কবিতাগুলো তৎকালীন মুসলিম সমাজে এক দৃঢ় সঞ্জীবনী শক্তিতে উজ্জীবিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

---

৩৪৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', নজরুল রচনাবলী , ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮।

৩৫০. নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান, জাগরণ, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আরবী -ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার

নজরুল ইসলামের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার তাঁর বিশাল সাহিত্য সম্ভারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার সার্থক রূপায়ণ বাংলা শব্দের অনুপ্রাসে নজরুল ইসলামের বহু কবিতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুনরূপ সৃজন করেছে। নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় যেমন আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেই শব্দ আমাদের কাছে অতি পরিচিত এবং বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম সমাজে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত সে সব ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ মুসলিম ঐতিহ্য আশ্রিত কবিতা ও ইসলামী গজল গানেই নজরুল ইসলাম বেশী আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। বিষয় ও ভাবের সাথে সঙ্গতির প্রয়োজনেই তাঁকে এই পথ অবলম্বন করেতে হয়েছিল। আল্লাহ, রাসূল, আযান, ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, বেহেশ্‌ত, দোযখ, কিয়ামত, আখিরাত, দু'আ, মুনাজাত প্রভৃতি মুসলমানদের নিত্য ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা তাঁকে প্রয়োজনের তাগিদেই ব্যবহার করতে হয়েছে।[৩৫১]

আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা কাব্য চর্চায় নজরুল ইসলামের পূর্ব্বে আরবী-ফারসী ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রি.) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.)। কিন্তু নজরুল ইসলামের সাথে তাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা কাব্যে ছন্দ-সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অভিজাত কবি মোহিতলাল মজুমদার এ সব শব্দ ব্যবহার করলেও নজরুল ইসলাম প্রথম ব্যাপকভাবে তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার শুরু করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার বিশিষ্ট মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মুন্সিয়ানার সাথে এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর নজরুল ইসলাম মুসলমানী পরিবেশে ছাড়াও সাধারণভাবে প্রায় কবিতায়ই ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে কয়েকটি অপ্রচলিত এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। নজরুল ইসলাম বিদেশী শব্দগুলোকে এমন সুকৌশলে প্রয়োগ করেন যে , বাংলা ভাষায় তাদের বেখাপ্পা বা বেমানান মনে হয়না। আর বাংলা ভাষায় ইসলামী কবিতার তিনিই প্রবর্তয়িতা, আরবী-ফারসী ভাষা ও শব্দ এই সূত্রেই তাঁর স্বাভাবিক বাহন হয়ে উঠেছে।[৩৫২]

বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার প্রয়োগে শৈল্পিক ও ঐতিহ্যিক বিন্যাস নৈপুণ্য প্রদর্শনে নজরুল ইসলাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয়। মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক শব্দাবলী নজরুল ইসলামের কবিতায় অপূর্ব দক্ষতায় ও অনায়াস নিপুণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশী। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১ খ্রি.) তাঁর 'নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনযে, "কাব্যের বহিরংগে নজরুলের কৃতিত্ব আরবী ফারসী শব্দের অবাধ এবং অকুণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুষংগ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। তার কিছু বাঙালী মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত, কিছু তাঁর জ্ঞানার্জিত শব্দ ভান্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলো প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়, ললিত হয়, ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় যেন পাঠকের মন

---

৩৫১. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ২৮৯।

৩৫২. সৈয়দ আলী আশরাফ, 'নজরুল কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ', মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, 'নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ', (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮/জুন , ১৯৯১), পৃ. ৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিগত সমারোহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ নিরপেক্ষ মোহ বিস্তারে পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে।"[৩৫৩]

নজরুল ইসলামের কবিতায় এ সব আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ প্রধানতঃ মুসলিম ঐতিহ্য ও জীবনধারা থেকে উৎসারিত। বস্তুতঃ আরবী-ফারসীর প্রতি নজরুল ইসলাম ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যেও আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী জ্ঞানচর্চার পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। কবি নিজেও সৈনিক জীবনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী এবং তাঁর আগে স্কুল জীবনের শিক্ষক মুন্সী হাফিজ নূরুন্নবী (মৃ. ১৯৪৩ খ্রি.) ও চাচা কাজী বজলে করীমের নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রখ্যাত ফারসী কবি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ (১৩২৫-১৩৯০ খ্রি.), জালালুদ্দীন আল-রুমী (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩২ খ্রি.) প্রমুখ কবিদের কবিতা অধ্যয়ন ও অনুবাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মের অনুশাসনে লালিত উত্তরাধিকারের সাথে আরব-পারস্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গই গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সঙ্গত কারণেই ইসলামী পরিবেশে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানকে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিখতে হয়, যার ভাষা হচ্ছে ক্লাসিক আরবী। আবার মসজিদের ইমাম ও গ্রাম্য মক্তবের শিক্ষক হিসেবেও নজরুল ইসলামকে আরবী-ফারসী চর্চা করতে হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীকে শেখাতে হয়েছে। এসব মিলিয়েই কবি নজরুল ইসলাম লাভ করেন আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারে আজন্ম অধিকার; যার শেকড় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার লালিত প্রান্তিক মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে নিঃসন্দেহে। সুতরাং তাদের চেয়ে নজরুল ইসলামের হাতে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, গভীর তাৎপর্যবাহী, বিপুল ব্যঞ্জনাময় এবং বহুলাংশে সঠিক ও যথার্থ।[৩৫৪]

বাংলা শব্দের পাশাপাশি কবিতায় আরবী-ফারসী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের সুষম ব্যবহার প্রকৃত প্রস্তাবে নজরুল ইসলাম পথিকৃৎ। এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম তাঁর অনেক যুক্তি, তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে বলেছেন, "আমি শুধু 'খুন' নয়-বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে, ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।"[৩৫৫]

বলাবাহুল্য যে, এই বিশ্বাসেই নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী শব্দ আমদানী করে তাঁর কবিতাকে রূপ, রস ও রঙে আস্বাদনযোগ্য ও মাধুর্যমন্ডিত করে তুলেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যে, মসজিদ, মাজার, মক্তবের আওতায় থাকার ফলে বাল্যাবস্থাতেই নজরুল ইসলাম তাঁর অসংখ্য কবিতা ও ইসলামী গজল-গানে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনেও সুনিপুণভাবে এ সব শব্দ ব্যবহার তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। ক্রমে নজরুল ইসলামের ইসলামী গান ও কবিতা গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের মনে-প্রাণে এক নব স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল। ফলশ্রুতিতে বহু সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দ এবং ইসলামী চিন্তা চেতনা ও ভাবধারা তিনি নির্দ্বিধায় প্রবর্তন করেছেন।

---

৩৫৩. মুনীর চৌধুরী, 'নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ', মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, 'নজরুল ইসলাম,' (করাচীঃ বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯), পৃ. ২১১-২১২।

৩৫৪. হারুন-অর-রশীদ, 'নজরুলের কবিতা ও গানে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার', 'সাহিত্য পত্রিকা', ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলা বিভাগ, বিয়াল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫/ অক্টোবর, ১৯৯৮), পৃ. ২৫৫।

৩৫৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৭।

Dhaka University Institutional Repository

খেয়াপারের তরণী

'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিখ্যাত কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' পাঠ করে আনন্দে অভিভূত কবি-সমালোচক, অনুবাদক, পত্রিকা ও গ্রন্থ সম্পাদক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রি.) পত্রিকার সম্পাদক কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.) কে লিখিত এক সুদীর্ঘপত্রে নবীন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও উপমা-চিত্রকল্পের আলোচনা করে কবিতাটির শিল্পরূপের পরিচয় তুলে ধরে 'একখানি পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যপ্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফুর্তি, অবাধ আবেগ কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবে দাসত্ব করিতেছে- কোনখানে আপন অধিকার সীমালঙ্ঘন করে নাই-এই প্রকৃত কবিশক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর, কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিব-

> আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দার
> দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
> কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
> দাঁড়ীমুখে সারি গান- 'লা-শরীক আল্লাহ'।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষতঃ এর শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা-শরীক আল্লাহ' যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"[৩৫৬]

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের অতুলনীয় কাব্যপ্রতিভা তথা আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের অভূতপূর্ব নৈপুণ্য বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের এহেন উক্তি খণ্ডিতভাবে উর্দু এবং সমভাবে ফারসী শব্দ প্রসঙ্গেও যথাযথ প্রযোজ্য।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কবি দ্বীন ইসলামকে একটি তরীরূপে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনকে ঐ তরীর মাঝি-মাল্লারূপে আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে দিশারীরূপে কল্পনা করেছেন। বস্তুতঃ গ্রাম-বাংলার নদ-নদীতে দাড়ী মুখে মাঝি-মাল্লাদের সারি গেয়ে দাঁড় বেয়ে যাওয়ার দৃশ্যাবলী আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত; সেই চির সজীব দৃশ্যে কবি নজরুল ইসলাম কর্তৃক 'লা-শরীক আল্লাহ' এই আরবী বাক্যাংশের সুনিপুণ ব্যবহারে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অর্পণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় আরবী-ফারসী ও ইসলামী পরিভাষাগত শব্দাবলী যেমন- কিয়ামত, দিল, সাফ, আহমদ, আবু বকর, উসমান, উমর, আলী হায়দার, লা শারীক আল্লাহ, শাফায়াত, জান্নাত, হুরী প্রভৃতি মুসলিম ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ সম্পৃক্ত হয়েছে। কবির ভাষায়:

---

৩৫৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা', মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত, 'নজরুল ইসলামঃ নানা প্রসঙ্গ', (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮/ জুন, ১৯৯১), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

'শাফায়াত' পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হতে ফেরে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।[৩৫৭]

মোহর্‌রম

নজরুল ইসলামের অন্যতম বিখ্যাত 'মোহর্‌রম' কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এবং অগ্নিবীণায় সংকলিত । চার মাত্রা চালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতাটির প্রারম্ভিক চরণ দু'টিতে বাংলা শব্দ বিশেষ নেই, সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ পর্যন্ত উর্দু পরিভাষা। কারবালার শোকাবহ ঘটনার সুদূরতা এবং ইসলামী ঐতিহ্য রূপায়ণের জন্যই তা দক্ষতার সাথে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে। কবিতার সূচনাতেই নীল আকাশের রং সিয়া বা কৃষ্ণ বর্ণ, যা শোকের রং কিন্তু দুনিয়ার রং লাল, যা কারবালায় প্রবাহিত রক্তের রং। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমা আয-যাহ্‌রা (রা.) এর পুত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত বরণ প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা ১০ ই মোহর্‌রম সংঘটিত কারবালার মর্মান্তিক হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলীর দৃশ্যায়ণ ও চিত্ররূপ অংকিত হয়েছে। কবির ভাষায়:

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,-
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া![৩৫৮]

বহুক্ষেত্রেই আরবী-উর্দু-ফারসী মিশ্রিত ইসলামী পরিভাষাগত উপকরণ নজরুল ইসলামের কবি-কল্পনাকে অনন্য সার্থকতায় ধারণ করেছে।'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা' অর্থাৎ মাথা দেব কিন্তু শিরস্ত্রাণ দেব না! জান দেব কিন্তু মান দেব না। ইসলামের বীরত্বের এই চমকপ্রদ মর্মবাণী প্রায়শঃই নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা ও গজল-গানে উচ্চারিত হয়েছে। পৌরুষদীপ্ত সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে নজরুল ইসলাম বারবার পাগড়ী বা শিরস্ত্রাণ অর্থে 'আমামা' শীর্ষক আরবী শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমনিভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি ইসলামী সঙ্গীতে আছে, 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা, শির উঁচু করি মুসলমান।'[৩৫৯]

'মোহর্‌রম' কবিতায় নজরুল ইসলামের হৃদয়ের আন্তরিক আবেগ বিশেষ নির্বাচনের গুণে পরিবেশ সৃজনে আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করেছে। কাব্যবস্তু ও ভাষায় মণিকাঞ্চনযোগে নজরুল ইসলামের এ জাতীয় ইসলামী চিন্তাধারার কবিতাবলী অনবদ্য। কেবল কারবালার কাহিনী বর্ণনা নয়, কারবালার বেদনা বিলাস নয়; শুধু হাহাকার কিংবা দীর্ঘশ্বাস নয়, কেবল ক্রন্দন বা অশ্রু ঝরানো নয়, শুধু অতীতের পুনর্জাগরণ নয়; বরং জালেমের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বর্তমানের হতাশা দূর করার জন্য, নবজাগরণের জন্য অতীত থেকে অনুপ্রেরণা লাভে সংকল্পবদ্ধ হওয়া এ কবিতার মুখ্য প্রতিপাদ্য। কবির ভাষায়:

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির-
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শম্‌শের হাতে নাও বাধোঁ শিরে আমামা !
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য্য,
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য্য।[৩৬০]

---

৩৫৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৩৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪২।

৩৫৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'গুলবাগিচা', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

৩৬০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মোহর্‌রম', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত চরণসমূহ ইসলামী পরিভাষাগত বিশেষ শব্দাবলীর সার্থক প্রয়োগ নিছকই আরবী-ফারসী-উর্দু চর্চার আনুষ্ঠানিকতা নয় এহেন শব্দ চয়ন আভিধানিক অর্থের সীমায়িত বন্ধনেও আবদ্ধ নয়। এ সকল চমৎকার শব্দাবলী কাব্যিক বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণময়তা, তেজস্বিতা এবং আবেগ-অনুভূতির ভূবন সৃষ্টিতে নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব অসাধারণ। কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, অন্যতর কোন মাধ্যমে কারবালার শোকাতুর ঘটনাবহুল মোহররমের মর্মবাণী এবং ত্যাগ ও আত্মউজ্জীবনের অনুপ্রেরণা এত তীর্যক ও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা যেত।

কোরবানী

নজরুল ইসলামের 'কোরবানী' শীর্ষক কবিতায় হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈ (আ.) এর কোরবানীর কাহিনী চরম আত্মত্যাগের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠে। সেই সাথে স্রষ্টা মহান বাণী সুদূর অতীতের কোরবানীর আদেশ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। নজরুল ইসলামের লেখনীতে আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার সার্থক রূপায়ন ঐতিহাসিক স্মৃতি ও প্রকৃত চিত্রকল্পের অনুরণিত হয়। কবির ভাষায়ঃ

আজ শো'র ওঠেঃজোর "খুন দে, জান দে, শির দে বৎস" শোন্!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন!...
খঞ্জর মাঝে গর্দ্দানেই,
পঞ্জরে আজি দরদ নেই,
মর্দ্দানী'ই পর্দ্দা নেই,
ডরতা নেই আজ খুন-খারাবীতে রক্ত-লুব্ধ মন
খুনে খেলবো খুন-মাতন ![৩৬১]

প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারাসম্পন্ন কবিতার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ও ইসলামী পরিভাষায় সুষম ব্যবহার। 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবগুলো কবিতা অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণভাবে নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করলেও তাঁর নিজস্ব মনোভাব ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি উপকথা থেকে সংগৃহীত উপমা ও চিত্রে আশ্রয় খুঁজেছেন এবং সাধারণ হিন্দু সমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজের ভাষার সাহায্য নিয়েছেন।

বিদ্রোহী

কেবল পরিবেশে সৃজনের জন্যই নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেননি। কবির কল্পলোককে আমাদের কাছে সত্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করে তোলার জন্য এবং সেই কল্পলোক যে অনুভূতি প্রেরণায় জেগে উঠেছে সেই আবেগ-অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কবি এই সব অধুনা পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মজাগরণের বিপুল বিচ্ছিন্ন প্রকাশ লক্ষণীয়। কবির ব্যক্তিত্বের প্রবল স্ফুরণ ঘটেছে এ কবিতাটিতে। যদিও ইহজগতের রাশি রাশি উপমা-অলংকারে এর প্রকাশ, কিন্তু মূলতঃ এহেন জাগরণ আত্মগত। প্রথম স্তবকের শুরুতে 'উন্নত শির', স্তবকের মাঝখানে 'চির উন্নত শির' হয়ে উঠেছে। মহাবিশ্বের মহাকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদ করে খোদার আসন 'আরশ' অতিক্রম করে উর্ধ্বারোহণের তীব্রতর ক্ষীপ্রগতি কবিতার প্রারম্ভেই অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের অবতারণা ঘটিয়েছে। কবির ভাষায়ঃ

বল 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

---

৩৬১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কোরবানী', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।[৩৬২]

'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে মুসলিম জীবন ও ইসলামী ঐতিহ্যবোধক বেশ কিছু আরবী-ফারসী শব্দ রয়েছে। উপর্যুক্ত পংক্তিগুলোতে 'খোদা', 'আরশ' ছাড়াও অন্যত্র রয়েছে 'বেদুঈন', 'চেঙ্গিস', 'ইস্রাফিল', 'বোর্‌রাক', 'জিব্রাঈল', 'অর্ফিয়াস', 'হাবিয়া দোযখ', 'জাহান্নাম' প্রভৃতি আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার সার্থক রূপায়ণ। এতদ্ব্যতীত নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় বাঙালী মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে অপ্রচলিত ফারসী বা উর্দু থেকে কতকগুলো শব্দ নতুন আমদানী করেছেন। এক্ষেত্রে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মপ্রত্যয় ঘোষিত নিম্নোক্ত পংক্তিটি উল্লেখ করা যায়,

আমি দুর্দম , মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপুর্ মদ।[৩৬৩]

কবিতার শ্লোকটিতে ফারসী 'পেয়ালা' ও 'হর্দম' শব্দের সাথে উর্দু 'হ্যায়' শব্দের সহযোগে গড়ে উঠা বাক্যটি আবৃত্তি করে অবাক বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ যেন মস্ত হয়ে জোর গলায় উর্দু বলে উঠা-যেমন অনেকেই রাগ হয়ে হঠাৎ উর্দুভাষী বনে যান। 'হ্যায়'-এর স্থলে যদি 'আছে' ব্যবহার করতেন তবে 'হর্দম আছে হর্দম ভরপুর মদ' কথায় উন্মত্ত হয়ে উঠার ভাবটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠত না। কারণ ফেনায়িত শরাবে ভরপুর পেয়ালার সাথে নিজকে উপমিত করার প্রাণ উপচানো চিত্রকল্প।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত ও 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'শাত-ইল-আরব', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'খেয়াপারের তরণী', 'মোহররম', 'কোরবানী' প্রভৃতি মুসলিম সভ্যতা ও ইসলামী ঐতিহ্য আশ্রিত কবিতায় নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার দ্বারা প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছেন। এই কবিতাগুলোতে নজরুল ইসলাম আশ্চর্য পারদর্শিতার সঙ্গে মুসলমানদের নিত্যব্যবহার্য আরবী-ফারসী শব্দ সংযোগ করেছেন। শব্দগুলো এত স্বাভাবিক ও নিখুঁত নিপুণতায় সংযোজিত যে, এর ফলে কবিতা যেমন শ্রুতিমধুর হয়েছে তেমনি অভাবনীয় গতিশীলতা লাভ করেছে। এ কবিতাগুলোর মাধ্যমে নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় কেবল ইসলামী চিন্তাধারায় নবভাব ও গতিশীলতাই আনয়ন করেননি নতুন ভাবাসৃষ্টির সাফল্যও প্রদর্শন করেছেন। অর্থ, ব্যপ্তি এবং তা প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবেও এসব শব্দ সম্পূর্ণ নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ইতোপূর্বে এতো স্বচ্ছন্দ ও সুনিপুণভাবে বাংলা কবিতায় এই শ্রেণীর শব্দযোজনা পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে নজরুল ইসলামের কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ সেকালের সাহিত্যোমোদী সমাজে অবাক বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শাত-ইল-আরব

আরবী মূলতঃ ফারসী শব্দ সম্বলিত 'শাত-ইল-আরব' বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা। উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষতঃ আরব জাহান পবিত্রভূমি হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম ধর্মের লীলাক্ষেত্র আরবদেশ দর্শনের তীব্র আকর্ষণ অনেক মুসলমানই অন্তরে গভীরভাবে পোষণ করে থাকেন। এমনি এক নবজাগরণের মুহূর্তে তরুণ মুসলিম সমাজ নজরুল ইসলামের কণ্ঠে আরবের বিখ্যাত নদীর নাম শুনে মনের ভেতর এক অপূর্ব অনুপ্রেরণা অনুভব করল। এই সুপ্রাচীন শাতিল আরব পবিত্র নদী, শহীদের লোহু এবং অসীম সাহসীর খুনের জন্যই পূত। নজরুল ইসলামের কবিতায় ন্যায়ের যুদ্ধ তথা জিহাদে প্রাণদানকারী শহীদের মর্যাদা সবার উপরে এবং দিলীর বা অসীম সাহসীও কবির কাছে বিশেষ মর্যাদাবান। পক্ষান্তরে কবির নিকট ঘৃণার পাত্র হচ্ছে ভীরু ও কাপুরুষ। তাই যুগ যুগ ধরে শহীদ ও দিলীরের রক্তস্নাত শাতিল আরব অতি পবিত্র। 'শাত-ইল-আরব'

---

৩৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।

৩৬৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৯; নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় নজরুল ইসলাম শাতিল আরবের অতীত মহিমা ও বর্তমান দৈন্যের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশেরই হীনদশা স্মরণ করে মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। কবির ভাষায়ঃ

শাতিল্-আরব ! শাতি্ আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী
য়ুনানী, মিসরী আরবী কেনানী;-
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা শির।
নাঙ্গা-শির-
শমশের হাতে আসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর ![৩৬৪]

উপরোক্ত কবিতাংশে 'লোহু' ও 'খুন' শব্দের 'রক্ত' অর্থে ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'লোহু' হিন্দী এবং 'খুন' ফারসী শব্দ কিন্তু বাঙালী মুসলিম সমাজে 'রক্ত' অর্থে ঘরোয়াভাবে প্রচলিত বিশেষতঃ আঞ্চলিক ভাষায় ফারসীতে যেমন বাঙালী মুসলমানদের ঘরে তেমনি 'খুন' শব্দ 'রক্ত' ও 'হত্যা' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত তাই নজরুল ইসলামের 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় 'শহীদের লোহু', 'দিলীরের খুন' যথাযথভাবেই প্রয়োগকৃত। নজরুল ইসলামের কবিতায় মরুচারী আরব বেদুঈন আজাদীর বা স্বাধীনতার প্রতীক। অনুরূপভাবে শম্‌শের বা তরবারী হাতে বীর নারীর অবয়বের সার্থক চিত্রারণ কারবালা প্রান্তরের আর ইসলামের ইতিহাসের মুসলিম বীরাঙ্গনাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শাতিল আরবের মোহনায় ফোরাত বা ইউফ্রেটিস তীরে ইংরেজ ও তুর্কীবাহিনীর মধ্যে সংগ্রাম চলে, এ সময়ে 'কুতল আমারা' নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল টাউন সেন্ডের বন্দী হবার ঘটনার আভাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলাম নিম্নের চরণগুলোতে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বলেছেনঃ

'কুত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া;
উগারি সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র
এস্তা-নীর।
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত- "শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর !"
দজ্‌লা-ফোরাত বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।[৩৬৫]

এখানে কুতল আমারার যুদ্ধে শহীদের রক্তে ভরা দজ্‌লার স্রোতধারাকে 'লোহুর দরিয়া' বা রক্তের নদী বলা হয়েছে। ফারসী 'দরিয়া' শব্দটি নদী বা সমুদ্রের অর্থে বাঙালী মুসলমানগণ ব্যবহার করে থাকেন। দজ্‌লা নদীকে প্রথমে 'লোহুর দরিয়া' পরে মহাদেবের রক্তধারা থেকে উৎপন্ন 'ভৈরব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'ভৈরব মস্তানী'র রক্ত নেশাগ্রস্ত ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদী,'মস্তানী' ফারসী শব্দ নেশা অর্থে প্রচলিত; এখানে উপরোক্ত স্তবকে 'ভৈরব' ও 'মস্তানী' শব্দের একত্র পাশাপাশি ব্যবহার ঐতিহ্যের মিশ্রণ। এছাড়াও শাতিল আরব নদীকে 'রক্ত-গঙ্গা-ফোরাত' ও বলা হয়েছে। তাই ফোরাত কেবল লোহুর দরিয়াই নয়, বরং পরিচিত রক্ত-গঙ্গাও বটে। এখানে ফারসী 'গোস্তাখী' শব্দের স্পর্ধা বা ঔদ্ধত্য অর্থে ব্যবহার ও বিশেষ লক্ষনীয়, যেহেতু প্রথম মহাযুদ্ধে শাতিল আরবের কুতল আমারায় ইংরেজ সেনাপতির দর্পচূর্ণ হয়েছিল তাই ফোরাতের গর্জনের সে ব্যথাই কবির ভাষায় ঘোষিত হচ্ছে- 'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর'।

৩৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শাত-ইল-আরব', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড,পৃ. ৪২।
৩৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'শাত-ইল-আরব', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্' ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এবং আরবী-ফারসী ও ইসলামী পরিভাষার শব্দ ব্যবহার এই কবিতায় খুব বেশী। বস্তুতঃ আরবী-ফারসী শব্দের আশ্চর্য প্রয়োগ, অপূর্ব অনুপ্রাস, বিস্ময়কর ছন্দ-ঝঙ্কার কবিতাটিকে সত্যিই অপরূপ করে তুলেছে। নিঃসন্দেহে কবিতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এটি অতুলনীয়। একে কবির একটি অভিনব সৃষ্টি বলা যেতে পারে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর নামের উল্লেখ এবং আরবী দরুদ শরীফের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবি নজরুল ইসলাম অভূতপূর্ব ইসলামী পরিবেশ সৃজন করেছেন। কবির ভাষায়ঃ

উরজ্ য়্যামেন্ নজ্দ হেজা্ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান্ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহ আলায়হি সাল্লাম' ।[৩৬৬]

কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে প্রাক ইসলামী যুগে আরবদেশে বিশেষতঃ মক্কায় পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনে তার প্রতিক্রিয়া উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

'সাবে ঈন্'
'তাবে ঈন্
হয়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দ্বীন!"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত-মানাত'-এর ওয়ারেশীন ।
রোয়ে "ওজ্জা হোবল্" ইবলিস্ খারেজিন,-
কাঁপে জীন !

জেদ্দার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত্ক্ষত,
তারি মাঝে কাবা আল্লার ঘর দুলে আজ হর্ ওক্ত্।[৩৬৭]

উপর্যুক্ত কবিতাংশে 'সাবেঈন্' বা আরবের মূর্তিপূজারীরা এবং 'তাবেঈন্' বা তাদের আজ্ঞাবহরা চীৎকার করে 'ওই ওই নাবে দ্বীন!' বা সত্যধর্ম 'লাত-মানাত' বা মূর্তিপূজকদের উত্তরাধিকারীরা নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত। 'ওজ্জা হোবল' বা প্রতিমাবৃন্দ, 'ইবলিস' বা শয়তান, 'খারেজীন' নাম্নী বদমাইস সম্প্রদায় এবং জ্বীন বা দৈত্যরা ভয়ে কম্পিত। এরপর পবিত্র মক্কা, মদীনা মুনাওওয়ারা ও কা'বা শরীফের ভৌগলিক স্থিতি অভিনব চিত্রকল্পে বর্ণিত হয়েছে।

কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পংক্তি 'পড়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম'[৩৬৮] এই আরবী দরুদ শরীফ, চতুর্থ স্তবকের শেষ চরণে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠরূপে প্রশংসাত্মক আরবী বাক্যযোজনা 'ওয়ে মার্হাবা ওয়ে মার্হাবা এয় সর্ওয়ারে কায়েনাত!' [৩৬৯] আর কবিতাটির পঞ্চম তথা শেষ স্তবকে সব ছাপিয়ে অংকিত হয়েছে দিকহারা দিকপার হতে জোর শোর ভেসে আসা কালাম;

'এয় শামসোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কমরোজ্জমাঁ সালাম!' [৩৭০]

---

৩৬৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম', 'বিষের বাঁশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১।

৩৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩; নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ১০২।

৩৬৮. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২।

৩৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে নজরুল ইসলাম তাঁর 'বার্ষিক সওগাত', 'খালেদ', 'উমর ফারুক', 'সুবহ্-উম্মেদ', 'খোশ-আমদেদ', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'চিরঞ্জীব জগলুল' প্রভৃতি ইসলামী চিন্তাধারার কবিতায় মুসলিম জীবনের ঘটনা বর্ণনায় অথবা মুসলিম ইতিবৃত্ত থেকে রূপাঙ্কনে পরিবেশ সৃজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

বার্ষিক সওগাত

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বার্ষিক সওগাত' ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 'সওগাত' পত্রিকার বার্ষিক সংকলন উপলক্ষে রচিত। আরবী-ফারসী-হিন্দী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার রূপক উপমায় অলংকৃত একটি নবতর সৃষ্টি 'বার্ষিক সওগাত' শীর্ষক নজরুল ইসলামের কবিতাটি। বিশেষতঃ বাংলার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার চটুল ভঙ্গীতে ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য চেতনার বিশেষ পরিচয়বহ এই কবিতায় এমন চমৎকার মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে আর কখনো বাংলা কবিতায় রূপায়িত হয়নি। কবির ভাষায়ঃ

রঙ্গিন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী রোবাব্ বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখী, সোনালী রূপালী দিন।
লাল-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস-ফুলী-আঁখ,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্‌লি পাত্‌লি কাঁখ,
নৈশাপুরের গুলবদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন শিরীন বোল।'[৩৭১]

আলোচ্য কবিতাটির প্রথমাংশে সাকী, শরাব, বুলবুল, লালা, নার্গিস, হেনা, শিরীন, ইত্যাদি ফারসী শব্দ এবং কতিপয় স্থানবাচক বিশেষ্যের প্রয়োগে নজরুল ইসলাম এক বিশেষ ঐতিহ্য জাগ্রত করেছেন। বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টিতে যে পাখী আর যে পুষ্প এ কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে তা ফারসী কবিতার বাগিচা থেকে আগত নারীর যে সৌন্দর্য রূপ এই কবিতাটিতে মোহ সৃষ্টি করে তার জন্যে উর্দু কবিরা ধ্যান করেন। বিশেষ ঐতিহ্যের পরিচর্যায় এ কবিতায় রঙীন সোনালী রূপালী দিনের আকাঙ্খা সৃজন করা হয়েছে।

ভারত এবং বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সংস্কৃতি ঐতিহ্য-প্রকৃতি মূলতঃ আরবী-ফারসী-বাংলা রূপক-উপমায় এবং সুমিষ্ট কাব্যিক ছন্দময়তায় চিত্তস্পর্শী রূপলাভ করেছে নিঃসন্দেহে। যেমন-

সুর্মা-কাজল তাম্বুলী-চোখ বসোরা গুলের লালী
নব বোগদাদী আলিফ-লায়লা, শা'জাদী জুল্‌ফ-ওয়ালী।
পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙ্গুর, টোকা-মিঠে কিসমিস,
মরু-মঞ্জীর আর-জনুজনের যবের ফিরোজা শিস।[৩৭২]

অঘ্রাণের সওগাত

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ও ১৩৩৩ সালের ১০ই কার্তিক কলকাতায় রচিত 'অঘ্রাণের সওগাত' শীর্ষক কবিতায় নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমান সমাজের সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ কবিতায় মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা এবং বাঙালী মুসলমানদের গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্য থেকে চয়নকৃত কিছু অভিনব চিত্রকল্প তৈরী করেছেন। অগ্রহায়ণ

---

৩৭১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বার্ষিক সওগাত', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ.৪২৭।

৩৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭; নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাসে ফসলের প্রাচুর্য চাষীর ঘরের যে খুশীর উৎসব বয়ে আনে তা কবি কল্পনায় যেভাবে রূপায়িত হয়েছে;

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরনীর সওগাত;
নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।
'গিন্নি-পাগল' চালে ফিরনী
তশ্‌তরী ভরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত।[৩৭৩]

এখানে উদ্ধৃত কবিতাংশে খাঞ্চা, সওগাত, অঘ্রাণ, ফিরনী, তশ্‌তরী, তেলেসমাত প্রভৃতি অপরূপ ইসলামী পরিভাষাগুলি ব্যবহার করে অগ্রহায়ণ মাসে গ্রাম বাংলার মুসলমান গৃহস্থ কৃষকের ঘরে নতুন ধান ও চাল উঠার এবং সেই চাল দিয়ে ফিরনী রান্না ও পরিবেশনের একটি পরিচিত দৃশ্য ভেসে ওঠে।

খালেদ

কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'খালেদ' কবিতায় নামাযের জামাতের রূপকে মুসলিম বিশ্বের পুনঃজাগরণের চিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রাত্রিশেষে ভোর সকালে ফজরের নামাযের আজান শোনা যাচ্ছে। সুউচ্চ মিনারা থেকে মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আজানের আহ্বানঃ 'আস্-সালাতু খায়রুম মিনান্নোম' اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ অর্থাৎ ঘুম অপেক্ষা সালাত উত্তম। কবির কাছে ভোরের আজানের ধ্বনি শুধু প্রার্থনার ডাক নয় বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র। তাই তো আজানের আরবী বাক্যাংশটুকু জাগরণের ডাক হিসেবে প্রতিভাত হয়ে নজরুল ইসলামের ইসলামী চিন্তাধারার সাথে একাত্ম হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নিম্নের চরণদ্বয়ের মাঝে। কবির ভাষায়ঃ

খালেদ ! খালেদ ! ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম,
ঐ শোন শোন,- "আস্-সালাতু খায়র মিনান্নৌম্ !"[৩৭৪]

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের আরবী বাক্যটির পরিবর্তে অন্য কোন সম্পূরক শব্দরাজি দ্বারা গঠিত বাক্যের সাহায্যে উদ্দীষ্ট ভাব ও মর্মার্থ প্রকাশ করা যেত কিনা দুরূহ ব্যাপার।

কবি নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে মহাবীর খালেদ শুধু মুসলমানদেরই রণ-ইমাম নয়, মজলুম মানুষের সেনাপতি। খালেদ নিঃস্বার্থ ও ঋজু স্বভাবের মহৎপ্রাণ লোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর মহাবীর চরিত্র-মাধুর্যকে অত্যন্ত আদর্শমন্ডিত করে তুলেছে। মাত্র কয়েকটি কথায় আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবি নজরুল ইসলাম বীর সমরনেতা খালেদের সুমহান চরিত্রকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রণ করেছেন;

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর,
দীন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার কদমে শির !
চারিটি জিনিষ চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা,রাসূল, ইসলাম আর শের-মারা শম্‌শের।[৩৭৫]

---

৩৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম , 'অঘ্রাণের সওগাত', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪২৮।

৩৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

৩৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬; নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কাব্যাংশে যে সব আরবী-ফারসী ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে- 'ইমামতি', 'গাজী', 'দীন', 'দুনিয়া', 'শহীদ', 'কদম', 'শির', 'হের-ফের', 'আল্লাহ', 'রাসূল', 'ইসলাম', 'শম্‌শের' প্রভৃতি।

'খালেদ' কবিতার ভাষা বলিষ্ঠ, ছন্দ বেগবান এবং শব্দ যোজনাসুদৃঢ়। আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার আধিক্য সত্ত্বেও কবিতাটি কোন অংশে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেনি। ইসলামের ঐতিহ্য ও মুসলমানদের অতীত যুগের বীরত্ব ও গৌরবের সাথে বর্তমানকালের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রায়ণ আলো-ছায়ার মত কবিতায় আনন্দ বেদনার রূপ সঞ্চারিত হয়েছে। জাতির আনন্দ-বেদনা, বিক্ষোভ-উন্মাদনা, আত্মশ্লাঘা এবং আত্মসমালোচনা কবিতাটিকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করেছে। মুসলমানদের জীবনবোধ, ইসলামী ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণে কবির প্রখর কল্পনাশক্তি কোথাও যথার্থকে লঙ্ঘন করেনি।

নজরুল ইসলাম বিরচিত 'খালেদ' শীর্ষক কবিতায় 'মালেকুল-মৌৎ', 'কতল-গাহ', 'বোর্‌রাক', 'বেদুঈন', 'নকীব', 'দামামা', 'সওয়ার', 'তলওয়ার', 'আমামা', 'ফরিয়াদ', 'আলবৎ', 'জালিম', 'জুলম', 'মজলুম', 'ফরমান', 'আফ্‌তাব', 'কুল-মখ্‌লুক', 'খাব', 'দরাজ-দিল', 'কুরআন', 'আসমান', 'মুনাজাত', 'খোদা', 'সাহি-সালামত', 'শমশের', 'আজরাঈল', 'আজাজিল', 'কবজ রূহ', 'আজান', 'ইমাম', 'মিনার', 'মুয়াজ্জিন', 'ফজর', 'জোহর', 'আসর', 'মগরেব', 'এশা', 'নামাজ', 'আব-জম্‌জম্‌', 'ওজু', 'রীশ-ই বুলন্দ', 'শেরওয়ানী', 'চোগা', 'তসবী', 'টুপী', 'সিজদা' 'তক্‌দীর', 'জিঞ্জীর', 'আখেরী', 'জুলফিকার' প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাগত মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজড়িত নির্দিষ্ট অর্থবোধক এহেন আরবী-ফারসী শব্দগুলো নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায় নতুন চেতনারূপে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।[৩৭৬]

উমর ফারুক

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের 'উমর ফারুক' কবিতায় নজরুল ইসলাম পবিত্র কালিমায়ে শাহাদাত কুরআন শরীফের আয়াতাংশ অবিকল আরবী ভাষায় ব্যবহার করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন বিবি খাদিজা (রা.) এর পরেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত হাম্‌যা (রা.) ও হযরত ওসমান (রা.) এর সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা.)। প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোরতর শত্রু ও বিদ্রোহী উমর (রা.) সহোদরা ফাতেমার প্রভাবে নব ধর্মে দীক্ষা ও ইসলাম প্রসারের চিত্র নজরুল ইসলামের লেখনীতে ইসলামী পরিবেশই বর্ণিত হয়েছে;

"আশ্‌হাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলি'
কহিল ফাতেমা-"এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি'
নেমেছে ভুবনে মোহাম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইসলাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই!"...
উমর আনিল ঈমান।- গরজি' গরজি' উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি'- "আল্লাহু আক্‌বার!"[৩৭৭]

আনোয়ার

যে সকল শব্দ আরবী-ফারসী ও উর্দু কাব্যে বহুল ব্যবহৃত এবং সেই হিসেবেই বাঙালী মুসলমানদের কাব্যধারায়ও এগুলোর অভিনব প্রয়োগে কবি নজরুল ইসলাম আশ্চর্যজনকভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমনটি 'আনোয়ার' কবিতার শুরুতেই আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করে কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও শব্দরূপগত মাধুর্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কবির ভাষায় :

---

৩৭৬. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৫০।

৩৭৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উমর-ফারুক', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার ।
আনোয়ার ! আফসোস !
বখ্‌তেরই সাফ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙ্গে গেছে শমশের-পড়ে আছে খাপ কোষ ।[৩৭৮]

'আনোয়ার' কবিতায় উল্লিখিত 'দিলওয়ার', 'তলওয়ার', 'নেস্ত-ও-নাবুদ', 'বখ্‌ত', 'সাফ', 'জোশ', 'শমশের', 'খাপ', 'আফসোস', 'জিঞ্জীর', 'খিঞ্জীর', 'গর্দ্দান', 'জোরওয়ার', 'মুশকিল', 'কঞ্জুশ', 'পস্তানো', 'দুশমন' প্রভৃতি আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বেশ কিছু ইসলামী পরিভাষার স্বার্থক প্রয়োগ নৈপুণ্যে, লালিত্যে, শব্দালংকারে, অর্থভান্ডারে, ছন্দ ঝঙ্কারে ও অনন্যমিলে অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। সমগ্র বাংলা কাব্য সাহিত্যে নজরুল ইসলামের এহেন কবিতার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল ।

সুব্‌হ্‌-উম্মেদ

'সুবহ্‌-উম্মেদ' (পূর্বাশা) কবিতাটি মুসলিম জাগরণের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রচিত। 'সুব্‌হ্‌-উম্মেদ' এর অনুপ্রাস ব্যবহারে নজরুল ইসলামের অপূর্ব কবিত্ব শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তের মন্থর টানে আরবী-ফারসী-বাংলা শব্দের অনুপ্রাসে ইসলামী চিন্তাধারার এ কবিতায় একটা বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কবির ভাষায়ঃ

বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশ্‌নীতে?
সিজ্‌দা করিল নূদ হেজাজ !
আবার কাবা'র মসজিদে!
আরবে করিল 'দারুল হারব'-
ধ্বসে পড়ে বুঝি 'কাবা'র ছাদ!
'দীন দীন' রবে শমশের-হাতে
ছুটে শের-নর 'ইব্‌নে সাদ'।[৩৭৯]

খোশ্‌ আমদেদ

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'খোশ আমদেদ' গানটি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত। গানটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য এবং মুসলিম ঐতিহ্যের প্রগাঢ় ছাপ। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে নব-জাগরণের উন্মেষকালে ভোরের পাখীর মধুর কণ্ঠস্বর যে এই 'খোশ-আমদেদ' শীর্ষক গানটিতে কবি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেনঃ

এল কি অলখ আকাশ বেয়ে তরুণ হারুন আল-রাশীদ।
এল কি আল-বেরুণী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী ॥...
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শি'রী
লাল-এ লায়লি লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসী ফুল কুড়িয়ে মালা নাই গাঁথিলি রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় করে দে ফুল-ডালি॥[৩৮০]

---

৩৭৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আনোয়ার', 'অগ্নিবীণা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

৩৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সুব্‌হ উম্মেদ', ' জিঞ্জীর' নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়

১৩৩৩ সালের ১ লা পৌষ / ডিসেম্বর, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়' শীর্ষক কবিতায় নজরুল ইসলাম বেহেশ্‌তের যে চিত্র অংকন করেছেন তা 'চির তরুণের চির মেলা' যুবা-যুবতীর সেখানে কেবল প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। বেহেশত বলতে কবি যুবা-যুবতীর আনন্দ উৎসবের মেলাকেই বুঝাতে চেয়েছেন। চির-নবীন বা চির-তরুণের দেশ সেই বেহেশ্‌ত শরাব-সাকীর স্বর্গ নজরুল ইসলাম ফারসী কবিদের গুলিস্তাঁর আদলেই কল্পনা করেছিলেন। 'তাজা-ব-'তাজা'র গান গেয়ে নওজোয়ানদের সেই নওরোজের মেলায় ঢুকতে হয়। শাস্ত্র-শকুন, জ্ঞান-মজুর বা বুঢ্ঢা পীরদের জন্য সে বেহেশতে প্রবেশাধিকার নেই। আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্যতার মাঝেও কবিতাটিতে বন্ধনহীন আনন্দমুখর জীবন ও যৌবনের জয়গানের চিত্র ফুটে উঠেছে;

আয় বেহেশতে কে যাবি আয়
প্রাণে বুলন্দ দরওয়াজায়
'তাজা-ব তাজা'র গাহিয়া গান
চির তরুণের চির মেলা ! ...
যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়
যেথা যেতে নারে বুঢ্ঢা পীর।
শাস্ত্র শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয় ![৩৮১]

কবির কাছে প্রাণের সজীবতা ও অসীম ঔদার্য অত্যন্ত মূল্যবান, বেহেশতের ছবিও নজরুল ইসলাম 'প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজা'র চিত্রকল্পে এঁকেছেন। এখানে বেহেশতের যে রূপ তা মুসলমানদের বেহেশত কল্পনা থেকে উদ্ধৃত হলেও ফারসী গুলিস্তাঁ এবং কবি নজরুল ইসলামের জীবন ও যৌবনের দ্বারা তা সুষমামন্ডিত; যা একটি নতুন পৃথিবী একটি নতুন সমাজের স্বপ্নরূপও বটে। 'শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়'-এই বাক্যাংশ যুগ যুগ ধরে ইরানী কবিদের মারফত মুসলিম মানসের অবিচ্ছেদ্য হওয়ার বিষয় চিত্রাংকন করে। শরাবের সাথে আছে ইরানী আঙ্গুরের যোগাযোগ ও ফারসী মহাকবি ওমর খৈয়ামের সম্পর্ক আর সাকীর সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকারিতা ও সুমিষ্ট হাসিতে সরাইখানার শরাব বন্টন এবং গুলিস্তাঁর বিচিত্র অপার্থিব সৌন্দর্যের মাঝে মুসলিম বেহেশতে জান্নাতবাসীদের 'শারাবান তহুরা' পানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই আরবী-ফারসী বাক্যাংশ এক বিশেষ কল্পলোক সৃষ্টি করে, যা অবাস্তব হলেও ঐ কবিতার পরিবেশের জন্য সত্য এবং নজরুল ইসলামের কল্পিত বেহেশত হিসেবে আমাদের জন্য সত্য।

নওরোজ

'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের 'নওরোজ' কবিতাটিতে নজরুল ইসলাম মোগল যুগের নওরোজ উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন। নওরোজ উৎসব মূলতঃ মোগল হেরেমের রাজপুরুষ ও রাজমহিষীদের প্রাণ বিনিময়ের উৎসব। এই কবিতাটি যৌবনের আনন্দ গান। 'নওরোজ' কবিতায় আরবী ও ফারসী শব্দের বহুলতা পরিদৃষ্ট হয়। বিদেশী শব্দ হলেও নওরোজ কবিতার শব্দ যোজনা ও ছন্দ গঠনে কবির অপূর্ব দক্ষতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। নওরোজের এই মেলায় কবি নজরুল ইসলামের ভাষা ও ছন্দের স্বতঃউৎসারিত, গতিশীল, উচ্ছল। কবির ভাষায় :

হেরেম বাঁদীয়া সেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্‌,
নওরোজের নও-ম'ফিল

---

৩৮০. কাজী নজরুল ইসলাম, 'খোশ-আমদেদ', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

৩৮১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়', 'জিঞ্জীর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব গোলাম, খুনী আশেক,
বিবি বাঁদী,- সব আজিকে এক।
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক শামিল।
বেপরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-ত'বিল।
নওরোজের নও-ম'ফিল।[৩৮২]

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

নজরুল ইসলাম তাঁর অনুবাদে আরবী, ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন। অপরিচিত ও অনতিপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ যে কি আশ্চর্য দক্ষতায় কবি কর্তৃক বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। এই সব আরবী-ফারসী শব্দের স্থলে সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ বসালে এমন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠত না। নজরুল ইসলাম যেহেতু আরবী ও ফারসী দুটি ভাষাতেই অনেকটা অভিজ্ঞ ছিলেন সেহেতু তাঁর পক্ষে মূল ব্যঞ্জনা ঠিক রেখে অনুবাদের কাব্য সৌকর্য ও মাধুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে , ফারসী কাব্যের মূল ব্যঞ্জনা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসে প্রয়োজনেই 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'এর অনুবাদে নজরুল ইসলামকে বহু আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে এবং তাতে যে তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথমে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' থেকে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে দৃষ্টান্ত চয়ন করা হলো;

মদ-লোভীরে মৌলোভী কন,
পান করে এ শারাব যারা
যেমন মরে তেমনি করে
গোরের পারে উঠ্‌বে তারা।
তাইতো আমি সর্বদা রই,
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠ্‌ব-নিয়ে
এই শারাব এই দিল্‌-পিয়ারা।[৩৮৩]

রুবাইয়াৎ-ই -ওমর খৈয়াম

মূলতঃ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এ যেমন নজরুল ইসলামের আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে মননশীল, তেমনি মননশীল 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে'। তিনি তাঁর কাব্যানুবাদ কর্মে মৌখিক ভাষার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করাতে তা বিশেষভাবে সাবলীল ও স্বছন্দময় হয়ে উঠেছে। আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার একান্ত অন্তরঙ্গভাবে প্রযুক্ত হয়ে অনুবাদের শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। নজরুল ইসলামের পূর্বসূরি বা উত্তসূরি আর কোন কবি-সাহিত্যিকের হাতে আরবী-ফারসী শব্দ এরকম ব্যঞ্জনায় ভাসিত হওয়ার মত সফল ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' থেকে এতদসম্পর্কিত দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক। কবির ভাষায়:

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শিরিন ঠোঁট,
গজল শোনাও , শিরাজী দাও, তম্বী সাকি জেগে ওঠ!
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপি রং শারাব
মনে ব্যথার বিনুনি মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।[৩৮৪]

---

৩৮২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'নওরোজ', 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

৩৮৩. কাজী নজরুল ইসলাম, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, নং -৩২, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য আমপারা

পবিত্র কুরআন মজীদের ৩০ তম পারার কাব্যানুবাদ নজরুল ইসলামের 'কাব্য আমপারা'। এটি বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে মূল কুরআনিক আরবী শব্দ অক্ষতরূপে ব্যবহার করে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং শব্দটির যথাযথ অর্থ বাংলায় আভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 'কাব্য আমপারা' তে বিভিন্ন সূরার অনুবাদে আরবী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একমাত্র শব্দ, মৌলিক প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই এমনটি সম্ভব। 'কাব্য আমপারা'-এর কয়েকটি সূরার অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরবী শব্দগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব নিরূপন করা যেতে পারে।

১. কুমন্ত্রণাদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ। [৩৮৫]

২. নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে 'হোতামা' য়,
'হোতামা' কাহারে বলে, জান কি তাহায়?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃদপিন্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)। [৩৮৬]

৩. পাল্লা হবে হালকা যার
(হবে) "হাভিয়া" দোজখ মাতা তারি'।
হাভিয়া কি, তুমি জান কি সে?
প্রজ্বলিত বহ্নি সে। [৩৮৭]

৪. শপথ "তারেক" ও আকাশের
সে 'তারেক' কি তা জান কি সে?
নক্ষত্র সে জ্যোতিস্মান
(নিশিথে আগত অতিথি সে)। [৩৮৮]

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে 'খান্নাস', 'হোতামা', 'হাভিয়া', 'তারেক', প্রভৃতি আরবী শব্দাবলী নজরুল ইসলামের হাতে ব্যবহার গুণে বাংলা পরিভাষার মত সহজবোধ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

মরু-ভাস্কর

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী কাব্য 'মরু-ভাস্কর' এ নজরুল ইসলাম অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আদর্শিক জীবনালেখ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম লগ্নের চিত্র অংকনে নজরুল ইসলামের কবি-কল্পনায় প্রভাতকালীন আজানের বর্ণনায় সম্যক উপলব্ধি করা যায়। কবির ভাষায়:

ওরে ওঠ তুই, নূতন করিয়া
বেঁধে তোল তোর বীণ!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজান মুয়াজ্জিন।

---

৩৮৪. কাজী নজরুল ইসলাম, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, নং -৪, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

৩৮৫. কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্য আমপারা, 'সূরা নাস', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯।

৩৮৬. কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্য আমপারা, 'সূরা হুমাজাত', প্রাগুক্ত,পৃ. ২৯৪।

৩৮৭. কাব্য আমপারা, 'সূরা কারেয়াত', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৩৮৮. কাব্য আমপারা, 'সূরা তারেক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী , ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি
"খায়রুন্-মিনান্নৌম !"[৩৮৯]

উল্লেখ্য যে, 'আজান', 'মুয়াজ্জিন', 'সালাত', 'খায়রুম মিনান্নৌম' প্রভৃতি আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা যথার্থ ব্যবহার উপযুক্ত চিত্রকল্প বিনির্মাণে সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে ইসলামী আবহের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় শুধু ইসলামী চিন্তাধারা এবং নতুন বিষয়বস্তুই আমদানী করেননি, বরং তিনি নিজস্ব ভাষা, আঙ্গিক এবং যথার্থ রূপরীতিও নির্মাণ করে নিয়েছেন সার্থকতার সাথে বক্তব্য প্রকাশ, শব্দ নির্বাচনে উপজীব্য বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে ফুটিয়ে তোলার উপমা প্রয়োগে প্রতীক ও কাব্য-শিল্প নির্মাণের প্রয়োজনে অতি উৎসাহে আরবী-ফারসী-উর্দু প্রভৃতি ভাষার ভান্ডারেও নির্দ্বিধায় দ্বারস্থ হয়েছেন এবং সেসব ভাষার কাব্য ঐতিহ্যের শরণ নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামের সাহিত্য সম্ভারে বাংলার পাশাপাশি আরবী, ফারসী, উর্দু , হিন্দী, সংস্কৃতি, তুর্কী এমনকি গ্রীক, ইংরেজী শব্দাবলীও সহাবস্থান করছে এবং বিচিত্র ও সুদক্ষ ব্যবহারে অর্থপূর্ণ কাব্য ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে আছে।[৩৯০]

উল্লেখ্য যে, একজন প্রকৃত ভাষা শিল্পীর ন্যায় নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় অজস্র আরবী-ফারসী-উর্দু বা বিদেশী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা বিশেষ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। আরবী-ফারসী ভাষায় নজরুল ইসলাম যে কতখানি দক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ কবির আরবী-ফারসী ছন্দ ব্যবহার পদ্ধতিতে নিহিত আছে।

আরবী ছন্দের কবিতা

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছন্দ ও মিলে বিচিপূর্ণ চাতুর্য দেখিয়ে শব্দ ও সুরের মোহনীয়তায় 'আরবী ছন্দের কবিতা' লিখেছেন। "আরবী ছন্দ যেমন দুরুহ, তেমনি তড়িৎ-চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে ওঠা ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যি এক রকমের নয়,- তা একটু বেশী মন দিয়ে দেখলে অথবা পড়লেই বোঝা কঠিন নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর, অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।[৩৯১]

আরবী 'মোতাকারিব' مُتَقَارِب ছন্দে লেখা বাংলা আসলে নজরুল ইসলামের 'দোদুল-দুল' কবিতাটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯২৩ খ্রি./ ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় সংকলিত হয়। পরে আরবী 'মোতাকারিব' ছন্দে রচিত নজরুল ইসলামের এই কবিতাটি 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। কবির ভাষায়:

দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!
বেনীর বাঁধ
আল্গ ছাদ

---

৩৮৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'অবতরণিকা', 'মরুভাস্কর', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৭১৩।

৩৯০. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ,(ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২/ফাল্গুন, ১৩৯৮), পৃ. ১৩।

৩৯১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আরবী ছন্দের কবিতা', 'নির্ঝর', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

খোপার ফুল
কানের দুল
খোপায় ফুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল ।[৩৯২]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আরবী 'মোতাকারিব' ছন্দের অনুপ্রাস ও ধ্বনি ঝংকারে কবি নজরুল ইসলাম কোন চঞ্চলা তন্বীর কানের দুলের আলগা ছাঁদ, বেনীর ও খোঁপার ফুলের দোলা কবিতায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতাটি যেহেতু আরবী 'মোতাকারিব' مُتَقَارِبْ ছন্দে রচিত তাই আরবীতে ঐ ছন্দের মূল সূত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আরবী 'মোতাকারিব' ছন্দের ছয়টি প্রকারভেদ বর্তমান। আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের আদর্শ হচ্ছে 'ফাউলুন্'- فَعُوْلُنْ

সূত্র : ফাউলুন্ ফাউলুন্ فَعُوْلُنْ فَعُوْلُنْ
ফাউলুন্ ফাউলুন্ ।[৩৯৩] فَعُوْلُنْ فَعُوْلُنْ

উল্লেখ্য যে, এটি পাঁচ মাত্রার পর্ব, 'ফ' - হ্রস্ব, 'উ'- দীর্ঘ এবং 'লুন'-বদ্ধ স্বর। কবি নজরুল ইসলাম বাংলায় আরবী হ্রস্ব স্বরের বিকল্প মুক্ত স্বর এবং দীর্ঘ ও বদ্ধ স্বরের জন্য বদ্ধ স্বরের প্রয়োগ করে দোলনার দোলাকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের 'আরবী ছন্দের কবিতা' এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম যথাক্রমে 'হজয' هَزَج 'রযজ' رَجَز 'রমল' رَمَل 'মোতাকারিব' مُتَقَارِب 'সরীএ' سَرِيْع 'খফীফ' خَفِيْف 'মযতস্' مُجْتَث 'মোজারা-া' مُضَارِع 'কামেল' كَامِل 'ওয়াফের' وَافِر 'মোতদারিক' مُتَدَارِك 'তবীল' طَوِيْل 'মদীদ' مَدِيْد 'বসীত' بَسِيْط 'মন্সর' مُنْسَرِح 'যদীদ' جَدِيْد 'করীব' قَرِيْب 'মশাকেল' مُشَاكِل প্রভৃতি ছন্দের কবিতা রচনা করেছেন। ১৯২৩খৃ./ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র যদীদ' সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম 'আরবী ছন্দ' শিরোনামে ১৮ টি আরবী ছন্দের সূত্র বিশ্লেষণ করে তাদের উদাহরণ হিসেবে কবিতা রচনা করেন। 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের 'আরবী ছন্দের কবিতা' এরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটি পরবর্তীতে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'আরবী ছন্দের কবিতা' শিরোনামে উদ্ধৃত হয়।[৩৯৪]

১৯২৪ খ্রি./১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম কৃত আরবী ছন্দের তরজমা সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.) তাঁর 'আরবী ছন্দের বাঙ্গলা' শিরোনামে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "গত ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী' তে বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব ১৮ টি ছন্দের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু আরবী ছন্দের সমষ্টি ১৮ নহে - ১৯। তা ছাড়া তিনি এক একটি ছন্দের নাম দিয়ে মাত্র একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, ছন্দগুলো এককভাবে সম্পূর্ণ অর্থাৎ উহাদের আর কোন শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে।... পাঠক দেখিবেন, কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত ১৮ টি ছন্দ ছাড়া যেগুলি অবশিষ্ট আছে, সেগুলি সংখ্যায় কত বেশী এবং কত বিচিত্র, নূতন ও মধুর।

---

৩৯২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'দোদুল দুল', 'দোলন-চাঁপা', নজরুলের কবিতা সমগ্র, পৃ. ৫২।

৩৯৩. আরবী ছন্দ সূত্রের যেখানে (x) চিহ্ন আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে। দ্রঃকাজী নজরুল ইসলাম, আরবী ছন্দের কবিতা', মোতাকারিব, সূ'ত্রঃ৪, 'নির্ঝর', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৩৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২০৫; মুঃ নবিনুল্লাহ, আরবী ছন্দ বিজ্ঞান, (রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১ম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৪, ফাল্গুন, ১৪০০), পৃ. ৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্ব্যতীত কাজী সাহেব কয়েক স্থলে আরবী ছন্দ সূত্রের উচ্চারণ ঠিক মত ধরিতে পারেন নাই। কাজেই স্থলে তার অনুবাদও ভুল হইয়াছে। তাছাড়া এমন দুই-একটি ছন্দ সূত্র লিখিয়াছেন- যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নুতন বলিয়া বোধ হইল। জানিনা, সে গুলি তিনি কোথায় পাইয়াছেন।" [৩৯৫]

আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতে, আরবীতে সর্বমোট ১৬ টি ছন্দ বা 'বাহর' আছে। ১৬ টি ছন্দের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত 'তাবীল' (দীর্ঘ), 'বাসিত' (বিস্তৃত), 'কামিল' (পূর্ণাঙ্গ), 'ওয়াফির' (প্রশস্ত), 'খাফীফ', (হ্রস্ব বা হালকা) প্রভৃতি। গজল ও গানে সাধারণতঃ 'মুদআরী', 'মুকতাদাব', 'মুজতাস' ইত্যাদি ছন্দরীতি মেনে চলা হয়। মোদ্দাকথা, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবী মাত্রায় ১৬ টি ছন্দের ব্যবহারই দেখিয়ে আমাদেরকে চমক লাগিয়ে বিমোহিত করে দিয়েছেন। তাই আমারা বিস্মিত ও আনন্দিত কি অপরূপ শৈল্পিক দক্ষতায় কবি সেই উপকরণসমূহ বাংলা কবিতার অঙ্গে বিন্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ফারসী কবিতার রূবাই, মিস্‌রা প্রভৃতি ছন্দরীতির ব্যবহার দেখিয়ে বাংলা ভাষা এমনকি আরবী-ফারসী সম্বলিত ছন্দের যে মাত্রা, লয়, অনুপ্রাস এ সবই কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক-পাঠিকাদের বিমুগ্ধ করেছেন।[৩৯৬]

আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা

ইসলামী চিন্তাধারায় কবিতা ও গান রচনা করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম যে সব আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার সংখ্যা অগণিত। তবে নজরুল সাহিত্যে উপর গবেষণা চালিয়ে মরহুম কবি আবদুস সাত্তার (১৯২৭- ২০০০ খ্রি.) তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ' শীর্ষক অভিধানগ্রন্থে প্রায় তিনহাজার শব্দের উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ আরবী শব্দ, শতকরা ৩০% ভাগ ফারসী শব্দ এবং শতকরা ১০% ভাগ উর্দু বা অন্যান্য শব্দ রয়েছে। এই সব শব্দ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে প্রচলিত আছে কবি নজরুল ইসলামও সেভাবে তাঁর কাব্যকর্মের বিভিন্ন ছত্রে ছত্রে চিত্রিত করেছেন।[৩৯৭]

নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রচুর সংখ্যক আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। যথাঃ- অক্ত, অজুহাত, আইন, আউয়াল, আওরত, আওলিয়া, আকিকা, আখের, আজব, আজম, আজল, আজান, আজাদ, আতর, আদব, আবাদ, আমল, আমামা, আমির, আমিরুল মুমেনিন, আমিন, আম্বিয়া, আয়াত, আয়েব, আরজি, আরব, আরাবীর, আল-আমীন, আল-আহাদ, আলবৎ, আল্লাহ, আশিক, আহমদ, আহাদ, ইজ্জত, ইনসান, ইনসাফ, ইফতার, ইবলিস, ইমান, ইলাহী, ইশ্‌ক, ইশারা, ইসলাম, ঈমান, ঈদ, উম্মত, এছম, এছমে আজম, এতীম, এলহান, এশা, ওজন, ওফাত, ওয়াজ, ওয়ালেদ, ওমরাহ, ওহী, কওম, কওসর, কতল, কবর, কবুল, করজ, কলেমা, কসম, কহর, কাফন, কাফের, কাফেলা, কাবা, কামাল, কিতাব, কিয়ামত, কিস্মত, কুরআন, কুরবান, কুরবানী, কুল, কুর্শী, কোরান, খরিদ, খাল, খাদেম, খান্নাস, খিমা, খিজির, খুবজ, খোৎবা, গরীব, গোলাম, জওহর, জওয়ান, জওয়াব, জমজম, জলসা, জবেহ , জমায়েত, জাকাত, জানাজা, জান্নাত, জামাত, জালিম, জাহান্নাম, জিন, জিয়ারত, জুলফিকার, জুলুম, জেওর, জেহাদ, জোহর, তওবা, তকবীর, তয়ম্মুম, তসবীহ, তসলীম, তসবীহ, তহরিমা, তাজ, তাজমহল, তালাক, তামাম, তারিফ, তুফান, তৌফিক, তৌহিদ, দখল, দলিল, দাওয়াত, দুনিয়া, দুলদুল, দৌলত, নকীব, নজর, নজরানা, নফসি নফসি, নবী, নবুয়ত, নহবত, নহর, নিয়ামত, নূর, নেকাব, ফকীর, ফখর, ফানা, বদ, বিলকুল, মওত, মজলুম, মঞ্জিল, মহফিল, মহব্বত, মহররম, মসজিদ, মাজহাব, মাল্লা, মাফ, মা'বুদ, মারফত, মিসকিন, মুনাজাত, মুনাফা, মুনাফিক, মুবারক, মুয়াজ্জিন, মুরশিদ, মুলক, মুসলমান, মুসাফির, মোল্লা,

---

৩৯৫. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিত মানস, পৃ. ২২১।

৩৯৬. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃ. ১০।

৩৯৭. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মোলভী, মৌলানা, মৌলুদ, মোস্তফা, রসূল, রহমত, রূহ, লানত, লা-শারীক, লেবাস, শয়তান, শরবত, শারাব, শারীক, সালাত, সালামত, সালাম, সাহাবা, সিজদা, সিয়া, সুরাজি, হজ্জ, হজরত, হাবীব, হারাম, হালাল, হাশর, হাশরত, হাওয়া, হিম্মত, হিসাব, হুকুম প্রভৃতি আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা।[৩৯৮]

সেইসাথে আওয়াজ, আখেরী, আজাদ, আফতাব, আফসোস, আব, আবে-হায়াত,আনার দানা, আতস, আঞ্জাম, আমদানী, আরাম, আহাজারি, ইরান, ঈদগাহ, উম্মেদ, একদম, কতলগাহ, কঞ্জুস, কবরস্তান, কমজোর, কমজাত, কমবক্ত, কাগজ, কাবাব, কাঙাল, কামান, কিশতী, কুর্ণিশ, কোহিনূর, খঞ্জর, খাক, খাজা-খিজির, খাপ, খামোশ, খাঞ্চা, খাস, খেয়ালী, খোশ আমদেদ, খোশ খবর, খুন, খোশরোজ, খোশবু, খোদ, খোদা, গর্দান, গম্বুজ, গিদধর, গুনাহগার, গুলজার, গুলবাগিচা, গুলবাহার, গুলাব, গুলশান, গুলবদন, গুলিস্তান, গেরেফতার, গোর, গোরস্তান, গোলামখানা, চরকা, চাপকান, চাপরাশি, চেরাগ, জখম, জঙ্গ, জমিন, জমিদার, জাহান, জানোয়ার, জিঞ্জির, জিন্দাবাদ, জিন্দান, জিন্দেগী, জুদা, জোশ, জোতদার, তকমা, তখত, তখত-তাউস, তলোয়ার, তাজী, তাম্বু, তেজ, তেগ, দম, দরগাহ, দরবার, দরবেশ, দরাজদিল, দরিয়া, দরুদ, দহলিজ, দস্ত, দাঙ্গা, দানাপানি, দামামা, দিল, দুশমন, দিশারী, দোজখ, দোয়া, দোস্ত, নওজোয়ান, নওরোজ, নওয়াব, নওশাহ, নয়াজামানা, নামাজ, নিশান, নীল, নেস্তনাবুদ, পয়জার, পয়গম্বর, পয়গাম, পয়মাল, পরওয়ারদেগার, পর্দা, পরোয়া, পাক, পালিদ, পানাহ, পিঞ্জর, পিরহান, পিয়ালা, পীর, পেরেশান, ফরমান, ফেরেশতা, ফরিয়াদ, বজ্জাত, বদল, বদনাম, বন্দী, বরবাদ, বরাত, বাগিচা, বাদশাহ, বান্দা, বিমান, বিয়াবান, বুলন্দ, বুসা , বেঈমান, বেআদব, ময়দান, মরদ, মস্তান, মাতম, মাজার মাহতাব, মিনার, মুর্দা, রওশন, রোশনী, রমজান, রসিদ, রাহা, রোজ, রোজা, লাজ, শবে কদর, শবে বরাত, শমশের, শরম, শামাদান, শাহান্‌শাহ, শির, শিরীন, শিরনী, শিরাজী, শেরওয়ানী, সওদা, সওদাগর, সওয়াব, সফেদ, সিতারা, সিন্দাবাদ, সিপাহসালার, হরদম, হররোজ, হাজার, হাম্মাম, হারামী, হারামখোর, হুশিয়ার, হুরপরী, হেরেম প্রভৃতি ফারসী শব্দ নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।[৩৯৯]

বাংলা কবিতায় নিত্যপ্রচলিত বিদেশী শব্দ ছাড়াও নজরুল ইসলাম যে অজস্র আরবী-ফারসী-উর্দু ও হিন্দী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন এ সম্পর্কে শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলা কাব্যের শব্দ ভান্ডারও নজরুল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছেন; যে সমস্ত আরবী বা উর্দু শব্দ তিনি কবিতায় প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য নৈসর্গিক ঔচিত্যবোধে সেগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বাংলা কাব্য ভাষার মধ্যে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি যখন 'ফরমান' বা 'আরজ' শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তাহাদের ভাব-প্রকাশিকা ব্যঞ্জনা শক্তি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠে। হয়ত কিছু কিছু আতিশয্য ও অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু মনে হয় তাঁহার কাব্য-পরিণতির পথে অপ্রত্যাশিত বাধা না আসিলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী শব্দ প্রয়োগের সুষ্ঠু নীতিটি চিরকালের জন্য নির্ধারণ করিয়া যাইতেন। প্রতিভাবান লেখকের প্রয়োগই এই ক্ষেত্রে ঔচিত্যের চরম মানদন্ড।"[৪০০]

ইসলামী চিন্তাধারাসম্পন্ন কবিতায় নজরুল ইসলাম যেমন আরবী-ফারসী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন নিঃসন্দেহে তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করেছে। অধিকাংশ ইসলামী কবিতা, হাম্‌দ, নাত, গজল, কাওয়ালী ও কবিগানে বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি ভাষার প্রাণশক্তি যেমন বৃদ্ধি করেছেন, ভাষাকেও তেমনি

---

৩৯৮. আবদুস সাত্তার , নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃ. ১০৩-১০৭।

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১১১।

৪০০. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য-সমীক্ষা, পৃ. ২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সুললিত, মনোরম ও লাবণ্যময় করে তুলেছেন। আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক প্রয়োগ ও ছন্দ-অলংকার ব্যবহারের সাবলীলতা তাঁর ইসলামী কবিতাকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। নজরুল ইসলামের কথায় এর ফলে তাঁর কবিতার মূল্য যে কিছুমাত্র কমেনি তা নয়; বরং আরো সমৃদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মিসরের জাতীয় জাগরণের কবি আহমাদ শাওকী বেক ও বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আধুনিক যুগের অনন্য সাধারণ কীর্তিমান বিশুদ্ধ প্রতিভা। উভয়েই ছিলেন শীর্ষস্থানীয় জাতীয় কবি। আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম তাঁদের কবিত্ব শক্তিকে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র সর্বোপরি ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের কবিতার মধ্যে শোষিত, বঞ্চিত মানবতার দুঃখ-দুর্দশার করুণ ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। উভয় কবির মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উপসংহারে আমরা আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর মূল্যায়ন করতে যেয়ে তাঁদের প্রত্যেকের জন্মগত পরিবেশ, বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন , কর্মজীবন তথা উভয় কবির জীবন চরিত ও সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত দেশে আবির্ভূত হন। আহমাদ শাওকী বেক ১৮৬৮ সালে মিসরে এবং কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে পশ্চিম বাংলায় জন্মলাভ করেন। শৈশবেই উভয় কবির মধ্যে আহমাদ শাওকী মাতৃহীন এবং নজরুল ইসলাম পিতৃহীন হয়ে পড়েন। কিন্তু আহমাদ শাওকী রাজ-দরবারে নানীর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত-পালিত হন এবং বিত্তবান পরিবারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। কাজেই তাঁর প্রাথমিক জীবনের কবিতাও ছিল সেইরূপ। রাজ-দরবারী কবি হিসেবে তিনি রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরাহ্‌দের প্রশংসা করে স্তুতিগাঁথা কবিতা লিখে প্রচুর সুনাম অর্জন করতেন এবং যথেষ্ট উপহার-উপঢৌকন ও লাভ করতেন।

পক্ষান্তরে নজরুল ইসলাম এক দরিদ্র সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নয় বৎসর বয়সে পিতাকে হারিয়ে ফেলেন, তারপর দুঃখ-কষ্টের সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে লালিত-পালিত হন। অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় তাঁর জীবন চলতে থাকে বল্গাহীন ঘোড়ার মত। জীবিকার তাগিদে কৈশোরেই তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে চাকুরী করতে বাধ্য হন। গ্রামের মক্তবে মোল্লাগিরি, মসজিদের ইমাম, মাজার শরীফের খাদেমসহ জীবনের প্রয়োজনে রুটির দোকানেও নজরুল ইসলামকে কাজ নিতে হয়েছিল। কিন্তু এসব কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে নির্জন-নিভৃতে তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিতা রচনা করতে থাকেন। তিনি কাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন দুঃস্থ মানবতার মনের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনার করুণ চিত্র। তুলে ধরলেন তারুণ্যের জয়-যাত্রা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা। দশম শ্রেণীতে লেখা-পড়া করার সময় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় দেশ-মাতৃকার টানে নজরুল ইসলাম পড়াশুনা বাদ দিয়ে বাঙালী পল্টনের সৈন্যদলে নাম লেখালেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তিনি হয়ে গেলেন 'হাবিলদার' কবি।

আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম উভয়েই ছিলেন জাতীয় জাগরণ ও দুঃস্থ মানবতার কবি। তাঁরা দু'জনই ছিলেন স্বাধীনতাকামী। উভয় কবি তাঁদের অগ্নিঝরা লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিরোধিতার ঝাণ্ডা তুলে ধরে দেশবাসীকে সজাগ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। স্বাধীন চিন্তার ধারক-বাহক মুক্ত মনের মানুষ হিসেবে জাতির দোষ-ত্রুটির কঠোর সমালোচনা করেন, মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে উভয়ই বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলেন। বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের কারণে আহমাদ শাওকীকে জন্মভূমি মিসর থেকে স্পেনে নির্বাসিত হতে

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জনগণের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে লাগলেন। আপামর জনসাধারণের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির জন্য তিনি জোরালো ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। অপরদিকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী লেখনীর দরুণ নজরুল ইসলামকেও রাজরোষে পড়ে কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং তাঁর অনেক কবিতা ও প্রবন্ধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কারাগারে বসেও নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। উভয় কবি দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের জনগণের জন্য, আজাদী অর্জনের জন্য শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীকে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করে কাব্য রচনা করেছেন। আহমাদ শাওকী ছিলেন মিসরবাসীর জন্য কান্ডারী, আর কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে ইংরেজদের কবল থেকে স্বাধীন করার অন্যতম প্রেরণা আর উৎসাহ প্রদানকারী কবি।

মিসরের অতীতের হারানো গৌরব ও শৌর্য-বীর্যের পুনরাবৃত্তি করে আহমাদ শাওকী জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কবি নজরুল ইসলামও এমনিভাবে মুসলমানদের অতীতের শান-শওকাতের চিত্র অংকন করে জাতির কর্মোদ্দীপনা ও ধর্মীয় প্রেরণা শাণিত করে তোলার প্রয়াস চালান। আহমাদ শাওকী পরাধীন জাতির হীনমন্যতার সমালোচনা করে কবিতা রচনা করেন; পক্ষান্তরে জরাগ্রস্ত, পরাধীন ও ঈমানী শক্তিহীন জাতির প্রতি কটাক্ষ করে নজরুল ইসলামও অসংখ্য জাগরণী কবিতা লিখে মুসলমানদের পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন।

আহমাদ শাওকীর রচনার বিষয়বস্তু ছিল প্রেমমূলক, বর্ণনামূলক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়; অন্যদিকে নজরুল ইসলামের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক পুনর্গঠন, দেশপ্রেম, ধর্মীয় কুসংস্কার, দীন-হীন, দুঃখী ও পীড়িতদের অবস্থা, হাম্‌দ, না'ত, গজল, গান প্রভৃতি।

আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম উভয়ই ছিলেন সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁরা তাঁদের কবিতার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে সজাগ সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। সমাজের ধনী-গরীব, মালিক-শ্রমিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনী ক্ষুরধার ছিল। উভয়ই সাম্যের কবি। কবি নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে বিখ্যাত হলেও প্রেম ও রোমান্স তাঁর সাহিত্যকে ফাঁকি দিতে পারেনি; বরং প্রেমবিষয়ে তিনি অনেক সাহিত্য রচনা করেন। তেমনিভাবে আহমাদ শাওকীর কবিতার মধ্যেও প্রেম ও রোমান্স লক্ষ্য করা যায়। উভয় কবি ছিলেন নারী মুক্তির অগ্রদূত। নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতি তাঁরা ছিলেন না। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম নারী জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে অনেক কবিতা রচনা করেন।

হারানো ঐতিহ্যকে ফিরে পাবার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বাঙালী জাতি ও মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্য নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য সাধনা করে যান। ঠিক নজরুল ইসলামের মত ততটা না হলেও আহমাদ শাওকী তাঁর কবিতায় জাতীয় জাগরণের জন্য মিসরবাসীদের শৌর্য-বীর্যের গান গেয়েছেন। তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবার জন্য জাগরণী মন্ত্র শুনিয়েছেন। তাই আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম উভয়ই জাতীয় জাগরণের কবি। লেখনীর মাধ্যমে তাঁরা ঘুমন্ত জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী মিসরের জাতীয় জাগরণের আর কবি নজরুল ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষতঃ বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অবদান রেখে গেছেন।

ধর্মীয় ভাবধারা জাগরণে আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম ছিলেন সদা তৎপর। আহমাদ শাওকী তাঁর ইসলামী কবিতার দ্বারা মুসলিম জাতিকে তাদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ইসলামী সমাজব্যবস্থা ছিল তাঁর নিকট অত্যাধিক প্রিয়। সব মানুষকে তিনি সৎ ও আদর্শবান হতে উপদেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামও তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুসলমান জাতিকে অগ্রগতিতে পিছিয়ে থাকার কারণ এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে আবার ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিতে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। কবি নজরুল ইসলাম বাংলার মানুষের ধর্ম-কর্ম থেকে বিচ্যুত হতে দেখে ব্যথিত হয়েছেন। মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ঈমানের বলে বলিয়ান হওয়ার জন্য উভয় কবিই সমানভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবলম্বনে উভয়েই কাব্যরচনা করেছেন। দু'জনই মুসলমানদের বর্তমান করুণ অবস্থা ও দুর্দশার জন্য আকুল হয়ে অনুশোচনা করেছেন। সঠিকভাবে ধর্মীয় জাগরণের জন্য উভয় কবিই দু'হাতে ক্ষুরধার লেখনী সঞ্চালন করেছেন। ফলে উভয়ের কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

আহমাদ শাওকী ধর্মীয় গোঁড়ামী পছন্দ করতেন না। তবে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য সকলের প্রতি জোড়ালো আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল ইসলামও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও নজরুল ইসলাম মুসলমান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে অনেক কবিতা ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে অর্থাৎ মানুষ যে মানুষই। সকলের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এবং মাতা বিবি হাওয়া (আ.)। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। কেন আজ হাতাহাতি, লাঠালাঠি। এ সব কিছু নিরসনে নজরুল ইসলাম কবিতা রচনা করেন। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেন এ লেখনীর মধ্যে। সকল ধর্মের ব্যাপারে লিখলেও তিনি ছিলেন ইসলামী চিন্তা-চেতনার কবি।

আহমাদ শাওকী ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দৃঢ় 'আকীদাসম্পন্ন একজন মুমিন মুসলমান। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও সোচ্চার। ধর্ম ছিল তাঁর মনের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যাছাড়া তাঁর মনে কোন শান্তি ছিলনা। তাই আহমাদ শাওকীর রচনায় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসাহ প্রেরণাশূণ্য কাসীদার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য; উপরন্তু তাঁর সাহিত্যের অর্ধাংশ জুড়ে ইসলামী ভাবধারা বিদ্যমান। তিনি মহান আল্লাহর স্তুতিগাঁথা, নবী-রাসূলগণের প্রশস্তিগাঁথা, ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য এবং মুসলিম খিলাফতের বন্দনা করে কবিতা রচনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লাহ , নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, খলীফা ও পবিত্র স্থানসমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে ইসলামী চিন্তা-চেতনার যথার্থ বিকাশ ঘটিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী 'আমীর আল-শু'আরা' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার চেয়ে নিজেকে 'শাইর আল-ইসলাম' বা 'ইসলামের কবি' উপাধিতে ভূষিত করাকে প্রাধান্য দিতেন ও অত্যাধিক আনন্দবোধ করতেন।

পক্ষান্তরে ধর্মের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম ছিলেন উদার নীতি অবলম্বনকারী। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও তিনি পরবর্তী জীবনে ইচ্ছামত ধর্ম পালন করতেন। বাংলা সাহিত্যে 'মুসলিম রেঁনেসার অগ্রদূত' ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। তথাপি একসময় কবি নজরুল ইসলামকে বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া ইসলামপন্থী লোকেরা 'উগ্রবাদী', 'কাফের' প্রভৃতি বলে ফতোয়া দিয়েছিল। কিন্তু নজরুল ইসলাম সর্বান্তকরণে তাদের উক্তির বিরোধিতা করে বলেন, 'বক্ষে আমার কা'বার ছবি, চক্ষে মুহাম্মদ রাসূল।'

এ লেখনীর পর সকলের ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে যায় এবং নজরুল ইসলামকে 'ইসলামী কবি', 'ইসলামের মহান সেবক' বলে দাবী করে। কবি নজরুল ইসলাম আল্লাহ ও রাসূলের শানে অসংখ্য হাম্‌দ, না'ত, গজল ও ইসলামী সঙ্গীত উপহার দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তাঁর আল্লাহ ও নবীপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। দু' একটি বিতর্কিত কবিতা ব্যতীত অন্যসব লেখাগুলোতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর একত্ববাদের বিশ্বাসের উৎকৃষ্ট নজরানা পেশ করেছেন। নজরুল ইসলাম পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদের 'আমপারা' অংশের কাব্যানুবাদ করে 'কাব্য আমপারা' রচনা করেছেন। সেই সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' কাব্য গ্রন্থ রচনা করে অতুলনীয় ইসলামী চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা রচনা করে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, 'কাব্য আমপারা'-এর 'আরজ' অংশে কবি নজরুল ইসলাম নিজেকে 'খাদেমুল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের সেবক'রূপে আখ্যায়িত করেছেন। নজরুল ইসলাম মানবতাবাদের শিক্ষা নিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইসলামের চিরন্তন আদর্শ থেকে। নজরুল ইসলাম তাঁর বিভিন্ন রচনায় মুসলমানদের মনে প্রেরণা সঞ্চার এবং তাদের জাগরণের জন্য ইসলামের মহিমা কীর্তণ করেছেন। কবি শুধু ইসলামের মহিমা প্রচার এবং ইসলামী কবিতা ও ভক্তিমূলক গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং ইসলামের আদর্শে তাঁর নিজের গভীরতর বিশ্বাসের কথা বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায়, প্রবন্ধে-নিবন্ধে, ভাষণ-অভিভাষণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন এবং নিজেকে 'মুসলিম' রূপে এবং ইসলাম ও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী তথা তৌহিদবাদী বলেও ঘোষণা করেছেন।

নজরুল ইসলাম শুধু কবি-সুলভ আবেগ এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইসলামী কবিতা, গজল-গান রচনা করেননি, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্তর্নিহিত সমানাধিকারের বাণীতেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নজরুল ইসলামের পক্ষে সব রকমের কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে মানুষের কাব্য রচনা সম্ভবপর হয়েছিল।

অতএব, এ দু'দেশ বরেণ্য ভিন্ন ভাষা-ভাষী কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরুহ। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বোপরি আরবী কাব্য সাহিত্যে নতুন ছন্দ, আধুনিক ভাবধারা ও নতুন বিষয়বস্তু অবতারণার জন্য সমালোচকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আধুনিক আরবী সাহিত্য অঙ্গনে আহমাদ শাওকী এক বিরল বিস্ময়কর ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, যিনি মুহূর্তেই আরবী ভাষাভাষী ও সুধী সমাজের বিস্মিত চকিত দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। স্রষ্টা প্রদত্ত অস্বাভাবিক প্রতিভার অধিকারী আহমাদ শাওকী নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতার গুণে অতিসূক্ষ্মভাবে সব কিছু অনুভব করতেন। তাঁর অন্তর ও সকলের অন্তরের মাঝে ছিল বৈদ্যুতিক তারের যোগসূত্রিতা; যদ্বারা তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বেদনায় ব্যথিত ও সুখে আনন্দিত হতেন। যিনি তাঁর কাব্যে নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করেছেন এবং একজন স্বভাব কবি হিসেবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। আহমাদ শাওকীর সক্রিয় সাহিত্য জীবনে সেই আলোকচ্ছটা বিচিত্র ধারায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। আর এ জন্যই তিনি আরবী কাব্য জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের আর জাতীয় জীবনে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান শীর্ষে। এজন্য নজরুল ইসলাম জনগণের মনে-প্রাণে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত নজরুল ইসলামের অসাধারণ পান্ডিত্যে, কবিতার প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে এবং হাম্‌দ, না'ত, গজল, গান প্রভৃতি রচনায় বাংলা সাহিত্যে অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। রাজ-প্রাসাদের কবি আহমাদ শাওকী বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন তা জনগণের কবি নজরুল ইসলামের নাগালের বাইরে ছিল। আহমাদ শাওকী ইউরোপে থেকে অধ্যয়ন এবং ফ্রান্স থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ পেয়েছেন। যার ফলে দেশ-বিদেশের শিক্ষা আর সাহিত্য চর্চার সুযোগ তিনি বেশী পেয়েছিলেন কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও ক্লাসের ফার্স্টবয় হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের নির্মম প্রতিকূলতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসনদ লাভ করতে পারেননি।

আহমাদ শাওকী এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে ব্যাপকভাবে সফর করেন, যার কারণে তিনি আরবী, ইংরেজী, তুর্কী, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন। পক্ষান্তরে নজরুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম দারিদ্রতার কারণে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না পেলেও ছোটবেলা থেকেই ব্যক্তিগত চেষ্টায় আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করেন। আহমাদ শাওকী ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর কবি ও উচ্চশ্রেণীর পতাকাবাহী। আর নজরুল ইসলাম ছিলেন গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর ও সকল শ্রেণীর মুখপাত্রস্বরূপ। এ সকল বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় কবি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম উভয়েই ছিলেন জাতীয় জাগরণের কবি। তাঁরা তাঁদের কবিত্ব শক্তিকে আজীবন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব কল্যাণে উৎসর্গ করে গেছেন এবং সমাজ চেতনা ও জাতীয় উন্নয়নে তাঁদের মত কবি-সাহিত্যিকদের কাছে আমরা চির ঋণী । সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনায় জাতিকে উজ্জীবিত করার জন্য যুগে যুগে এমনি ধরনের বিরল, বিস্ময়কর কবি-প্রতিভার আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে যতদিন সারা বিশ্বে আরবী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা চলতে থাকবে ততদিন তাঁরা সাহিত্যামোদীদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গৌরবের আসনে সমাসীন থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

: আল-কুরআন আল-কারীম

বেক, আহমাদ শাওকী : আল-শাওকিয়্যাত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড
বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.

: দুওয়াল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: মাস্‌রা' ক্লিউবাত্‌রা
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: মাজনূন লায়লা
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: কামবীয
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: আলী বেক আল-কাবীর
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: আনতারা
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: আল-সিত্তু হুদা
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: আমীরাত আল-আন্দালুস
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

: আস্‌ওয়াক আল-যাহব
বৈরুত: দার আল-আউদা, ১৯৮১

আহমাদ কাব্বিশ : তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস
বৈরুত: দার আল-জীল, ১৯৭০

আহমাদ মাহফূয : হায়াতু শাওকী
কায়রো, তা. বি.

আহমাদ উবায়দ : যিক্‌রা আল-শাইরাইন
দামেশ্‌ক , ১৩৫১ হি.

আব্বাস হাসান : আল-মুতানাব্বী ওয়া শাওকী
কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩

আল-আয্‌ব, মুহাম্মদ আহমাদ, ড. : আন আল-লুগা ওয়া আল-আদব ওয়া আল-নাক্‌দ
বৈরুত: আল-মারকায আল-আরবী লি আল-সাকাফা ওয়া আল-উলূম

আল-আক্কাদ, আব্বাস মাহমূদ : শু'আরাউ মিসর ওয়া বীআতুহু ফী আল-জায়ল আল-মাদী
কায়রো: ১ম প্রকাশ, ১৯৩৭

: রিওয়াইয়াতু কামবীয ফী আল-মীযান

Dhaka University Institutional Repository

কায়রো, তা. বি.

আল-আশতার, সালিহ, ড. : আন্দালুসিয়্যাতু শাওকী
দামেশ্‌ক, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৯

আবুল 'আয, আহমাদ আবদুল ওয়াহ্‌হাব : ইত্বনা 'আশারা 'আমান ফী সোহবাতি আমীর আল-শু'আরা
কায়রো, ১৯৩২

আহমাদ আমীন, ড. ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : আল-দীওয়ান লি হাফিজ ইব্‌রাহীম ১ম খণ্ড
বৈরুত: দার আল-আউদা লিল সাহাফা ওয়া আল-তাবা'আ ওয়া আল-নাশর, ১৯৩৭, কায়রো, ৭ম সংস্করণ, ১৯৫৫

আল-আব, লুইস মা'লূফ : আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ
বৈরুত: দার আল-মাশ্‌রিক, ২১তম সংস্করণ, ১৯৭৩

আল-আব, ফারদীনান তূতাল : আল-মুনজিদ ফী আল-আ'লাম
বৈরুত: দার আল-মাশ্‌রিক, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৬, ১০ম সংস্করণ, ১৯৮০

: আল-মুনজিদ ফী আল-আদব ওয়া আল-'উলূম
বৈরুত: মু'জাম লি আ'লাম আল-শায়ক ওয়া আল-গায়ব, ১৯৫৬

খান, আজহারউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে নজরুল
কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৭

আনওয়ারুল ইসলাম : নজরুলের বাল্যজীবন
কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১

আয়ুব হোসেন, মুহাম্মদ : গ্রামীণ নাটক: লেটোগান
ঢাকা: লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০২

আহমাদ, ডি. এফ. : নজরুলের গানে ইসলামী আকিদা
ঢাকা:নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা,১৬শ খন্ড, ফাল্গুন,১৪০০/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

: নজরুলের রচনায় মাহে রমজান
ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ পৌষ, ১৪০৬/ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

আল-আমান, আবদুল আজিজ (সম্পাদিত) : নজরুল গীতি অখণ্ড
কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৯৯

আল-আমান, আবদুল আজিজ : ধূমকেতুর নজরুল
কলকাতা, ১৯৭৪

আতাউর রহমান : নজরুল কাব্য সমীক্ষা
ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭

আলী, কে. : ইসলামের ইতিহাস
ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬, ১০ম সংস্করণ, ১৯৮৭

: মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড
ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৫, ৯ম সংস্করণ, ১৯৮৭

ইউনূস, মুস্তফা মাহমূদ, ড. : মিন আদাবিনা আল-মু'আসির
মিসর: মাতবা'আ আল-ফাজর আল-জাদীদ, ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইস্কানদারী, আহমাদ ও মুস্তাফা ইনানী : আল-ওয়াসীত ফী আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখিহি
মিসর: মাত্বাআতু আল-মা'আরিফ, ১৩৪৭/১৯২৮

আল-ইস্কানদারী, আহমাদ ও আহমাদ আমীন, অন্যান্য হাসান হাল্লাক, ড. (সম্পাদিত) : আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী ফী আল-উসূর আল-কাদীমা ওয়া আল-ওয়াসীতা ওয়া আল-হাদীসা
বৈরুত: দার ইহ্ইয়া আল-উলূম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪/১৯৯৪

ইয়াহ্ইয়া হাক্কী : হাযা আল-শি'র
কায়রো: আল-হায়আতু আল-মিসরিয়্যা আল-'আম্মাহ লিল-কিতাব, ১৯৮৮

ইয়াহ্ইয়া শামী, ড. (সম্পাদিত) : আল-শাওকিয়্যাত ১ম ও ২য় খণ্ড
বৈরুত: দার আল-ফিকর আল-আরবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬

: ইসলামী বিশ্বকোষ
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, আগষ্ট, ১৯৮৭; ৫ম খণ্ড, ১৯৮৮; ১৩শ খণ্ড, ১৩৯৯/১৯৯২

ঈলিয়্যা হাভী (সম্পাদিত) : আ'লাম আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীস
বৈরুত: আল-মাক্তাব আল-তিজারী লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্র ওয়া আল-তাওযী', ১ম সংস্করণ, ১৯৭০

আল-উরইয়ান, সাঈদ : মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত ৪র্থ খণ্ড
কায়রো, ১ম প্রকাশ ১৯৪৩; বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.

আবূ আল-ওয়াফা, মাহমূদ : মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত ৩য় খণ্ড
কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৯৩৬; বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.

আহমদ, ওয়াকিল, ড. (সম্পাদিত) : সাহিত্য পত্রিকা (নজরুল জন্মশত বার্ষিক সংখ্যা)
ঢা. বি.:বাংলা বিভাগ, ৪২বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫/অক্টোবর,১৯৯৮

: সাহিত্য পত্রিকা
ঢা. বি.:বাংলা বিভাগ, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০৫/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

কূকন, মুহাম্মদ ইউসূফ : আ'লাম আল-নাসর ওয়া আল-শি'র ফী আল-আসর আল-হাদীস
মদ্রাজ: দার হাফিজা লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্র, ১৪০০/১৯৮০

কোরায়শী, গোলাম সামদানী : আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৭৭

আবদুল কাদির : নজরুল পরিচিতি
ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৩৬২

: নজরুল প্রতিভার স্বরূপ
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪/১৯৮৮

আবদুল কাদির (সম্পাদিত) : নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪/মে, ১৯৬৬

: নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, পৌষ, ১৩৭৪/ডিসেম্বর, ১৯৬৭

: নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

	ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৭৬/ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০
	: নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড
	ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪/মে, ১৯৭৭
	: নজরুল রচনা সম্ভার
	কলকাতা: ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, ১৩৭২/১৯৬৫;
	ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬/১৯৬৯
আবদুল কুদ্দুস, মোহাম্মদ	: নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা
	কুমিল্লা: প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭০
আজাদ, কামরুন্নেছা	: ধর্মীয় চেতনায় নজরুল
	ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, চৈত্র, ১৪০৭/এপ্রিল, ২০০১
চৌধুরী, কবীর	: নজরুল দর্শন
	ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৯৮/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২
আল-খাফাজী, আবদুল মুনঈম	: মিন কিতাবি দিরাসাত ফী আল-আদব আল-আরবী আল-মুআ'সির
	কায়রো, তা. বি.
আবূ আল-খাশ্‌ব, ইবরাহীম, ড.	: তারীখ আল-আদব আল-আরবী ফী আসর আল-হাদির
	কায়রো, তা. বি.
খলীল মুতরান	: শাইর আল-'উমারা
	কায়রো, তা. বি.
আল-জুন্‌দী, ইন'আম	: আল-রাঈদ ফী আল-আদব আল-আরবী ২য় খণ্ড
	বৈরুত: দার আল-রাঈদ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৮৬
আল-জুন্‌দী, আবদুল হামীদ সিন্‌দ	: হাফিজ ইব্‌রাহীম শাইর আল-নীল
	কায়রো, ১৯৬৮
জুলফিক্কার হায়দার, সূফী	: নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়
	ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭১/১৯৬৪
জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ	: কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন
	ঢাকা: বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ডিসেম্বর, ১৯৮২
ত্বাহা হুসাইন, ড.	: হাফিজ ওয়া শাওকী
	কায়রো: মাত্‌বা'আত আল-ই'তিমাদ, ১৯৩৩
চৌধুরী, তিতাশ	: এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
	কুমিল্লা: ভিনাস প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৯৭/আগষ্ট, ১৯৯০
	: দায়েরায়ে মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা ২য় খণ্ড
	লাহোর: ১ম সংস্করণ, ১৩৮৬/১৯৬৬
আল-দাসূকী, ওমর	: ফী আল-আদব আল-হাদীস ২য় খণ্ড
	কায়রো: দার আল-ফিক্‌র আল-আরবী, ১৯৫০
দরবার আলম, শেখ	: অজানা নজরুল
	ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫/১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

দিদার, লাল মোহাম্মদ : নজরুল সঙ্গীতে মহানবী: বিচিত্র অনুভবে
কান্ডারী হুশিয়ার (নজরুল জন্মশত বার্ষিক স্মারক)
ঢাকা: নজরুল জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬/২৫ মে, ১৯৯৯

নাসিফ, আলী নাজ্দী : আল-দ্বীন ওয়া আল-আখলাক ফী শি'র শাওকী
কায়রো: ১৯৬৪

নকিবুল্লাহ, মু: : আরবী ছন্দ বিজ্ঞান
রাজশাহী :বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৪০০/মার্চ, ১৯৯৪

নূরুদ্দীন আহমদ : আস্-সাব্উল মু'আল্লাকাত
ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২

নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ : সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫/১৯৮৮

নূর-উল ইসলাম, মুস্তফা (সম্পাদিত) : নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮/জুন, ১৯৯১

: নজরুল ইসলাম
ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯
করাচী: বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৬৯

নূরুল ইসলাম, মুহাম্মদ, শেখ : নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী
ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

নূরুল ইসলাম, শেখ : জাতীয় কবির মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলার চক্রান্ত
ঢাকা: দৈনিক দিনকাল, ১২ ভদ্র, ১৪০৬/২৭ আগষ্ট, ১৯৯৯

নজরুল ইসলাম, কাজী : অগ্নি-বীণা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০১/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

: দোলন-চাঁপা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, বৈশাখ, ১৪০২/এপ্রিল, ১৯৯৫

: বিষের বাঁশী
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০১/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

: ভাঙার গান
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/অক্টোবর, ১৯৯৬

: ছায়ানট
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/মার্চ, ১৯৯

: পূবের হাওয়া
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক, ১৪০৩/অক্টোবর, ১৯৯৬

: সাম্যবাদী
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

: চিত্তনামা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক, ১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬

: সর্বহারা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০১/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

: ফণি-মনসা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, কার্তিক, ১৪০৩/অক্টোবর, ১৯৯৬

: সিন্ধু হিন্দোল
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, চৈত্র, ১৪০৩/মার্চ, ১৯৯৭

: জিঞ্জীর
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪/মে, ১৯৯৭

: সঞ্চিতা
ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯১

: চক্রবাক
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, চৈত্র, ১৪০৩/এপ্রিল, ১৯৯৭

: সন্ধ্যা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

: প্রলয়শিখা
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/অক্টোবর, ১৯৯৬

: নির্ঝর
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

: নতুন চাঁদ
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আশ্বিন, ১৪০৩/সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

: মরু-ভাস্কর
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪/জুন, ১৯৯৭

: শেষ সওগাত
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, বৈশাখ, ১৪০৪/এপ্রিল, ১৯৯৭

: ঝড়
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ফাল্গুন, ১৪০৩/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

: কাব্য আমপারা
কলকাতা : করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৯৩৩

: একটি চিঠি
ঢাকা: নজরুল একাডেমী পত্রিকা, বসন্ত, ১৩৭৬

নূরুল হুদা, মুহাম্মদ (সম্পাদিত) : নজরুলের কবিতা সমগ্র
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭/মে, ২০০০

নূরুল হুদা, মুহাম্মদ ও রশিদুন নবী (সম্পাদিত) : নজরুলের নির্বাচিত কিশোর সাহিত্য
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, আষাঢ়, ১৪০৪ / জুন, ১৯৯৭

গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র : চলমান জীবন

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা: ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, দ্বিতীয় পর্ব, তা. বি.

চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ : সাংবাদিক নজরুল
কলকাতা, ১৯৮৭

আল-ফাখূরী, হান্না : তারীখ আল-আদব আল-আরবী
বৈরুত: আল-মাতবা'আত আল-বূলীসিয়া, তা. বি.
: আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী
বৈরুত: দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬

ফীলীব হাত্তী : তারীখ আল-আরব
বৈরুত: দার গান্দূর লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্‌র ওয়া আল-তাওযী', ১৯৭৪

ফাহ্‌মী, মাহির হাসান : শাওকী: শি'রুহ আল-ইসলামী
কায়রো: ১৯৫৯

আবু ফাতেমা,ইসহাক, মোহাম্মদ : মুসলিম রেনেঁসায় নজরুলের অবদান
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭০

আল-বা'আলাবাক্কী, মুনীর : আল-মাওরিদ
বৈরুত: দার আল-ইল্‌ম লিল মালায়্যীন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৭৮

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) : কাজী নজরুল ইসলাম

মানদূর, মুহাম্মদ, ড. : মুহাদারাত আন মাস্‌রাহিয়্যাতু শাওকী
কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪
: আল-শি'র আল-মিসরী বা'দা শাওকী
কায়রো: নাহদাতু মিসর লিল তাবা'আ ওয়া আল-নাশ্‌র ওয়া আল-তাওযী'
আল-ফাজালাহ, তা. বি.

আল-মুহান্দিস,আলী মাহমূদ,ত্বাহা : মাওত আল-শাইর 'আল-মুক্‌তাতফ' ৩য় খণ্ড
কায়রো: ডিসেম্বর, ১৯৩২

মারুন 'আব্বূদ : শাওক ওয়া হাফীজ
বৈরুত: আল-মাজাল্লা আল-কিতাব, অক্টোবর, ১৯৪৭

মাজ্‌মা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যা: আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত
মিসর: দার আল-মা'আরিফ, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২/১৯৭২:
২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩/১৯৭৩

খান, আবদুল মান্নান, আ. ন. ম. : উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক স্টাডিজ
ও কুরবান আলী, মুহাম্মদ
ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১মপ্রকাশ, সেপ্টেম্বর,১৯৮৮, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৪
: ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ
ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯

খান, আবদুল মুনিম, মুহাম্মদ : আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা
ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ,৩য় সংখ্যা,এপ্রিল-জুন,১৯৯৮
: আরবী কাব্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশস্তিগাথা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলা বিভাগ, 'সাহিত্য পত্রিকা', ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

: ইমরুউল কায়স-এর জীবন ও তাঁর মু'আল্লাকায় প্রণয়গীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৬৯,ফেব্রুয়ারী, ২০০১/ ফাল্গুন, ১৪০৭

মুছলেহ উদ্দীন, আ. ত. ম. : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২

মেহেরুল্লাহ, জি. এম. : আরবী কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য
ঢাকাঃ আল-নাহ্‌দা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

মুমতাজী, মুহাম্মদ সিকান্দার : আহমাদ শাওকী ও তাঁর আধুনিক আরবী কাব্য
ঢাকাঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, মে, ১৯৭০

খান, মঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ : যুগস্রষ্টা নজরুল
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৫/১৯৭৮

মোদাব্বের, মোহাম্মদ : নজরুল ইসলাম
ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৩৮৮/১৯৮২

মুজফ্‌ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা
ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৭৩

মুজীবুর রহমান, মুহাম্মদ, ড. : নজরুল অনূদিত 'কাব্যে আমপারা'
ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ১০ম সংকলন, বসন্ত, ১৩৯৬

মনোয়ারা হোসেন : নজরুলের কাব্য আমপারা
ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, মাঘ, ১৪০৭/ফেব্রুয়ারী, ২০০১

মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ : নজরুলের ইসলামী গান ও মুসলিম সমাজ
ঢাকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯৪

আবুল মনসুর, আহমদ : সাহিত্য ও যুগ ধর্ম
সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৬/১৯২৬

চৌধুরী, আবদুল মুকীত (সম্পাদিত) : নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, মে, ১৯৮২

: নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭/মে, ১৯৮০

চৌধুরী, আবদুল মুকীত : বাংলাদেশে নজরুলঃ বিদায়ী সালাম
ঢাকাঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৩৮৪

: শেষ সালাম
ঢাকাঃ নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮৪

আবদুল মান্নান, সৈয়দ : নজরুল ইসলামঃ কবি ও কবিতা
ঢাকাঃ নজরুল একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৮৪/আগষ্ট, ১৯৭৭

আলী, মোবাশ্বের : নজরুল প্রতিভা
ঢাকাঃ মুক্তধারা, ৩য় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯৫/ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকী, মাহবুবা, ড.	: আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১/মে, ১৯৯৪
মজুমদার, মোহিতলাল	: বাংলা কবিতার ছন্দ
	: একখানি পত্র মোসলেম ভারত, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৭
আল-যাইয়্যাত, আহমাদ হাসান	: তারীখ আল-আদব আল-আরবী বৈরুত: দার আল-ছাকাফা, ২৮ তম সংস্করণ, তা. বি.
যায়দান, জুরজী	: তারীখু আদব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যা ২য় খণ্ড
আল-যুবায়দী, মুহাম্মদ মুরতাদা, আল-সায়্যিদ	: তাজ আল-আরুস ২য় খণ্ড বৈরুত : মাতাবি' দার সাদির, ১৯৬৬
আল-রুসাফী, মারূফ	: আল-দীওয়ান বৈরুত: আল-মাক্তাব আল-আহলিয়্যা, তা. বি.
আল-রাফিয়ী, মুস্তাফা সাদিক	: শাওকী 'আল-মুক্তাতফ ৩য় খণ্ড কায়রো: নভেম্বর, ১৯৩২
আল-রিকাবী, জুদাত, ড.	: ফী আল-আদব আল-উন্দুলুসী মিসর: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫
রফিকুল ইসলাম, ড.	: কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৮৯/ এপ্রিল ১৯৮২
	: কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য কলকাতা: কে . পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯১
	: নজরুল জীবনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৯/ ১৯৭২
	: নজরুল নির্দেশিকা ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯
	: নজরুল এ্যালবাম ঢাকা: ১৯৯৪
	: নজরুল প্রসঙ্গে ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৪০৫/ আগষ্ট, ১৯৯৮
	: রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, 'সাহিত্য পত্রিকা' ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫/ অক্টোবর, ১৯৯৭
বিন হাবিব, আবদুর রহমান (সম্পাদিত)	: বি. সি. এস. টেক্স্ট এন্ড গাইড ঢাকা: গুরুগৃহ প্রকাশনী, ১৯৯৫
লুৎফর রহমান, এস. এম.	: অনুবাদ সাহিত্যে নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯২
শাওকী দায়ফ, ড.	: আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর

Dhaka University Institutional Repository

কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৭, ৫ম সংস্করণ, ১৯৬১

: তারীখ আল-আদব আল-আরবী ২য় খণ্ড
কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১২শ সংস্করণ, তা. বি.

: শাওকী শাইর আল-আসর আল-হাদীস
কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৩

: ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাক্দিহি
কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭

: আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফী আল-শি'র আল-আরবী
মিসর: দার আল-মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৪৩, ৮ম সংস্করণ, ১৯৬০

শওকত, মুহাম্মদ হামিদ : আল-মাসরাহিয়্যাতু ফী শি'র শাওকী
কায়রো, ১৯৪৭

আহমদ, শাহাবুদ্দীন : ইসলাম ও নজরুল ইসলাম
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট, ১৯৮০

: নজরুল সাহিত্য-বিচার
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬
১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬/ মে, ১৯৯৯

আহমদ, শাহাবুদ্দীন (সম্পাদিত) : নজরুলের পত্রাবলী
ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২/মে ১৯৯৫

শামসুদ্দীন, আবুল কালাম : অতীত দিনের স্মৃতি
ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

: কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান
সওগাত, পৌষ, ১৩৩৩

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ : আমার বন্ধু নজরুল
কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

: কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬৭/১৯৬০

শিশির কর : নিষিদ্ধ নজরুল
কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর, ১৯৮৩

: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮২

সূরতী, আবদুর রহমান তাহির (অনূদিত) : তারীখে আদবে আরবী লি আহমাদ হাসান যাইয়্যাত
লাহোর: শায়খ গুলাম আলী এন্টারপ্রাইজ পাবলিশার্স, ১৯৬১

আল-সানদূবী, হাসান : আল-শু'আরা আল-ছালাছা
মিসর: মাতবাআতু আল-মাকতাবা আল-তিজারিয়্যা, ১৩৪১/১৯২২

বিন হুসাইন, মুহাম্মদ সা'দ, ড. : আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু 'আল-আসর আল-হাদীস'
রিয়াদ:মাতাবি' জামিয়া আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়্যা,

Dhaka University Institutional Repository

১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.: ৫ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.

আবদুস সাত্তার : আধুনিক আরবী সাহিত্য
ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
: নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ
ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ফাল্গুন, ১৩৯৮/ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২
: নজরুল ও অধ্যাত্মবাদ
ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬/মে, ১৯৯৯

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম : নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন
আফজালুল বাসার (অনূদিত) ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

আসগর, সৈকত : নজরুলের গদ্যরচনা ভাবলোক ও শিল্পরূপ
ঢাকা: অস্ট্রিক পাবলিশার্স, আগষ্ট, ১৯৯০

জাহাঙ্গীর, সেলিম : লোকায়ত নজরুল
ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, আষাঢ়, ১৪০৪/জুন, ১৯৯৭

দাস, সজনীকান্ত : আত্মস্মৃতি ১ম খণ্ড
কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
কলকাতা: বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬৫

গুপ্ত, সুশীলকুমার, ড. : নজরুল চরিত মানস
কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৭

ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ : যাত্রী
কলকাতা, ১৩৫৭

আল-হুফী, আহমাদ মুহাম্মদ : আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী
কায়রো: ১৩৯২/১৯৭২

আল-হুর, আবদুল মাজীদ, ড. : আহমাদ শাওকী আমীর আল-শু'আরা ওয়া নাগ্‌ম আল-লাহন ওয়া আল-গিনা
বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১৩/১৯৯২

হায়কাল, মুহাম্মদ হুসাইন, ড. : মুকাদ্দিমাতু আল-শাওকিয়্যাত ১ম খণ্ড
কায়রো: দার আল-কিতাব আল-আরবী, তা. বি.

হামূদা, আবদুল ওয়াহ্হাব : নি'মাত ওয়া হিরমান
বৈরুত: আল-মাজাল্লা আল-কিতাব, অক্টোবর, ১৯৪৭

আল-হাশিমী, আহমাদ : জাওয়াহির আল-আদব
মিসর: আল-মাকতাবা আল-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৪

হুসাইন শাওকী : আবী শাওকী
কায়রো, ১৯৪৭

চৌধুরী, হাসান আলী : ইসলামের ইতিহাস
ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হায়াৎ মামুদ : নজরুল
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৩৯০/১৯৮৩
: প্রতিভার খেলা নজরুল
ঢাকা: চেতনা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪/১৯৮৮

হারুন অর রশীদ, মোঃ : নজরুল সাহিত্যে ধর্ম
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৪০৩/ অক্টোবর, ১৯৯৬
: নজরুলের কবিতা ও গানে আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, সাহিত্য পত্রিকা, ৪২ বর্ষ,১ম সংখ্যা,
কার্তিক, ১৪০৫/অক্টোবর, ১৯৯

আবুল হোসেন, মীর (সম্পাদিত) : নজরুল সাহিত্য
ঢাকা: রওনক পাবলিকেশান্স, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭/ মে ১৯৬০

Brugman, J. : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt
Leiden: E. J. Brill, Journal of Studies in Arabic Literature, Vol- X, 1984

Badawi, M. M. : A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry
Cambridge: University Press, First Published, 1975.
: Modern Arabic literature
Cambridge: University Press, First Published, 1992.

Cachia, Pierre : An Overview of Modern Arabic literature
Edinburgh: University Press, 1990.

Haywood, John, A. : Modern Arabic Literature 1800-1970
London: Lund Humphries, First Edition, 1971

Hans Wehr : A Dictionary of Modern Written Arabic
New York: Spoken Language Services, Inc. 1976

Jayyusi, Salma, Khadra : Trends and Movements in Modern Arabic Poetry
Leiden : E. J. Brill, Journal of Studies in Arabic Literature, Vol. vi. 1977

Khouri, Mounah, A. : Poetry and the Making of Modern Egypt 1882-1922
Leiden: E. J. Brill, 1971

Mahdi, Ismat : Modern Arabic Literature 1900-1967
Hyderabad: Dairatul Ma'arif Press, First Published, 1983

Nicholson, R. A. : A Literary History of the Arabs
Cambridge: University Press, First Published, 1930.